(মহাপাতকীর জীবনে)

সদ্‌গুরুর লীলা ।

কুলীনগ্রাম নিবাসী বসু রামানন্দ-বংশধর
বোলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল—
শ্রীহরিদাস বসু দ্বারা প্রণীত
ও প্রকাশিত ।

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা
১৯৩।১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীদেবকীনন্দন প্রেসে
শ্রীপুলিনবিহারী দাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ।

[১০০০ কপি]

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র ।

সূচীপত্র।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

(মহাপাতকীর জীবনে)

সদ্‌গুরুর লীলা।

কুলীনগ্রাম নিবাসী বসু রামানন্দ-বংশধর

বোলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল—

শ্রীহরিদাস বসু দ্বারা প্রণীত

ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা

১৯৩।১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীদেবকীনন্দন প্রেসে

শ্রীপুলিনবিহারী দাস কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

[১০০০ কপি]

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

ভারতবর্ষ আর্য্যঋষিগণের তপস্যার স্থান, অতি প্রাচীন কাল হইতে তাঁহারা কঠোর তপস্যা করিয়া পরমেশ্বরকে লাভ করতঃ তাঁহাকে হস্তামলকবৎ দর্শন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের বংশধরেরা যুগযুগান্তরব্যাপী তপস্যা দ্বারায় ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া ক্রমে ক্রমে সনাতন ধর্ম্মের চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। তাঁহাদের তপস্যার ফলে হিন্দু জাতি ধর্ম্ম সম্বন্ধে সমস্ত পৃথিবীর শীর্ষ-স্থানীয়। হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে রুচি ও অধিকার ভেদে বিভিন্ন পন্থার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কাহাকেও ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করা হয় নাই। প্রবৃত্তি ও অধিকার অনুসারে কেহ কর্ম্মী, কেহ ব্রহ্মোপাসক, কেহ যোগী, কেহ বা ভক্ত, কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ দ্বৈতবাদী, কেহ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, কেহ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহার যতটুকু জ্ঞান বা বিশ্বাস, তিনি সেই মত ধর্ম্ম সাধন করিয়া থাকেন। এই উদার ধর্ম্ম সকল পন্থাবলম্বীকেই আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। ভগবান্ এই সনাতন ধর্ম্মকে চিরকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছেন

এবং ধর্ম্ম রক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ * করায় মহাত্মাগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

এই সনাতন ধর্ম্মকে বহুকাল হইতে নানা উৎপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি সকল ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়া ইহাকে নির্ম্মূল করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। এক সময় শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের দ্বারায় ভারতবর্ষপরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, পরে ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রভাবে এই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া দেশান্তরে আশ্রয় লইল, সনাতন ধর্ম্ম ভারতবর্ষে পুনঃ স্থাপিত হইল।

তাহার পর আবার মুসলমানেরা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া সনাতন ধর্ম্মের বিনাশ সাধন মানসে ৭০০ শত বর্ষব্যাপী তরবারি চালাইতে লাগিল; শাস্ত্র গ্রন্থ সকল ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। প্রকাশ্য ভাবে হিন্দুধর্ম্ম যাজন ও প্রচার বন্ধ করিয়া দিল, ছলে ও বলে হিন্দুদিগের জাতি নাশে প্রবৃত্ত হইল, দেব-মন্দির ও দেব-মূর্ত্তি সকল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে লাগিল। রাজনীতির কৌশলজাল বিস্তার করিয়া ও নানা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া হিন্দুগণকে

---

* যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত,
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

মুসলমান করিতে লাগিল ; ধর্ম্ম রক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী চিতারোহণে ও মুসলমানের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভগবান আর কত সহ্য করিবেন ? দুঃস্থ ভারতবাসীর আর্ত্তনাদে তিনি বিচলিত হইলেন ; ভারতবর্ষের শাসন ভার মুসলমানের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া সুসভ্য ইংরাজ জাতির হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিবেন, প্রজার ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। ভারতে শান্তি স্থাপিত হইল ; নিদাঘতাপে সন্তাপিত ভারতবাসী ইংরাজ শাসনের সুশীতল ছায়ায় প্রাণ জুড়াইতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া প্রেম-ভক্তি-পরিমার্জ্জিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কালক্রমে সনাতন ধর্ম্মে যে সকল গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নিরাকৃত করিলেন।

কিছুকাল পরে আবার এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল—খ্রীষ্টান রাজার রাজ্য দেখিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ইংরাজী শিক্ষিত তরুণ যুবকগণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আপাতঃ রমণীয় আলোকে বিমোহিত হইয়া, পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ দলে দলে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে পাদরীগণ উৎসাহিত হইয়া গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন করতঃ ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও যুবকগণকে

খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। ইহাদের নিকট হিন্দুর দেব দেবী উপহাসের বস্তু হইল, শাস্ত্রগুলি ব্রাহ্মণের ঘরে তালপাতার পুঁথী আকারে লুক্কাইত থাকিল; কেহ শাস্ত্র পড়িতে পাইল না বা পড়িবার চেষ্টা করিল না; শাস্ত্রে কি আছে, না আছে, কিছুই টের পাইল না। এদিকে পাদ্রীগণ বাইবেল প্রভৃতি খ্রীষ্ট ধর্ম্মের গ্রন্থসকল বিনামুল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া সরল প্রকৃতি যুবকগণের মাথা ঘুরিয়া গেল, তাহারা আর স্বধর্ম্মে স্থির থাকিতে পারিল না; সদাহার সদাচার কুসংস্কারের মধ্যে পরিগণিত হইল, ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুগণ প্রমাদ গণিল; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কথা কে শুনে? তাঁহারা শিক্ষিত যুবকগণের নিকট হাস্যাস্পদ; কে তাহাদিগকে গ্রাহ্য করে? হিন্দুধর্ম্ম যায় যায়।

এইবার আবার হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য ভগবান অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। দেশের উপস্থিত বিপদ দেখিয়া রাজা রামমোহন রায়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি রাজধানী কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া শিক্ষিত যুবকগণকে স্বধর্ম্ম আলোচনার জন্য আহ্বান করিলেন। ব্রহ্মসভা সংস্থাপিত হইল। উপনিষদের প্রতিপাদ্য পর-ব্রহ্মের উপাসনাই যে প্রকৃত উপাসনা, ইহাই শিক্ষিত যুবক গণকে বুঝাইতে লাগিলেন। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

বলিয়া লোক সমাজে ঘোষণা করিতে লাগিল। গুরুবাদ মিথ্যা কথা; ভগবান্ সর্ব্বদর্শী, তাঁহাকে আত্মনিবেদন করিবার জন্য গুরুরূপী একটা উকিল বা মোক্তারের আবশ্যক রাখে না; অবতার বাদ, পুনর্জ্জন্মবাদ এ সব রূপকথার কথা। ইহার মূলে কোন সত্য নাই; হিন্দুয়ানী কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মগণ এই সব প্রচার করিতে লাগিল; তাহারা হিন্দুগণ হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক্ করিয়া তুলিল। আপনাদিগকে অহিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল ও ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের ঘোর বিদ্বেষ্টা হইয়া পড়িল। হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে ভীষণ সমর ঘোষণা করিয়া দিল। যাহারা এক সময় খ্রীষ্টান ধর্ম্মের গ্রাস হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিল, আজ তাহারাই আবার হিন্দুধর্ম্মকে সমূলে বিনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

খ্রীষ্টান হওয়া বন্ধ হইয়াছে। এইবার ব্রাহ্মদিগের প্রচারে যুবকগণ আকৃষ্ট হইয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। আত্মীয় স্বজনের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিল, গুরু পুরোহিত ত্যাগ করিল; অসবর্ণ বিবাহ করিয়া বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন করিতে লাগিল; স্ত্রীস্বাধীনতা দিয়া সাহেব সাজিয়া বসিল; হিন্দুর আর কিছুই ভাল দেখিতে পারিল না; ইংরাজী শিক্ষার যতই বিস্তার হইতে লাগিল। শিক্ষিত লোক সকল ততই

ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিতে লাগিল। হিন্দু-সমাজ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়িল ; হিন্দুধর্ম্ম আর টেকে না। শিক্ষিত যুবকগণের নিকট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মূর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। গুরুগুলা অপদার্থ, তাহাদের কথা শুনে কে? পাদ্রী-গণের ন্যায় ব্রাহ্মগণকে নিরস্ত করিবার কেহ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মগণ ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিয়া অবাধে হিন্দুধর্ম্ম বিনাশে তৎপর হইলেন।

সরল বিশ্বাসী হিন্দুগণকে ব্রাহ্মেরা বুঝাইয়া দিল, ব্রাহ্মণেরা দেশটাকে মাটী করিয়াছে, তাহারা ব্রাহ্মণেতর জাতিগণকে সর্ব্বপ্রকার অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া আপনাদের স্বার্থ সাধন করিয়াছে। তোমরা জাগ্রত হও, স্বাধীন চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদের কল্যাণ দেখ, ব্রাহ্মণগণের কুহকে পড়িয়া আর ঘুমাইয়া থাকিও না, আপনার উন্নতির পথে অগ্রসর হও ; পাশ্চাত্য জাতি সকলের ন্যায় তোমরাও সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে যত্নবান হও। এই সকল কথা যুবকগণের কর্ণে মধু বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহারা আর হিন্দুয়ানীর গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে চাহিল না, চারিদিকে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হইল, যুবকগণ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। যাহারা প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইল না তাহাদেরও হৃদয় ব্রাহ্মভাবে পরিপূর্ণ হইল ; ফলতঃ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আচার ব্যবহারে জন সাধারণের অনাস্থা জন্মিল।

এইরূপে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মগণের আক্রমণে মৃতপ্রায় হইল ; ইহাকে আর বাঁচাইবার কোন উপায় নাই ; ইংরাজরাজত্ব, কাটাকাটী রক্তারক্তীর উপর নাই ; বিচার তর্কে ব্রাহ্মগণকে পরাস্ত করা অসম্ভব। তাহারা সুপণ্ডিত ও সুসভ্য ; রাজনীতি, সমাজনীতি, সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন ও শিক্ষা তাহাদের হস্তে। সমস্ত সংবাদ পত্র তাহাদের দ্বারায় পরিচালিত ; কালপ্রভাবে দেশের লোকের রুচিও ব্রাহ্মদিগের অনুকূল ; সুতরাং সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জীবন রক্ষা একেবারে অসম্ভব।

ভগবান সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এজন্য এইবার তিনি এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিলেন ; মুমূর্ষু হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য সময়োচিত ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্ম সমাজের একজন খ্যাতাপন্ন লোক, অত্যন্ত ধর্ম্মপিপাসু, ব্রাহ্মগণের আদর্শ পুরুষ ও নেতা ; ব্রাহ্ম মাত্রেই তাঁহাকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন। ইনি হিন্দুধর্ম্মের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সমাজ সংস্কারকদিগের অগ্রণী। ব্রাহ্ম-সমাজের উচ্ছেদ সাধন ও সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য ইঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া গয়ায় আকাশগঙ্গা পাহাড়ে কোন মহাত্মা ইঁহাকে নিজশক্তিবলে অভিভূত করিয়া বলপূর্ব্বক দীক্ষামন্ত্র প্রদান করেন। দীক্ষার অল্পদিন পরে ইনি অবস্থা লাভ

করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। হিন্দুশাস্ত্র অভ্রান্ত, দেবদেবী সব সত্য, ভগবত প্রাপ্তির পক্ষে সদ্‌গুরুর কৃপালাভ ভগবানের অব্যর্থ নিয়ম, ইত্যাদি ধর্ম্মের যাবতীয় নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইলেন। ব্রাহ্মগণের ভ্রান্তি, ব্রাহ্মধর্ম্মের অসারতা বুঝিতে পারিলেন। ব্রাহ্ম-দিগের সাধন প্রণালী ও সামাজিক আচার ব্যবহার যে উচ্চ ধর্ম্ম লাভের সম্পূর্ণ অন্তরায় ইহা জানিতে আর তাঁহার বাকি রহিল না। যে ভগবানকে লাভ করিবার জন্য সংসারের যাবতীয় বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন, গোস্বামী মহাশয় আজ সেই ভগবানকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাঁহার সকল আশা পূর্ণ হইল। এতদিনের পর যদিও গোস্বামী মহাশয় প্রকৃত হিন্দু হই-লেন, কিন্তু গুরু আজ্ঞায় তাঁহাকে কয়েক বৎসর যাবত ব্রাহ্ম-সমাজেই থাকিতে হইল। ব্রাহ্মগণ গুরুবাদ স্বীকার না করিলেও গোস্বামী মহাশয়ের প্রভাব দেখিয়া দলে দলে তাঁহার নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয় মুখে কাহাকেও কিছু বলিলেন না, কেবল তাঁহার প্রদত্ত মহামন্ত্রপ্রভাবে তাহারা হিন্দু হইতে লাগিল। ব্রাহ্ম-সমাজের সামাল সামাল পড়িয়া গেল। তাহারা আর হিন্দু-সমাজকে আক্রমণ করিবেন কি ? ব্রাহ্ম-সমাজ রক্ষা করাই তাহাদের পক্ষে দায় হইল। যে সকল উৎ-পথগামী ব্রাহ্ম কিছুতেই গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা

যায় না। এইরূপে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম খ্রীষ্টান ধর্ম্মের গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিল।

অতঃপর নব্য যুবকদল ব্রহ্মোপসনার রসাস্বাদন করিয়া মহোৎসাহে ব্রহ্মনামের জয় পতাকা দেশে দেশে উড়াইয়া দিলেন, তাঁহারা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আন্দোলনে সুদূর ইয়ুরোপ, আমেরিকা পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম কেবল যে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইল এমত নহে, সুদূর আমেরিকা ও ইয়ুরোপে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়িল, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতিভায় খ্রীষ্টান ধর্ম্ম মলিন হইয়া গেল।

এইবার আবার সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মহাবিপদ উপস্থিত হইল। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ব্রাহ্মগণ ইয়ুরোপ বাসীর আদর্শে আপনাদের সমাজ গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া হিন্দু মুসলমান, হাড়ী শুঁড়ী ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সব এক করিতে লাগিলেন। বিধবা বিবাহ দিয়া পবিত্র সতী ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। যাহার তাহার হাতে যাহা তাহা খাইতে লাগিলেন; খাদ্য রুচিকর ও স্বাস্থ্যকর হইলেই হইল। ইহাঁদের নিকট সদাচার, সদাহার বলিয়া কোন জিনিস থাকিল না। শ্রীবিগ্রহ সকল ইট, কাট, পাথর বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। শাস্ত্রগুলি কেবল গাঁজাখুরী

ঘোষণা করিলেন। পাদরীগণকে বিচারে আহ্বান করিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও অকাট্য যুক্তি-তর্কের নিকট সকলকে পরাস্ত হইতে হইল। খ্রীষ্টধর্ম্মের অসারতা, উহার ভ্রম প্রমাদ তিনি সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিলেন। শিক্ষিত যুবকগণের মতি ফিরিল। খ্রীষ্টধর্ম্মের অসারতা উপলব্ধি হওয়ায় তাহারা আর খ্রীষ্টধর্ম্মের পক্ষ-পাতী থাকিলেন না। ব্রহ্মোপাসনায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের হস্তে ব্রহ্ম-সভার ভারার্পণ করিয়া তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তথায় তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

তাহার পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মোপাসনায় প্রাণ মন ঢালিয়া দিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইল, তিনি তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য, অসামান্য প্রতিভা, সুগভীর সাধনা ও অসাধারণ জ্ঞান এই খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রতিরোধ ও ব্রহ্মোপাসনা প্রচারে নিয়োগ করিলেন। ক্রমে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও সাধু অঘোরনাথ প্রভৃতি অনেক ধর্ম্মপিপাসু উৎসাহী যুবক এই ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্ম নামের জয়ডঙ্কা চারিদিকে বাজিয়া উঠিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইল। পাদ্রীগণের প্রচার বন্ধ হইয়া গেল। Missionary school সকল উঠিয়া গেল। আর কোন যুবক খ্রীষ্টান হইতে

গ্রহণ করিবে না, গোস্বামী মহাশয় তাহাদিগের সম্মুখে এমন সব কৌশল জাল বিস্তার করিতে লাগিলেন যে, তাহারা গোস্বামী মহাশয়ের কৌশল বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার জালে পড়িতে লাগিলেন এবং দীক্ষা গ্রহণানন্তর ব্রাহ্ম-সমাজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

ব্রাহ্মগণ কি ধাতুতে নির্ম্মিত গোস্বামী মহাশয় তাহা জানিতেন ; ব্রাহ্মগণ পিতামাতার ক্রন্দনে কর্ণপাত করে নাই, আত্মীয় স্বজনের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে ; স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী হইয়া শাস্ত্র সদাচার ঠাকুর দেবতা সব অগ্রাহ্য করিয়াছে, ইহারা কাহারও কথা শুনিবে না ; একারণ গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মগণের নিকট ব্রাহ্ম-সাজে সজ্জিত থাকিয়া,কেবল একটী দীক্ষামন্ত্র প্রদান করি-তেন। এই মন্ত্রশক্তির এমনি প্রভাব যে, এই মন্ত্রশক্তির বলে ব্রাহ্মগণ আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিন্দু হইতে লাগিলেন। তাহারা বহু চেষ্টা করিয়াও স্বমতে স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিলেন ; ব্রাহ্মধর্ম্মের অসারতা বুঝিতে পারি-লেন ; হিন্দু-আচার ব্যবহার গ্রহণ করিলেন এবং অনেকে আপন আপন আত্মীয় স্বজনকে হিন্দুসমাজ হইতে আনিয়া গোস্বামী মহাশয়ের পদপ্রান্তে সমর্পণ করিলেন। এই সময় শাস্ত্রগ্রন্থ সকল ছাপা হইতে লাগিল হরিসভার ধূম পড়িয়া গেল, হিন্দু প্রচারকগণ হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিয়া

বেড়াইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মদিগের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল, হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপিত হইল। শাস্ত্র ও সদাচার রক্ষিত হইল।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ মধ্যে অনেকেই হিন্দু-ধর্ম্মের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাহারা গুরুবাদ, শাস্ত্র, সদাচার ও ঠাকুর দেবতার ঘোর বিদ্বেষী, উৎপথগামী ব্রাহ্ম ছিলেন। ইহাদের মধ্যে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য গোস্বামী মহাশয়কে কিরূপ অলৌকিক কৌশল জাল বিস্তার করিতে হইয়াছে এবং কি অমানুষী শক্তিবলে ইহাদের মত ও ধর্ম্মবিশ্বাস পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এই গ্রন্থে তাহার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মের একজন ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন; শাস্ত্র-সদাচার ঠাকুর-দেবতা গুরুবাদ বা মধ্য-বর্ত্তী বাদের বিরোধী ছিলেন। কি কৌশলে কি অমোঘ শক্তির বলে গোস্বামী মহাশয় তাহাকে হিন্দু করিয়াছেন এই কথা প্রকাশ করিবার জন্য গোস্বামী মহাশয়ের কোন কোন শিষ্য একান্ত অনুরোধ করায় গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহার কথঞ্চিৎ বর্ণন করিলেন। অতিরিক্ত বা রঞ্জিত কোন কথা লিখিত হয় নাই, বরং এই অবিশ্বাসের যুগে সকল কথা প্রকাশ করিতে তিনি সাহস করেন নাই। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের বা গোস্বামী মহাশয়ের জীবন-চরিত লিখিত হয় নাই। গোস্বামী মহাশয়ের জীবন-চরিত তাঁহার

জীবনী লেখকগণ লিখিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থকারের সহিত গোস্বামী মহাশয়ের যতটুকু সংশ্রব ও তিনি গ্রন্থকারের জীবনে যে যে লীলা করিয়াছেন কেবল তাহাই সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে সাধন রাজ্যের অনেক তত্ত্ব পাঠকগণ জানিতে পারিবেন।

বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলের পাঠোপযোগী করিবার জন্য এই পুস্তক চলিত কথায় লিখিত হইয়াছে, ইহাতে দীক্ষাতত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব, পুনর্জ্জন্ম বাদ, ভগবত্তত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের বর্ণনা আছে। যিনি একবার এই গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেন, তিনি ইহার শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারিবেন না। ধর্ম্ম পিপাসু চিন্তাশীল লোক মাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা এই গ্রন্থ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ করিবেন তাঁহারা নিশ্চয়ই জীবনে বিশেষ উপকার লাভ করিবেন।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

পাঠ্যাবস্থা।

ভক্ত বৈষ্ণব বংশে আমার জন্ম। আমার জ্ঞাতি-যদুনাথ বসু মহাশয়ের নিকট থাকিয়া দিনাজপুরের গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ইংরাজী পড়িতাম। স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্ম ছিলেন। আমাদের বাসার নিকটে ব্রাহ্ম ও ছাত্রগণের প্রধান আড্ডা, আমাদের বাসা বাটীতে শ্রীশ্রী৺কানাইয়া লাল বিগ্রহের সেবা প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ভক্তিভরে ঠাকুরের আরতি দর্শন করিতাম। সহাধ্যায়ী কোন কোন ব্রাহ্ম বালক আরতি দর্শন কালে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কদর্য্য ভাষায় গালাগালি দিতেন; ইহাতে আমার প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগিত। হিন্দু-সমাজে নানা দেবদেবীর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত; কেহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিতেছেন, কেহ কালী দুর্গা ভজিতেছেন, কেহ বা শিব আরাধনা করিতেছেন; এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আমি ইতবুদ্ধি হইতাম। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন দেবতা কে? এবং উপাসনা মনুষ্যের অবশ্য

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সদাচার ও সদাহার ছিল না; আমি স্কুলে যাইবার সময় তাহাদের রান্নাঘরের পিছনে পেঁয়াজ রসুনের খোসা, হাঁসের ডিমের খোলা ও পাখীর পালক দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের উপর অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ ছিলাম; তখন তথাকার হিন্দুদিগের চক্ষে ব্রাহ্মগণ অত্যন্ত ঘৃণিত ছিলেন। কোন ব্রাহ্ম বাসায় আসিয়া বিছানায় বসিলে হিন্দুরা হুঁকার জল ফেলিয়া দিতেন। এজন্য ব্রাহ্মগণ হিন্দুর বাসায় আসিয়া তাঁহাদের বিছানা স্পর্শ করিতে সাহস করিতেন না।

এই সময় পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দিনাজপুরে উপস্থিত হন। আমাদের পাড়ায় কোন ব্রাহ্ম জমিদারের বাসায় তাঁহার বক্তৃতা হইবে, এই কথা শুনিয়া বক্তৃতা শুনিতে যাইবার জন্য আমি খুড়া মহাশয়ের অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি অনুমতি প্রদান করায় সন্ধ্যার পর আমি বক্তৃতা শুনিতে গেলাম। লোকে লোকারণ্য, বক্তৃতার বিষয়—ভক্তি ও বিশ্বাস। গোস্বামী মহাশয় জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। সমস্ত লোক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নীরব নিস্তব্ধ; বক্তৃতা শুনিয়া আমার প্রাণ একেবারে উদাস হইয়া গেল; হাত পায়ে বল নাই, বাসায় আর আসিতে পারি না, মনে করিলাম, আমাদের গুরুবংশীয় এই গোস্বামী যখন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ইহাই

প্রকৃত ধর্ম্ম হইবে। বক্তৃতার বিরুদ্ধে একটী কথা বলিবার নাই।

বাসায় আসিলে খুড়া মহাশয় বক্তৃতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সবিস্তারে বর্ণন করিলাম। খুড়া মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুগণ শুনিয়া নীরব রহিলেন; কোন কথা বলিলেন না।

দিনাজপুরের পড়া শেষ হইলে আমি হুগলী কলেজে পড়িতে লাগিলাম। সহাধ্যায়ী সচ্চরিত্র ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যুবক বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত (ইনি পরে সর্ব্বজন পূজিত মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর শিষ্য হন) আমার অত্যন্ত প্রণয় জন্মিল। তাঁহার সহবাসে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার সঙ্গগুণে আমার নৈতিক জীবন পরিমার্জ্জিত হইল; এবং অন্তর নিহিত ভালবাসার ফোয়ারা যেন খুলিয়া গেল।

হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থা।

হুগলী কলেজের পড়া শেষ হইলে আমি ওকালতী পরীক্ষা দিয়া জেলা বীরভূমের অন্তর্গত বোলপুরে আসিয়া তথাকার মুন্সফী আদালতে ওকালতী আরম্ভ করিলাম। তখন বোলপুরের নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত ঘৃণিত ছিল, মদ্যপান ও ব্যভিচারের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত, এই সকল দুষ্কার্য্য দোষের বলিয়া পরিগণিত ছিল না।

এই সময়ে বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বোলপুরে আসিয়া ঔষধ বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। তিনি একজন অতি উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবক। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রগুণে আমি দিন দিন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা আরম্ভ হইল। উপনিষদ বেদান্তসূত্র প্রভৃতি জ্ঞান শাস্ত্র পাঠে ব্রহ্মোপাসনাই যে মনুষ্যের প্রকৃত ধর্ম্ম ইহাই আমার ধারণা হইল। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমার অনাস্থা জন্মিল। আমি ব্রাহ্মদিগের সহিত খুব মেশামিশি করিতে লাগিলাম। কখনও নববিধান সমাজ কখনও বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে গিয়া উপাসনায় যোগ দিতাম।

আমার জেটতুতা ভগ্নিপতি বাবুযদুনাথ রায় এক জন অতি নিষ্ঠাবান্ ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টায় রামপুরহাটে এক সুন্দর ব্রাহ্মমন্দির সংস্থাপিত হয়। তিনি জীবন ভোর রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে রামপুরহাটে ব্রাহ্মদিগের এক প্রধান আড্ডা হইয়াছিল; যদুবাবু আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, প্রতিবৎসর উৎসবের সময় আমি রামপুরহাট যাইতাম।

আকাশগঙ্গা পাহাড়ে দীক্ষা লাভের পর রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের উৎসব ও যদুবাবুর গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যদুবাবু কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া গোস্বামী মহাশয় রামপুরহাটে আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত, হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু,পরিধানে গৈরিক বসন। সেবার শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথ বাবু ও ত্রৈলোক্য বাবু প্রভৃতি অনেকগুলি নামজাদা ব্রাহ্ম কলিকাতা হইতে রামপুরহাটে আসিয়াছিলেন। এখান-কার ব্রাহ্মমন্দিরের বেদীর কার্য্য ভক্তিভাজন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত ছিল। তিনি অসুস্থতা নিবন্ধন সেবার রামপুরহাটে আসিতে পারেন নাই; শিবনাথ বাবু ও ত্রৈলোক্য বাবু বেদীর কার্য্য করিতে অসম্মত প্রকাশ করায় যদুবাবু চিন্তাকুল হইলেন; এমন সময় গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, চিন্তার কারণ নাই, অদ্যই নগেন্দ্র বাবু আসিয়া উপস্থিত হইবেন। যদুবাবু বলিলেন নগেন্দ্রবাবুর

শরীর অসুস্থ হইয়াছে, তিনি আসিতে পারিবেন না বলিয়া পত্র লিখিয়াছেন। ইহাতে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, অদ্য নিশ্চয়ই নগেন্দ্রবাবু আসিয়া উপস্থিত হইবেন। যদুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কেমন করিয়া বলিতেছেন যে নগেন্দ্র বাবু আসিবেন? তাহাতে গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেন "আমি নগেন্দ্রবাবুকে ঘোড়গাড়ী করিয়া হাবড়া ষ্টেসনে আসিতে, টিকিট খরিদ করিতে ও ট্রেণে উঠিতে দেখিলাম" যথাসময়ে নগেন্দ্রবাবু রামপুরহাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

এইবার রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজে উৎসবের যে জমাট হইয়াছিল এমন আর কখনও হয় নাই; গোস্বামী মহাশয়ের ভাবাবেশে ও নৃত্যে ব্রাহ্মমন্দির যেন কাঁপিতে লাগিল। উপাসক মণ্ডলীর প্রাণ ভাবে গর গর। আমাদের সতীর্থবাবু যুগলকিশোর সরকার এইবার ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

একদিন গোস্বামী মহাশয় বেদীতে বসিয়া উপাসনা করতঃ বক্তৃতায় বলিলেন "হে দেব তুমি আমাকে শিরোমণি কর,—আমাকে পরশুরাম কর—" উপাসনা শেষ হইলে আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম;—

প্রশ্ন—মহাশয় বক্তৃতা কালীন কি বলিলেন? "আমাকে শিরোমণি কর,—আমাকে পরশুরাম কর,—"

এ কথার অর্থ কি ? পরশুরাম ত মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন।

উত্তর—সে পরশুরাম নয়। পূর্ব্ববাঙ্গলায় ধামরাই গ্রামে পরশুরাম বলিয়া একটী জন্মান্ধ লোক ছিলেন তিনি আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তথাকার মাধব বিগ্রহের আশ্রয় লন। মাধবের প্রসাদ খাইতেন, মাধবের বাটীতে থাকিতেন এবং "মাধব মাধব" বলিয়া কাঁদিতেন তিনি অসীম ভক্তি বলে শেষ বয়সে চক্ষু লাভ করিয়াছিলেন। আর শিরোমণির নাম গৌর শিরোমণি; ইনি শ্রীবৃন্দাবনের একজন পরম ভক্ত বৈষ্ণব, আমি ইঁহার মত ভক্ত বৈষ্ণব দেখি নাই; এই বলিয়া শিরোমণি মহাশয়ের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

এই সময় নগেন্দ্রবাবু বলিলেন"একদিন পরশুরাম বাবাজীকে আমি দেখিতে গিয়াছিলাম, তিনি মাধব মাধব বলিয়া কাঁদিতেছেন. আমি তাঁহাকে বলিলাম আপনি মাধব মাধব বলিয়া কেন কাঁদিতেছেন, মাধব যে আপনার সম্মুখে; তাহাতে বাবাজী মহাশয় বলিলেন ও মাধব নহেন উঁহার পশ্চাতে আর এক মাধব আছেন।"

উপাসনান্তে ব্রাহ্ম মন্দির হইতে গোস্বামী মহাশয় বাহির হইয়া আসিলে সম্মুখের বৃক্ষে একটা তিতির পাখী

যেমন ডাকিল অমনি গোস্বামী মহাশয়ের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা, পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে—একদিন চাঁদ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, আর ভাবে বিভোর হইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। একদিন ডাক্তার কেদারনাথ মিত্রের জামাতা তাঁহার বাগান হইতে একটী প্রকাণ্ড গোলাপফুল আনিয়া গোস্বামী মহাশয়ের হস্তে দিলেন, তিনি ফুলটী দেখিতে দেখিতে একেবারে সমাধিস্থ হইলেন।

এইবার ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে সমস্ত নরনারী বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে সে কখনও তাহা ভুলিতে পারিবে না।

গোস্বামী মহাশয় যতুবাবুর গৃহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেবার তাঁহার সঙ্গে দিদিমা (গোস্বামী মহাশয়ের শাশুড়ী) মা ঠাকরুণ (গোস্বামী মহাশয়ের স্ত্রী) নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী কন্যা প্রভৃতি অনেকগুলি ব্রাহ্মমহিলা কলিকাতা হইতে রামপুরহাটে আসিয়াছিলেন; উপাসনান্তে দিদি গরদের একটা জোড় ও কয়েকটী টাকা আনিয়া গোস্বামীমহাশয়কে দিলেন; গোস্বামী মহাশয় যতুবাবুকে বলিলেন, একি? ব্রাহ্মসমাজে আবার পৌরহিত্য? দিদি বলিলেন, না, আমি সেজন্য দিতেছি না; আপনি আমার গুরু বংশীয় কেবল আপনার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমি দিতেছি।

গোস্বামী মহাশয় বস্ত্র ও টাকা নিজে না লইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পাঠাইয়া দিলেন।

যতই ব্রাহ্মদিগের সংসর্গে আসিতে লাগিলাম আমি ততই তাহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। তাহাদের সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মানুরাগ, সরলতা, সদ্ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। ব্রাহ্ম না হইলে কথা কহিয়া তৃপ্তি নাই, ব্রাহ্মের সঙ্গ ব্যতীত অন্য সঙ্গ কুসঙ্গ বলিয়া মনে হইতে লাগিল, সুতরাং ব্রাহ্মদিগের সংসর্গেই কালযাপন করিতে লাগিলাম।

ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগ।

যতই শাস্ত্রালোচনা করিতে লাগিলাম, ব্রহ্মোপাসনাই যে প্রকৃত ধর্ম্ম তাহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। ক্রমে ক্রমে আমি একজন পুরা ব্রাহ্ম হইয়া দাঁড়াইলাম। এই সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। স্থানে স্থানে হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। নানাপ্রচারক নানাদেশে হিন্দুধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন। আমি কোন কোন প্রচারক ও শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ করায় ব্রহ্মোপাসনা যে প্রকৃত ধর্ম্ম তাহা তাঁহারা স্বীকার করিয়া বলিলেন নিকৃষ্ট অধিকারীর জন্য মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মোপাসনা যে প্রকৃত উপাসনা ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। এই সময় বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের যত্নে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আপন শান্তিনিকেতন আশ্রম ব্রহ্মোপাসনার জন্য অর্পণ করিলেন। অঘোরবাবু আশ্রমধারীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

শান্তিনিকেতন বোলপুর হইতে দেড় মাইল উত্তরে

এক সুবিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুরম্য অট্টালিকা, সুন্দর পুষ্পোদ্যান বিবিধ ফলের বাগিচা। চারিদিকে বিস্তৃত প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। এই শান্তিনিকেতন তাঁহার তপস্যার স্থান; এইস্থানে বহুকাল তপস্যা করিয়া বৃদ্ধ বয়সে তিনি কলিকাতার পার্কষ্ট্রীটে গিয়া অবস্থিতি করেন।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মোপাসনার জন্য অর্পিত হওয়ায় আমি নিয়ত তথায় গিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতাম। সাপ্তাহিক উপাসনার দিন ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র ইত্যাদি সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া বোলপুরের বাসা হইতে আমি শান্তিনিকেতনে গিয়া উপাসনায় যোগ দিতাম। কাছারী বন্ধ হইলে শান্তিনিকেতনেই আহার, অবস্থিতি, আলোচনা ও শাস্ত্রপাঠ করিতাম।

আমি যতই ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা করিতে লাগিলাম, হিন্দুধর্ম্ম যে অসার, মিথ্যা ও কপটতায় পরিপূর্ণ ইহাই আমার প্রতীতি হইতে লাগিল; আমি ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের ঘোর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলাম। আমার মনে হইত হিন্দুগণ স্বাধীন চিন্তার অভাবে কেবল ইট, কাট, পাথর পূজা করিয়া মরিতেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় ঘোর কপটাচারী, তাহারা মনে মনে কিছুই মানে না, কেবল বাহিরে ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখাইয়া কপটাচরণ করিতেছে; বাবুর বাটীতে দুর্গোৎসব হইতেছে, পুরুত ঠাকুর চাল, কলা, সন্দেশ

ইত্যাদি কাপড়ে বান্ধিতেছেন, বাবু মদ্য মাংস বেশ্যা ও ইয়ার লইয়া মত্ত হইয়াছেন; সাধারণ লোক ভোজ খাইতেছে, আর নাচ তামসা, দেখিতেছে। কোথায় বা ধর্ম্ম আর কোথায় বা হিন্দুগণের মন! গুরু পুরোহিত-গণ কেবল শিষ্য ও যজমানগণকে ঠকাইয়া নিজেদের স্বার্থসাধন করিতেছে। সন্ন্যাসিগণ জটাধারণ ও ভস্ম লেপন করিয়া সং সাজিয়া বেড়াইতেছে, বৈষ্ণবগণ ডোর কৌপীন পরিধান করত মালা তিলক লইয়া লোক-চক্ষে ধূলা নিক্ষেপ করিতেছে; অল্পবুদ্ধি লোকদিগকে ঠকাইয়া উদরান্নের সংস্থান করা ভিন্ন ইহাদের অন্য কাজ নাই। শাস্ত্রগুলি কেবল গাঁজাখোরী ব্যাপার। এতদিন ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াও যখন হিন্দুদের চৈতন্য হইল না, তখন এ জাতির আর মঙ্গল নাই। ইহারা কোন কালে মানুষের মত হইতে পারিবে না। ক্রমে হিন্দুগণের প্রতি, বিশেষ গুরু, পুরোহিত, সাধু, সন্ন্যাসী, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ ও ঠাকুর দেবতার প্রতি আমি খড়গহস্ত হইয়া উঠিলাম। সাধু সন্ন্যাসী বা বৈষ্ণব দেখিলে মনে হইত ইহাদিগকে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড়াইয়া দিই। ব্রাহ্মণ, গুরু, পুরোহিত দেখিলে মনে হইত ইহাদের কান ধরিয়া ঘোড়দৌড় করি। ঠাকুর দেখিলে মনে হইত এগুলা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিই; শাস্ত্রগ্রন্থ দেখিলে মনে হইত পুড়াইয়া ভস্মীভূত করি। হিন্দুদের কিছুই ভাল দেখিতে

পাইতাম না ; আমরা যে কয়েকটি ব্রাহ্ম আছি কেবল ইহারাই মানুষ। আমি নিজের ব্যবসার যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়া প্রাণপণে ব্রহ্মোপসনায় শরীরের রক্ত জল করিতে লাগিলাম।

শাস্ত্রালোচনাকালে কোন তন্ত্র মধ্যে এক মনোমত নাম পাইয়া আমি পরমানন্দ লাভ করিলাম। এই নাম পাইয়া আমি অধিক উৎসাহের সহিত নাম জপ ও সাধন ভজনে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। অতঃপর শুনিলাম গোঁস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল। আমার মনে হইল ভারতের মাটীতে মানুষ হয় না ; এমাটীর এমনি গুণ যে ইহাতে ঠাকুর গড়িতে গেলে বানর হয়। অগ্নিহোত্রী একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন ; আবার গোসাঞিজী ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু হইতে চলিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের উপর আমার যে শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের পর হইতে সে ভক্তি শ্রদ্ধা আর থাকিল না। লোকটাকে অপদার্থ জ্ঞান হইল। যাহা হউক আমি প্রাণপণে ব্রহ্মোপসনায় প্রবৃত্ত থাকিলাম।

নাস্তিকতার তীব্র যাতনা।

আমি বহুদিন যাবৎ ব্রহ্মোপসনায় প্রবৃত্ত থাকিয়াও আমার জীবনের কোন প্রকার উন্নতি না দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। আমি দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইলাম ক্রমে সন্দেহ ঘনীভূত হওয়ায় মনোমধ্যে অজ্ঞেয়তাবাদের উদয় হইল। ব্রহ্মোপসনা শিথিল হইয়া পড়িল। আমার মনের উৎসাহ ও উদ্যম সমস্ত কমিয়া গেল। মন বিষণ্ণ হইতে লাগিল।

কিছুদিন এইভাবে কাটিয়া গেলে নাস্তিক ও আস্তিক-গণের বিচার তর্ক যুক্তি সম্বন্ধে আমার মনোমধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম নাস্তিকের মতই ঠিক, ব্রহ্মবাদ একটা কথার কথা মাত্র। সমাজ রক্ষার জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ঈশ্বররূপ একটা জুজুর ভয় দেখাইয়া মানবগণকে জড়সড় করিয়া রাখিয়াছে। বাস্তবিক ঈশ্বর বলিয়া কোন পদার্থ নাই। পাপপুণ্য, স্বর্গ-নরক, আত্মা এসব কিছুই নয়। বেদান্ত আদি শাস্ত্র কেবল প্রতিভাশালী লোকের বুদ্ধি কৌশলের পরিচায়ক। প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল শাস্ত্রে ব্রহ্ম স্থাপন হয় নাই। দর্শন-শাস্ত্র সকল পরস্পর বিভিন্ন; যাহার যেমন বুদ্ধি তিনি তেমনি মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

অন্তরে নাস্তিকতা প্রবেশ করায় নীতির বন্ধন আর কতদিন টেকে? এখন মনে হইল Epicurean theory ফেলিবার জিনিষ নহে; খাও দাও আমোদ আহ্লাদ কর, Penalcode বাঁচাইয়া যাহা খুসী তাহাই করিতে পার; পরকালের বা নরক যন্ত্রণার কোন ভয় নাই; কোন চিন্তা নাই, লোকনিন্দা গ্রাহ্য করিবার প্রয়োজন নাই, যে যাহা বলে বলুক, যাহাতে আনন্দ পাও তাহাই কর।

মন বিষণ্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এখনও বিষণ্ণতা দূর করিবার জন্য Epicurean Theory অবলম্বন করিলাম কিন্তু কার্য্যকালে দেখিলাম এই Theory অনুসারে চলিয়া মানুষ সুখী হইতে বা আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না বরং দুঃখ অধিক হইলে অধিকতর বাড়িয়া যায়, নীতির বন্ধন যতই শিথিল হইতে লাগিল, পার্থিব আমোদ আহ্লাদে মনকে ততই ভুলাইতে আরম্ভ করিলাম ততই অধিকতর দুঃখ আসিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। ক্রমে আমার জীবন ভারবহ হইল। রাবণের চুল্লীর ন্যায় দিবারাত্রি প্রাণ হুহু করিতে লাগিল। না আছে আহারে সুখ, না আছে বসিয়া সুখ, না আছে কাহারও সঙ্গে কথা কহিয়া সুখ, প্রাণ দিবানিশি জ্বলিতেছে; আমি যেন একটা প্রকাণ্ড সমুদ্র মধ্যে পড়িয়া, ধরিবার একটা কুটাও নাই; আমি একাকী এই বিশ্বমধ্যে, মরিলেই annihilation!

যন্ত্রনা দিন দিন বাড়ীতে লাগিল, ক্রমে অসহ্য হইয়া

উঠিল। তখন আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা যন্ত্রণা নিবাইব মনস্থ করিলাম। যখন ২।৫ দিন পরেই annihilation হইবেই হইবে, তখন এই ২।৫ দিন কেন দুঃখ ভোগ করি? একটা পিস্তলের গুলিতে সকল দুঃখের অবসান হইতে পারে। এখন আত্মহত্যাই দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায় স্থির করিয়া আমি আত্মহত্যার উপযুক্ত হইয়াছি কিনা ইহাই পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। মন এতই বিষণ্ণ ও আমি এমনি আত্মহারা হইয়াছি যে একদিন সাঁইতা হইতে বোলপুর ট্রেনে আসিবার জন্য ষ্টেশনে টিকিট খরিদ করিয়া প্ল্যাটফরমে বেঞ্চের উপর বসিয়া আছি, এমন সময় ট্রেণ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, লোক জন ট্রেণ হইতে নামিয়া গেল, যাত্রীগণ ট্রেনে উঠিল, ট্রেণ ছাড়িয়া দিল, হুস্ হুস্ করিয়া ট্রেণ চলিয়া গেল, আমি সমস্ত দেখিলাম কিন্তু ট্রেণে উঠিতে হুঁস হইল না। তারপর পরের ট্রেণে বোলপুর আসিলাম।

আবার সময় সময় আমার মনে হইতে লাগিল আমি কি পাগল হইব? আমার মস্তিষ্ক কি বিকৃত হইয়াছে! আমি কেন্ এমন হইলাম! এই দুর্দ্দিনে আমার যে মানসিক ক্লেশ তাহা বর্ণনার অতীত।

পরলোকবাসী আত্মার আবির্ভাব।

এই সময় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রাইপুর নিবাসী বাবু প্রতাপনারায়ণ সিংহের পুত্র বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি নিরামিষাসী ব্রহ্ম উপাসক যুবক। বিলাত গেলে তথায় মাংসাহার করিতে হইবে, এইজন্য তিনি মাংসাহার অভ্যাস করিতেছিলেন। একদিন কলিকাতা হইতে আপন বাটী রাইপুর মোকামে আসিয়া একটা ছাগল খরিদ করিয়া কাটিয়া খাইবার জন্য স্ত্রীর নিকট পাঁচটী টাকা চাহিলেন। হেমেন্দ্রবাবু বৈষ্ণব-বংশোদ্ভব, তাঁহার ভগ্নী, স্ত্রী ও আত্মীয়া স্ত্রীলোকেরা ছাগল কাটিয়া খাইবে শুনিয়া, হেমেন্দ্রনাথকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, একি! একটা নিরীহ ছাগল কাটিয়া খাইবে? তুমি এমনি নিষ্ঠুর!

হেমেন্দ্র—আমাকে বিলাত যাইতে হইবে আমি মাংসাহার অভ্যাস করিব না?

স্ত্রী—তোমার বিলাত যাওয়া কেবল মেম বিবাহ করিবার জন্য। তোমার মেম বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, সেইজন্য বিলাত যাইতেছ; সেখানে গেলে মেম দেখিয়া তোমার মন ভুলিয়া যাইবে।

হেমেন্দ্র—কি! এমন কথা! আমার মন কেহ ভুলাইতে পারে? আমার মনের তেজ তোমরা জান না; আমার এমনি মনের তেজ যে আমি ইচ্ছা করিলে এই স্থানে বসিয়া মনের বলে দূরস্থ লোককে মারিয়া ফেলিতে পারি।

স্ত্রী—ইস্, এই নাকি হয়? (হাস্য।) এসব পাগলামীর পূর্ব্ব লক্ষণ; আমি কিছুতেই মরিব না, কই আমাকে মার দেখি।

হেমেন্দ্র—দেখ্‌বে? দেখ্‌বে? এই বলিয়া ষোড়শ বর্ষীয়া আপন স্ত্রীর প্রতি একটা তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

দৃষ্টি নিক্ষেপ মাত্র হেমেন্দ্রবাবুর স্ত্রী, সুশীলাবালা (ইনি ব্যারিষ্টার এস্, পি, সিংহের সহোদরা ভগ্নীর কন্যা) মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। সকলে ভীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন; হেমেন্দ্রবাবু ভয়-বিহ্বলচিত্তে মনে করিলেন, হায় কি করিলাম অকারণ স্ত্রীহত্যা করিয়া ফেলিলাম; হে ভগবন্ আমাকে রক্ষা কর; সুশীলাকে বাঁচাইয়া দাও, আমি কিছু জানি না, মারিব মনে করি, নাই একটা তীব্র দৃষ্টি দিয়াছিলাম মাত্র। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া কাতর প্রাণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

সুশীলার চৈতন্য হইল, কিন্তু তিনি ঠিক প্রকৃতিস্থ

হইলেন না, যেন অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার দেহে আবির্ভূত হইয়া গ্রীক ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন ; তাঁহার কণ্ঠের স্বর ও চক্ষের চাহনি তাঁহার নিজের নয়, কোন গ্রীক ভাষাভিজ্ঞ লোক যেন তাঁহার ভিতর হইতে কথা কহিতেছেন।

এই অবস্থায় তিন দিন কাটিয়া গেল, তিনি বন্ধুবর অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সংবাদ দিলেন ; অঘোরবাবু আসিয়া হেমেন্দ্রবাবু ও সুশীলাকে শান্তি-নিকেতনে লইয়া গেলেন। যাইবার সময় আমাকে ডাকিয়া লইলেন। বেলা অবসানে শান্তি-নিকেতনে পৌঁছিয়া সুশীলাকে দেখিলাম যেন মদ্য পানে টলটলায়মানা। তিনি প্রকৃতিস্থ নহেন। আমরা সুশীলাকে লইয়া হাত ধরাধরি করিয়া চক্র (circle) করিয়া ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম। উপাসনা করিবামাত্র সুশীলা প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই দিন রাত্রি হইতে সুশীলার উপর পুনঃ পুনঃ নানা পরলোকবাসী আত্মার আবির্ভাব হইতে লাগিল।

পূজার ছুটী, কাছারী বন্দ, এই সময় আমি প্রায়ই শান্তি-নিকেতনে থাকিতাম। আমরা অতি সন্তর্পণে সুশীলাকে রক্ষা করিতে লাগিলাম। দিন দিন অনেক ব্যাপার দেখা যাইতে লাগিল, যখন কোন পাপী আত্মার আবির্ভাব হইত তখন সুশীলা উচ্ছৃঙ্খল, দুর্দ্দমনীয়া হইয়া ধৃষ্টতার পরিচয় দিতেন, আবার সাধু আত্মার আবির্ভাব হইলে, শান্তিময়ী

মনোহারিণী হইয়া দাঁড়াইতেন, পরলোকবাসী আত্মার আবির্ভাব হইলে তাঁহার কণ্ঠস্বর লাবণ্য ও মুখ-শ্রী স্বতন্ত্র হইয়া যাইত। তাঁহার চেহারা ও কথাবার্ত্তার-বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হইত। কোন কোন পাপী প্রেতাত্মার পরিচয় লইয়া তাহার পাপ জীবনের অতি গুহ্য ইতিবৃত্ত শুনিতাম. এবং গ্রামে গিয়া তদন্ত করিতাম তাহাতে সমস্ত ঘটনা মিলিয়া যাইত। আমি পরলোকবাসী আত্মা (Spirit) বিশ্বাস করিতাম না। এই ব্যাপারটা কি ইহার কিছুই ঠিক করিতে পারিতাম না। একবার মনে হইত হিষ্টিরিয়া ব্যারাম, কখন বা মনে হইত Somnambulism বা তদ্রূপ কোন ব্যারাম। ফলতঃ অনুসন্ধিৎসা দূর হইল না, কোন স্থির সিদ্ধান্তেও উপনীত হইতে পারিলাম না। কয়েকদিন পরে যুবতী স্ত্রীলোকের নিকট থাকা অকর্ত্তব্য মনে করিয়া আমি একটু স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে লাগিলাম।

একদিন রাত্রি ৯ টা বাজিয়াছে, সুশীলা খাটের উপর বসিয়া আছেন,—আমি, হেমেন্দ্র বাবু ও অঘোর বাবু নিকটে বসিয়া আছি—এমন সময় হঠাৎ এক পরলোকবাসী আত্মার আবির্ভাব হইল। ইংরাজী কেতায় তিনি আমাদের হস্ত-মর্দ্দন করিয়া মধুরালাপ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার হাবভাব কথাবার্ত্তায় আমরা মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কে? Spirit পরিচয় দিলেন

না। বলিলেন আপনাদের জানিবার আবশ্যক নাই।

আমরা—আপনার কতদিন মৃত্যু হইয়াছে, আপনি কি কাজ করিতেন?

Spirit—এসব কথার দরকার কি?

আমরা—আপনি আমাদের নিকট কেন আসিয়াছেন?

Spirit—আপনাদের উপকারার্থে।

তারপর আমাদের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া সদালাপ করতঃ Spirit চলিয়া গেলেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ৩।৪ দিন যাবত ঐ Spirit আসিয়া আমাদের সহিত সদালাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কে, একথা আমরা কিছুতেই ঠিক করিতে পারিলাম না।

একদিন প্রাতে উদ্যানের এক প্রান্তে আমি একাকী বেড়াইতেছি, সুশীলা, হেমেন্দ্রবাবু ও অঘোরবাবু উদ্যান মধ্যে চেয়ারে বসিয়া আছেন, সম্মুখে একটা টেবিল; এমন সময় ঐ সাধু Spirit এর আবির্ভাব হইল। অঘোর বাবু আমাকে দেখাইয়া Spiritকে বলিলেন, ঐ যে লোকটী উদ্যানের একপ্রান্তে একাকী বেড়াইতেছেন, উনি ঈশ্বর মানেন না, পাপপুণ্য স্বর্গ-নরক কিছুই বিশ্বাস করেন না। উনি নাস্তিক। এই কথায় Spirit বলিলেন, উহাঁকে ডাকিয়া আনুন। অঘোরবাবু আমাকে ডাকায় আমি Spirit এর নিকট উপস্থিত হইলাম। Spirit বলিলেন—,

Spirit—আপনি কি পরমেশ্বর মানেন না ?

আমি—ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝা যায় না, এ পর্য্যন্ত কেহই ইহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

Spirit—আপনি নাকি পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরক কিছুই মানেন না ?

আমি—পাপ-পুণ্য বলিয়া কিছু বুঝা যায় না ; স্বর্গ-নরক মানুষের কল্পনা মাত্র।

Spirit—মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন ?

আমি—না।

Spirit—আপনি শাস্ত্র মানেন ?

আমি—শাস্ত্র কল্পনাপ্রসূত।

ইহার পর Spirit এর সহিত নানা কথোপকথন ও বিবিধ প্রশ্নের অবতারণা হইতে লাগিল। আমি বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের বিবিধ জটিল প্রশ্নের অবতারণা করিলাম। Spirit সকল গুলিরই সুষ্ঠু উত্তর দিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার উত্তর শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

সুশীলা বোধোদয় না হয় কথামালা পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, তাঁহার সাধ্য নাই যে দর্শন শাস্ত্র বা বিজ্ঞানের জটিল প্রশ্নের উত্তর দেন! ভাবিলাম ব্যাপার কি ? শুনা গিয়াছে, স্বপ্নাবস্থায় কথন কথন মস্তিষ্কের এরূপ অবস্থা হয় যে, তখন অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া

যায়। যদি একথা সত্য হয় তাহা হইলে এমন রোগও হইতে পারে, যাহা হইলে সেইরূপ রুগ্নাবস্থায় মস্তিষ্ক বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া জটিল প্রশ্নের মিমাংসা করিয়া দেয়। বর্ত্তমান অবস্থায় সুশীলার কোন ব্যারাম, না সত্য সত্যই Spirit বলিয়া কোন পদার্থ আছে? ইহা কি সেই Spirit এর কার্য্য? শুনা যাইতেছে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এখন নাকি Spiritualism এর খুব আলোচনা হইতেছে। যাহা হউক আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। প্রকৃত অবস্থা কি জানিবার জন্য আমার কৌতূহল বাড়িতে লাগিল।

অঘোরবাবু Spirit কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে, আমাদিগকে খুলিয়া বলুন। Spirit এ কথার উত্তর দিলেন না। আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, তোমরা ইঁহাকে চিনিতে পারিতেছ না? ইনি সাধু অঘোরনাথ। একথা আমার মুখ দিয়া কেন বাহির হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। প্রকৃত পক্ষে আমি কিছুই জানি না। আমার কথা শুনিয়া Spirit মুচকে হাঁসিলেন এবং মাথা নাড়িয়া আমার কথায় সায় দিলেন। আমরা সকলে আনন্দ লাভ করিলাম।

আশ্বিন মাস, সামান্য শীতের আমেজ দেখা দিয়াছে, এমন সময়ে শান্তিনিকেতনের অট্টালিকায় শুইয়া আছি, রাত্রি ৩টার সময় হেমেন্দ্রবাবু আমার নিকটে আসিয়া

বলিলেন, সুশীলা আপনাকে ডাকিতেছেন ; আপনি তাঁহার নিকট যান। আমি বিছানা হইতে উঠিয়া হেমেন্দ্রবাবুকে বলিলাম আপনি আমার সঙ্গে আসুন। তিনি বলিলেন, আমার যাওয়া হইবে না, সুশীলা আমাকে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন, আপনি একাকী তাঁহার নিকট যান। এই কথা শুনিয়া আমি একাকী সুশীলার শয়ন কক্ষে গমন করিলাম। দেখিলাম তিনি শয়ন কক্ষের কপাট ঠেকাইয়া দিয়া তাহার পশ্চাতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন ; আমি তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র সুশীলা ইংরাজী কেতায় আমার কর মর্দ্দন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া আমার হস্ত ধারণ করতঃ নিজের শয়নের পালঙ্কোপরি আমাকে আদর করিয়া বসাইলেন। তিনি আমার দক্ষিণে বসিলেন, আমি তাঁহার বামদিকে বসিলাম। তিনি আমাকে এত আদর করিয়া নিজের শয়ন কক্ষে লইয়া গেলেন, কিন্তু আমার সহিত কোন কথা কহিলেন না, একেবারে নীরব নিস্তব্ধ। আমি কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রকৃতি ও শয়ন কক্ষের শোভা দর্শন করিতে লাগিলাম। প্রকৃতি ঘোর তমসাচ্ছন্ন, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না ; মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ কাহারও কোন শব্দ শুনা যায় না, সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানে নানা জাতীয় ফুল ফুটিয়া চারিদিকে সৌগন্ধ বিস্তার করিতেছে! বিশেষ সেফালিকা পুষ্পের গন্ধে আশ্রম আমোদিত হইতেছে।

সুশীলার প্রকোষ্ঠ সুরম্য শয্যায় সুশোভিত, উপরে নেটের সুন্দর মশারী, প্রকোষ্ঠের এক পার্শ্বে টুলের উপর মেজের মধ্যে বাতি জ্বলিতেছে। সুশীলার পূর্ণ যৌবন, রূপ লাবণ্যে ঘর আলোকিত হইতেছে। যেন স্বর্গ হইতে কোন দেবকন্যা ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। বিছানায় নানা জাতীয় ফুল ও ফুলের মালা ছড়াইয়া রহিয়াছে। সুশীলা বহুক্ষণ যাবৎ নিস্তব্ধ থাকায় আমার মনে হইল সুশীলা স্ত্রীলোক অল্প বয়স্কা, বোধ হয় লজ্জা বশতঃ আপন মনোগত ভাব আমার নিকট ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না, আমি পুরুষ মানুষ প্রথমে আমারই কথা কহা কর্ত্তব্য এই ভাবিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

আমি—এত রাত্রে তলব কেন?

সুশীলা—একটি কথা আছে।

আমি—কি কথা?

সুশীলা—অগ্রে প্রতিজ্ঞা করুন আমার কথাটী রক্ষা করিবেন।

আমি—অগ্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে নাই, আমি প্রতিজ্ঞা করিতে পারিব না।

সুশীলা—আপনাকে আমার কথাটী রক্ষা করিতেই হইবে।

আমি—রক্ষা করিবার উপযুক্ত হইলে অবশ্য রক্ষা করিব, অযোগ্য হইলে করিতে পারিব না।

সুশীলা—না, আপনাকে রক্ষা করিতেই হইবে।

আমি—ব্যাপার কি নিঃসঙ্কোচে খুলিয়া বলুন।

সুশীলা—আমার গায়ে হাত দিয়া বলুন আমার কথাটী রাখিবেন?

এই প্রকারে অনেকক্ষণ ধরিয়া ধস্তাধস্তি চলিতে লাগিল, আমি কিছুতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হইলাম না; সুশীলা অনন্যোপায় হইয়া দুই হাতে আমার দুইটী হাত ধরিয়া মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিলেন, কথা কহিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, আমি সুশীলার ভাবগতিক দেখিয়া বলিলাম, অধিক পীড়াপীড়ির আবশ্যক নাই, আপনার কথা প্রতিপালন যোগ্য হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রতিপালন করিব, আপনি মনের কথা খুলিয়া বলুন।

সুশীলা। আপনি যোগ অভ্যাস করুন, আপনার কল্যাণ হইবে।

আমি—আমি বিবাহিত, আমার সন্তান জন্মিয়াছে, আমার ব্রহ্মচর্য্য রক্ষিত হয় নাই; আমি কি প্রকারে যোগাভ্যাস করিব।

সুশীলা—একি কথা! অমুক ঋষির এতগুলি ছেলে ছিল, তিনি বিবাহিত, অথচ মহাযোগী ছিলেন; অমুক ঋষির এতগুলি সন্তান, তিনিও মহাযোগী, আপনাকে কে বলিয়াছে যে বিবাহিত হইলে যোগাভ্যাস হয় না?

সুশীলা অনেক ঋষি ও তাঁহাদের সন্তানগণের নামোল্লেখ করিলেন। সে সব নাম আমার মনে নাই। আমি সুশীলার কথায় অবাক হইয়া গেলাম, বলিলাম বুঝিয়া উত্তর দিব। এদিকে রাত্রি প্রভাত; Spirit বলিলেন, সকাল হইয়াছে, এক্ষণ আমি যাই; আমি বলিলাম, আপনি যাইবেন মিডিয়ামের কি প্রকারে চৈতন্য সাধিত হইবে? তিনি বিছানা হইতে একটা গোলাপ ফুল লইয়া আমার হস্তে দিয়া বলিলেন এই গোলাপ ফুল মিডিয়ামের কপালে ছুঁয়াইলেই তাঁহার চৈতন্য হইবে, আমি গোলাপ ফুলটী হাত পাতিয়া লইলাম। Spirit যেমন আমার কর মর্দ্দন করিয়া বিদায় হইলেন, সুশীলা অমনি অচেতন হইয়া বিছানায় পড়িয়া গেলেন। পাছে বেকায়দায় পড়িয়া আঘাত প্রাপ্ত হন, এই আশঙ্কায় আমি তাঁহাকে পাতালী কোলা করিয়া বিছানার উপর শুয়াইয়া দিলাম। সুশীলার মুখের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকিলাম, দেখিলাম চৈতন্যের লেশ মাত্র নাই, যেন গভীর নিদ্রায় অভিভূত; আমি ডাকিলাম, গায়ে হাত দিয়া নাড়িয়া দেখিলাম, চৈতন্য নাই, কিছুক্ষণ কাছে বসিয়া ভাবিলাম একি হইল! সুশীলা এতক্ষণ ধরিয়া আমার কাছে এত কথা বলিতেছিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে অচৈতন্য! আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি এই রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না; এটা কি সুশীলার ব্যারাম; না সত্য সত্যই Spirit

বলিয়া একটা পদার্থ আছে; এটা কি Spirit এর কার্য্য? আমি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সুশীলার চৈতন্য সম্পাদন জন্য Spirit এর প্রদত্ত গোলাপফুলটী তাঁহার কপালে ছুঁয়াইলাম; কপালে ফুলটী ঠেকাইবা মাত্র সুশীলার চৈতন্য হইল; তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন; আমি তাঁহার অলক্ষিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম. সুশীলা কিছুই টের পাইল না।

এই অভিনয় কিছুদিন যাবৎ রাত্রি তিনটা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ অভিনীত হইতে লাগিল। সুশীলা প্রত্যহ আমাকে যোগাভ্যাস করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; আমি একদিন অগত্যা তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইয়া বলিলাম।

আমি—আমি জানি আপনি একজন মহাযোগী আপনি নিজে আমাকে যোগ শিক্ষা দিউন।

সুশীলা—আমার কি দেহ আছে? যাঁহারা দেহে বর্ত্তমান নাই, তাঁহাদের যোগ শিক্ষা দিবার নিয়ম নাই।

আমি—কে আমাকে যোগ শিক্ষা দিবেন?

সুশীলা—আপনি (অমুকের) নিকট গমন করুন (আমার পরিচিত কোন সাধু লোকের নাম করিলেন)

আমি—তিনি এক্ষণে কোথায়?

সুশীলা। ওঙ্কারনাথ পাহাড়ে।

আমি আচ্ছা বলিয়া আপন সম্মতি প্রদান করিলাম; প্রভাত কাল উপস্থিত; Spirit পূর্ব্ববৎ আমার কর মর্দ্দন করিয়া বিদায় হইলেন; আমিও পূর্ব্ববৎ মিডিয়ামের চৈতন্য সম্পাদন করতঃ তাঁহার অলক্ষিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। পরদিন রাত্রে আবার এই অভিনয় অভিনীত হইতে লাগিল।

সুশীলা—আপনি ওঙ্কার নাথ যাইবার কি করিয়াছেন?

আমি—তথায় যাওয়া হইবে না।

সুশীলা—কেন?

আমি—লোকটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নাই, তিনি মাংসাহারী।

সুশীলা—(ধীরে ধীরে) হিংসা প্রবণ, হিংসা প্রবণ। তারপর আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি আপনাকে আমার বন্ধুর নিকট পাঠাইতেছি আপনি আমার বন্ধুর নিকট গমন করুন।

আমি—আপনার বন্ধু কে?

সুশীলা—পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

আমি—তিনি কোথায়?

সুশীলা—কলিকাতায়।

আমি—আমি তাঁহার নিকট গেলে তিনি কি আমাকে যোগ শিক্ষা দিবেন?

সুশীলা—দিবেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি আপনার

প্রভূত কল্যাণ হইবে, আপনি অবহেলা করিবেন না।

আমি—আপনি আমার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিবেন কি ?

সুশীলা—হাঁ অনুরোধ করিব। আপনি কোন বিপদে পড়িলে আমাকে স্মরণ করিবেন, আমি আপনাকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিব। মনে কোন সন্দেহ হইলে তাহা কাগজে লিখিয়া বালিশের তলে রাখিয়া শয়ন করিবেন আমি স্বপ্নযোগে বলিয়া দিব।

এইরূপ নানা কথায় সুশীলা আমাকে খুব উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, আমি চিন্তায় মগ্ন হইলাম, কেবল ভাবি এসব কি হইতেছে। আমি আকাশ পাতাল ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। সুশীলাকে বলিলাম।

আমি—সম্মুখস্থ বৃক্ষের একটা ডাল যদি হঠাৎ আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া যায়, তবে আপনার কথায় আমার বিশ্বাস হয়।

সুশীলা—আজ বলিবেন গাছের ডাল ভাঙ্গ, কাল বলিবেন পাখা টান, পরশু বলিবেন দেওয়ালটা ফেলিয়া দাও, যদি আমার কথায় আপনার বিশ্বাস না হয় তাহা হইলে আর আমি আপনার নিকট আসিব না, আর আপনাকেও কোন কথা বলিব না।

আমি Spirit এর অভিমান দেখিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম, তিনি নানা কথায় আমার সন্দেহ ভঞ্জন ও আমাকে পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইল, Spirit পূর্ব্ববৎ আমার কর মর্দ্দন করিয়া বিদায় হইলেন। সুশীলা সংজ্ঞাহীন হইলেন, আমি Spirit এর নির্দ্দেশ মত সুশীলার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার অলক্ষিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলাম।

এতদিন ধরিয়া এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইল, সুশীলা ইহার কিছুই জানেন না। আমি প্রত্যহ রাত্রি তিনটা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত সুশীলার নিকট নির্জ্জনে থাকি, সুশীলা কেনই বা আমাকে প্রত্যহ ডাকিয়া লইয়া যান, এ সম্বন্ধে হেমেন্দ্রবাবুও আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন না; সুশীলা পূর্ণ যুবতী, রাত্রিকালে তাঁহার নিকট যাইতে বা থাকিতে আমার আদৌ সঙ্কোচ হইত না; যেন দুই বন্ধু একত্রে বসিয়া সদালাপ করিতেছি। সুশীলা স্ত্রীলোক এজ্ঞানই যেন আমার ছিল না।

দীক্ষা গ্রহণ।

এইবার কলেজ খুলিবে, হেমেন্দ্রবাবু সুশীলাকে লইয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন, আমি নাস্তিক, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করি না। এই ব্যাপারে আমার চিন্তার স্রোত আবার পরিবর্ত্তিত হইল সুশীলার ব্যারাম কি? ইহা Spirit এর কার্য্য ইহা ঠিক করিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। দিন কয়েক পরে আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় গিয়া হেমেন্দ্রবাবুর বাসায় উঠিলাম; বাসায় পদার্পন করিবা মাত্র হেমেন্দ্রবাবু আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, সুশীলা আপনাকে ডাকিতেছেন। আমি সুশীলার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম, হেমেন্দ্রবাবু আপনার বন্ধু বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত অন্য প্রকোষ্ঠে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সুশীলা আমাকে দেখিয়া আনন্দে আটখানা হইলেন, তাঁহার মুখে হাসি ধরে না। তিনি আমাকে নানা কথায় উৎসাহিত করিয়া বৈকালে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যাইতে অনুরোধ করিলেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্ম সমাজ পরিত্যাগ করায় আমি গোস্বামী মহাশয়ের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলাম;

তাঁহার নিকট যাইবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কেবল নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য গোস্বামী মহাশয়ের নিকট চলিলাম। এই সময় গোস্বামী মহাশয় সুকীয়া ষ্ট্রীটে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আমি অপরাহ্নে একাকী তাঁহার বাসায় গিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছি, এমন সময় দেখিলাম একটী যুবক (বোধ হয় বৃন্দাবনবাবু) সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছেন। যুবক আমাকে দেখিয়া সিড়িতে দাঁড়াইলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

যুবক—আপনি কে? কোথায় যাইতেছেন?

আমি—আমি বোলপুরে থাকি, গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যাইতেছি।

যুবক—কি জন্য গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যাইতেছেন?

আমি—প্রয়োজন আছে।

যুবক—কি প্রয়োজন? সাধন লইবেন নাকি?

কথা শুনিয়া আমার মনে হইল এখানে একটা কাণ্ড-কারখানা কিছু আছে, আমি প্রকাশ্যে বলিলাম।

আমি—হাঁ, সাধন লইব।

যুবক—কোথায় সন্ধান পাইলেন?

আমি—সব জানি (প্রকৃত পক্ষে আমি কিছুই জানি না;) গোস্বামী মহাশয়ের নিকট কোন যোগের ব্যাপার আছে কিনা এবং তিনি কোন শিক্ষা দেন কি না এসব কিছুই জানি না, কেবল

স্থশীলার ব্যারাম কিনা এইটী পরীক্ষা করিবার জন্য আমার আগমন।)

যুবক—গোস্বামী মহাশয় সাধন দিতে বড় একটু রাজী নহেন, তিনি সহজে কাহাকেও সাধন দেন না, আপনি কিছুতেই ছাড়িবেন না, যদি সাধন লইতে পারেন, কিছু না হউক তবু আপনাকে একটা নূতন মানুষ গড়িয়া দিবেন ; আপনি কিছুতেই ছাড়িবেন না।

এই বলিয়া যুবক নামিয়া গেলেন, আমি উপরে উঠিয়া দেখিলাম গোস্বামী মহাশয়ের প্রকোষ্ঠে তিনি একখানা প্রকাণ্ড মৃগ চর্ম্মের উপর শুইয়া আছেন ; প্রকাণ্ড দেহ, অল্প জটাভার, যেন সাক্ষাৎ কৈলাসপতি দেবাদি-দেব মহাদেব।

তাঁহার কন্যা প্রেমসখী একটী ক্ষুদ্র পিতলের ধুমুচীতে ধুনা জ্বালিয়া লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের শয়নকক্ষে যাইতেছেন ; সেখানে কোন লোক জন নাই। গোসাঞিজীকে শয়ান দেখিয়া, আমি আর তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম না ; বারান্দায় অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। দুই তিন মিনিটের মধ্যে গোসাঞিজী উঠিয়া বসিলেন ; আমি তাঁহার প্রকোষ্ঠে গিয়া প্রণাম করিয়া বসিলাম।

গোসাঞিজী—আপনি কি জন্য এখানে আসিয়াছেন ?

আমি—আমি কি বলিব ? বলিবার কিছুই নাই, স্থশীলার

কথায় যোগ শিক্ষা করিতে আসিয়াছি এ কথাত বলা যায় না; আমি ওকালতী বুদ্ধি খাটাইয়া বলিলাম, "আপনার কৃপালাভের জন্য আসিয়াছি"।

গোসাঞিজী—কি? আপনি কি সাধন লইবেন?

আমি—আজ্ঞে হাঁ (সমস্তই মিথ্যা কথা, আমি তখন সাধনা বলিয়া কিছুই জানিতাম না)

গোসাঞিজী—আমি ত সাধন দিই না।

আমি—অনেক আশা করিয়া আসিয়াছি (কথাটা ঠিক নহে, আমি কোন একটা কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আসিয়াছি)

গোসাঞিজী—আমার গুরুজী সাধন দেন।

আমি—তিনি কোথায়?

গোসাঞিজী—মানস সরোবরে।

আমি—ছেলেবেলায় ভূগোল পড়িয়াছিলাম তিব্বৎ দেশে মানস সরোবর নামে এক হ্রদ আছে, ইহা কি সেই মানস সরোবর!

গোসাঞিজী—হাঁ, সেই মানস সরোবর।

এই খানেই কথা শেষ হইল; আমি আর কোন কথা বলিলাম না। অল্পক্ষণ পরে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "আমি অসময়ে গুরুজীকে স্মরণ করি না, আজ আপনার জন্য আমি অসময়ে গুরুজীকে স্মরণ করিতেছি—আপনি একটু সরিয়া বসুন।" আমি আবার বারান্দায় গিয়া

দাঁড়াইলাম; গোস্বামী মহাশয় গুরুজীকে স্মরণ করিলেন। "জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু" এই শব্দ কয়টী মাত্র আমার শ্রুতিগোচর হইল, আর কিছুই শুনিলাম না। দুই এক মিনিটের মধ্যে গোস্বামী মহাশয় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "গুরুজী বলিলেন সাধন পাইবেন; অদ্য রাত্রি ৮টার সময় আপনি আসিবেন" আমি প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

সাধন কি কিছুই বুঝি না, প্রাণের মধ্যে কোন আগ্রহ নাই, রাত্রিকালে কে আবার সুকিয়া ষ্ট্রীটে যায়? পরদিন প্রাতে আবার গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া আমাকে ফিরাইয়া দিলেন। আমি বারাসতের নিকট মণ্ডলগাঁথা গ্রামে আমার সেই বন্ধু কেদারবাবুর নিকট চলিয়া গেলাম। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া বোলপুর আসিবার উদ্দেশে কলিকাতায় হেমেন্দ্রবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম; বাসায় আসিবামাত্র হেমেন্দ্রবাবু আমার নিকট আসিয়া বলিলেন সুশীলা আপনাকে ডাকিতেছেন; আমি সুশীলার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিতে লাগিলেন,—

সুশীলা—আপনার সাধন হয় নাই? আপনি হতাশ হইবেন না। আপনি পুনরায় গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে যান।

আমি—তিনি আমাকে অপমানিত করিয়াছেন, আর আমি তাঁহার নিকট যাইব না।

সুশীলা—এমন হইয়া থাকে, আপনি দুঃখিত হইবেন না;
তাঁহার নিকট ফের যান, আপনার কল্যাণ
হইবে।

আমি—আবার যদি অপমান করেন ?

সুশীলা—আমাকে সেইখানে স্মরণ করিবেন, আমি নিজে
উপস্থিত থাকিয়া সাধন দেওয়াইব।

এই কথা বলিয়া সুশীলা নানা কথায় আমার মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন। সুশীলার একান্ত অনুরোধে আমি আবার বেহায়ার মত সেই সুকীয়া ষ্ট্রীটের বাসায় গেলাম; গোস্বামী মহাশয় আমাকে দেখিয়া তেলেবেগুণে জ্বলিয়া উঠিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

গোসাঁইজী—আপনি আবার কেন আসিয়াছেন ? সেদিন
নিষেধ করিয়া দিয়াছি, আপনার সাধন
হইবে না।

আমি—মহাশয় আমার সাধন লইবার ইচ্ছাও নাই, আমি
আপনা হইতেও আপনার নিকট আসি নাই, সাধু
অঘোরনাথ একান্ত জিদ করিয়া আমাকে আপনার
নিকট পাঠাইয়াছেন।

সাধু অঘোরনাথের নাম শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় যেন হতভম্ব হইয়া গেলেন; ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, আমাকে মিষ্টি কথায় তুষ্ট করিতে লাগিলেন; তিনি বলিলেন "অসময়ে কিছু হয় না, এখন আশ্বিন মাস, সম্মুখে

যে আম গাছ দেখিতেছেন, ইহার শিকর, গুঁড়ী ডাল পালা, সমস্ত চিরিয়া দেখুন; কোথাও একটী আমের গুটী দেখিতে পাইবেন না। আবার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দেখিবেন, এই বৃক্ষ আমে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, সময় না হইলে কিছু হয় না; সময় উপস্থিত হইবে, তিথি নক্ষত্রের যোগ হইবে, তবে সাধন হইবে; আপনি এখন বোলপুর ফিরিয়া যান, সময় উপস্থিত হইলে, আমি আপনাকে সংবাদ দিব।” এই কথা শুনিয়া আমি গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সুশীলা আমাকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন, গোস্বামী মহাশয় সংবাদ পাঠাইলে আসিবার জন্য, আমাকে নিতান্ত জিদ করিয়া আমাকে বিদায় দিলেন; আমি লুপ মেলে বোলপুর চলিয়া আসিলাম।

কয়েক দিন পরে গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র যোগজীবন গোস্বামীর একখানি পত্র পাইলাম; পত্রে লেখা আছে “আপনি আগামী কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে এখানে আসিলে সাধন পাইবেন” পত্র পাইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্ব দিন আমি কলিকাতা গিয়া হেমেন্দ্রবাবুর বাসায় উঠিলাম, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় বাসায় উঠিবামাত্র সুশীলা আমাকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়া মহানন্দ প্রকাশ করিলেন এবং অপরাহ্ণে যত্নের সহিত গোস্বামী মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। গোস্বামী মহাশয় আমাকে দেখিয়া বলিলেন—

কল্য প্রাতে আট ঘটিকার সময় আসিবেন।” আমি প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম। প্রাতে সুশীলা আমাকে খুব উৎসাহিত করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আমি রাস্তায় ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। সাধন কি এ পর্য্যন্ত কিছুই জানি না, ব্যাপারও বুঝিতে পারিতেছি না; সুকীয়া ষ্ট্রীটের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দুই খানি কুশাসন সারি সারি পাতা রহিয়াছে, প্রেমসখী ধুনুচী করিয়া একটু ধুনা জ্বালিয়া দিলেন; গোস্বামী মহাশয় আমাকে ও ব্রাহ্মসমাজের আর একটী লোককে (আমার বোধ হয় প্যারীদাস) ঐ কুশাসনে বসিতে বলিলেন; আমরা উভয়ে পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করিলাম; গোস্বামী মহাশয় সম্মুখে দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। ভাব গতিক দেখিয়া আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিল, একি! এ যে সর্ব্বনেশে ব্যাপার! গোসাঞিজী আমাকে শিষ্য করিবেন নাকি! আমি গুরুবাদ ও মধ্যবর্ত্তিবাদ আদৌ স্বীকার করি না, আমি মন্ত্রদাতা কুলগুরু ত্যাগ করিয়াছি, ইষ্টমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি, আবার গুরুকরণ! আমি রোষে ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইলাম, এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া লম্ফ প্রদান করতঃ আসন হইতে উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম। গোসাঞজীকে বলিলাম, “মহাশয়, আমি মানুষ গুরু মানি না, আপনি ক্ষান্ত হউন”। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন “মানুষ, মানুষই, মানুষ কখনও

গুরু হইতে পারে না ; মানুষ দ্বারায় কিছুই হয় না, একমাত্র ভগবানই গুরু, তিনি ভিন্ন কেহই গুরু নাই। "ভগবানই গুরু" এই কথা বলাতে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি আমার মনে পড়িল, আমি আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় আসনে উপবেশন করিলাম। আমি পূর্ব্বে ব্রাহ্মাবস্থায় তন্ত্র শাস্ত্র হইতে যে মনোমত মন্ত্রটী বাছিয়া গ্রহণ করিয়া বহুকাল যাবৎ জপ করিয়াছিলাম, গোস্বামী মহাশয় কৃপা করিয়া ঠিক সেই মন্ত্রটী প্রদান করিলেন ; আমি সন্তুষ্ট হইলাম, আমার মনে হইল যদিও গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাল ফাঁক যায় না। এটা বহুকাল ব্রাহ্মসমাজে থাকিবার ফল ; যাহা হউক আমি মনোমত নাম লইয়া পরিতুষ্ট হইলাম, যদি হিন্দু দেবদেবীর প্রতিপাদ্য কোন নাম দিতেন আমি নিশ্চয়ই তাহা পরিত্যাগ করিতাম। আমি ঘোর পাষণ্ড, দুর্ব্বিনীত, গুরুত্যাগী, নাস্তিক ; গুরুবাদের ঘোর প্রতিদ্বন্দী ; আমার দীক্ষা গ্রহণ এক অসম্ভব ব্যাপার ; গোস্বামী মহাশয় কিন্তু চোরের উপর বাটপার ; তিনি এমনি কৌশলজাল বিস্তার করিলেন যে আমি কিছুতেই সে কৌশল ভেদ করিতে পারিলাম না ; তাঁহার জালে পড়িলাম ; ১২৯৬ সাল ৩রা কার্ত্তিক কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে আমার দীক্ষাকার্য্য শেষ হইয়া গেল।

দীক্ষা গ্রহণকালে আমি গুরু-শক্তির (কুলকুণ্ডলিনী

শক্তি) কোন পরিচয় পাইলাম না, কেবল মনে হইতে লাগিল, আমি যেন একজনকার হাতে পড়িলাম, কে যেন আমার পিছু লইল ; যাহা হউক দীক্ষান্তে গুরুকে প্রণাম করিয়া বলিলাম—

আমি—গুরুসেবাই শিষ্যের একান্ত কর্ত্তব্য, পূর্ব্বকালে শিষ্যেরা ভিক্ষা করিয়াও গুরুসেবা করিতেন, আমি বিদেশস্থ, নিকটে থাকিয়া সেবা করিবার আমার সুবিধা নাই, যদি আমার উপার্জ্জিত অর্থে আপনার সেবার কিছু সাহায্য হয়, তাহা হইলে, আমি কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারি কিনা ?

গোসাঞী—(কর্ণে হস্ত দিয়া বলিলেন) ছি ; সেবা শুশ্রূষা বা অর্থ সাহায্য করাকে গুরু সেবা বলে না ; গুরু আজ্ঞা প্রতিপালন ও শ্বাসে শ্বাসে নাম জপই প্রকৃত গুরুসেবা, যে ব্যক্তি গুরুকে অর্থ প্রদান করে সে নরকস্থ হয়, যে গুরু শিষ্যের নিকট অর্থ গ্রহণ করেন, সে গুরুও নরকস্থ হয় ; উভয়ই পতিত। গুরু শিষ্যকেই দান করিবেন, শিষ্যের নিকট কিছুই লইবেন না, গুরু সম্বন্ধ দানের সম্বন্ধ, গ্রহণের সম্বন্ধ নয়। আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন ; তাহাতেই

তাঁহাদের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত এবং দরিদ্র শিষ্যগণকে দান করিতেন। তবে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ ব্যতিরেকে যদি কেহ মনে করে একটা লোক অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে, তিনি দরিদ্র বিবেচনায় দান করিতে পারেন।

এই কথার পর আমি হেমেন্দ্রবাবুর বাসায় চলিয়া আসিলাম; সুশীলার আনন্দ আর ধরে না; আমাকে নিকটে লইয়া গিয়া কত কথাই বলিলেন, কত উপদেশই দিলেন; বলিলেন কদাচ সাধন পরিত্যাগ করিবেন না,সাধন-পন্থায় মধ্যে মধ্যে শুষ্কতা আসে,সেইটী বড় বিপদের সময়; সেই সময় ধৈর্য্য সহকারে নাম করিবেন; অনেক পরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। বিপদকালে আমাকে স্মরণ করিবেন। আমি আপনাকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিব; এই সকল কথা বলিয়া আমাকে আনন্দের সহিত বিদায় দিলেন, আমি বোলপুর চলিয়া আসিলাম। ইহার পর সুশীলার মধ্যে Sprit এর যে আবির্ভাব হইত তাহা ঘুচিয়া গেল, আমার সঙ্গেও আর কোন সম্বন্ধ থাকিল না, এত কাণ্ড কারখানা হইল সুশীলা বা হেমেন্দ্রবাবু ইহার কিছুই টের পাইলেন না; আমার দীক্ষা হইল ইহাও তাঁহারা, জানিলেন না। এই সময় হইতে যখনই আমি শান্তি নিকেতন যাইতাম, তখনই আমার শরীরে জ্বরভাব হইত।

ব্রহ্মোপাসনা পুনরারম্ভ।

—:*:—

সন্দেহবাদ ও ক্রমে নাস্তিকতা প্রবেশ করায়, আমি ব্রহ্মোপাসনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া Epicurus এর শিষ্য হইয়াছিলাম, এক্ষণ গুরুর নিকট আমার পূর্ব্ব পরিচিত ব্রহ্মোচিত মনোমত নাম পাইয়া আমি ব্রহ্মোপাসনায় মনোনিবেশ করিলাম। প্রত্যহ নিয়মিত উপাসনা আরম্ভ হইল। এই সময় নানা ঘটনা ঘটিতে লাগিল। এই সকল ঘটনা যে গুরুর হাত দিয়া ঘটিতেছে, তখন আমি তাহা বুঝিতাম না। এক আধটি ঘটনার উল্লেখ করিলে, কি রকমের ঘটনা তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমার বাসার পার্শ্বে বাবু যশোদানন্দন সিংহ উকিলের বাসা; তিনি বয়োবৃদ্ধ বৈষ্ণব। সন্ধ্যাকালে আমি যখন কোটার উপর ব্রহ্মোপাসনা করিতে বসিতাম, তখন তিনি আপন বাসায় করতাল বাজাইয়া "ভালি গোরা চাঁদের আরতি বলি" এই পদ ধরিয়া গান আরম্ভ করিতেন। একে নরপূজা তাহাতে আমার করতালের কর্কশ শব্দ; ইহা আমার সহ্য হইত না; ব্রহ্মোপাসনার বড়ই বিঘ্ন উৎপাদন করিত, এই disturbance এ (প্রতিবন্ধকতায়) আমি মন স্থির করিতে পারিতাম না, মধ্যে মধ্যে চটিয়া লাল হইতাম;

এক দিন এতই রাগ হইল যে আসনে স্থির থাকিতে পারিলাম না, যেমন ধড়মড় করিয়া উঠিয়াছি অমনি কে যেন আমার হাত ধরিয়া বলিল, "ছি! উপাসনা কি ত্যাগ করিতে হয়"? "বসিয়া নাম জপ কর"। আমি আসনে উপবিষ্ট হইয়া ধৈর্য্য সহকারে নাম করিতে-লাগিলাম।

আর একদিন সন্ধ্যার পর ব্রহ্মোপাসনা করিতেছি, নীচে গোলমাল হইতেছে, তজ্জন্য আমার মনস্থির হইতেছে না, ইহাতে আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উপাসনা পরিত্যাগ করতঃ স্ত্রীকে খুব তিরস্কার করিলাম, তিনিও দুকথা বেশ শুনাইয়া দিলেন, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া গেল, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, আমি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম; শরীরের তাপ দূর না হওয়ায় উকিলবাবু রসিককৃষ্ণ ঘোষের বাসায় চলিয়া গেলাম। রসিকবাবু আমাকে দেখিয়া বলিলেন—

রসিক বাবু—হরিবাবু এত রাত্রে এখানে?

আমি—আপনি শ্রীবৃন্দাবন হইতে আসিয়াছেন, আপনাকে দেখিতে আসিলাম।

রসিকবাবু—বেশ, বসুন।

আমি নিকটে বসিলাম, সেখানে গল্প হইতেছে "সনাতন গোস্বামী অতি দীনভাবে সর্ব্বদা সাধন ভজনে কালযাপন করিতেন, যদি কথনও ভজনে বিঘ্ন উপস্থিত হইত, তাহা হইলে তিনি মনে করিতেন আমি ভগবানের নিকট বড়ই

অপরাধ করিয়াছি, সেইজন্য আজ ভজনে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, তিনি আপনাকে অপরাধী জ্ঞানে ধিক্কার দিয়া ভগবানের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতেন এবং ধৈর্য্য সহকারে ভজন করিতে থাকিতেন" এই কথা শুনিয়া আমি বাসায় আসিবার জন্য উঠিলাম, আমাকে উঠিতে দেখিয়া রসিকবাবু বলিলেন ;—

রসিক বাবু—একি ! আপনি যেমন আসিলেন তেমনি চলিলেন ? এক দণ্ডও বসিলেন না, কোন কথাও হইল না ?

আমি—আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে।

রসিকবাবু—(আশ্চর্য্য হইয়া) ব্যাপার কি ?

আমি—অদ্য সন্ধ্যার পর উপাসনা কালীন বাসায় গোলমাল হওয়ায়, আমি উপাসনা পরিত্যাগ করতঃ ক্রোধ ভরে স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিয়া রাস্তায় বেড়াইতে ছিলাম, ভগবান্ কৃপা করিয়া আপনার নিকট আনিয়া আপনার মুখ দিয়া আমাকে উপদেশ দিলেন; আমি কৃতার্থ হইলাম।

ক্রমাগত এইরূপ নানা ঘটনা ঘটিতে লাগিল, উপাসনা কালীন গুরুর দরিদ্রতা স্মরণ করিয়া আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ হইতাম, আমার বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া যাইত ; ব্রাহ্ম সমাজের উপর আমার ঘৃণা জন্মিত ; আমি ভাবিতাম, যিনি ব্রাহ্ম সমাজের জন্য আজীবন শরীরের প্রত্যেক রক্ত-

বিন্দু পাত করিলেন ; অনাহারে, অকাতরে, জীবনের সমস্ত মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া যিনি দেশ বিদেশে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইলেন ; যিনি একদিনের জন্যও সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না ; কতদিন কাদা খাইয়া ও উপবাসী থাকিয়া ব্রহ্মোপাসনায় দিন কাটাইলেন ; ব্রাহ্ম সমাজের জন্য নিদারুণ পরিশ্রমে যাঁহার শরীর চিরদিনের জন্য দুশ্চিকিৎস্য হৃদ্‌রোগে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল ; অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুর ব্রাহ্ম সমাজ শেষাবস্থায় তাঁহার অতি সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় মাসহারাটী বন্ধ করিয়া দিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের দরিদ্রতা ভাবিয়া আমি দিন দিন অবসন্ন হইতে লাগিলাম। গুরু নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং অর্থ সাহায্যের উপায় নাই। উপাসনা কালীন আমার মনস্থির হইত না, কেবল মনে হইত আমি গুরুকৃপা ভিক্ষা করিতেছি ; অথচ গুরুর অবস্থার প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিতেছি না, এরূপ কাষ্ঠভক্তি নিতান্ত ঘৃণিত। ক্রমে যখন মন অত্যন্ত বিষাদিত হইল, তখন আর থাকিতে পারিলাম না ; যাহা হইবার হউক, এই ভাবিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট মণি অর্ডার করিলাম। তখন গোস্বামী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে দাউজীর (বলরাম) মন্দিরে। আমি পরে শুনিয়াছিলাম, গোস্বামী মহাশয় টাকা পাইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ

করিয়াছিলেন ; এবং টাকা পাইবামাত্র সমস্ত টাকাগুলি দাউজীকে প্রদান করিয়াছিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের টাকা প্রাপ্তির রসিদ (acknowledgment) পাইয়া আমি আশ্বস্ত হইলাম এবং কয়েক দিন পরে আবার টাকা পাঠাইয়া দিলাম। এবারও গোস্বামী মহাশয় টাকা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পত্র আসিল, "গোস্বামী মহাশয় কাহারও মণিঅর্ডার বা চিঠি পত্র গ্রহণ করেন না ; টাকা পাঠাইবার ইচ্ছা হইলে যেন মাতা ঠাকুরাণী (যোগমায়া দেবী) নামে পাঠান হয়," সেই অবধি আমি মা ঠাকুরুণের নামে টাকা পাঠাইতে লাগিলাম। তিনি প্রাণ ভরিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পত্র লিখিতেন।

কিছুদিন পরে মা ঠাকরুণের দেহ ত্যাগের সংবাদ পাইয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম। মা ঠাকরুণের দেহ ত্যাগের পর যোগজীবনের নামে মণি অর্ডার পাঠাইতে লাগিলাম।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দীক্ষার পর যখনই শান্তিনিকেতনে যাইতাম, তখনই আমার শরীরে জ্বরভাব হইত ; আমি বন্ধুবর অঘোরবাবুকে বলিতাম, ভাই শান্তিনিকেতনের জল বায়ু আমার আর সহ্য হইল না ; আমি যখনই আসি তখনই আমার জ্বরভাব হয়। এমন সুবিস্তৃত প্রান্তর এমন নির্ম্মল জল ও নির্ম্মল বায়ু এমন পরি-

স্কার পরিচ্ছন্ন অট্টালিকা কোলাহলশূন্য স্থান আমার কিন্তু আর সহ্য হইতেছে না। বোলপুরে বাসার পার্শ্বে বাঁশ-বন, পচা পুষ্করিণী, সারকুড় চারিদিকে নর্দ্দমা ও দুর্গন্ধ তথাপি সেখানে আমার শরীর যেন ভাল থাকে।

শান্তি-নিকেতনে গেলে যদিও আমার শরীর অসুস্থ হইত তথাপি আমি যাইতে ছাড়িতাম না। ব্রহ্মোপাসনা না করিলেই নয়। ব্রাহ্ম বন্ধুগণের সহিত কথাবার্ত্তা ও আলোচনা বড়ই একটা আনন্দের জিনিস, সে আকর্ষণে আমি বোলপুরের বাসায় থাকিতে পারিতাম না।

সাধন দিবার সময় গোস্বামী মহাশয় আমাকে উচ্ছিষ্ট খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি কোন বিগ্রহের প্রসাদ পর্য্যন্ত খাইতাম না; ভক্তলোকেরা তজ্জন্য প্রাণে বড় আঘাত পাইতেন। আমি পত্র লিখিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলাম, বিগ্রহের উচ্ছিষ্ট খাওয়া যাইতে পারে কি না। গোস্বামী মহাশয় উত্তর দিলেন, বিগ্রহের উচ্ছিষ্ট, উচ্ছিষ্ট নহে, উহা প্রসাদ, উহা খাইতে দোষ নাই। আমি পত্র পাইয়া ভাবিতে লাগিলাম এ কি হইল? গোস্বামী মহাশয় কেন এমন কথা লিখিলেন? পরে স্থির করিলাম, বিগ্রহগুলা ইট কাট পাতর বই ত নয় ইহাদের আবার কি উচ্ছিষ্ট হইবে। ইহারা যদি খায় তবেইত উচ্ছিষ্ট? নতুবা আবার উচ্ছিষ্ট কিসের?

প্রথম ঢাকা গমন।

এই ভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল, ১২৯৮ সালে পূজার ছুটী হইল; বৰ্দ্ধমান ব্রাহ্মসম্মিলনী হইতে নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া আমি বৰ্দ্ধমান রওনা হইলাম; সেখানে গোস্বামী মহাশয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়ায়, আমার মন একেবারে উদাস হইয়া গেল, ঢাকায় গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন করিতে যাইবার জন্য প্রাণ এমনি ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, বোলপুর ফেরত আসিয়া টাকা লইবার দেরী সহিল না। আমি একেবারে চুচুঁড়ার নিকট ধরমপুরে আমার বন্ধু বাবু নবীনচন্দ্র মিত্রের নিকট টাকা ও সামান্য বিছানা ও একটী ঘটী লইয়া ঢাকা রওনা হইলাম। ঢাকার কোন্ স্থানে, কোন্ ঠিকানায় গোস্বামী মহাশয় আছেন, কোন্ পথে কোন্ ট্রেণে কি উপায়ে ঢাকা যাইতে হয়, এসব ভাবিবার আমার সাবকাশ নাই, কেবল এইমাত্র ঠিক আছে, গোস্বামী মহাশয় দরিদ্র, আমি তাঁহার গলগ্রহ হইয়া তাঁহার অন্ন খাইতে পারিব না, অন্য কোথায়ও থাকিব। ঢাকায় আমার অবস্থিতির জন্য নবীনবাবু কয়েক জন ভদ্রলোকের নামে সুপারিস পত্র দিলেন;

আমি উর্দ্ধশ্বাসে নৈহাটী ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ঢাকার টিকিট্ লইয়া যে ট্রেণ সম্মুখে পাইলাম, তাহাতেই চড়িয়া বসিলাম ; ট্রেণ কোথায় যাইবে জানি না। ট্রেণে শুনিলাম আমাকে গোয়ালন্দে নামিতে হইবে ; একটা ট্রেণ বরাবর গোয়ালন্দে যায়, অন্য ট্রেণে পোড়াদহে নামিতে হয়, গাড়ীতে এমনি কি একটা কথা শুনিলাম।

পথের পরিশ্রমে আমি ক্লান্ত হইয়াছিলাম, ট্রেণে উঠিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। ট্রেণ পোড়াদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে, কুলীগণ—"পোড়াদহ পোড়াদহ" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। তাহাদের ডাকে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলাম আমার কামরায় কোন লোক নাই, একজন ভদ্রলোক প্ল্যাটফরম দিয়া যাইতেছেন; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়, এ ট্রেণ কি গোয়ালন্দ যাইবে ?" তিনি বলিলেন, "হাঁ"। আবার কি মনে হইল একজন রেল কর্ম্মচারীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় এ ট্রেণ কি গোয়ালন্দ যাইবে" ? তিনি বলিলেন, "হাঁ"। তদপর একজন সাহেব দেখিয়া আবার কি মনে হইল, সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ ট্রেণ কি গোয়ালন্দ যাইবে ?" সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—

সাহেব—তোমলোক কাঁহা যাওগে ?

সাহেব—উতার, উতার, জল্‌দী উতার, হুঁয়া ট্রেণ খাড়া হ্যায, আবি ছোড়েগা, জল্‌দী যাও, এ ট্রেণ সারাঘাট যায়গা।

আমি তাড়াতাড় করিয়া বিছানাপত্র লইয়া যেমন গোয়ালন্দের ট্রেণে উঠিলাম, অমনি ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। প্রভাতে গোয়ালন্দ উপস্থিত হইলাম.পদ্মার বিস্তীর্ণ জলরাশি দেখিয়া প্রাণ বিস্ময় ও আনন্দে পরিপ্লুত হইল। এইবার শুনিলাম, আমাকে ষ্টীমারে চড়িয়া ঢাকা যাইতে হইবে। ঘাটে তিনখানি ষ্টীমার সারি সারি রহিয়াছে। কোন্ খানিতে ঢাকা যাইতে হইবে জানি না। আমি না বুঝিয়া ট্রেণে উঠিয়াছিলাম। ঐ ট্রেনে সারাঘাট চলিয়া গেলে বিপদে পড়িতাম, এখন শিয়ানা হইয়াছি। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয় এই তিনখানি ষ্টীমার কোথায় যাইবে? তিনি বলিলেন, "এই খানি নারায়ণগঞ্জে, এই খানি আসামে, আর এই খানি চট্টগ্রাম যাইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আমি ঢাকা যাইব, কোন ষ্টীমারে যাইতে হইবে?" তিনি বলিলেন, এই নারায়ণগঞ্জের ষ্টীমারে যাইতে হইবে। ইহার পর আরও ২।৩ জন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, সকলেই ঐ কথা বলিলেন। আমি নিঃসন্দেহচিত্তে নারায়ণ গঞ্জের ষ্টীমারে আরোহণ করিলাম, ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। পদ্মা ও মেঘনার জলরাশির সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে মনের আনন্দে চলিলাম।

পদ্মা শ্বেতবর্ণা মেঘনার জল কাল, উভয়ের মধ্যে একটী রেখা, ঠিক যেন হরহরি মিলন হইয়াছে।

বেলা ২॥০ ঘটিকার সময় আমি নারায়ণ গঞ্জে উপস্থিত হইলাম। ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি, সমস্ত রাত্রি অনাহারে কাটাইয়াছি; দিবাভাগেও কিছু খাই নাই। দোকানের অপবিত্র লুচী সন্দেশ খাইতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। ষ্টেসনের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঢাকার ট্রেনে উঠিলাম। ট্রেণ হুস্‌হুস্ করিয়া চলিতে লাগিল। কয়েকটা ষ্টেসন পার হইয়া গেলে বেলা অবসানে একটী যুবক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

যুবক—মহাশয়, কোথায় যাইবেন ?

আমি—ঢাকা যাইব।

যুবক—কি জন্য ঢাকা যাইতেছেন ?

আমি—সেখানে আমার গুরু আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেছি।

যুবক—আপনার গুরু কে ?

আমি—পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

যুবক—তিনিত ঢাকায় থাকেন না ?

আমি—কোথায় থাকেন ?

যুবক—গেণ্ডারিয়ায়। আপনি ঢাকা গেলে তাঁহার দর্শন পাইবেন না; অধিকন্তু রাত্রিকালে বিপন্ন হইবেন।

আমি—আমিত জানি তিনি ঢাকাতেই থাকেন!

যুবক—না, তিনি গেণ্ডারিয়ায় আছেন, দোনাইগঞ্জ ষ্টেসনে নামিতে হইবে, আপনাকে ঢাকা পর্য্যন্ত যাইতে হইবে না।

আমি—মহাশয়, যে ষ্টেশনে নামিতে হইবে, আমাকে বলিয়া নামাইয়া দিবেন।

যুবক—চলুন, আমিও নামিব, আপনাকেও নামাইয়া লইব।

যথাকালে ট্রেণ সেই দোনাইগঞ্জ ষ্টেসনে উপস্থিত হইলে, যুবক গাড়ী হইতে নামিলেন, আমাকে ও নামাইয়া লইলেন, বলিলেন, আমার সঙ্গে আসুন, আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর যুবক গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমের দরজা দেখাইয়া দিয়া আমাকে প্রবেশ করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, গোঁসাইজী তাঁহার আশ্রমের আঙ্গিনায় খড়ম পায়ে দিয়া বেড়াইতেছেন; আমাকে দেখিয়া পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন, কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া যোগজীবনকে বলিলেন, হরিদাস বাবুর সমস্ত দিন আহার হয় নাই, শীঘ্র জলখাবার আনিয়া দাও ও ভাত চড়াইয়া দাও। চাকরকে বলিলেন শীঘ্র পা ধুইবার জল ও বসিতে কম্বল আনিয়া দাও। চাকর ক্ষিপ্র হস্তে একখান কাল কম্বল পাড়িয়া এক ঘড়া জল আনিয়া

যোগজীবন তাড়াতাড়ি রেকাবী করিয়া জল খাবার আনিয়া দিল। দেখি পেস্তা, বেদানা, কিশমিশ, বিবিধ ফল ও সন্দেশ, জলখাবারের উপকরণ দেখিয়া ভাবিলাম, একি? গোঁসাইজী চিরদুঃখী, জলখাবার যে রাজা রাজড়ার ব্যাপার! অল্পক্ষণ পরে যোগজীবন আমাকে আহারের জন্য ডাকিলেন, আমি বলিলাম সকলের সহিত একত্রে আহার করিব, এখন আহারের দরকার নাই।

গোস্বামী মহাশয় তাঁহার জনৈক শিষ্য রাধারমণ বাবুর বাটীর একটা বাহিরের ঘরে আমার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের (জনৈক শিষ্য) কুটীরের শিকায় এক হাঁড়ী তৈল ঝুলান থাকে, ঐ স্থানে তেল মাখিবার ও গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমে আহারের বন্দোবস্ত হইল। আমি গুরুদর্শনে পরমানন্দ লাভ করিলাম। আহারান্তে শয়ন করিলাম।

নৈহাটীতে যে ট্রেণে উঠিয়াছিলাম, তাহাতে সারাঘাটে গিয়া বিপদগ্রস্ত হইতাম, এবং ঢাকার ট্রেণে রাত্রিকালে ঢাকা গিয়া উপস্থিত হইলে, আমাকে বিপন্ন হইতে হইত; এই সকল বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করিয়া গোস্বামী মহাশয় যে আমাকে আপনা সন্নিধানে লইয়া আসিবেন, একথা তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই, মনে করিয়াছিলাম সমস্তই chance.

গিয়াছিলাম, ঢাকা অবস্থিতিকালে প্রাণে তেমনি আঘাত পাইলাম। প্রাতঃকালে গোঁসাইর সেই বেড়ার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, একখানা পট টাঙ্গান রহিয়াছে, যশোদা গোপালকে কোলে লইয়া স্তন্য পান করাইতেছেন। এই পট দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা একেবারে শুকাইয়া গেল ; বুকটা ভাঙ্গিয়া গেল ; একি ! গোঁসাইজীর ঘরে হিন্দুর দেবতার প্রতিমূর্ত্তি ! গোঁসাই যে একেবারে পৌত্তলিক হইয়া পড়িয়াছেন। আমি মনে মনে কত ভাবনাই ভাবিলাম ; তফাতে আর একখানা পট দেখিলাম ; ইহা যীশুখ্রীষ্টের crusifiction ; এই পটখানা দেখিয়া কিছু আশ্বস্ত হইলাম, মনে করিলাম, সব রকমই আছে।

গোঁসাইজীর অনেকগুলি নিষ্কর্ম্মা শিষ্য তাঁহার আশ্রমে থাকেন ; গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদন যোগান। প্রাতঃকালে প্রচুর পরিমাণে চা প্রস্তুত হইয়া আসিল, সকলে এক এক পেয়ালা গ্রহণ করিলেন, আমি চা খাইতাম না, গোস্বামী মহাশয় অনুরোধ করায় আমি কিছু চা পান করিলাম। পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি আমাকে দেখিয়া পরম সমাদর করিলেন ; আমি তাঁহার আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তায় মুগ্ধ হইয়া গেলাম, প্রেমের সুদৃঢ় রজ্জুতে আমরা উভয়ে বাঁধা পড়িলাম।

করিতে বসিলাম; আহারের পারিপাট্য দেখিয়া আমার বিস্ময় জন্মিল। এ কি! এ যে রাজভোগ! উৎকৃষ্ট অন্ন, বিবিধ ডাল তরকারী, ক্ষীর সন্দেশ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি শ্রীধর (জনৈক শিষ্য) কে জিজ্ঞাসা করিলাম—

আমি—প্রত্যহ কি এই প্রকার আহার হয়?

শ্রীধর—হাঁ প্রত্যহইত এইরূপ খাই।

আমি—কোথা হইতে আসে?

শ্রীধর—তা ত জানি না।

আমি—গোস্বামী মহাশয়ের স্কন্ধে এইরূপ আহার করিতে লজ্জা বোধ হয় না?

শ্রীধর—তাত কিছু হয় না।

আমি মনে করিলাম, গোস্বামী মহাশয় সুদরিদ্র, নিতান্ত ভাল মানুষ বলিয়া এই ভবঘুরে লোকগুলা গোঁসাইজীর স্কন্ধে ভোগ করিতেছে; ইহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা নাই। ইহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র নাই।

আহারের সময় শান্তি-সুধা (গোস্বামী মহাশয়ের কন্যা) একপাথর ইলিশ মাছের ঝোল আনিয়া উপস্থিত করিলেন। লঙ্কা বাঁটায় মাছের ঝোল রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। আমি নিরামিষাশী জানিয়াও শান্তি-সুধা আমাকে ইলিশমাছের ঝোল খাইতে বড়ই জেদ করিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন, "দাদা, বড় ভাল রান্না হইয়াছে

একটু খাইয়া দেখুন"; আমি কিছুতেই মাছের ঝোল খাইলাম না, আর আর সকলেই খাইলেন; ডাল, তরকারী সমস্তই উত্তম রন্ধন হইয়াছে, কিন্তু এমনি ঝাল যে আমি কিছুই মুখে করিতে পারিলাম না, দুই একখানা ভাজা দিয়া আহার করিলাম, তাহাতেও আমার বুক অগ্নি শিখার ন্যায় হুহু করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

আমি গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম, "আমি দেখিতেছি আপনার আশ্রমে ষোড়শোপচারে আহারের বন্দোবস্ত, এত ভাল নয়; যাহারা ভজন সাধন করিবেন তাঁহারা কেবল জীবন ধারণ জন্য যৎসামান্য আহার করিবেন, জিহ্বার লাম্পট্য ভাল নয়, অধিক পরিমাণে উপাদেয় সামগ্রী খাইলে লোভ জন্মায়, ইন্দ্রিয় প্রবল হয়, ভজন নষ্ট হইয়া যায়"। গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেন, "বাড়ীতে শ্যামসুন্দরের সেবা, মেয়েরা অতি যত্নসহকারে শ্যামসুন্দরকে বিবিধ বিবিধ সামগ্রী খাওয়াইতেন, সেই অভ্যাসটা রহিয়া গিয়াছে; আচ্ছা আজ হইতে আর অধিক রান্না হইবে না, কেবল একটা ডাল, একটা তরকারী, একটা ভাজা ও একটা অম্বল হইবে, ইহার অধিক আর হইতে পারিবে না; বাড়ীর লোক জনকে ডাকিয়া 'এই কথা বলিয়া দিলেন। পরদিন আহারের সময় দেখিলাম, যথা-

ইলিশ মাছের ঝোল আনিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, গোঁসাই জীব [illegible] কে শুনে ? শাস্তি আমাকে মাছের ঝোল খাইতে অনেক অনুরোধ করিলেন, আমি কিছুতেই খাইলাম না।

X পরদিন বাবু কুঞ্জবিহারী ঘোষ (গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক শিষ্য) আমাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন, আমি তাঁহার বাটীতে আহার করিতে গিয়া দেখিলাম ; লঙ্কা বাঁটা দিয়া বড় বড় লঙ্কার চড়চড়ী হইয়াছে ; বড় বড় লঙ্কা ভাজা হইয়াছে, বড় বড় লঙ্কা দিয়া শাক ভাজা হইয়াছে, লঙ্কা বাঁটায় ডাল রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে ; তরকারীতেও ভয়ানক ঝাল। আমি রাঢ় দেশের লোক, আমরা লঙ্কা স্পর্শ করি না। ডাল তরকারী শাক ইত্যাদি মুখে দেয় কাহার সাধ্য, আমি ভাজাভুজি দিয়া কোন রকমে আহার করিলাম, বুক হুহু করিয়া জ্বলিতে লাগিল। কুঞ্জ বাবু আমার সঙ্গে আহার করিতে বসিয়াছিলেন, তাহার নিকট রাশী-কৃত মৎস্য আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি সমস্তই আহার করিলেন। X

বংশগত সংস্কার বশতঃ আমি কখনই কদাহার করি নাই, আমি আমিষ আহারের ঘোর বিরোধী, গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের এই তামসিক আহার দেখিয়া আমি

আহার থাকিতে ইহারা কখনই ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হইবে না। প্রকৃতি যতক্ষণ তামস থাকিবে যতক্ষণ দেহ তমোগুণাক্রান্ত থাকিবে, ততক্ষণ তামস আহার ভাল লাগিবে। তামস আহার অভ্যস্থ থাকিলে ক্রমশই তমো-গুণ বৃদ্ধি পাইবে, সাধনে অনুরাগ জন্মিবে না, ক্রমে ভজন নষ্ট হইয়া যাইবে। সত্ত্বগুণ জাগ্রত না হইলে ভজনে অনুরাগ হয় না, সাধক ভজনের রসাস্বাদন করিতে পারে না। সাধুর আশ্রমে এ কি! জীবদেহসিদ্ধ? যে মুখে ভগবানের নাম উচ্চারিত হয়, সেই মুখে জীবের অস্থিমাংস ভক্ষণ? জীবাস্থি চর্ব্বণ? ছি, ছি, ছি?

চিত্রপট দেখিয়া গোস্বামী মহাশয়ের উপর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, এইবার শিষ্যগণের তামসিক ও রাজসিক আহার দেখিয়া তাঁহাদের উপরেও আমার অশ্রদ্ধা জন্মিল।

এই সময় আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজিনীর বিবাহ কাল উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজে বিবাহ দিবার জন্য গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতি চাহিলাম; তিনি বলিলেন,

গোস্বামী মহাশয়—ব্রাহ্ম সমাজ আবার কি? ব্রাহ্ম সমাজ বলিয়া কোন সমাজ নাই।

আমি—(স্বগত) এ লোকটা দেখিতেছি, ব্রাহ্মসমাজের ঘোর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; চিরকাল ব্রাহ্মসামাজে থাকিয়া আজ কিনা বলিতেছেন,

যেন কিছুই জানেন না। (প্রকাশ্যে) মহাশয় আমি পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিতে পারিব না।

গোঁসাই—আপনাকে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিতে হইবে না; বাটীতে দাদা আছেন, আত্মীয় স্বজন আছেন, তাঁহারাই বিবাহ দিবেন। সমাজ কাহাকে বলে? যেখানে খুড়া জেঠা মামা পিসা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন থাকেন, সেইটা সমাজ; আর একজন কোয়েটার, একজন বারমার, একজন মান্দ্রাজের আর একজন শিমলা পাহাড়ের জুটীয়া একটা সমাজ হয় না।

এই সব কথা শুনিয়া আমি চুপ করিয়া থাকিলাম; ফলতঃ কথাগুলি আমাকে ভাল লাগিল না। একদিন গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম, আপনার একখানা জীবন চরিত লিখিত হওয়া উচিত; তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, মানুষ কি মানুষের জীবনী লিখিতে পারে; আমি বলিলাম, জীবনের ঘটনাগুলি পড়িলেও মানুষের উপকার হয়, আপনি নিজেই কেন একখান আপনার জীবনচরিত লিখুন না? তিনি বলিলেন প্রয়োজন নাই। তাহার পর বলিলাম, আমাদিগকে একটা চিহ্নধারণের অনুমতি করুন না? নানাদেশে গুরু ভাই ভগ্নি আছেন, চিহ্ন দেখিলে বুঝিতে পারিব। গোঁসাই উত্তর করিলেন, আপনিই বুঝিতে

আমরা পুরুষোত্তমের শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের পট্টডুরীর * সেবাইত, পুরুষানুক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে আমাদিগকে ৺জগন্নাথ দেবের পট্টডুরী যোগাইতে হয়। আমি ঠাকুর দেবতা মানি না, সুতরাং এই পট্টডুরী বন্দ হইয়া গিয়াছে, এই জন্য গোস্বামী মহাশয় একদিন আমাকে বলিলেন।

গোঁসাই—পট্টডুরীটা দিতে হয়।

আমি—কি মহাশয়? কাঠের ঠাকুরকে পাটের রসা দিয়া বান্ধা? এ আবার কি? ভগবানকে কি কেহ পাটের দড়ি দিয়া বান্ধিতে পারে? জানেনত, একদিন যশোদা গোপলকে দড়া দিয়া বান্ধিতে গিয়াছিলেন, পারিয়াছিলেন কি? ভগবানকে বাঁন্ধিতে হইলে, প্রেমের রজ্জুতে

---

* ৺জগন্নাথদেব বিশালতর মূর্ত্তি, সহজে নড়াচড়া করিবার উপায় নাই, রথযাত্রা বা স্নান যাত্রা উপলক্ষে তাঁহাকে রত্নবেদী হইতে স্থানান্তর করিতে হইলে, রেশমের কাছীদ্বারায় বন্ধন করিয়া টানিয়া বাহির করিতে হয়। এই কাছীর সাহায্যে স্নান পিঁড়ী ও রথোপরি উঠান হয় এবং তথায় খাম্বার সহিত এই কাছীর দ্বারায় জগন্নাথ দেবকে বাঁন্ধিয়া রাখা হয়। এই রেশমের কাছী দেখিতে অতি মনোহর, সময় সময় এই কাছীই আবার জগন্নাথ দেবের মালারূপে ব্যবহৃত হয়। জগন্নাথ দেবের গলায় পরাইয়া দিলে দেখিতে বেশ সুন্দর লাগে। এই কাছীকে পট্টডুরী বলে।

বাঁধিতে হয় ; এই বলিয়া গোস্বামী মহাশয়ের উপর মস্ত একটা lecture (বক্তৃতা) ঝাড়িলাম।

এই কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় চুপ করিয়া থাকিলেন, অন্য গুরু হইলে ইষ্ট নিন্দা সহ্য করিতে পারিতেন না, আমার কানে ধরিয়া আমাকে আশ্রম হইতে দূর করিয়া দিতেন।

কিন্তু গোস্বামী মহাশয় অন্তর্যামী, তিনি আমার অন্তরের দুরবস্থা দেখিয়া ইষ্ট নিন্দা শুনিয়াও চুপ করিয়া রহিলেন।

প্রত্যহ দেখি প্রাতঃকালে নানা স্থান হইতে অনেকগুলি পাখী আসিয়া আশ্রমে উপস্থিত হয় ; গোঁসাই বাম হাতে একটা ধামীতে /৫।৬ সের চাউল লইয়া উঠানে ছড়াইয়া দেন, পাখীগুলি কুটকাট করিয়া খাইয়া উড়িয়া যায়। আমি গুণিয়া দেখিলাম ২৬টা ছাতারে ৫২টা কাক, গোটা আষ্টেক শালিক প্রায় প্রতিদিন উপস্থিত হয়, ইহাদের সহিত আর আরও পাখী থাকে। দেশে দুর্ভিক্ষ টাকায় /৭ সের হিসাবে চাউল বিক্রয় হইতেছে. গোঁসাই সুদরিদ্র, এ অবস্থায় পাখীগুলাকে প্রত্যহ এতাধিক চাউল খাওয়াইবার এ কেমন ব্যবস্থা ? গোঁসাইর দেখিতেছি সব আজগুবী কাণ্ড *।

---

* প্রত্যেক গৃহস্থকে শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ মহা যজ্ঞ করিতে হয়,

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আশ্রমে কিছুক্ষণ সংকীর্ত্তন হইত, একদিন গান হইতেছে "ভালি গোরাচাঁদের আরতি বলি" যেমন এই কথা আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে, অমনি আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কে যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে জ্বলন্ত কুল কাঠের আঙ্গার ঢালিয়া দিল; আমি ক্রোধে ক্ষোভে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া তৎক্ষণাৎ সংকীর্ত্তনে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলাম। আমার

নচেৎ গৃহবাস জনিত স্থনাদোষে লিপ্ত হইতে হয়। ইহা না করিলে গৃহস্থের ধর্ম্ম হয় না।

পঞ্চস্থনা গৃহস্থস্য চুল্লীপেষণ্যুপস্করঃ
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্।
তাসাং ক্রমেণ সর্ব্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ
পঞ্চক্লৃপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাং।
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্
হোমোদৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।
পঞ্চৈতান্ যো মহাযজ্ঞান্ ন হাপয়তি শক্তিতঃ
স গৃহেঽপি বসন্নিত্যং স্থনাদোষৈ র্ন লিপ্যতে॥

মনু ৩।৬৮।৭০।

গোস্বামী মহাশয়ের এই পঞ্চযজ্ঞ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেবল শিষ্যগণকে শিক্ষা দিবার জন্য এই পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। আমি এ সব ব্যাপার কিছু জানিতাম না ও করিতাম না। সুতরাং গোস্বামী মহাশয়ের এই ব্যাপার দেখিয়া

সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। জ্বালা নির্ব্বাণের জন্য আমি মাঠাকুরুণের সমাধি মন্দিরে গিয়া নাম করিতে চেষ্টা করিলাম, নাম কি আসে ? আমার সমস্ত শরীর হু হু করিয়া জ্বলিতেছে নাম আসিবে কেন ? যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। ঢাকা ঠাণ্ডা দেশ, কার্ত্তিক মাস বেড়ার ঘর, বেশ একটু শীত পড়িয়াছে। বিছানায় শুইয়াও শরীর শীতল হইল না; যেমন জ্বলিতেছিল, ঠিক সেইরূপ জ্বলিতে লাগিল; শয্যাকণ্টকী উপস্থিত হইল; একবার এ পাশ, একবার ওপাশ; বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি। মনে হইতে লাগিল মন্ত্র লইয়া কুকর্ম্ম করিয়াছি। যদিই বা মন্ত্র লইয়াছিলাম, বোলপুরে প'ড়ে থাকিলেই হইত; গোঁসাইর দুর্গতি স্বচক্ষে দেখিতে হইত না। ইনি এক্ষণ আর ব্রহ্মোপাসক নাই, ইনি নরপূজক; ছি, ছি, ছি, এতকাল ব্রহ্মোপাসনা করিয়া শেষে এই দুর্গতি ?

রাত্রি প্রায় একটা বাজিল। যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল, ক্রমে অসহ্য হওয়ায় আমি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া বিছানা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিলাম এবং দ্রুতপদে গোস্বামী মহাশয়ের ঘরে গিয়া তাঁহাকে ভীষণবেগে আক্রমণ করিলাম। আমি বলিলাম মহাশয় একি ? আমি বোলপুরে থাকি, প্রত্যহ উপাসনা কালে যশোদানন্দন সিংহ নামক এক বৈষ্ণব উকিল কর্ত্তাল বাজাইয়া "ভালি গোরা

চাঁদের আরতী বলি” বলিয়া গান আরম্ভ করেন, আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া যায়; এখানে আসিলাম, এখানেও তাই; ভগবানের পূজা পরিত্যাগ করিয়া মানুষের পূজা; ভগবানের সিংহাসনে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করা? শ্রীচৈতন্য পরম ভক্ত, ইহা আমি জানি, তাই বলিয়া কি তাঁহাকে ভগবানের সিংহাসনে বসাইতে হয়? দিন দিন কি হইতেছে? ইত্যাদি—ইত্যাদি।

আমার কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় নীরব, নিস্তব্ধ; কুঞ্জবাবু প্রভৃতি শিষ্যগণ স্তম্ভিত; কাহারও মুখে কথা নাই। কিছুক্ষণ পরে আমাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য গোস্বামী মহাশয় শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব, শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব ও শ্রীঅদ্বৈততত্ত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। আমি বলিলাম মহাশয়, লোকে কি এসব বোঝে? কেহ কি আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করে? লোকে মানুষই জানে, মানুষই বোঝে; তিনি আমাকে আর অধিক কি বুঝাই-বেন? আমার মন কি এসব কথায় ভোলে? তিনি চুপ করিলেন, আমি আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম; সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, কেবল এপাশ ওপাশ করিয়া রাত্রিযাপন করিলাম।

প্রভাত হইল, বিছানায় পড়িয়া রহিলাম; কোথায় যাইব? কোথায় গিয়া একটু শান্তি পাইব? একটু

ঘরে গেলাম, দেখিলাম ঘরে লোকারণ্য; আমি এক প্রান্তে চুপ করিয়া বসিলাম। গোঁসাই গল্প করিতেছেন—কোরানে একটী আখ্যায়িকা আছে; একদিন প্রভু পরমেশ্বর আপন প্রিয় দূত শয়তানকে ডাকিয়া বলিলেন, শয়তান, আমাকে এক মুঠা মাটী আনিয়া দাও—আমি তাহাতে মানুষ গড়িব; শয়তান যে আজ্ঞে বলিয়া মাটী আনিতে চলিলেন; শয়তান প্রথমতঃ পৃথিবীর নিকট গিয়া বলিলেন, প্রভু পরমেশ্বর মানুষ গড়িবেন আমাকে এক মুঠা মাটী দাও, পৃথিবী বলিলেন মানুষ গড়িবার জন্য আমি মাটী দিতে পারিব না; শয়তান সূর্য্যলোকে, নক্ষত্রলোকে, লোকলোকান্তরে গমন করিলেন, সর্ব্বত্রই ঐ এক কথা। তিনি কোথায়ও মাটী না পাইয়া প্রভু পরমেশ্বরের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, প্রভু সর্ব্বত্র গমন করিলাম; কেহই একমুঠা মাটী দিল না। তখন প্রভু পরমেশ্বর বলিলেন শয়তান, যেমন করিয়া পার আমাকে এক মুঠা মাটী আনিয়া দাও। চীলে যেমন ছোঁ মারে, এই বার শয়তান সেইমত অলক্ষে ছুটীয়া আসিয়া পৃথিবী হইতে এক মুঠা মাটী লইয়া দৌড় দিলেন; কি কর কি কর বলিয়া পৃথিবী পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন, কিন্তু শয়তানকে ধরিতে পারিলেন না। শয়তান হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রভু পরমেশ্বরের নিকট গিয়া বলিলেন, এই মাটী লউন।

ব'লব ? ধরা পড়িলে আর রক্ষা ছিল না। পরমেশ্বর হাত পাতিয়া মাটী লইয়া তাহাতে একটী ফুঁ দিলেন, আর আদম জন্মিল। তাঁহার রূপে চারিদিক আলোকিত হইল। পরমেশ্বর আপন সিংহাসনে আদমকে বসাইলেন, নিজের মস্তকের মুকুট তাঁহার মস্তকে পরাইয়া দিলেন। পরমেশ্বর বলিলেন,—

পরমেশ্বর—শয়তান দেখ আমার আদমকে কেমন সাজিয়াছে।

শয়তান—আজ্ঞে বেশ সাজিয়াছে।

পরমেশ্বর—শয়তান, আদমকে প্রণাম কর।

শয়তান—আজ্ঞে এঁ্যা, এঁ্যা।

পরমেশ্বর—শয়তান, আদমকে প্রণাম কর।

শয়তান—আজ্ঞে ও কথাটা—

পরমেশ্বর—আমার কথা শুন্‌বে না ? ঐ দপ্তরটা পাড়।

শয়তান দপ্তর পাড়িলেন, প্রভু পরমেশ্বর দপ্তর হইতে একখানা একরার বাহির করিয়া শয়তানকে দেখাইয়া বলিলেন,—

পরমেশ্বর—এ দস্তখত তোমার ?

শয়তান—আজ্ঞে হাঁ, আমার।

পরমেশ্বর—একবার এইখানা পড়।

শয়তান একবার পাঠ করিতে লাগিলেন, "আপনি

আজ্ঞা করিবেন, অবনত মস্তকে বহন করিব নতুবা স্বর্গ হইতে দূরীভূত হইব।”

পরমেশ্বর—পড়িলে ? এখনও বলিতেছি ; আদমকে প্রণাম কর।

“পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে” গল্প এই পর্য্যন্ত হইলে, আমার মনে হইল কাল রাত্রে গোঁসাইকে তিরস্কার করিয়াছি আজ তাহার প্রতিশোধ হইতেছে ; গল্পের অর্থ আর কিছুই নহে আমাকে বলা হইতেছে, যখন গুরু স্বীকার করিয়াছ তখন যাহা আজ্ঞা করিব তাহাই করিতে হইবে, নতুবা শয়তানের ন্যায় দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। একে আমার সর্ব্বাঙ্গে ঘা, তাহার উপর আবার নুনের ছিটে। আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, উঠিয়া গোঁসাইজীকে বলিলাম—

আমি—মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ কত দূর ?

গোঁসাই—কেন ?

আমি—সেখানে যাইব। বঙ্গবাবু কেমন লোক ?

গোঁসাই—বঙ্গবাবু ভাল লোক, ব্রাহ্মসমাজ এখান হইতে এক ক্রোশের উপর।

আমি—আমি সেইখানে চলিলাম।

গোঁসাই—ওহে শ্রীচরণ বাবু (জনৈক ব্রাহ্ম শিষ্য) ইনি ব্রাহ্মসমাজে যাইবেন, রাস্তা জানেন না, তুমি ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও।

বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোক, ছাত্রসমাজের সম্পাদক, একজন ঘোর ব্রাহ্ম, ইহাঁর সঙ্গে আমি ঢাকা নববিধান সমাজে চলিলাম; রাস্তায় ইহাঁকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলাম; বলিলাম আপনি একজন ব্রাহ্ম, গোঁসাই দিন দিন পৌত্তলিক হইয়া যাইতেছেন, গোঁসাইর আশ্রমে যথেচ্ছাচার হইতেছে, আপনি দেখিয়া শুনিয়া কিছুই বলেন না কেন? তিনি বলিলেন আমি কি করিব? আমার কথা কে শুনিবে? আমরা যথাসময়ে নববিধান সমাজে উপস্থিত হইলাম, বঙ্গবাবুর সঙ্গে আলাপ হইল; তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমি স্নানান্তে তাঁহাদের পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিলাম।

আরাধনার সময় আমি সংজ্ঞাহীন হইয়া দেখি সম্মুখে গোঁসাই। চমক ভাঙ্গিয়া গেল। মনে করিলাম একি। আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম? না আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইল? অথবা গোঁসাই আমাকে একটা ভেল্‌কি দেখাইলেন। আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না; মনে করিলাম, এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। লোকে শুনিলে আমাকে বেকুব বলিবে।

উপাসনান্তে আমি আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

নিকট বিদায় লইয়া ভগ্ন হৃদয়ে বোলপুর ফিরিয়া আসিলাম। আসিবার সময় গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম, আপনি একবার বোলপুর চলুন। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন যাইব।

কলিকাতা শ্যামবাজার গমন।

ঢাকা হইতে বোলপুর আসিয়া আমি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলাম, গোঁসাই পৌত্তলিক, পতিত, তাঁহাকে গুরু করিয়া বড়ই কুকর্ম্ম করিয়াছি। যাহা হউক ব্রহ্মোপাসনাটা পরিত্যাগ করিলাম না, পূর্ব্বের ন্যায় উপাসনা করিতে লাগিলাম। এদিকে বড়দিনের ছুটী আসিল, কাছারী বন্ধ হইল, গোঁসাইর জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আমি তাঁহাকে দর্শন না করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, কলিকাতা শ্যামবাজারে রওনা হইলাম। গোঁসাই সুদরিদ্র, আমি আজ তাঁহার নিকট গিয়া কোথায় কি খাইতে পাইব, এই ভাবিয়া কিছু জল-যোগ করিয়া প্রাতের লুপমেলে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। হাবড়া ষ্টেশনে ভয়ানক বৃষ্টি, ঘোড়গাড়ীর সুবিধা হইল না, একখানা পাল্কীভাড়া করিয়া শ্যামবাজার চলিলাম।

আমি শ্যামবাজারের বাড়ী চিনি না, বেহারাগণও চেনে না; তাহারা বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়া ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল, খুব বৃষ্টি পড়িতেছে। শ্যামাকান্তবাবু পূর্ব্ব হইতে আমার শ্যামবাজার গমনের সংবাদ পাইয়া ছাদের

উপর উঠিয়া রাস্তা পানে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, বেহারাদিগকে ঘুরিতে ফিরিতে দেখিয়া উপর হইতে হাঁক দিয়া ডাকিলেন এবং দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিয়া আমাকে সাদরে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন; দেখিলাম প্রকাণ্ড তেতলা বাটী; লোকে লোকারণ্য; আমি উপরে উঠিয়া গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করিলাম। তিনি সানন্দে আমাকে গ্রহণ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই ব্রহ্মচারী (বাবু কুলদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) মহাশয় একখানা কলাপাতে পেস্তা, বেদানা, কিশ্‌মিশ্‌, আকরোট প্রভৃতি নানাবিধ মেওয়া জিনিস, এবং রসগোল্লা ছানাবড়া প্রভৃতি বিবিধ মিষ্টান্ন ও নানারকম ফল আনিয়া আমাকে জলযোগ করিতে দিলেন; আমি বলিলাম এত কেন? ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন, খাও হে, খাও। আমি সমস্তই খাইলাম।

প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে আহার প্রস্তুত হইল। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায় আমাকে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন; আমি বলিলাম আমার খাওয়া হইয়াছে; তিনি বলিলেন ফের খাইবেন আসুন। আমি আহার করিতে গিয়া দেখি মহা রাজসূয় ব্যাপার; ছানার পোলাও, ছানার কালিয়ে, উৎকৃষ্ট ঝোল, ভাজা, তরকারী, দই, সন্দেশ ইত্যাদি ইত্যাদি। পাক পরিপাটী। আমি খুব খাইলাম, এমন

খাওয়া পূর্ব্বে আর কখনও খাই নাই। প্রত্যহ দেখি দিন দিন এইমত রাজসূয় ব্যাপার। কতলোক যে খায় কে তাহা ঠিক করিবে।

এই সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের মাতা স্বর্ণময়ীদেবী শ্যামবাজারের বাড়ীতে থাকিতেন। তিনি বিধবা স্ত্রীলোক, স্বপাক আহার করিতেন। তিনি নিজের জন্য আলাহিদা পাক করিতেন। তিনি কখনও একা রাঁধিয়া একা খাইতে পারিতেন না। অন্ততঃ ৭।৮ জনের মত রান্না করিয়া তাহা হইতে আমাদিগকে কিছু কিছু পরিবেশন করিতেন।

একদিন রাত্রি ৮টার সময় গোস্বামী মহাশয়ের ঘরে তিনটী কুলবধুর দীক্ষা হইবে। যথাকালে নীচের উপরের দুয়ার জানালা বন্ধ হইল; স্ত্রীলোক তিনটী পৃথক পৃথক আসনে সারি সারি হইয়া উপবেশন করিলেন; আমরা তাঁহাদের পশ্চাতে বসিয়া নাম জপ করিতে লাগিলাম। গোস্বামী মহাশয় উপদেশ দিয়া যেমন নাম দিবেন অমনি একটী স্ত্রীলোক “থ্যাকর থ্যাকর” করিয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিলেন। গোঁসাই বলিতে লাগিলেন, থাম, থাম, কিন্তু কিছুতেই থামে না। অবশেষে অনেক করিয়া গোঁসাই থামাইয়া দিলেন, স্ত্রীলোক তিনটী তাঁহাদের অভিভাবক সহ গোঁসাইর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম।

আমি—গোঁসাই একি? স্ত্রীলোকটী "থ্যাকর থ্যাকর" করিয়া এমন বিকট রব করিলেন কেন?

গোঁসাই— একটা প্রেত ইহাকে আশ্রয় করিয়াছিল; নাম দিবা মাত্র নামের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া বিকট রব করিতে করিতে পলাইয়া গেল।

আমি—প্রেতটা কেন ইহাকে আশ্রয় করিয়াছিল?

গোঁসাই—সাধন দিবার সময় নাম পাইয়া উদ্ধার হইবার আশায় কখন কখন প্রেতগণ মানুষকে আশ্রয় করে; কিন্তু নামের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতঃ বিকট রব করিয়া পলাইয়া যায়।

আমি—দুয়ার জানালা সব বন্ধ, আমরা নিকটে বসিয়া নাম করিতেছি, প্রেত কেমন করিয়া আসিল?

গোঁসাই—এখানে আসিবার পূর্ব্ব হইতে স্ত্রীলোকটীকে আশ্রয় করিয়াছিল।

আমি—প্রেতটা "থ্যাকর থ্যাকর" রব করিল, ইহা আপনি কি প্রকারে বুঝিলেন?

গোঁসাই—আমি স্বচক্ষে দেখিলাম।

আমি—প্রেত কি চক্ষে দেখা যায়?

গোঁসাই—হাঁ, দেখা যায়।

আমি—প্রেতটার কেমন চেহারা দেখিলেন।

গোঁসাই—বিকট কালপানা।

কথা শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। গোঁসাইর সঙ্গে কয়েক দিন পরমানন্দে কালযাপন করিতেছি এমন সময় একদিন গোস্বামী মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

গোঁসাই—আপনি কি শাস্ত্র পাঠ করেন?

আমি—আজ্ঞে করি।

গোঁসাই—কি পড়েন?

আমি—মহর্ষীর ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, উপনিষদ।

গোঁসাই—ভক্তিশাস্ত্র কিছু কিছু পাঠ করিতে হয়।

আমি—ভক্তিশাস্ত্র কি?

গোঁসাই—অধিক আর কিছু বলিতেছি না, এই চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, তবে চৈতন্যভাগবত আগে পড়িয়া চৈতন্য-চরিতামৃত পড়িতে হয়।

এই কথা শুনিয়া আমি শিশির বাবুর কার্য্যালয় হইতে একখানি চৈতন্যভাগবত খরিদ করিয়া আনিয়া পাঠারম্ভ করিলাম।

এবার শ্যামবাজারের বাটিতে যেমন রাজসূয় ব্যাপার তেমনি লোকের সংঘট্ট। প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত লোকের বিরাম নাই, দলে দলে লোক আসিতেছে এবং গোস্বামী মহাশয়কে শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, গোস্বামী মহাশয় ক্রমাগত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। গোঁসাইকে বলিলাম—

আমি—গোঁসাই একি ? প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত দলে দলে লোক আসিয়া আপনাকে শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, আর আপনি তাহার উত্তর দিতেছেন, আপনার বিরক্তি বোধ হয় না ? আমরা উকিল মানুষ, লোকে টাকা দিয়া আমাদিগের পরামর্শ লয়, বেশীলোক বা বেশী কথা হইলে, আমাদের অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হয়, আমরা সহ্য করিতে পারি না।

গোঁসাই—আমার সহ্য হইয়া গিয়াছে, এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা সমস্ত দিন বাজারে বাজারে কেবল জিনিসের দর জানিয়া বেড়ায়, জিনিস খরিদ করে না ; ইহারাও সেই শ্রেণীরলোক।

আমি—আপনি আর এখানে থাকিবেন না, বড়ই বিরক্তি আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে।

গোঁসাই—এবার অতি বৃষ্টিতে ঢাকা অঞ্চল ডুবিয়া গিয়া অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে হইয়াছে, তাই এখনও এখানে আছি ; পরশু রবিবার ঢাকা যাইব।

পরদিন গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বোলপুর চলিয়া আসিলাম। গোস্বামী মহাশয়ের কথানুসারে এইবার ভক্তিশাস্ত্র চৈতন্যভাগবত পাঠ করিতে লাগিলাম, জগদীশবাবুর সম্পাদিত একখানি চৈতন্যচরিতামৃত খরিদ করিয়া আনাইলাম। চৈতন্যভাগবত পাঠে বড় একটা তৃপ্তি

পাইলাম না। চৈতন্যচরিতামৃত পাঠারম্ভ হইল। আদি-লীলার গোড়াটা বড়ই কট্‌মটে, পড়িতে ইচ্ছা হয় না। গুরু-আজ্ঞা, কি করি, কট্‌মটে, দুর্ব্বোধ্য হইলেও পড়িতে লাগিলাম। একটা শ্লোক দেখিলাম "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিসদি তদপ্যস্য তনুভা"। শ্লোক পড়িয়া হাঁসিতে লাগিলাম ; মনে মনে ভাবিলাম ব্যাটা বদ্যি কি লিখিয়াছে ? এ আবার পড়িতে হয়, (কবিরাজ গোস্বামী যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তখন আমি তাহা জানিতাম না)। ঐ গ্রন্থের আর এক যায়গায় পড়িলাম "লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে" এই শ্লোক পড়িয়া কবিরাজ গোস্বামীর প্রতি আমার ঘৃণা জন্মিল। মনে হইল এমনি জাতিবিদ্বেষ যে ভক্তিগ্রন্থ লিখিতে গিয়াও ব্যাটা বদ্যি কায়স্থগণের উপর গালিবর্ষণ করিয়াছে। কায়স্থগণ তাহার কি করিয়াছে ? সে এমন কথা কেন লেখে ? গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের ভক্তির পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হইলেও আমি দেখিলাম গ্রন্থখানি গোঁড়ামী, সাম্প্রদায়িকতা ও পৌত্তলিকতায় পরিপূর্ণ। যাহা হউক গুরু যখন আদেশ করিয়াছেন, পাঠ করিতেই হইবে ; প্রতিদিন স্নানের পর উপাসনাকালীন এক পরিচ্ছেদ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠের নিয়ম হইল।

ঢাকা দ্বিতীয় বার গমন।

গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গেলেই সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়, কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রাণের এমনি টান যে তাঁহাকে না দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়ি; ১২৯৯ সাল পূজারবন্ধ উপস্থিত, মন মাতিল, প্রাণ গোঁসাইর দিকে ছুটিল। আমি কাল বিলম্ব না করিয়া মহোৎসাহে ঢাকা রওনা হইলাম। এবার পথ-ঘাট সব জানা আছে, আমি নির্ব্বিঘ্নে ঢাকা পৌঁছিয়া গোঁসাইকে প্রণাম করিলাম। তিনি খুব আদর করিয়া আমাকে গ্রহণ করিলেন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারেও আমার সেইরূপ থাকিবার বন্দোবস্ত হইল। রাত্রি যাপনের পর আমি প্রাতে গোঁসাইর ঘরে গিয়া বসিলাম। এবার কিন্তু সর্ব্বনেশে ব্যাপার; গোঁসাইর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি আসনে উপবিষ্ট, তাঁহার দক্ষিণে এক সিংহাসন; তন্মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি; সিংহাসনে ঠাকুর দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম, এবং ক্রোধান্বিত হইয়া গোঁসাইর প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিলাম। তিনি আমার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "ইহা কুতুবুড়ীর (ছোট কন্যা প্রেমসখী) খেলিবার পুতুল, ইহার পূজা হয় না"। এই কথায় আমার প্রাণটা আশ্বস্ত হইল।

প্রাতঃকালে একত্রে চা পান, পণ্ডিত মহাশয়ের কুটীরে তেল মাখা, বুড়ী গঙ্গায় স্নান, মধ্যাহ্নে ষোড়শোপচারে আহার; রাধারমণবাবুর বাটীর বাহিরের ঘরে শয়ন; একদিন গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য সেই vagabond (ভবঘুরে) গুলার সহিত বুড়ীগঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেছি—এমন সময় পথে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা আরম্ভ করিল। যদিও আমি এখন ব্রাহ্মসমাজের কোন ধার ধারি না, তত্রাপি ব্রাহ্মসমাজকে মনে মনে ভালবাসি। ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা আমার সহ্য হইল না। উহাদিগকে খুব তিরস্কার করিলাম, বলিলাম কেনই বা ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছিলে; আর কেনই বা এত ঢলান্ ঢলালে। তোমরা নিতান্ত অসার, তোমাদের ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া উচিত হয় নাই। এই কথা শুনিয়া একজন বলিলেন, ঢের ব্রাহ্ম দেখিয়াছি;—আপনি আর কি করিয়াছেন? আপনাকে পৈতা ফেলিতেও হয় নাই, অসবর্ণ বিধবা বিবাহও করিতে হয় নাই আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, পৈতা ছিঁড়িয়াছি,—বিধবা শুঁড়ীর মেয়ে বিবাহ করিয়াছি, সাহেব মুসলমানের সহিত খানা খাইয়াছি, গোঁসাই আমার দফা রফা করিয়া দিয়াছেন। আপনি অধিক জাঁক করিবেন না, দিন কতক সবুর করুন, গোঁসাই আপনার মাথায় এমনি ডাঙ্গস মারিবেন যে, একেবারে সব চুরমার হইয়া যাইবে। আমি

পরে নবমী পূজার দিন গোস্বামী মহাশয়ের ঐ সকল শিষ্যেরা বলিলেন, আপনি ঢাকেশ্বরী মাকে দর্শন করেন নাই, চলুন দর্শন করিয়া আসি। আমি তাঁহাদের সঙ্গে ঢাকেশ্বরী দর্শন করিতে চলিলাম। ঢাকেশ্বরীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নাট মন্দিরে পাঁঠার রাশি রাশি ছিন্ন দেহ পতিত হইয়া রহিয়াছে, রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। আমি বৈষ্ণব বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি,—চিরকাল প্রাণিহত্যার বিরোধী, বংশগত সংস্কারবশতঃ কখনও পশুহত্যা দেখি নাই, এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া আমার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল।

পূর্ব্ব হইতে আমার হিন্দু ধর্ম্মের উপর অনাস্থা জন্মিয়াছিল এই দৃশ্য দেখিয়া হিন্দু ও হিন্দু ধর্ম্মের উপর আরও বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হইল। মনে হইল হিন্দুরা কি বর্ব্বর! ইহাদের মনোবৃত্তি পৈশাচিক; একটা ইট, কাট, বা পাথরের মূর্ত্তি নিজে গড়িয়া তাহাকে পূজা করে ও তাহার নিকট পশু বলিদান দেয়, ইহারা এই সব মূর্ত্তির নিকট নরহত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ নহে। কেবল ইংরাজের ভয়ে পারে না। ইহাদের অন্তরে দয়ার লেশমাত্র নাই, এই যে ঢাকেশ্বরী ঢাকেশ্বরী বলিতেছে—এটাত একটা অচেতন জড় পদার্থ; আমি যদি ইহাকে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া বুড়ী গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিই,

দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝে না, তাহাদের অপেক্ষা বর্ব্বর আর কে আছে ?

গুরুভাইগণ ভক্তিসহকারে ঢাকেশ্বরী মাকে প্রণাম করিলেন, পূজারী সিঁদুরের টিপ সকলের কপালে ও ২।৪ খানা করিয়া বাতাসা প্রসাদ সকলের হস্তে দিল। গুরুভাইগণ ভক্তিসহকারে প্রসাদ খাইতে খাইতে আশ্রমে ফিরিলেন; পূজারী আমার হস্তেও বাতাসা প্রসাদ দিয়াছিলেন, আমি গ্রহণ করিয়া সকলের অলক্ষিতে ঘৃণার সহিত রাস্তায় ফেলিয়া দিলাম, আমার মনে হইল গোঁসাই উচ্ছন্ন গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শিষ্যগণও উচ্ছন্ন গিয়াছে।

আশ্রমে একদিন দিদিমা (গোঁসাইর শাশুড়ী) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার গুরুদর্শন হইয়াছে ?" আমি বলিলাম, "না ; তবে গতবারে ঢাকা নববিধান সমাজে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল" ; এই বলিয়া পুর্ব্ববারের নববিধান সমাজের ব্যাপারটা বর্ণন করিলাম ; তিনি শুনিয়া বলিলেন "আপনার গুরু-দর্শন হইয়াছে।"

গেণ্ডারিয়ার আশ্রমের একপ্রান্তে গোস্বামী মহাশয়ের একখানি ক্ষুদ্র কুটীর আছে, পূর্ব্বে গোস্বামী মহাশয় ঐ কুটীরে বসিয়া সাধন ভজন করিতেন এখন ঐ কুটীরের ভিতর একধারে এক প্রকাণ্ড ত্রিশূল গাড়া আছে

এই কুটীরে কিছুই থাকে না, এবং কেহ ইহা ব্যবহার করে না, ইহা বারমাস চাবি বন্দ থাকে, এই কুটীরের একটা গর্ত্ত মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বিষধর সর্প বাস করে। গোস্বামী মহাশয়কে এই সাপের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "ঐ কুটীরে একটা প্রকাণ্ড বিষধর সর্প বাস করিয়া থাকে, একদিন আমি বসিয়া আছি এমন সময় সাপটা আস্তে আস্তে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমার মাথার উপর উঠে। মাথাটা ভারী ভারী ঠেকায় আমি হাত দিয়া দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড বিষধর সর্প; সাপটা নামিয়া গর্ত্তে ঢুকিল। তদপর প্রায়ই আমার গায়ে উঠিত, শেষে এমনি বেহায়া হইল, যে লোকজন থাকিলেও তাহাদের সাক্ষাতে আসিয়া আমার গায়ে উঠিত; অবশেষে আমি বেলের মালা ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম; বেলের মালা যেথানে থাকে সেথানে সাপ যায় না" এই কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, সাপ আপনার গায়ে কেন উঠিত! তিনি বলিলেন "যাহারা সাধন ভজন করেন, তাঁহাদের শরীর বড় শীতল হয়, সাপ শীতল স্থান বড় ভালবাসে, এই জন্য সাধকদের গায়ে উঠিয়া আরামে থাকে, সাপটা এখনও ঐ কুটীরে গর্ত্তে আছে।"

একদিন গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম, আপনি একবার

অভাব হয় না, তাহা কোন রকমে জুটিয়া যায়, কিন্তু আপন ইচ্ছায় কোন কায করিতে হইলে আমার মনে হয় আমি যেন নরকে ডুবিতেছি; আর নিজের ইচ্ছায় কোন কায করিব না; তিনি যাহা করাইবেন তাহাই করিব;" এ কথার উপর আর কোন কথা নাই, আমি চুপ করিয়া থাকিলাম।

এই সাধন কুটীরের এক পার্শ্বে একটা বৃহৎ আম গাছ আছে, গোস্বামী মহাশয় সময় সময় ঐ আম তলায় বসিয়া সাধন ভজন করিতেন, সেইবার ঐ আমগাছে মধু বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল; গোস্বামী মহাশয় মধু বর্ষণ দেখাইবার জন্য আমাকে আম তলায় লইয়া গিয়া বলিলেন "দেখুন কেমন মধু বর্ষণ হইতেছে," যে গাছতলায় ভগবানের উপাসনা হয় সেই বৃক্ষে মধু বর্ষণ হইয়া থাকে বেদে ইহার বর্ণনা আছে।" আমি স্বচক্ষে দেখিলাম বৃক্ষ হইতে মধু বর্ষণ হইতেছে, গাছের পাতা সকল মধুতে ভিজিয়া গিয়াছে; অনেক পিঁপড়ে গাছতলায় আসিয়া মধু খাইতেছে। আমি কিন্তু এমনি পাষণ্ড এই সব স্বচক্ষে দেখিয়াও বলিলাম "পাতা গজাইবার সময় ঐ রকম হইয়া থাকে।" তদপর গোস্বামী মহাশয় পিঁপড়ে দেখিয়া, চিনি আনাইয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন।

ঢাকায় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ লোক আছেন;

ইতে আসিলেন, একজন তবলা, ও অপর একজন বেহালা বাজাইতে লাগিলেন ; ঘরে লোকে লোকারণ্য, যেমন বাজনা আরম্ভ হইয়াছে অমনি গোস্বামী মহাশয়ের মাতা (সেই স্বর্ণময়ী দেবী) কোথা হইতে আসিয়া খ্যামটা নাচ জুড়িয়া দিলেন। আমি তাঁহার নাচ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম ; গোস্বামী মহাশয় নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত, কোন কথাটী নাই ; তিনি যেমন স্থিরভাবে বাজনা শুনিতেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই বাজনা শুনিতে লাগিলেন। ঘরের সমস্ত লোক হতভম্ব। আমি মনে মনে বলিলাম ভ্যালারে শান্তিপুরে মেয়ে, না হবে কেন ? গোস্বামী মহাশয়ের মা এইরূপ নাচিতে থাকায় রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি তাঁহার পায়ে ঠেকিয়া পড়িয়া গেল, এবং লাথির চোটে খণ্ড খণ্ড হইল। এই মূর্ত্তি আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছিল, এইবার পদাঘাতে খণ্ড খণ্ড হওয়ায় প্রাণটা জুড়াইয়া গেল। বাজনা শেষ হইলে নাচ থামিল। লোক জন বিদায় হইয়া গেল ; গোস্বামী মহাশয় কুঞ্জবাবুকে বলিলেন „মাকে সাধন কুটীরে শিকল দিয়া আটক করিয়া রাখ"। আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম ;—

আমি—ঠাকুর মা সকলের সমক্ষে নাচ আরম্ভ করিলেন ব্যাপার কি ?

গোসাই—মায়ের পিতা মাতা সন্তানাভাবে বড় দুঃখিত ছিলেন, একজন সিদ্ধ ফকিরের কৃপায় মায়ের

জন্ম হয়; মায়ের মধ্যে সময়ে সময়ে ঐ ফকি-
রের আবির্ভাব হয়, যখন আবির্ভাব হয়, তখন
তিনি উম্মাদ গ্রস্থ হইয়া থাকেন।

আমি—সাধন-কুটীরে মহা বিষধর সর্প আছে, আপনি ঠাকুর মাকে ঐ ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে বলিলেন, যদি সর্পাঘাত হয়?

গোঁসাই—মায়ের যে পায়ের চোট, সাপটা ভয়ে গর্ত্ত হইতে বেরুতে পাল্লে হয়?

ঠাকুর মাকে সাধন-কুটীরে আবদ্ধ করিয়া রাখা আমার ভাল লাগিল না, আমি বিপদের আশঙ্কা করিয়া সভয়ে রাত্রিযাপন করিলাম; পরদিন দেখিলাম ঠাকুর মার কিছু হয় নাই।

ভদ্রসমাজে বহু লোক সমক্ষে গোস্বামী মহাশয়ের মাতা থ্যামটা নাচ নাচিতে লাগিলেন, গোস্বামী মহাশয় অবশ্য নিবারণ করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করিলেন না। গোস্বামী মহাশয় নিন্দা, প্রশংসা, ঘৃণা, লজ্জার অতীত; তিনি সমস্ত ঘটনাতেই ভগবানের লীলা দর্শন করিতেন; মায়ের নাচ তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই; কে কি মনে করিবে এসব কথা তাঁহার অন্তরে উদয় হয় নাই, একারণ তিনি মাতাকে নিবারণ করেন নাই; এসব কথা আমি তখন বুঝিতাম না!

(গোস্বামী মহাশয়ের দিব্য দর্শন খুলিয়া গিয়াছিল।

তিনি বলিয়াছিলেন সাপে তাঁহার মাতার কোন অনিষ্ট করিবে না, এ কারণ তিনি সাপের ঘরে মাতাকে আটক করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন; এ জ্ঞান কিন্তু আমার তখন ছিল না; সেইজন্য আমি দুঃখিত হইয়াছিলাম ও সভয়ে রাত্রিযাপন করিয়াছিলাম।

এবারেও গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "পট্টডুরীটা দিতে হয়", এবারও আমি পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বেশ দশ কথা তাঁহাকে শুনাইয়া দিলাম; গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "কৌলিক কায এটা রক্ষা করা ভাল।" আমি জানিতাম, নিজে বড় বুদ্ধিমান, আর গোঁসাইটা বোকা; আমি একদিন তাঁহাকে কৃষ্ণতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি উত্তর করিলেন "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" এই কথা শুনিয়া আমি তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলাম, বেদান্তসূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম; তিনি তাহাতে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। আমি ভাবিলাম যে ব্যক্তি বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চায় না, আর বিরক্তি প্রকাশ করে, তাঁহার সহিত বিচার করিতে নাই; এই স্থানে আর থাকা উচিত নহে। এইরূপ মনে করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতি লইয়া আমি ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে গেণ্ডারিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম।

আমি জানি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বাবু নগেন্দ্রনাথ

গেণ্ডারিয়া হইতে একেবারে কলিকাতা গোয়া বাগানে নগেন্দ্রবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম ; তাহাকে বলিলাম ;—

আমি—আপনি ত গোস্বামী মহাশয়ের পরম ভক্ত ; গোঁসাইর বিদ্যে শুনেছেন ?

নগেন্দ্রবাবু—কি ?

আমি—তিনি বলিলেন "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ;

নগেন্দ্রবাবু—লোকটা ভক্ত, কিন্তু বুদ্ধিটা চিরকাল মোটা।

নগেন্দ্রবাবুর কথায় আমি খুব খুসি হইলাম, নানা কথাবার্ত্তার পর বোলপুর চলিয়া আসিলাম।

কলিকাতা সুকীয়াষ্ট্রীটে রাখালবাবুর বাটীতে গমন।

ঢাকা হইতে বিষণ্নমনে বোলপুরে আসিয়া আমি মনোদুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলাম কিন্তু সাধন-ভজন পরিত্যাগ করিলাম না ; রীতিমত সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত থাকিলাম। কিছু দিন পরে আমার আত্মদর্শন লাভ হইল : বেলা একটা বাজিয়াছে এ সময় আমি দেখি, আমার সম্মুখে আমি নিজে দাঁড়াইয়া আছি ; প্রত্যেক চুলগাছটী ও প্রত্যেক লোমকূপটী পর্য্যন্ত অতি পরিষ্কাররূপে দেখা যাইতেছে ; আয়নাতে এত পরিষ্কার দেখা যায় না। মাঝে মাঝে এইরূপ দর্শন হইতে লাগিল ; ইহাকে যে আত্ম-দর্শন বলে একথা তখন আমি বুঝিতাম না। মনে করিতাম এমন কেন হইতেছে। যাহা হউক এ সব কথা আর প্রকাশ করিলাম না।

গোস্বামী মহাশয়ের সহিত মত ভেদ থাকিলেও তাঁহার প্রতি আমার প্রাণের আকর্ষণ অত্যন্ত বলবান ছিল। তাঁহার অদর্শনে মন বড় ব্যাকুল হইত, একটু সুবিধা পাইলেই তাঁহার কাছে ছুটিয়া যাইতাম। তাঁহার

দৃষ্টি ছিল। সর্ব্বদা তাঁহার ছিদ্র অনুসন্ধানে থাকিতাম। এক পৌত্তলিকতা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন দোষ দেখিতে পাইতাম না। ১৩০০ সালের ভাদ্র মাসে স্ত্রীকে দীক্ষা দেওয়াইবার জন্য সুকীয়াষ্ট্রীটে রাখালবাবুর বাটীতে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ছুটিলাম। গোস্বামী মহাশয় আমার স্ত্রীকে দীক্ষা দিলেন ; নাম দিবামাত্র আমার স্ত্রী নামের শ্রবণ-শক্তি সহ্য করিতে না পারিয়া একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন ; গোস্বামী মহাশয় আপন কথাও শ্বাশুড়ীকে বলিলেন, তোমরা ইহার পিটের শিরদাঁড়াটা বেশ করিয়া দলিয়া দাও ; তাঁহারা আমার স্ত্রীর মেরুদণ্ড বলপূর্ব্বক দলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ করাতে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইল।

আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয় আমাকে একরূপ নাম দিয়াছেন, ইহাঁকে আবার অন্য রূপ নাম দিলেন কেন ? গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেন, সকলকে এক নাম দিলে ফল হয় না, যাহার যেরূপ প্রকৃতি তাহাকে সেইরূপ নাম দিতে হয়।

এই সময় গুরু-পরিবারের খুব দারিদ্রতা ছিল ; কষ্টে দিনপাত হইত ; এই সময় রাখালবাবু (জনৈক বড় লোক জমিদার শিষ্য) গোস্বামী মহাশয়ের ব্যবহার জন্য একদিন প্রাতে ২০৲ টাকা খরচ করিয়া একটি ভাল আলখাল্লা,

বৈকালে দুই জন ন্যাড়া-নেড়ী ডুবকী ও মন্দিরা বাজাইয়া ভিক্ষা করিতে আসিয়া গোস্বামী মহাশয়কে গান শুনাইলেন; গোস্বামী মহাশয় গান শুনিয়া, ঐ আল্‌খাল্লা টাকা কড়ি, কম্বল, নিজের বসিবার আসন খানি পর্য্যন্ত যাহা কিছু ছিল তৎসমুদয় ঐ ন্যাড়া-নেড়ীকে দিলেন, এবং নিজে ঘরের মেজের উপর ধুলায় বসিলেন। ন্যাড়া-নেড়ী দ্বয় এমনি পাজী, যে গোস্বামী মহাশয়কে ধুলায় বসিতে দেখিয়াও ক্ষুদ্র আসনখানিও প্রত্যর্পণ করিল না। ন্যাড়া-নেড়ার এই দুর্ব্যবহারে আমি বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম।

* গোস্বামী মহাশয় রাখালবাবুর সাধের এই আলখাল্লাটী ভিক্ষুককে দেওয়ায়, রাখালবাবু দুঃখ ও বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, ইহাতে গোস্বামী মহাশয় রোষ-কষায়িত লোচনে রাখালবাবুকে তীব্র ভৎর্সনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "যে ব্যক্তি মনে করিবে তাহার প্রদত্ত জিনিষ আমি ব্যবহার করিব, সে যেন আমাকে কোন জিনিস না দেয়, আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব কেহই কোন কথা বলিতে পারিবে না।"

একদিন রাখালবাবু কোন একটী ঘটনা উপলক্ষে বলেন, "গোস্বামী মহাশয় লোকের খাতির করেন।" এই কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় ভ্রুকুটী করিয়া রাখাল বাবুকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন; তিনি বলিলেন "কি ?

কাহারও কোন তোয়াক্কা রাখি ? এই তোমার বাড়ীতে রহিয়াছি, তোমার কোন খাতির করি ? তুমি এমন কথা মুখে উচ্চারণ কর ?" এই কথা শুনিয়া রাখালবাবু কাঁপিতে কাঁপিতে বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন; পরদিন প্রাতঃকালে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিয়া বলিলেন, কল্য সমস্ত রাত্রি আমার ঘুম হয় নাই, আপনি আমার উপর রাগান্বিত হওয়ায় আমার বড় ভয় হইয়াছে ; আমার মনের ভাব অন্যরূপ ছিল, আপনি "দয়া করেন" বলিবার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু বলিবার সময় "দয়া" না বলিয়া "খাতির" বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। গোস্বামী মহাশয় এ কথায় চুপ করিয়া থাকিলেন।

এই সময় ব্রাহ্মসমাজের অনেক লোক গুরু বাদের দোষোল্লেখ করতঃ গোস্বামী মহাশয়ের উপর গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কাগজে তীব্র প্রবন্ধ সকল বাহির হইতে লাগিল। বাবু মনোরঞ্জন গুহ গোস্বামী মহাশয়ের এক ভক্ত শিষ্য। তিনি অভ্রান্ত গুরুবাদ সমর্থন করিয়া নানা প্রবন্ধ বাহির করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মনোরঞ্জন বাবুকে বাদ-প্রতিবাদ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। মনোরঞ্জন বাবু বলিলেন, ব্রাহ্মেরা আপনাকে গালি দেয় ইহা আমার সহ্য হয় না ; গোস্বামী মহাশয় বলিলেন সহ্য করুন, কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই ; এই অবধি মনোরঞ্জনবাবু প্রবন্ধ লিখিতে

আমি গোস্বামী মহাশয়ের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম; তাঁহার আচার, ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, কাযকর্ম্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার জন্য সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতাম। রাত্রিকালে এক ঘরে নিকটে শয়ন করিতাম। কোথাও কোন ত্রুটী দেখিতে পাইতাম না। একদিন নিকটে শয়ন করিয়া ঘুমাইতেছিলাম, রাত্রি একটার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইল, দেখিলাম গোস্বামী মহাশয় আসনে উপবিষ্ট আছেন, আমি বলিলাম ;—

আমি—মহাশয়, অনেক রাত্রি হইয়াছে, এখনও বসিয়া আছেন? শয়ন করুন।

গোঁসাই—রাত্রি কত?

আমি—রাত্রি একটা বাজিয়াছে।

গোঁসাই—এখনও অনেক রাত্রি আছে।

এই কথার পর ঘুমাইয়া গেলাম ; রাত্রি ৩টার সময় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখিলাম, গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্ববৎ আসনে উপবিষ্ট আছেন, তখন বলিলাম,—

আমি—মহাশয়, এখনও শয়ন করেন নাই? রাত্রি যে ৩টা বাজিয়া গিয়াছে।

গোঁসাই—এখনওত অনেক রাত্রি রহিয়াছে।

আবার আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল, রাত্রি ৪টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম, তখনও গোস্বামী মহাশয়

আমি—মহাশয়, এখনও বসিয়া রহিয়াছেন? শয়ন করেন নাই? শীঘ্র শয়ন করুন, অসুখ হইবে।

গোঁসাই—রাত্রি কত?

আমি—রাত্রি ৪টা বাজিয়াছে।

গোঁসাই—এখনও অনেক রাত্রি আছে।

আবার নিদ্রাকর্ষণ হইল। ঘুমাইয়া পড়িলাম, ভোর হইয়াছে, পূর্ব্ব দিক ফরসা হইয়াছে, এমন সময় নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্ববৎ আসনে উপবিষ্ট; আমি তাঁহাকে বলিলাম;—

আমি—একি! এ যে ভোর হইয়াছে, পূর্ব্বদিক ফরসা, আপনি এখনও শয়ন করেন নাই? আসনে বসিয়া রহিয়াছেন?

গোঁসাই—দুর্ল্লভ সময়, এই সময় কি ঘুমাইয়া নষ্ট করিতে পারা যায়?

এইবার আমার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, এমন মহাপুরুষ ত কখনও দেখি নাই; ইনি নিন্দা প্রশংসার অতীত; লজ্জা, ভয় শোক, মোহ ইহাঁর কিছুই নাই; কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না; সর্ব্ব প্রকার আসক্তি হইতে ইনি বিমুক্ত; ভগবানে ইহাঁর একান্ত নির্ভর। শাস্ত্রে মহাপুরুষের যে সমুদয় লক্ষণ বর্ণিত আছে, তৎ-

কেন ? ভাবিলাম যাহারা নিতাই গৌর, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি ভজে তাহারাও কি ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে ?

আমি মনে মনে এই সমস্ত আন্দোলন করিতেছি, এমন সময় গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, যে উপায়ে হউক না, "অবস্থা লাভ হইলেই হইল, অবস্থা লাভই প্রয়োজন" অর্থাৎ নিতাই, গৌর, রাধাকৃষ্ণ, ভজিয়া যদি মানুষ অবস্থা* লাভ করিতে পারে তাহাতে ক্ষতি কি ?

রাখাল বাবু একজন বড় জমিদার, শুনিয়াছি তাঁহার নাকি ৫০০০০৲ টাকা জমিদারীর মুনফা; তিনি কৃপণ স্বভাবের লোক। একদিন গোস্বামী মহাশয় বলিলেন ;—

গোঁসাই—পরমহংসজী (গোস্বামী মহাশয়ের গুরু) বড় বাড়াবাড়ী আরম্ভ করিয়াছেন।

আমি—কি করিয়াছেন ?

গোঁসাই—গত রাত্রে পরমহংসজী রাখালবাবুকে স্বপ্ন যোগে বলিয়াছেন "গোঁসাই পশ্চিমে যাইবেন তাঁহাকে টাকা দেন"।

---

* অবস্থালাভ এই কথার অর্থ কি আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি নাই। ভগবানের নিত্য দাসত্বই জীবের প্রকৃত অবস্থা "জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস।" আমরা ভগবানকে ভুলিয়া মায়াচ্ছন্ন হইয়া নিজের প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হইয়াছি। এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিজের স্বরূপ লাভ করার নামই অবস্থা লাভ।

আমি—রাখাল বাবু তাহাতে কি বলিলেন ?

গোঁসাই—রাখাল বাবু বলিলেন, আমি টাকা কোথায় পাইব ? আমার হাতে টাকা নাই।

আমি—তারপর কি হইল ?

গোঁসাই—পরমহংসদেব বলিলেন, টাকা না থাক্‌লে খাইস না ? ধার করে টাকা দিগে না ?

এই কথা বলিয়া গোস্বামী মহাশয় হাঁসিতে লাগিলেন ; দিন দিন গোস্বামী মহাশয়ের উপর আমার অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমি কিছুদিন তাঁহার নিকট পরমানন্দে থাকিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সপরিবারে বোলপুর চলিয়া আসিলাম।

প্রয়াগ তীর্থের কুম্ভে গমন।

—:*:—

বোলপুর আসার পর আমার শরীর অসুস্থ হইল; দিন দিন কাহিল হইতে লাগিলাম। এমন সময় ১৩০০ সালের পৌষ মাহায় প্রয়াগ হইতে একখানি পত্র আসিল। পত্রে লেখা আছে "গোস্বামী মহাশয় বলিলেন প্রয়াগে কুম্ভমেলা, নানা স্থান হইতে সকলে আসিতেছেন. হরিদাস বাবু কি বোলপুরে বসিয়া কেবল ওকালতী করিবেন, আর টাকা রোজগার করিবেন? তাঁহাকে এখানে আসিতে লিখিয়া দাও, এখানে আসিলে তাঁহার শরীর সারিবে।" আমি ঘোর সংসারী, কৃপণ স্বভাবের লোক, পত্রখানি পাঠ করিয়া মনে হইল, গোস্বামী মহাশয়ের ইচ্ছা যে আমি প্রয়াগ যাই; পাছে আমি না যাই, এইজন্য "শরীর সারিবে" এই প্রলোভন বাক্য পত্রে লিখিত হইয়াছে।

ঠাকুর দেবতা, তীর্থ ও সাধু সন্ন্যাসীর উপর আমার আদৌ আস্থা নাই, প্রয়াগ গিয়া কেবল অনর্থক কতকগুলা অর্থ ব্যয় ও ব্যবসায়ের ক্ষতি ইহা মনে ভাবিয়াও গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করা অকর্ত্তব্য বিবেচনায় আমি কালবিলম্ব না

করিয়া পরদিন রাত্রি নয়টার সময় একাকী লুপ মেলে প্রয়াগ রওনা হইলাম। ভোর বেলায় মোকামা পৌঁছিয়া পঞ্জাবমেল ধরিলাম এবং বেলা ২॥ আড়াই ঘটিকার সময় এলাহাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ট্রেণ হইতে যেমন প্ল্যাটফরমে নামিলাম, অমনি দেখি সম্মুখে যোগজীবন।

যোগজীবন আমাকে দেখিয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হরিদাসবাবু, আসিয়াছেন ? চলুন বাসায় যাই। এই বলিয়া একখানি ঘোড়গাড়ী ভাড়া করিয়া আমায় লইয়া বাসার দিকে রওনা হইলেন; এখন আমার চৈতন্য হইল, আমি ভাবিলাম প্রয়াগ অপরিচিত স্থান; এখানে গোস্বামী মহাশয়কে কেহ চেনে না; আর কোন্ ঠিকানায় তিনি আছেন তাহা আমিও জানি না; যোগজীবন না আসিলে আমি কেমন করিয়া বাসায় যাইতাম; আমি যোগজীবনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কিজন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন ?" যোগজীবন উত্তর করিলেন "আপনি আসিবেন বলিয়া বাবা আমাকে ষ্টেসনে পাঠাইয়া দিয়াছেন, বাবা এখন বাসায় নাই, সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিবেন।" আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, অদ্য এই গাড়ীতে আমি যে প্রয়াগ আসিব এ কথা গোঁসাইজী কেমন করিয়া জানিলেন! তিনি কি দিব্য দৃষ্টিতে সমস্ত দেখিতে পান ?

যাহা হউক আমি বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, প্রকাণ্ড বাসা, গোঁসাই নাই, তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য

বাসায় অবস্থিতি করিতেছেন ; দিদিমা আমাকে স্নানাহার করিতে বলিলেন ; আমি স্নান করিয়া আহারে বসিলাম। দিদিমা কাছে বসিয়া আহার করাইতে লাগিলেন। দেখিলাম উৎকৃষ্ট আতপ চাউলের অন্ন, অড়হরের ডাল, বিবিধ তরকারী, পায়স, মিষ্টান্ন প্রভৃতি। আমি দিদিমাকে বাড়ী ভাড়া, চাকর, চাকরাণি, রান্ধুনি ও উপস্থিত লোকজনের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম ; তিনি সমুদয় বলিলেন ; তাহাতে আমি বলিলাম ;—

আমি—খুব ধুমধাম ত দেখিতেছি, এদিকের (অর্থের) ব্যাপারটা কেমন ?

দিদিমা—কিছুই নাই।

আমি— তবে এত ধুমধাম কেন ?

দিদিমা—আমি কি করিব ? আমার কথাত কেহ শুনে না। কলিকাতার দোকানে ৫০৲ টাকা ঔষধের দাম বাকী আছে প্রত্যহ তাগাদা আসিতেছে দিতে পারিতেছি না।

সন্ধ্যাকালে গোস্বামী মহাশয় বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম ; তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারই কামরায় আমার আসন ও শয়নের বন্দোবস্ত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বসিয়া আছি এমন সময় কতকগুলি গুরুভাই আসিয়া আমাকে বলি-

লেন—"হরিদাসবাবু, আসিয়াছেন, বেশ হইয়াছে, এইবার মস্তক মুণ্ডন করুন, ত্রিবেণীতে স্নান করুন।" গোস্বামী মহাশয় তাহাদের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, যিনি যাহা বিশ্বাস করেন না, তাঁহাকে কখনও সে কথা বলিতে নাই, উনি কেন মস্তক মুণ্ডন করিবেন ? তদপর আমাকে বলিলেন "ত্রিবেণীর ঘাটে, যেখানে একটা কাছী দিয়া একখানা নৌকা বান্দা আছে, সেইখানে জলে নামিয়া কাছীটা ধরিয়া মনে মনে স্মরণ করিবেন, এই ত্রিবেণী গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম স্থল ; অতি প্রাচীন কাল হইতে কত মুনি, কত ঋষি, কত সাধু, কত মহাত্মা এই স্থানে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়াছেন, বৎসর বৎসর নানা দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া পাপ-কালিমা বিধৌত করিবার জন্য এই পবিত্র জলে অবগাহন করিতেছেন, "অদ্য আমি সেই পবিত্র ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান করিয়া আপনাকে পবিত্র করিতেছি." এই বলিয়া ডুব দিবেন।

এই কথা বলার পর তিনি পুনরায় বলিলেন "আপনার একাকী যাওয়া হইবে না, আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া স্নান করাইয়া আনিব।"

দরিদ্র ও সাধুগণকে বিতরণ করিবার জন্য আমি গোস্বামী মহাশয়ের হস্তে কিছু টাকা দিলাম, একখানা ঘোড়গাড়ী ভাড়া হইল, তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া

ত্রিবেণী বাসা হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে ; গোস্বামী মহাশয় তথায় পৌঁছিয়া ত্রিবেণীর ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া থাকিলেন, আমি সঙ্কল্প না করিয়া স্নান করিলাম, উঠিয়া পাণ্ডাকে কিছু পয়সা দিলাম।

শ্যামাকান্তবাবু স্নান করিয়া কিছু ফুল কিনিয়া গোস্বামী মহাশয়ের চরণে অর্পণ করতঃ প্রণাম করিলেন। এই সময় শ্যামাকান্তবাবু গুরু আজ্ঞায় ভিক্ষা করিয়া খাইতেন, তিনি গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন, "মালা ও তিলক ধারণের জন্য প্রাণে বড় টান হইতেছে" ; গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেন, "আপনার মালা তিলক ধারণের এখনও সময় হয় নাই"।

ত্রিবেণী হইতে গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বেণীমাধব দর্শনে চলিলেন। সঙ্গে অনেক-গুলি শিষ্য। রাস্তার দুই পার্শ্বে ভিখারীগণ ভিক্ষা চাহি-তেছে, গোস্বামী মহাশয় নানা ভঙ্গী করিয়া হাত ও পাছা ঘুরাইয়া তাহাদিগকে পয়সা দিতেছেন, আর বলিতেছেন "আজ হামত বড় দাতা বন্ গিয়া"। আমি তাঁহার রঙ্গ দেখিয়া হাসি রাখিতে পারিলাম না। ক্রমে দশাশ্ব-মেধের ঘাট ও তন্নিকটস্থ বেণীমাধবের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। গোস্বামী মহাশয় দশাশ্বমেধের ঘাট দেখাইয়া আমাকে বলিলেন, "এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে দশ দিন ধরিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন।"

শ্রীমন্দিরের হাতার মধ্যে গিয়া বলিলেন, "এই স্থানে মহাপ্রভু থাকিতেন" পরে শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে গিয়া সাষ্টাঙ্গ দিয়া বেণীমাধবকে প্রণাম করিলেন।

গোঁসাইজীর এই আচরণ দেখিয়া আমার পেটের ভিতর হাত-পা সেন্দিয়ে গেল; আমি স্তম্ভিত হইলাম, বুক ধড়াশ ধড়াশ করিতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয়ের দেখাদেখি তাঁহার শিষ্যগণও সাষ্টাঙ্গ দিয়া প্রণাম করিলেন, আমি এই তাজ্জব ব্যাপার দেখিয়া অবাক্। স্থদু ইহাই নয়, আবার মন্দির পরিক্রমা আরম্ভ হইল, আমি আর নাই, কি করি লজ্জার খাতিরে হাতে প্রাণ করিয়া চুপ করিয়া একটা প্রণাম করিলাম এবং সকলের পিছে পিছে ঘুরিতে লাগিলাম। কয়েকবার পরিক্রমার পর গোস্বামী মহাশয় ১৲ এক টাকার বাতাসা আনাইয়া বেণীমাধবের ভোগ দেওয়াইলেন এবং প্রসাদ লইয়া বাসায় ফিরিলেন।

গোস্বামী মহাশয় বাসায় আসিয়া বলিলেন, "আমি অনেক ঘুরিলাম, কোথাও কোন একটী সাধু দেখিতে পাইলাম না, একটী সাধু কেবল বেণীমাধবকে দেখিয়া কিছু দিয়া আসিলাম"। গোঁসাইজীর কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম, কি আর উত্তর দিব? ইহার পর আবার শুনিলাম, বেণীমাধব স্বয়ং সাধু সাজিয়া

গেলেন। আমি এ সব কি বুঝিব, আমি নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিলাম।

পরদিন আহারান্তে কাহাকেও কিছু না বলিয়া মাথায় একটা ফ্যাটা বাঁধিয়া হাতে লাঠী লইয়া গোস্বামী মহাশয় একাকী যেমন বাসা হইতে বাহির হইলেন, অমনি এই ঝণ্ডুর দল পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, দেখাদেখি আমিও পিছু পিছু চলিলাম।

গোস্বামী মহাশয়ের পায়ে বেদনা, চকের সম্মুখে তাহার জন্য একখানা ঘোড়গাড়ী ভাড়া হইল. ঘোড়গাড়ীর পিছু পিছু ত আর মানুষ হাঁটিতে পারে না? কাজে-কাজেই আরও ৫।৬ খানা গাড়ী ভাড়া হইল; সমস্ত দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া ঠাকুর ও সাধু দর্শন করতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় আসা হইল, সমস্ত গাড়ী ভাড়া আমি মিটাইয়া দিলাম। পরদিনও ঠিক এই ব্যাপার। তাহার পরদিন কানপুর হইতে উকীল বাবুমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "দুইটা বয়েল পাওয়া গিয়াছে, খুব বহাইয়া লওয়া যাউক।" তিনি রহস্য করিয়া এই কথা বলিলেন, আমার কিন্তু বুকে ঢেঁকীর পাড় পড়িতে লাগিল।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি কৃপণ স্বভাবের লোক; আমার মধ্যে বড়ই অর্থাশক্তি। গোস্বামী মহাশয়ের

আমি গুরুকে না খাওয়াইয়া খাইতে পারিব না, গুরুও আশ্রমবাসী সকলকে না খাওয়াইয়া খাইতে পারিবেন না, সুতরাং সমস্ত ব্যয়ভার আমাকেই বহন করিতে হইবে; মনে এই সব চিন্তার উদয় হইয়া আমাকে অতিশয় বিষণ্ণ করিয়া তুলিল, তৃতীয় দিবসের গাড়ীভাড়া মন্মথবাবু বহন করিলেন, চতুর্থ দিনের ভাড়া আমি দিলাম, তৎপর দিনের ভাড়া মন্মথবাবু দিয়া বলিলেন, "আমাকে কানপুর যাইতে হইবে।"

গোস্বামী মহাশয় মন্মথ বাবুকে কানপুর যাইতে অনুমতি দিলেন পরদিন তিনি কানপুর চলিয়া গেলেন। চাকুরের মধ্যে আমি একাকী গোস্বামী মহাশয়ের নিকট থাকিলাম। এই দিন আমি সমস্ত গাড়ীভাড়া দিলাম, এবং দুই দিন পরে বোলপুর আসিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম; এই কথা গোস্বামী মহাশয়ের কর্ণগোচর হইলে, তিনি বলিলেন "পরশু? সেত অনেক দিনের কথা।" এই কথা শুনিয়া গুরুভাইগণ বলিলেন, "হরিদাস বাবু, আপনি কদাচ বোলপুর যাইবেন না, যে ব্যক্তি যখন যাইতে চায়, গোস্বামী মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় দেন, কাহাকেও থাকিতে বলেন না; আপনাকে যখন যাইবার অনুমতি দিলেন না, তখন আপনি এই স্থানেই থাকুন, ওকালতী নষ্ট হয় হউক, আপনি ক্ষতি মনে

অনুমতি না পাওয়ায় আমি প্রয়াগেই অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।

একদিন গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, এই পাড়ায় একটা কুকুর আছে, সে প্রত্যহ আরতির সময় শিবের ভজন গায়। আমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, এবং সত্য মিথ্যা জানিবার জন্য আরতির অপেক্ষায় থাকিলাম। এখানে সন্ধ্যার সময় আরতি হয় না, রাত্রি ৮টার পর আরতি আরম্ভ হয়, মুসলমান বাদসাহের আমলাবধি এই নিয়ম প্রচলিত আছে। সন্ধ্যাকালে কাঁসর ঘণ্টার শব্দে পাছে নমাজের বিঘ্ন হয় তজ্জন্য এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রাত্রি ৮টা বাজিয়া গেল, যেমন শিবের আরতি আরম্ভ হইল, অমনি একটা কুকুর ভেউ ভেউ করিয়া নানারূপ শব্দ করিতে লাগিল, যেমন আরতি থামিল, অমনি কুকুরের রব থামিল। প্রতিদিন এইরূপ শুনিতে লাগিলাম। একদিন আরতি আরম্ভ হইলে কুকুরের রব শুনিতে পাইলাম না, গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম, কই মহাশয়? আজ ত কুকুরের রব শুনি না? গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, হয় ত কুকুরটা কোথাও খাইতে গিয়াছে, সময় মত উপস্থিত হইতে পারে নাই, এখনি আসিয়া ভজন গাইবে। বাস্তবিক একটু পরেই কুকুরের সেই রব শুনা গেল, ভজন আরম্ভ করিতে যতটুকু বিলম্ব

বর শুনা গেল। আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—

আমি—মহাশয়, কুকুরে ভজন গায়, এ বড় আশ্চর্য্য কথা, অন্য কোন কুকুর ত ভজন গায় না ?

গোঁসাই—এই কুকুরটা পূর্ব্বজন্মে পরম সাধু ছিল, গুরুর অভিশাপে কুকুরযোনী প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমি—তবে কি জন্মান্তর আছে ?

গোঁসাই—হাঁ নিশ্চয় আছে। আমি পূর্ব্বে জন্মান্তরের বিপক্ষে কত লিখিয়াছি, কত বক্তৃতা করিয়াছি, যুক্তি দ্বারায় বিচার করিলে জন্মান্তর না থাকাই প্রতীয়মান হয়, কিন্তু এখন যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে পূর্ব্বজন্ম আছে, তখন কেমন করিয়া অস্বীকার করিব।

আমি—আপনি কি প্রকারে পূর্ব্বজন্ম জানিতে পারিলেন ?

গোঁসাই—আমার দীক্ষা হইবার কিছুদিন পরে হঠাৎ আমার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির উদয় হইল। পূর্ব্বজন্মে আমি এক রামাইত সন্ন্যাসী ছিলাম, রামগয়ায় ফল্গু নদী তীরে একটা অশ্বত্থ বৃক্ষের ডালে সীতারামের নাম খুদিয়া দিয়াছিলাম; এই কথা আমার স্মৃতিপথে উদয় হওয়ায় সেই বৃক্ষ দেখিতে গিয়াছিলাম, গিয়া দেখিলাম

লাভ হইলে ভূত; ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সব এক হইয়া যায়।

আমি—যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, দূরে ঘটিতেছে, বা ভবিষ্যতে ঘটিবে তাহা কি আপনি জানিতে পারেন?

গোঁসাই—হাঁ, জানিতে পারি।

আমি—কেমন করিয়া জানিতে পারেন?

গোঁসাই—আমার নিকট দৃশ্য পড়ে।

আমি ইহার কি বুঝিব চুপ করিয়া থাকিলাম; একজন প্রতিবেশীকে বলিলাম, মহাশয়, আপনাদের পাড়ায় একটা কুকুর আছে সে শিবের আরতি-সময়ে প্রত্যহ ভজন গায়। তিনি আমাকে উপহাস করিয়া বলিলেন, এও কি হয়? আমরা এতকাল এখানে বাস করিতেছি, আমরা কিছু শুনিলাম না, জানিলাম না. আর আপনারা তিন দিন আসিয়া একথা জানিতে পারিলেন! আমি বলিলাম আরতির সময় আপনি আমাদের বাসায় আসিবেন, কুকুরের ভজন শুনিতে পাইবেন। তিনি আমার কথা আদৌ বিশ্বাস করিলেন না, আমাকে অপ্রতিভ করিবার অভিপ্রায়ে সন্ধ্যার পর আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যথাসময়ে আরতি আরম্ভ হইলে কুকুর

গেলেন, ইহার পর তিনি আরও ৩।৪ দিন আসিয়া কুকুরের ভজন শুনিলেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি কৃপণ স্বভাবের লোক, আমার অর্থাশক্তি অত্যন্ত প্রবল, আমার অর্থ ব্যয় হইতে থাকায় দুশ্চিন্তার উদয় হইয়াছিল, আমার মনের স্ফূর্ত্তি নষ্ট হইয়াছিল, আমি দিন দিন বিষন্ন হইতে-ছিলাম। গোস্বামী মহাশয় আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া আমার অসাক্ষাতে একদিন প্রাতে শিষ্যগণকে বলিলেন হরিদাসবাবুর নিকট গাড়ীভাড়া ইত্যাদি কিছুই লইবে না; সরকারী ব্যয়ে সমস্ত নির্ব্বাহ করিবে। আমি যদিও ভিন্ন কুঠরীতে ছিলাম কিন্তু এই কথাটা আমি স্বকর্ণে শুনিলাম। কথাটা শ্রুতিমধুর হইলেও মন প্রসন্ন হইল না। কিছুক্ষণ পরে গোস্বামী মহাশয় সকলকে ডাকিয়া বলিলেন ;—

গোঁসাই—সকলে বিদেশে আসিয়াছ, এখানে হরেগোল করে থাক্‌লে চলবে না, সকলে এক একটা করিয়া কাযের ভার লও।

শিষ্যগণ—যে আজ্ঞে, আমাদিগের এক একজনকে এক একটা কাযের ভার দিউন।

গোস্বামী মহাশয়ও স্বামী দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীকে বলিলেন আপনি বাজার সরকার থাকিলেন, শ্যামাকান্ত বাবুকে বলিলেন আপনি রন্ধনবাড়ীর তত্ত্বাবধারক থাকি-

লেন, বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়কে বলিলেন আপনি মুহুরী থাকিলেন, সমস্ত জমা খরচ করিবেন, এই মত কাহাকেও স্নানের জল তোলাইয়া জালা ভর্ত্তি করিয়া রাখিবার ভার দিলেন, এইরূপ এক একজনকে এক একটা কাযের ভার দিয়া বলিলেন "আমাকে একটা কাযের ভার দাও?" সকলে নীরব। তখন গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "আমি সকলকে ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইব।"

ঘাম দিয়া যেমন জ্বর ছাড়িয়া যায়, এই কথা শুনিয়া আমারও তেমনি অবস্থা হইল, আমার বিষণ্ণতা দূর হইল, আমি যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলাম। পরক্ষণেই গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে বলিলেন, "যাহার যাহা আছে আমাকে ভিক্ষা দাও," এই বলিয়া গোস্বামী মহাশয় অাঁচল পাতিলেন, যাহার যাহা ছিল সকলে আনিয়া গোস্বামী মহাশয়ের অাঁচলে দিলেন, আমার four monthly টিকিট ছিল, গাড়ী ভাড়ার ভাবনা নাই, তথাপি পাঁচটি টাকা রাখিয়া যাহা কিছু সঙ্গে ছিল তৎসমুদয় আনিয়া দিলাম। ভিক্ষায় ১৬০৲ টাকা পরিমাণ হইল; গোস্বামী মহাশয় আসনের নীচে তাহা রাখিয়া দিলেন এবং আমাদিগকে বলিলেন তোমাদের আত্মীয় স্বজনকে পত্র লেখ, যাহার যাহা ইচ্ছা, এই সময় আমাকে

কোথায় আছে যে তাহারা টাকার জন্য তাহাদিগকে পত্র লিখিবে ? আমি টাকা পাঠাইবার জন্য আপন পরিবারকে একখানা পত্র লিখিলাম।

বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র জমা খরচ রাখিবার জন্য একখানা কাগজ ভাঁজ করিয়া একটা কানফোড়া খাতা বান্ধিলেন ও একটা পেন্সিল সংগ্রহ করিয়া লইলেন। তহবিলে ।৶০ আনা পয়সা জমা হইল। ভিক্ষার টাকা আর খাতায় জমা হইল না, উহা গোস্বামী মহাশয়ের আসনের তলাতেই থাকিল।

এইবার গোঁসাইজীকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলাম ; আমার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁহার প্রতি সর্ব্বদাই অর্পিত থাকিল। প্রয়াগে কুম্ভমেলা, দেশ দেশান্তর হইতে লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া এই স্থানে সমবেত হইতেছে, জিনিস পত্র দিন দিন অগ্নিমূল্য হইতেছে ; এখানে জন প্রাণীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় নাই, কোথাও ধার পাইবার উপায় নাই ; দোকান হইতে কোন জিনিস লইতে হইলে নগদ পয়সা চাই ;—এক পয়সার জিনিস ধারে পাইবার উপায় নাই ; প্রতিদিন ১০।১২ টাকা খরচ আবশ্যক, তাহার কমে দিন নির্ব্বাহ হইবে না ; ভিক্ষায় ১৬০\ টাকা পরিমাণ পাইয়াছেন, ইহাতে আর ক দিন চালাইবেন ? গোস্বামী মহাশয়ের মনে কোন

পড়ে কিনা, খরচ নির্ব্বাহ জন্য তিনি আমাদের সঙ্গে কোন যুক্তি পরামর্শ করেন কি না, ইহার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিলাম।

কুম্ভ উপলক্ষে প্রয়াগধামে অনেক সাধু সমাগম হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সাধু বেশধারী অনেক চোর জুয়াচোর, ভিক্ষুকও জুটিয়াছে। কেহ আসিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলিতেছেন "মহারাজ, হামারা কম্বল নেহি হ্যায়, বড় জাড়া লাগ্‌তা হ্যায়; কেহ বলিতেছেন, মহারাজ হামারা ধূনীকা লকড়া নেহি হ্যায়, কেহ বলিতেছেন গাঁজা নেহি, কেহ বলিতেছেন, হাম বড়া ভুখা হ্যায়; কেহ বলিতেছেন একঠো লোটা দেও বাবা, গোস্বামী মহাশয় আসনের নীচে হইতে টাকা লইয়া তাহাদিগকে একে একে দিতেছেন। বেলা ৩টার সময় সমস্ত টাকাগুলি নিঃশেষ হইয়া গেল।

গোস্বামী মহাশয়ের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া আমি অবাক; ১৬০৲ টাকায় ১০।১৫ দিন চলিত, সমস্ত উড়াইয়া দিলেন! কেমন করিয়া চালাইবেন! রাত পোহাইলেই ১০।১২টী টাকার দরকার; আমি হতভম্ভ হইয়া রাত্রিযাপন করিলাম।

ভোর হইয়াছে, চারিদিকে পাখী ডাকিতেছে, গোস্বামী মহাশয় আসনে উপবিষ্ট আছেন, আমি কাছে লেপ মুড়ী দিয়া শুইয়া আছি এমন সময় দ্বারদেশে

একটা লোক আসিয়া উপস্থিত হইল; লোকটার পরণে তুলাভরা পাজামা, পায়ে নাগরা জুতা, গায়ে তুলাভরা চাপকান, মাথায় তুলা ভরা টুপী। দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া লোকটা গোঁসাইজীকে বলিলেন, "মহারাজ আপকা হুকুম হোয় ত হাম আজকো সেবা লেই" গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, আচ্ছা। লোকটী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

বেলা ৭॥০টা বাজিয়াছে, দুইজন বাঁকী হুঁতিতে হুঁতিতে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ভদ্রলোকটী গোস্বামী মহাশয়ের সেবার জন্য এই বাঁকীদ্বয় দ্বারায় রাশীকৃত চাউল, ডাইল, লবণ, তৈল, ঘৃত, ময়দা, আটা, সূজী, চিনি, মিছরী, বিবিধ সন্দেশ; আলু, বেগুণ, কপি, শিম, শাক প্রভৃতি বিবিধ তরকারী, নেবু, পেয়ারা প্রভৃতি নানাজাতীয় ফল; দুগ্ধ, দই, রাবড়ী ও বিবিধ মসলা; টিকে, তামাক, কাট, দেশলাই, পান ইত্যাদি সমস্ত আহার্য্য সামগ্রী অতি যত্ন সহকারে পাঠাইয়া দিয়াছেন। জিনিস দেখিয়া ঝগুুর দলের আনন্দের আর সীমা নাই; তাহারা না পায় তামাক খেতে, না পায় পান খেতে, না পায় উপযুক্ত মত আহার করিতে; (দিদিমা সকল বিষয়েই একটু টানাটানি করেন)।

জিনিস দেখিয়া ঝগুুর দলের কেহ কেহ বাটীর ভিতর নাচিতে লাগিল; কেহ বা আনন্দে ডীগবাজী

দিল ; কেহ কেহ বা মালসাট মারিতে লাগিল ; কেহ বা তাল ঠুকিতে লাগিল ; এইরূপ করিতে করিতে একজন আসিয়া গোটাকতক কমলা নেবু, কেহ বা পেয়ারা, কেহ বা টিকে, তামাক দেশালাই ; কেহ বা সন্দেশ তুলিয়া লইল ; দিদিমা ঘরের গিন্নি, তিনি আসিতে না আসিতে এই সকল জিনিসের অর্দ্ধেক ফুরাইয়া গেল ; তিনি গন্ গন্ করিতে করিতে বাকী জিনিসগু'ল ভাণ্ডার জাত করিলেন। সে দিন চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় করিয়া প্রচুর আহার হইল। আমি মনে করিলাম, আজ যাহা হয় হইল, কল্য কেমন্ করিয়া চলে দেখা যাইবে।

রাত্রি ৪টা বাজিয়া গিয়াছে, গোস্বামী মহাশয় আসনে উপবিস্ট আছেন, আমি লেপ মুড়ী দিয়া নিকটে শুইয়া আছি—এমন সময় সেই লোকটী পুনরায় আসিলেন এবং দ্বারে দাঁড়াইয়া যোড় হাত করিয়া বলিলেন "মহারাজ হুকুম হয় ত আজ হাম সেবা লেই" গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "আচ্ছা"। এই কথা শুনিয়া লোকটী গোঁসাইকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

আরার বেলা ৭॥০ টার সময় দুইজন বাঁকি ; তাহারা আবার পূর্ব্বদিনের মত সমস্ত জিনিস আনিয়াছে, ঝণ্ডুর দলের আবার সেইরূপ আনন্দ, সেইরূপ কাড়াকাড়ী ; দিদিমার সেইরূপ বিরক্তি প্রকাশ! সে দিনও চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় করিয়া প্রচর আহার হইল। আমি

ভাবিলাম, আচ্ছা আজত চলিয়া গেল, কাল কেমন করিয়া চলে দেখা যাইবে।

আবার রাত্রি ৪টার সময় সেই লোকটী আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া গোস্বামী মহাশয়কে অভিবাদন করতঃ যোড়হস্তে বলিলেন "মহারাজ হুকুম হোয় ত আজ সেবা লেউ" গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেন, "নেহি, হোগা নেহি! তোম্ দোরোজ দিয়া, আউর হোগা নেহি, সন্তন্ লোকক৷ এ্যাসা দস্তুর নেহি হ্যায়"। আগন্তুক বলিলেন "হিঁয়া ভাঁলা দুধ নেহি মিলতা, হামারা বহুত দুধ হোতা, মর্জ্জি হোয়ত থোড়া দুধ ভেজ দেউঁ" গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "নেহি, কুচ নেহি হোগা" লোকটী অভিবাদন করতঃ বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া গেলেন। শিষ্যগণ সকলেই মনে মনে বড় আপসোস্ করিতে লাগিলেন, আমাদের টাকা পয়সা নাই, একটা লোক ষোড়শোপচারে খাওয়াইতেছিল, গোস্বামী মহাশয় তাহা বন্দ করিয়া দিলেন, যাহা হউক আমি বিছানা হইতে ত্বরায় উঠিয়া লোকটার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম এবং রাস্তায় তাহার নাগাইল পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম।

আমি—মহাশয় আপনার নাম কি?

ভদ্রলোকটী—আমার নাম অমুক (স্মরণ নাই)।

আমি—আপনার বাড়ী কোথায়?

ভদ্রলোকটী—চকক৷ লগিজ মে যো দোমহলা বাড়ী হ্যায় ওহি হামারা বাড়ী।

আমি—আপনি কি করেন ?

ভদ্রলোকটী—হামারা কুচ ইলাকা হ্যায়।

আমি—আপনি গোস্বামী মহাশয়কে কেন এত জিনিস পত্র দেন ?

ভদ্রলোকটী—হামারা গুরু হ্যায়, গুরুজী বোল দিয়া হুঁয়া একঠো সাধু হ্যায় ওস্‌কা খবর লেও। ইসি-ওয়াস্তে হাম খবর লেতা হ্যায়।

আমি ভদ্রলোকটীকে অভিবাদন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম ; ভাবিলাম পয়সা কড়িত কিছুই নাই, আজ কিসে চলে দেখা যাইবে। বেলা আটটা বাজিয়াছে এমন সময় শুনিলাম একটী সাধু (পরে শুনিলাম ঐ ভদ্রলোকটির গুরু) নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি আমাদের কীর্ত্তন শুনিবেন। গোস্বামী মহাশয় দলবল সহ সেই সাধুর আশ্রমে গমন করিলেন, তথায় খুব কীর্ত্তন হইল, গোস্বামী মহাশয় ভাবাবেশে খুব নৃত্য করিলেন, তাঁহার শিষ্যবৃন্দ অনেকেই তাঁহার সঙ্গে নাচিলেন ; যথাকালে আহারের জন্য আমাদিগকে ডাক পড়িল, আমি আহার করিতে গিয়া আয়োজনের পারিপাট্য দেখিয়া বিস্মৃত হইলাম ; লুচী, কচুরী, মালপোয়া, পরোটা, নিম্‌কী, বিবিধ তরকারী, বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সন্দেশ, নাড়ু, দই, ক্ষীর, রাবড়ী, বিবিধ রকম চাট্‌নী, আরও পশ্চিম দেশীয় কত প্রকার খাবার জিনিস, আমি তাহার নাম জানি না ;

আমি প্রচুর পরিমাণে আহার করিলাম, এমন খাওয়া আর কখনও খাই নাই। দেখিলাম সাধুর আশ্রমে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শুনিলাম এই সাধু নাকি আসন ছাড়িয়া ৩০ বৎসর কাল কোথায়ও যান নাই।

এই রকমে কোন না কোন প্রকারে আমাদের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা চলিতে লাগিল; আমি সর্ব্বদাই গোস্বামী মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতাম, তিনি প্রশান্ত ভাবে যোগাসনে উপবিষ্ট; মুখমণ্ডলে চিন্তার লেশ মাত্র নাই। বাসায় লোকে লোকারণ্য, এই সমস্ত লোকের আহারাদির ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন, কোথা হইতে আসিবে কেমন করিয়া চলিবে কোন কথা নাই; পেড়া নাই, বাক্স নাই, কোন তহবিল নাই, কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা নাই, যুক্তি পরামর্শ নাই, মহেন্দ্রবাবু খাতা বান্ধিয়া যে ✓০ আনা পয়সা জমা করিয়াছিলেন আর তাঁহাকে জমা খরচ করিতে হইল না, কাগজ পেন্সিল যেমন ছিল তেমনি থাকিল তাহার সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকিল না।

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বাসায় কীর্ত্তন হইত, কীর্ত্তনে গোস্বামী মহাশয় ভাবাবেশে অতি মধুর নৃত্য করিতেন; কোন কোন দিন কীর্ত্তন মধ্যে নিজের ইষ্ট দেবতাকে দর্শন করিয়া ভাবাবেশে স্তিমিতনেত্রে আপন জটা হস্তে লইয়া তদ্দ্বারা অতি মনোহর আরতি করিতেন, শিষ্যগণের

মধ্যে অনেকেই ভাবে অভিভূত হইয়া তাঁহারি চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেন।

এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইল, যাহাদিগকে আমি এতদিন ঝণ্ডুর দল, (vagabond) বলিয়া উপহাস ও অশ্রদ্ধা করিতাম, এখন তাঁহাদের প্রেম দেখিয়া বিমোহিত হইলাম, মনে হইতে লাগিল, ইহাদের জন্ম সার্থক, যাহারা ইহাদের একটু পায়ের ধূলা পায় তাহাদের জীবন ধন্য হইয়া যায়। ইহারা মানুষ নহেন, স্বর্গের দেবতা; শিষ্যবৃন্দের উপর আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল।

এমন কীর্ত্তন, এমন ভাবের তরঙ্গ যে একবার দেখিত সেই বিমোহিত হইত; আমি কিন্তু যে কাট সেই কাট; কীর্ত্তন ও নৃত্য দাঁড়াইয়া দেখিতাম; ইহা আমার অন্তর স্পর্শও করিত না, বরং খোল কর্ত্তালের ধ্বনিতে আমার কানে ঝালাপালা লাগিত। আমি চিন্তায় মগ্ন হইলাম, আমার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল, যে কীর্ত্তনে পাষাণও গলিয়া যায়, আমার মন গলেনা কেন? এত কাল ধরিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলাম, এতদিন গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, আমার কিছুতেই কিছু হইল না। এই সকল শিষ্যের কেমন মধুর অবস্থা আমি যে পাষণ্ড সেই পাষণ্ড! প্রেমবন্যায় চারিদিক ভাসিতে লাগিল আমার শুষ্ক হৃদয়ে এক বিন্দুও স্পর্শ করিল না।

আমার মনে হইল ওকালতীই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ওকালতী ব্যবসা যে মিথ্যা প্রবঞ্চনা মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে হয়, hypocracy (কপটতা) ইহার প্রধান অঙ্গ, মনে একরকম, মুখে একরকম, যে কোন উপায়ে হউক হাকিমকে ঠকাইতে হইবে, তাঁহার চক্ষে ধূলা নিক্ষেপ করিতে হইবে। সত্যকে অসত্য ও অসত্যকে সত্য বলিয়া হাকিমের মনে ধারণা জন্মাইয়া দিতে হইবে। তবেই ওকালতীর বাহাদুরী। একজন তাহার যথার্থ বিষয় হইতে নৈরাশ হইবে, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নাচের ভিখারী হইবে, তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই, মক্কেলকে জিতাইতে পারিলেই পরমানন্দ মিথ্যা মোকর্দ্দমা জিতিয়া আহ্লাদের সীমা নাই। সাক্ষী কাটরায় ঢুকিয়াছে, সত্য কথা বলিতেছে, আমার মক্কেলের ক্ষতি হইতেছে ইহাতে মহা বিরক্তি ; মক্কেলকে ধমকাইয়া বলিতেছি ব্যাটা এমন সাক্ষী কেন আনিলে ? মক্কেল মিথ্যা সাক্ষী গুজরাইতেছে তাহাতে মোকর্দ্দমার পোষক হইতেছে; ইহাতে পরমানন্দ ; বিপক্ষ পক্ষের কোন ভদ্রলোক সত্য এজাহার দিতেছে, যদি প্যাঁচ পোঁচ করিয়া তাহাকে ঘাবড়াইয়া দিতে পারি তবেই খুসী। এই যাহাদের ব্যবসা, মক্কেল টাকা দিলে যাহারা তাহাদের জন্য না কত্তে পারেন এমন কায নাই, যাহারা বিবেকের দংশন এড়াইবার জন্য মনকে বুঝায়

হইয়া দুকথা বলিতেছি, হাকিম বিচার করিতেছেন, পাপ পুণ্যের ভাগা মক্কেল ; এইরূপে যাহাদের বিবেক একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, সেই পাপাসক্ত হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির কি উদয় হইতে পারে ? ওকালতীই আমার সর্ব্বনাশের মূল এত কালের উপাসনায় যে কিছু হইল না ইহার একমাত্র কারণ ওকালতী। তখন মনে হইল যদি ৫০৲ টাকা বেতনের একটা চাকরী পাই তাহা হইলে ওকালতী পরিত্যাগ করি। চাকরী করিয়া মনিবের দাসত্ব করা, তাহার লাথী ঝাঁটা খাওয়াও ভাল, তথাপি ওকালতীর ন্যায় কুকার্য্য করিতে নাই ?

এই মনে করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আমি ওকালতীর কথা পাড়িলাম, একটু বলিতে না বলিতে তিনি বলিলেন "হরিদাস, ওকালতী ত্যাগ করিতে পারিবে না, তোমার সে শক্তি নাই, আর ওকালতী ত্যাগ করিলেও তোমার ভাল হইবে না ; সাবধানে, যতদূর পার সদ্ভাবে থাকিয়া ওকালতী করিবে, উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিবে। দুঃখ করিও না, ভগবান্ যখন যে অবস্থায় রাখিবেন তখন সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট চিত্তে থাকিবে, ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান, যদি তিনি ধর্ম্ম দেন তবে এই নরকের মধ্যেই দিবেন, নতুবা কিছুতেই কিছু হইবে না।"

লেন, আহারান্তে তিনি সাধু ও দেবদর্শনে পূর্ব্ববৎ বাহির হইলেন, শিষ্যবৃন্দ গাড়ী ভাড়া করিবার জন্য আগাইয়া গেলেন, গোস্বামী মহাশয় পিছাইয়া পড়িলেন; আমি পশ্চাতে তাঁহার কমণ্ডলু হস্তে লইয়া চলিলাম। মন বিষণ্ণ, গুরু ভাইদের প্রেম দেখিয়া আমি মনে মনে আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতেছি এবং নৈরাশ্যে অভিভূত হইতেছি এমন সময় গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "যাহা দেখিতেছ তাহার মাধুর্য্য নাই, যদি একটা বৃক্ষের একটা ডাল খুব লম্বা হইয়া যায়, আর অন্য ডাল গুলি ছোট ছোট থাকে তাহা হইলে সে গাছের কি শোভা হয়? সমস্ত ডালগুলি সমভাবে চারিদিকে বর্দ্ধিত হইবে পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত হইবে তবেইত গাছের শোভা, দুঃখ করিও না, সময়ে সব হইয়া যাইবে।"

এতকাল ব্রহ্মোপসনা করিতেছি, এতকাল ধর্ম্মাচরণ করিতেছি, কিন্তু ধর্ম্ম কি তাহা আমি এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই, আমি কেবল মনে করিতাম পরমেশ্বরের উপাসনা ও ধর্ম্ম কার্য্য করিলে পরকালে সদ্‌গতি হয়; ইহা ভিন্ন আর আমি কিছু জানিতাম না, বুঝিতামও না। ধর্ম্ম যে ধরিবার, ছুঁইবার ও সম্ভোগ করিবার জিনিস, ইহাতে তাপত্রয় নষ্ট হইয়া জীবন যে মধুময় হয়, সর্ব্বপ্রকার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া

প্রাণের মধ্যে যে অমৃত ধারা ঢালিয়া দেয়। কাম ক্রোধাদি রিপুগণের দাসত্ব মোচন হয়, দুষ্প্রবৃত্তি দূরীভূত হইয়া সৎপ্রবৃত্তি জাগারত হয়, তখন আমার এসব জ্ঞান ছিল না, "সুতরাং সব হইয়া যাইবে" একথার অর্থ আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম না। তিনি সশিষ্যে ন্যাঙ্গা বাবার নিকট চলিলেন।

ন্যাঙ্গা বাবা একজন পরমহংস, মহাসাধু পুরুষ, তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর। বহুকাল যাবৎ উলঙ্গ, পরিধানে বা গাত্রে কোন বস্ত্র নাই; গঙ্গাগর্ভে একটা প্রকাণ্ড বটতলায় কুটীর বান্ধিয়া বহুকাল যাবৎ ভজন করিতেছেন; উলঙ্গ বলিয়াও ভজনের বিঘ্ন আশঙ্কায় তিনি সচরাচর কুটীরের বাহির হন না। গোস্বামী মহাশয় মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট গিয়া বসিতেন ও কথাবার্ত্তা কহিতেন। এই দিন গোস্বামী মহাশয় ন্যাঙ্গা বাবার আশ্রমে গেলে তিনি কুটীর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন; গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে লাগিলেন, তদপর নানা স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া ঠাকুর ও সাধু-দর্শন করতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাসায় আসিয়া গোস্বামী মহাশয় আমাকে বলিলেন,

গোঁসাই—ন্যাঙ্গা বাবাকে দেখিলেন? আহা প্রত্যেক হরি কথায় কেমন পুলক!

আমি—মহাশয় কি বলিতেছেন? আমি আমার গুরু-ভাইগণের মধ্যে যাহা দেখিতে পাই, তাহার এক কণাও ন্যাঙ্গা বাবাতে দেখিতে পাই না।

গোঁসাই—এ জিনিস তিনি কোথায় পাইবেন?

"এ জিনিস" এই কথার অর্থ আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম না, মনে হইল পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণ প্রেম * এই প্রেম সুদুর্ল্লভ, ইহা লাভ হইলে মানুষের যাহা কিছু লাভ হইবার আছে তাহা সমুদয় লাভ হইয়া থাকে।

একদিন গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

শিষ্যগণ—আমরা কোন্ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত তাহা কিছু জানি না, কুম্ভে অনেক সাধু সমাগম হইয়াছে, যদি কেহ আমাদের সম্প্রদায় জানিতে চাহেন, আমরা কি উত্তর দিব?

---

* কৃষ্ণ প্রেম কেবল সাধন ভজনের দ্বারায় লাভ হয় না। ইহা ভগবানের বিশেষ দান, গুরু কৃষ্ণ কৃপায় ইহা লাভ হইয়া থাকে "নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়"

"নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।

গোঁসাই—তোমরা মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া উত্তর দিও।

আমি এ পর্য্যন্ত জানিতাম না যে আমরা কোন হিন্দু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, এই পর্য্যন্ত জানিতাম যে, গোস্বামী মহাশয় একজন ব্রাহ্ম, আমাদিগকে পরব্রহ্মের নাম সাধন করিতে দিয়াছেন আমরা তাহাই করিতেছি; ইহার ফলাফল কি এসব কিছুই জানিতাম না, গোস্বামী মহাশয়ও শিষ্যগণকে কিছুই বলিয়া দেন নাই; তাঁহারা জানিতেন গোস্বামী মহাশয় একজন ব্রহ্মোপাসক, তাঁহারও তাহাই; তিনি বলিয়াছিলেন গুরু-দত্ত নাম সাধন করিতে করিতে যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম তাহা প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি হইবে, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না; যাহা সত্য, যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম, তাহা দশবার বাজাইয়া লইবে।

আমরা মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এই কথা গোস্বামী মহাশয় বলিয়া দিলেন সত্য, কিন্তু আমি মনে করিলাম, আমরা ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্ম অথবা অসম্প্রদায়ী একদল লোক, হিন্দুদিগের নিকট ব্রাহ্মদিগের কোন সম্প্রদায় নাই; অসম্প্রদায়ী একথাও বলিবার যো নাই; একারণ সাধুদিগের নিকট কুম্ভে স্থান পাইবার ও পরিচয় দিবার জন্য গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া পরিচয়

দিতে বলিলেন; কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমরা অসম্প্রদায়ীইও নহি, ব্রাহ্মও নহি আমরা প্রকৃত পক্ষে মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত ভিখারীর দৌরাত্ম্য; কেহ বলিতেছে হাম ভুখা হ্যায়, কেহ বলিতেছে বড়া জাড়া লাগতে হ্যায়, কেহ বলিতেছে ধুনীর লক্‌ড়ী নেহি হ্যায়, কেহ বলিতেছে গাঁজা নেহি হ্যায়; কেহ বলিতেছে বাবা একঠো লোটা দেও; গোস্বামী মহাশয় অবিশ্রান্ত কাহাকেও কাপড় কাহাকেও কম্বল, কাহাকেও লোটা, কাহাকেও গাঁজা, কাহাকেও ধুনির কাট কিনিয়া দিতেছেন, নিজের গায়ের কম্বল, আলখাল্লা, বসিবার আসন, জল খাইবার কমণ্ডলু পর্য্যন্ত দান করিয়া উলঙ্গ গাত্রে ধূলায় বসিয়া আছেন কাহারও সঙ্গে কোন কথা নাই, গোস্বামী মহাশয়ের শরীর অসুস্থ, তিনি এই দারুণ শীতে খোলাগায়ে ধরাসনে বসিয়া আছেন, এখনি জ্বর হইবে, এই ভাবিয়া শিষ্যগণ কোন রকমে একখানা কম্বল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া গোস্বামী মহাশয়ের গায়ে জড়াইয়া দিলেন আর একখানা কম্বল পাট করিয়া পাতিয়া তাহার উপর তাঁহাকে বসাইয়া দিলেন, ২।১ ঘণ্টার পর যেমন ভিখারী আসিতে লাগিল অমনি গায়ের ও

যে অনাবৃত দেহ, সেই অনাবৃত দেহ; আবার শিষ্যগণ কোন রকমে কম্বল সংগ্রহ করিয়া আনিল; আবার তাই, আবার আনিল, আবার তাই; শিষ্যগণ ক্রমে নিরুপায় হইয়া পড়িল। তাঁহারা আমাকে বলিলেন, আপনি এইবার কম্বল কিনিয়া আনিয়া গোস্বামী মহাশয়কে দিয়া বলুন, এই কম্বল কাহাকেও দিতে পারিবেন না।

রাখালবাবুর উপর তিরস্কারের কথা আমার মনে আছে, আমি শিষ্যগণকে বলিলাম "কম্বল কাহাকেও দিতে পারিবেন না একথা আমি কদাচ বলিতে পারিব না" এই বলিয়া কম্বল কিনিয়া আনিয়া গোস্বামী মহাশয়কে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে যেমন ভিখারী আসিল তখনি তাহা দান হইয়া গেল। শিষ্যগণ প্রমাদ গণিল, অনেক পরামর্শের পর দিদিমাকে বলা হইল আপনি কম্বল কিনিয়া দিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলুন "এই কম্বল আমার, আমি আপনার গায়ে দিয়া রাখিতেছি ও আপনাকে বসিতে দিতেছি ইহা আপনি কাহাকেও দিতে পারিবেন না।" দিদিমা প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিলেন, পরে সাহসে ভর করিয়া কম্বল দিয়া ঐ কথা বলিলেন। এই অবধি গোস্বামী মহাশয়ের গায়ে কম্বল থাকিল, আর তাঁহাকে শীত ভোগ করিতে হইল না।

করিতাম, একদিন একজন সাধু আসিয়া আমার নিকট কম্বল চাহিল, আমি তাহাকে নিজের কম্বলখানি দিলাম; লোকটা চলিয়া গেলে গোস্বামী মহাশয় হাঁসিয়া আমাকে বলিলেন ;—

গোঁসাই—আজ আপনাকে খুব ঠকাইয়াছে, একটা চোর সাধু সাজিয়া আসিয়া আপনার নিকট কম্বল খানি লইয়া গেল।

আমি—আপনি কেমন করিয়া জানিলেন ঐ লোকটা চোর ?

গোঁসাই—আমি মানুষের দেহ দেখি না; তাহার আত্মা দেখি।

আমি—আত্মা কি দেখা যায় ?

গোঁসাই—হাঁ দেখা যায়, তাহার সমস্ত কার্য্য-কলাপে দেখা যায়।

আমি—শুনিয়াছি কখনও কখনও মহাত্মারা ভিখারী বেশে গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হন; তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা না হইলে, গৃহস্থের অমঙ্গল হইতে পারে।

গোঁসাই—যে মহাত্মা গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হন, তিনি তাহাদের মঙ্গলের জন্য উপস্থিত হইয়া থাকেন, তিনি এমন কোন কায করেন না, যাহাতে গৃহস্থের অমঙ্গল হইবে।

আমি—চোর কি সাধু কিপ্রকারে জানিব ?

গোঁসাই—সাধু কখনও যাচ্ঞা করেন না, তিনি কখনও আত্ম-প্রসংশা করেন না, কখনও পরনিন্দা করেন না ; কখন বুজরুকি দেখান না ; কখনও পরের ধর্ম্মবিশ্বাস নষ্ট করেন না ।

প্রয়াগের পূর্ব্বধারে গঙ্গা প্রবাহিতা, দক্ষিণে যমুনা, সঙ্গমস্থলের সাম্‌নে ইংরাজের কেল্লা ; এই কেল্লার সম্মুখস্থ সুবিস্তৃত ভূমিতে কুম্ভ মেলা হইয়া থাকে । এবার কিন্তু তাহা হয় নাই ; গঙ্গার পূর্ব্বপারে সুবিস্তীর্ণ চরে মেলার স্থান নিরূপিত হইয়াছে ; গঙ্গা পার হইবার জন্য নৌকা দিয়া সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে. ঐ চরে এক এক সম্প্রদায় সাধুর জন্য এক একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে । সাধুগণ আপন আপন স্থানে গিয়া কেহ তাম্বু খাটাইতেছেন, কেহ কুটীর বান্ধিতেছেন, কেহ ছাতা গাড়িতেছেন, আবার কেহ ইহার কিছুই করিতেছেন না, সুনীল আকাশতলে উলঙ্গ গাত্রে আসন পরিগ্রহণ করিতেছেন ।

একদিন গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আমরা মেলার স্থানে সাধুদর্শনে গমন করিলাম ; গঙ্গার পুল পার হইয়া যেমন চরে উঠিলাম, তখনি একটা লোক দৌড়িয়া আসিয়া … আমাদের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া

আরতি করিতে লাগিল; লোকটী দৃঢ়কায়, গৌরবর্ণ পরণে একটা ছেঁড়া কম্বল। আরতি করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে দৌড়িয়া পলাইয়া গেল; আবার ক্ষণকাল পরে আসিয়া পূর্ব্ববৎ আরতি করিতে লাগিল। তাহার শরীর এমনি সুদৃঢ় যে সে এক নিশ্বাসে ক্রোশাধিক ছুটিয়া যায় আবার এক নিশ্বাসে ছুটিয়া আসে, হাঁপায় না। সকলে তাহাকে পাগল মনে করে, কোথায়ও সে আদর যত্ন পায় না; যেমন তিনি কাছে আসিলেন, পণ্ডিত মহাশয় অমনি তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলেন, প্রণাম করিবামাত্র একটা ডিগবাজী দিয়া লোকটা দশহাত তফাতে পড়িল; দেখাদেখি আমিও প্রণাম করিতে গেলাম, আমার বেলায়ও তাই; কাহার সাধ্য যে তাঁহাকে স্পর্শ করে? লোকটার কথাবার্ত্তার শৃঙ্খলা নাই, সমস্তই অসংলগ্ন।

বাসায় আসিয়া গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, লোকটা কে? গোস্বামী মহাশয় বলিলেন। উনি একজন মহাপুরুষ, উহার নাম মহাত্মা অর্জ্জুন দাস; উনি কোথায় থাকেন, কোথা হইতে আসেন, কেহই জানে না, এই যে এত বড় মেলা একা উহার প্রভাবেই ঠিক থাকিবে। উহার মত একটিও মহাত্মা এই মেলায় নাই।

সন্ধ্যার পর মহাত্মা অর্জ্জুনদাস আমাদের বাসায়

আসিয়া উপস্থিত হইলেন, গোস্বামী মহাশয়ের আদেশে তাঁহার জামাতা বাবু জগবন্ধু মৈত্র তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া দিতে গেলেন; কাহার সাধ্য তাঁহার পায়ে হাত দেয়? পরে গোস্বামী মহাশয়ের অভিপ্রায় বুঝিয়া মহাত্মা অর্জ্জুন দাস পা ধুইতে দিলেন। জগদ্বন্ধুবাবু তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া দিয়া গোস্বামী মহাশয়ের ইঙ্গিতে অতি উপাদেয় আহার সামগ্রী আনিয়া উপস্থিত করিলেন, তিনি আসনে উপবিষ্ট হইয়া আহার করিলেন; পরে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত কথোপকথন করিয়া মেলার স্থানে চলিয়া গেলেন।

আমি গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম লোকটা পাগলের মত, কথাবার্ত্তা অসংলগ্ন; তিনি উত্তর করিলেন, পাগল না সাজিলে কি আর রক্ষা আছে? যে স্বার্থপর লোক, কিছু ক্ষমতা আছে টের পাইলেই একেবারে ছিঁড়ে খাবে। সেই অবধি মহাত্মা অর্জ্জুনদাস মধ্যে মধ্যে আমাদের বাসায় আসিতেন ও আহারাদি করিতেন। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। যে শাস্ত্রের যে স্থান হইতে একটা শ্লোক বলুন, তিনি সেই স্থান হইতেই শ্লোক আওড়াইয়া যাইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা পশ্চিম দেশীয় সাধুগণ জানেন না; ইনি সমস্তই জানিতেন। গোস্বামী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কেমন করিয়া মহাপ্রভুর কথা জানিলেন?" তিনি উত্তর করিলেন "ধ্যানমে মিলা।"

একদিন মেলায় যাইবার সময় গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাত্মা অর্জ্জুনদাসের সাক্ষাৎ পাইব কি? তিনি বলিলেন, যখনই তাঁহাকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া মেলায় যাইবেন, তখনই তাঁহার দেখা পাইবেন। আমি গঙ্গার পুল পার হইয়া যেমনি মেলায় উপস্থিত হইলাম, অমনি মহাত্মা অর্জ্জুনদাস ছুটিয়া আসিয়া আরতি করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার হাঁসি মুখ দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ তখন সকলেই ব্রাহ্ম ছিলেন; বৈষ্ণবতা কি, তখন তাহা ইঁহারা কেহই জানিতেন না। সকলেই সাম্য মৈত্রীর পক্ষপাতী। ইঁহাদের লঘু গুরু জ্ঞান ছিল না, লোকের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানিতেন না। একদিন রাত্রি ৯টার সময় সঙ্কীর্ত্তন ভাঙ্গিলে, গোস্বামী মহাশয় দেখিলেন তাঁহার জনৈক শিষ্য একজন ব্রাহ্মণের দিকে পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, ইহা দেখিয়া তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন "ইহাদের কি ধর্ম্ম হইবে? কোন কালেও ইহাদের ধর্ম্ম হইবে না, ইহাদের লঘু গুরু জ্ঞান নাই।" সেই সময় আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম;—

আমি—আপনি আমাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম

মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন, তবে কেন আমাদিগকে বৈষ্ণবাচার যাজন করিতে বলিলেন না ?

গোঁসাই—দেখিতেছ না ইহারা কিরূপ লোক ? ইহাদিগকে কি কিছু বলিবার যো আছে ? যদি কিছু ইহাদিগকে বলি, তাহা হইলে ইহারা আমার মাথায় লাঠি মারিবে। যদি বলি ঠাকুর দর্শন করিতে হইবে, অমনি বলিবে ইট, কাট, পাথর দেখিলে কি হইবে ? যদি বলি তিলক করিতে হইবে, অমনি বলিবে কতকগুলা মাটি লেপিয়া কি হইবে ? আমার কি কিছু বলিবার যো আছে ? এইজন্য কেবল একমাত্র নাম দিয়াছি, এই নাম হইতে সব হইয়া যাইবে।

আমি—যাহারা আমিষ ভক্ষণ করে, তাহারা কি তাহা পরিত্যাগ করিবে ?

গোঁসাই—নাম করিতে করিতে এমন সময় উপস্থিত হইবে, যখন আমিষ আহারে আর প্রবৃত্তি থাকিবে না, শরীরেও সহ্য হইবে না !

আমি—এই নাম হইতে কি বৈষ্ণবতা ও বৈষ্ণবাচার আসিবে ?

গোঁসাই—হাঁ সমস্তই আসিবে।

গোস্বামী মহাশয় সহরের বাসা পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গারচরে সেই মেলায় গিয়া সাধুগণের নিকট আসন পরিগ্রহ করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন ; শিষ্যগণ তাঁহার থাকিবার জন্য তথায় একটা তাম্বু খাটাইবার জন্য সচেষ্টিত হইলেন ।

একদিন শিষ্যগণ গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন ; মহাশয়, হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা ও আফগান স্থানের নিকট হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত যেখানে যে সাধু আছেন, সকলেই প্রয়াগে আসিতেছেন, আমাদের পরমহংসদেব (গোস্বামী মহাশয়ের গুরু) কি আসিবেন না ? গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেন তিনি আসিলেও আসিতে পারেন, তোমাদের দরকার কি ? শিষ্যগণ বলিলেন আমরা তাঁহাকে একবার দেখিতাম, আমি বলিলাম গুরু লইয়াই যত কিছু আমাদের কায, গুরুর গুরু দেখিলে, পাছে আমাদের মন বিচলিত হয়, এইজন্য পরমহংসদেব আমাদিগকে দেখা দেন না। ইহার পর গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, তোমাদের তাম্বু খাটান হউক আর নাই হউক, আমি কাল চরে গিয়া আসন করিব।

শিষ্যগণ তাড়াতাড়ি একটা তাম্বু সংগ্রহ করিয়া Cutch দেশীয় একজন বৈষ্ণব সাধুর নিকট হইতে কতকটা স্থান চাহিয়া লইয়া তথায় তাম্বু খাটাইলেন।

একে মাঘ মাস, তাহাতে গঙ্গার চর, বড়ই স্যাঁত সেঁতে; তাম্বুর নীচে বালি দিয়া ভরাট করা হইল, তাহার উপর খড় দরমা ইত্যাদি বিছান হইল। শিষ্যগণ ইহার পর আপন আপন বিছানা বিছাইবেন, একপার্শ্বে গোস্বামী মহাশয়ের আসন স্থাপিত হইল। তাঁহার সম্মুখে একটা ধুনীর কুণ্ড খোদা হইল। এই কুণ্ডে সমস্ত রাত্রি ধুনী জ্বলিত।

প্রয়াগের হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বাবুরামযাদব বাগচী গোস্বামী মহাশয়কে নিতাই গৌরের মূর্ত্তি স্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার এইকথা শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, মনে করিলাম এ ব্যাটা আবার কোথা হইতে পোঁদপস্তা জুটীল? গোস্বামী মহাশয়কে যে যাহা বলিতেন, তিনি তাহাই শুনিতেন,রামযাদব বাবুর কথানুসারে চরে নিতাই গৌরের মৃন্ময় মূর্ত্তি স্থাপিত হইল।

বাসা, চাকর চাকরাণি, রাঁধুনি যেমন ছিল, তেমনি থাকিল, রোগী, অসুস্থকায় শিষ্য ও স্ত্রীলোকগণকে বাসায় রাখিয়া অবশিষ্ট শিষ্যগণসহ গোস্বামী মহাশয় গঙ্গার চরে মেলার স্থানে যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। গঙ্গার পুল পার হইয়া যেমন চরে উঠিলেন, অমনি সম্মুখে একটা লোক দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। শিষ্যগণ ইহা

দেখিয়া হুড়াহুড়ী করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ খোল করতাল বাজাইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন; গোস্বামী মহাশয় ভাবাবেশে নাচিতে নাচিতে আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে চলিলেন, আমি গোলমাল হুড়াহুড়ী ভালবাসি না; সহ্য করিতেও পারি না। গুরুভাইগণ চলিয়া গেলে আমি লোকটীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলাম, দেখিলাম লোকটি একহারা, শ্যামবর্ণ, মুখমণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণ গোঁফ, মাথায় পাকড়ী, গায়ে চাপকান, পরণে মালকোচা মারা একখান কাপড়, পায়ে জুতা নাই, এক পা ধূলা। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ে হাত দিয়া ধূলা লইয়া মস্তকে ও অঙ্গে দিলাম। ইনি দুই হাত নাড়িয়া "মেরা প্রাণ, মেরা প্রাণ" এই কথা বলিলেন।

কীর্ত্তন অগ্রগামী হইয়াছে, আমি দ্রুতপদে গিয়া কীর্ত্তনে উপস্থিত হইলাম; লোকটীর আর কোন খোঁজ খবর লইলাম না; তিনি কে ইহা জানিবার জন্যও কোন রকম কৌতূহল জন্মিল না। ক্রমে কীর্ত্তন আশ্রমে উপস্থিত হইল। নিতাই গৌরের সম্মুখে কীর্ত্তনের গগণভেদী রোল উঠিল। গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যগণ ভাবাবেশে খুব নৃত্য করিতে লাগিলেন।

আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় স্থির হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

পশ্চিম দেশীয় সাধুগণ কখনও খোল করতাল দেখেন নাই, এমন হৃদয়গ্রাহী মধুর কীর্ত্তনও শুনেন নাই, এমন ঠাকুরও কখন দর্শন করেন নাই। গোস্বামী মহাশয়ের মস্তকে জটাভার; কপালে তিলক; মুখমণ্ডলে গোঁফ দাড়ী; গলদেশে তুলসী, রুদ্রাক্ষ, বেল, পদ্ম প্রভৃতি নানানজাতীয় মালা; পরিধানে গৈরীক ডোর, কৌপীন, বর্হিবাস; হস্তে দণ্ড, কমণ্ডলু। শিষ্যগণের মধ্যে কাহারও গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক, পরণে কম্বল, কাহারও গলায়, হাতে ও মস্তকে বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা. কপালে সিন্দুরের ফোঁটা। কেহ কোট পেণ্টুলেন পরিয়া আছেন, কেহ বা শান্তিপুরে কালাপেড়ে ধূতি পরিয়া, কামিজ ও উড়ানি গায়ে দিয়া, পায়ে মোজা ও বার্ণিস করা জুতা পরিয়া বাহার উড়াইতেছেন; গুরু বা শিষ্যগণের বেশ দেখিয়া ইহারা কোন্ সম্প্রদায়ের লোক উহাদের ধর্ম্ম কি কিছুই ঠাওরাইবার উপায় নাই, কীর্ত্তন থামিলে সাধুরা গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

সাধুগণ— আপ্ কা ডেরা কাঁহা হ্যায়?

গোঁসাই—বাঙ্গালা দেশমে শান্তিপুর নামে একঠো গাঁও

সাধুগণ—আপ্‌কা ক্যা ধরম হ্যায়।

গোঁসাই—বাঙ্গলা দেশমে, গঙ্গা তীরমে নবদ্বীপ নামে একঠো বস্‌তী হ্যায়, হুঁয়া ভগবান্‌ অবতীর্ণ হুয়া; উন্‌কো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বোলতা হ্যায়; উন্‌কো যো ধরম, হামারা ওহি ধরম হ্যায়।

সাধুগণ—(খোল দেখাইয়া) এ কেয়া যন্ত্র হ্যায়?

গোঁসাই—ইস্‌কো মৃদঙ্গ বোল্‌তা হ্যায়।

সাধুগণ—(করতাল দেখাইয়া) এ কেয়া হ্যায়?

গোঁসাই—ইস্‌কো করতাল বোলতা হ্যায়।

সাধুগণ—(ঠাকুর দেখাইয়া) এ কেয়া হ্যায়?

গোঁসাই—ওহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব হ্যায়।

সাধুগণ তারিপ করিতে করিতে আপন আপন স্থানে চলিয়া গেলেন। তাম্বুর ভিতরে সেই খড় ও দরমার উপর আমরা আপন আপন বিছানা বিছাইয়া লইলাম; এক পার্শ্বে গোস্বামী মহাশয়ের আসন হইল। তাঁহার সম্মুখের কুণ্ডে ধুনী জ্বলিল। সরের বেড়া দিয়া Compound ঘিরিয়া লওয়া হইল। এই Compound মধ্যে একটা কূপ খনন হইল। গেটে "হরে র্নামৈব কেবলম্‌" লিখিত হইল। মহাত্মা অর্জ্জুনদাস এই Compound এর এক পার্শ্বে আড্ডা গাড়িলেন। ইনি গোস্বামী মহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। ইনি এক দিন বলিলেন,

হরদম নাম সমাধিমে রয়তা, রামজী কিষণজী এনকো জটাকা সেবা করতা হ্যায়।” শিষ্যগণকে বলিলেন “তোমলোককা বহুত ভাগ হ্যায়, এ্যাসা সাধু মিলা। কই নেহি নিন্দ জাতা, সবকো হরদম শ্বাসে শ্বাসে নাম চল্‌তা হ্যায়!”

গোস্বামী মহাশয় মেলার স্থানে আসিয়া শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন “তোমরা এখানে কল্যকার জন্য কিছুই সঞ্চয় রাখিবে না, যে দিন যাহা আসিবে তাহা রোজ রোজ ব্যয় করিবে।” তখন বাবু বিধুভূষণ ঘোষ গোস্বামী মহাশয়ের প্রধান পরিচারক; যেমন হুকুম, তেমনি কায, এক ছটাক ময়দা বা এক মুঠা চাউল সঞ্চয় রাখিতেন না। এলাহাবাদের বাসায় যেমন খরচ ছিল, তেমনি খরচ চলিতে লাগিল, এখানে আবার আলাহিদা ব্যয় হইতে লাগিল। কোথা হইতে কি প্রকারে ব্যয় সঙ্কুলান হয় কিছুই বুঝা যায় না। গোস্বামী মহাশয়ের সহিত তৎসম্বন্ধে কোন কথাও হয় না, কেবল রান্ধিবার সময় তিনি জিজ্ঞাসা করেন;—

গোঁসাই—আজ কত লোকের রান্না হইতেছে?

শিষ্যগণ—আজ্ঞে ৪০ জনের।

গোঁসাই—ইহাতে হইবে কেন? আজ ৬০ জনের রান্ধ।

এইরূপ প্রত্যহ জিজ্ঞাসা করিতেন, কেবল বলিতেন

—আজ ৫০ জনের রান্ধ, কোন দিন বলিতেন, আজ ৪০ জনের রান্ধ, কোন দিন বলিতেন কল্য ৪৩০ শত সাধু ভোজন করাইতে হইবে তাহার আয়োজন কর, কোন দিন বলিতেন কল্য ৮০০ শত জন সাধু ভোজন করাইতে হইবে সেইমত আয়োজন করিও, টাকা কড়ির কোন কথা বলিতেন না। গোস্বামী মহাশয়ের আদেশমত আয়োজন হইত, সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া যাইত। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আরতি ও কীর্ত্তন হইত, গোস্বামী মহাশয় ভাবাবেশে খুব নৃত্য করিতেন, সাধুরা দলে দলে দেখিতে আসিতেন।

কুম্ভমেলা সাধুগণের একটা Congress; আবহমান কাল হইতে এই মেলাতে কোন বাঙ্গালী সাধুর স্থান নাই; বাঙ্গালীগণ মৎস্যাসী ও যোষিৎ সঙ্গী, এইজন্য পশ্চিম দেশীয় সাধুগণ বাঙ্গালিগণকে সাধু বলিয়া মনে করেন না; কুম্ভে বসিবার ইহাদের স্থান নাই, Cutch দেশীয় একজন বৈষ্ণব সাধু গোস্বামী মহাশয়ের প্রার্থনা মতে নিজের স্থান হইতে কতকটা যায়গা গোস্বামী মহাশয়কে দিয়াছিলেন, সেই স্থানটা ঘিরিয়া লইয়া তথায় তাম্বু খাটাইয়া গোস্বামী মহাশয় আসন করিয়াছিলেন।

গোস্বামী মহাশয় বাঙ্গালী সাধু, তিনি কুম্ভ মেলায় বসিবার অধিকারী নহেন, এজন্য তাঁহাকে মেলা হইতে

সাধুগণের মধ্যে একটা Conference বসিল; গোস্বামী মহাশয়ের সদাব্রত * বন্ধ হইল; Cutch দেশীয় বৈষ্ণর-টীর কৈফিয়ৎ তলব হইল। তিনি বলিলেন "আমি জানিতাম না যে গোঁসাই বাঙ্গালী সাধু, আমি না জানিয়া স্থান দিয়াছি।" এই Conference এ স্বামী ভোলানন্দ গিরি ও শ্রীবৃন্দাবন চৌরাশীক্রোশের মহান্ত মহাত্মা রামদাস কাটীয়া উপস্থিত ছিলেন। উভয়েই খুব প্রভাবশালী খ্যাতাপন্ন সাধু; তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়কে পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন; তাঁহারা এক বাক্যে বলিলেন "কুম্ভে ওহ বাঙ্গালী সাধুকা মাফিক একঠো সাধু নেহি হ্যায়" এই কথা বলাতে Conference এর সাধুগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন, সকল গোলমাল মিটিয়া গেল। গোস্বামী মহাশয়ের সদাব্রত আসিতে লাগিল, দিন কয়েক পরে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন আমি তাম্বুতে থাকিব না, আমার জন্য একটা কুঁড়ে বান্ধিয়া দাও। তাম্বুর একটু তফাতে একটা কুঁড়ে বান্ধা হইল, গোস্বামী মহাশয় এই কুঁড়েতে থাকিতে লাগিলেন, রাত্রিকালে

---

* কুম্ভমেলার নিয়ম এই যে যদি কোন ব্যক্তি সাধু সেবার জন্য কোন আশ্রমে কিছু দেন তাহা হইলে সেই আশ্রমের মহান্ত সেই জিনিস মেলার সমস্ত আশ্রমে তাহা বিভাগ করিয়া দেন;

অনেক সাধু সন্ন্যাসীকে গোস্বামী মহাশয় এই কুঁড়েতে সঙ্গোপনে দীক্ষা দিলেন।

এই মেলায় আসার কয়েকদিন পরে একদিন শিষ্যগণ গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—

শিষ্যগণ—এই মেলায় ভারতের সর্ব্বত্র হইতে লক্ষ লক্ষ সাধু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, আমাদের পরমহংসদেব আসিলেন না ?

গোঁসাই—তিনি ত আসিয়াছিলেন ? তোমরা কি দেখ নাই ?

শিষ্যগণ—না, আমরা ত দেখি নাই।

গোঁসাই—আমরা মেলায় আসিবার সময় পুল হইতে যখন চড়ায় উঠি, ঠিক সেই সময় একজন লোক যিনি চড়ার উপর দাঁড়াইয়াছিলেন, আমি যাহাকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ দিলাম, তোমরাও প্রণাম করিলে, তিনিই পরমহংসদেব।

তখন শিষ্যগণ সকলে আপ্‌সোষ্‌ করিতে লাগিলেন, হায় হায় আমরা কেহই দেখিলাম না। আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম ;—

আমি—পরমহংসদেব কেন আসিয়াছিলেন ?

গোঁসাই—তোমাদিগকে লইবার জন্য।

আমি—আমি তাঁহার যে চেহারা দেখিয়াছি, তাহাই কি

গোঁসাই—এ চেহারা তাঁহার নিজের নয়, ইহা কল্পিত চেহারা, তিনি একটা কল্পিত দেহ পরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছিলেন।

আমি—তাঁহার নিজের দেহ কোথায়?

গোঁসাই—মানস-সরোবরে।

আমি—কি অবস্থায় আছে?

গোঁসাই—সমাধি অবস্থায় আছে।

আমি—মানুষ কি দেহ হইতে বাহির হইয়া অন্য দেহ পরিগ্রহ করিতে পারে?

গোঁসাই—হাঁ, পারে; এই কল্পিত দেহ দুই প্রকারে হইতে পারে। মহাত্মারা সাধারণতঃ পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাবস্থা পঞ্চীকরণ দ্বারায় কল্পিত দেহ পরিগ্রহ করেন।

আমি—পরমহংসদেবের পায়ে হাত দিয়া বেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি তাঁহার রক্ত মাংসের শরীর।

গোঁসাই—তাহাও হয়, ইহা একটু আয়াস সাধ্য, তোমরাও চেষ্টা করিলে পারিবে। দেহ ভগ্ন হইলে অনেক সাধু ভগ্ন দেহ পরিত্যাগ করিয়া আর একটা নূতন দেহ গড়িয়া লয়েন। কেহ কেহ দুই তিনবারও এইরূপ করিয়া থাকেন।

আমি—পরমহংসদেব কল্পিত দেহে কেন আসিলেন?

মানুষ যে স্বার্থপর, স্বার্থের জন্য তাঁহাকে ছিঁড়িয়া খাইবে।

আমি—মানুষ আপন দেহ পরিত্যাগ করিয়া আর একটা দেহে প্রবেশ করিতে পারে এ বড় আশ্চর্য্য কথা।

গোঁসাই—পূর্ব্বে আমিও এ কথা বিশ্বাস করিতাম না, একদিন কয়েকজন লোক একটা মৃত দেহ সৎকার করিতে যাইতেছে, এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টি আসিল ; একারণ তাহারা ঐ মৃত দেহটা নামাইয়া রাখিয়া একটু তফাতে গেল ; পরম-হংসদেব ঐ মৃত দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আমার নিকট উঠিয়া আসিয়া বলিলেন "কেমন এখন বিশ্বাস হয় ?" আমি অবাক্ হইয়া বলিলাম, মহাশয়, আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা।

গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে প্রত্যহ সাধু দর্শন ও পরিক্রমা করিতে বলিয়া দিয়া বলেন, সর্ব্বদা কোন সাধুর নিকট যাইও না, কেবল দূর হইতে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে ; তাঁহারা কখন কোন্ মেজাজে থাকেন কিছু বলা যায় না, বিরক্ত হইলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। আমি তাঁহার কথানুসারে প্রত্যহ সাধু দর্শনে বহির্গত হইতাম, মেলায় সর্ব্বত্র পরমহংসদেবকে খুঁজিতাম, কিন্তু একদিনও তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয় নাই।

নানা দেশ হইতে মহাত্মগণ কুম্ভে আসিয়া সমবেত

হইয়াছেন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই; সঙ্গে হাতী, ঘোড়া, উট, গরু ইত্যাদি; কুম্ভে এক মাস খরচ নির্ব্বাহের জন্য কেহ এক লক্ষ, কেহ দুই লক্ষ, কেহ বা পঞ্চাশ হাজার, যিনি নিতান্ত গরীব তিনি অন্ততঃ কুড়ি হাজার টাকা সঙ্গে আনিয়াছেন। তাঁহারা যখন অশ্বারোহণে স্নানে যাইতেন তখন মনে হইত যেন কোন বাদ্‌সা যাইতেছেন; তাঁহাদের পোষাক মণি মুক্তা খচিত, সূর্য্যালোকে ঝক্ মক্ করিতেছে; অশ্বটার শয্যাই বা দেখে কে? সমস্ত স্বর্ণখচিত, দেখিতে পরম রমণীয়; সঙ্গে প্রকাণ্ড ধ্বজা, ৮।১০ জন লোক চারি দিকে দড়ি দিয়া বান্ধিয়া খাড়া করিয়া লইয়া যাইতেছে। ধ্বজার কাপড় কিংখাপ ও মখমলের উপর স্বর্ণ-খচিত হীরা বসান।

এই সকল মহান্ত দেখিয়া রঙ্গিন বাবা * মুখ বিকৃত করিয়া বলিতেন "ক্যা সাধু হ্যায়, একঠো নবাব।" ঐ সকল সাধু যখন নিজ নিজ আশ্রমে থাকিতেন তখন সকলেরই মুখে চিন্তার রেখা দেখিতে পাইতাম; এত অর্থ সঙ্গে থাকিতেও কি প্রকারে কুম্ভের এক মাসের খরচ সঙ্কুলান হইবে এই দুশ্চিন্তা। গোস্বামী মহাশয় কপর্দ্দকশূন্য,

---

* ইনি যে আলখাল্লা গায়ে দিতেন, তাহা নানা রঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাপড়ের টুক্‌রা দ্বারায় নির্ম্মিত, ইনি একজন নানকপন্থী সাধু; ইহাঁর এই আলখাল্লা দেখিয়া লোকে ইহাকে রঙ্গিন বাবা বলিতেন।

তাঁহার উপর বিপুল ব্যয়ভার, তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও অর্থের ভাবনা ভাবেন নাই ; সর্ব্বদাই তাঁহাকে প্রশান্ত ও নিশ্চিন্ত দেখিতাম।

একদিন স্বামী ভোলানন্দ গিরির কুটীরে গেলাম ; দেখিলাম তিনি একখানা মৃগচর্ম্মের উপর বসিয়া আছেন, মৃগচর্ম্মখানির চারিদিক ঝালরে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে ; দুই ধারে পাস বালিস, শুভ্র সুন্দর কাপড়ের ওয়াড় উৎকৃষ্ট বোতাম দিয়া আঁটা ; তাঁহার পরিধানে গৈরিক বসন। তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া হিন্দিভাষায় ভগবদ্গীতার উপদেশ দিলেন ; পরদিন আবার গেলে তিনি আমার পরীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন ; আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না, তিনি তিরস্কার করিয়া বলিলেন "সব্‌ ভুল গিয়া ?" আশ্রমে আসিয়া গোস্বামী মহাশয়কে সব আনুপূর্ব্বিক বলিলাম, তিনি বলিলেন,—

গোঁসাই—তুমি বলিতে পারিলে না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বক্তা, অর্জ্জুন শ্রোতা ; উপদেশ দেওয়ার পর পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন সব ভুলিয়া গিয়াছ ? আমি কোন্‌ ছার যে সমস্ত মনে করিয়া রাখিব ?

আমি—বেশ দশ কথা শুনাইয়া দিতে পারিতাম, কেবল ধৃষ্টতা হয় এই ভাবিয়া চপ করিয়াছিলাম।

একদিন রাত্রে খুব ঝড় বৃষ্টি হইয়া গেল, ভোর হইয়াছে, স্বামী ভোলানন্দ গিরি, উলঙ্গ দেহে, কেবলমাত্র একটী কৌপীন পরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমাদের তাম্বুর দ্বারদেশে উঁকি মারিতেছেন, মহাত্মা অর্জ্জুন দাস তাঁহাকে তাম্বুর ভিতর লইয়া গিয়া তাঁহার গায়ে বালি মাখাইতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার শীত অনেক পরিমাণে নিবারণ হইল। তাহার পর তিনি উঠিয়া গেলে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, ইঁহাদের ঐশ্বর্য্য ও ধুলা সমান; দেখ স্নানের সময় ইহাঁদিগকে দেখিলে বাদসা বলিয়া মনে হয়, আজ রাত্রে ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এজন্য কাহারও ধুনীর অভাব হইয়াছে, কেহ গাত্র বস্ত্র অভাবে কষ্ট পাইতেছে, কাহার আহার হয় নাই, ইত্যাদি দেখিবার জন্য ইনি উলঙ্গ দেহে কাঁপিতে কাঁপিতে চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; ইহাঁদের যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য দেখিতেছ, তাহা কেবল পদের গৌরব রক্ষার জন্য।

একদিন গৈরিক বসন পরিহিত, জটাজুটধারী এক সাধু আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হইল; তাহার সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম বিলেপিত, হস্তে কমণ্ডলু; আশ্রমে আসিবামাত্র গোস্বামী মহাশয় "চোররূপী নারায়ণ" বলিয়া ঐ সাধুটীকে প্রণাম করিলেন। সাধুটী সচকিত চিত্তে কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম :—

আমি—ব্যাপারটা কি? চোররূপী নারায়ণ বলিয়া যে প্রণাম করিলেন?

গোঁসাই—যে লোকটা আসিয়াছিল, সে সাধু নহে, এক জন চোর, সাধুর বেশ ধারণ করিয়া চুরি করিয়া বেড়াইতেছে, উহাকে আর কি বলিব? চোররূপী নারায়ণ বলিলাম।

আমি—ঐ লোকটা যে চোর তাহা আপনি কি প্রকারে জানিলেন?

গোঁসাই—আমরা মানুষের দেহ দেখি না, তাহার আত্মা দেখি। এই লোকটা আর এক দিন আমাদের নিকট আসিয়াছিল, ঠাওরাইতে পার নাই?

তখন আমরা লোকটাকে চিনিতে পারিলাম। ইহার তিন দিন পরে দেখিলাম, পুলিশ লোকটাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাতকড়ি দিয়া মেলা হইতে লইয়া যাইতেছে।

এই সময় গোস্বামী মহাশয়ের কন্যা শান্তিসুধার অত্যন্ত ব্যারাম, তিনি নানা প্রকার স্ত্রীরোগে আক্রান্ত; শরীর অস্থি চর্ম্ম সার; সর্ব্বদা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেন; শান্তিসুধা যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন "বাবা আমাকে মারিয়া ফেল, না হয় আমার ব্যারাম ভাল করিয়া দাও।" গোস্বামী মহাশয়

আসিতে হইবে”। শান্তিসুধা আর কোন কথা বলিলেন না, গোস্বামী মহাশয়ও রোগ প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা করিলেন না।

একদিন শান্তিসুধা রোগ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছেন, তাঁহার কাতরতায় দিদিমা নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বড় কাটীয়া বাবার নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিলেন, “বাবা! বসিয়া রহিয়াছেন, শান্তি যে মারা যায়, গোঁসাইত তাহার কোন ব্যবস্থা করিলেন না।” বড় কাটীয়া বাবা (রামদাস কাটীয়া) চরস টানিয়া চক্ষু লাল করিয়া বুঁদ হইয়া বসিয়া আছেন, দিদিমার কথা শুনিয়া জোর করিয়া বলিলেন “আবি ছুট যাও” এই কথা বলিয়া ধূনী হইতে একটু ছাই লইয়া দিদিমার হাতে দিয়া বলিলেন “পেট বুলাইয়া দেও” এই কথা বলিয়া একটী ঔষধও বলিয়া দিলেন; ঔষধটী এই, এক খণ্ড আদা চিরিয়া তাহার ভিতরে একটু হিঙ্গ ভরিতে হইবে, তদপর আদাখানি আগুণে ঝল্সাইয়া তাহার ছাল ঝাড়িয়া ফেলিয়া কুচীকুচী করিয়া কাটীতে হইবে, তদপর একটু লবণ দিয়া এক এক খণ্ড খাইতে হইবে। দিদিমা ফিরিয়া আসিতে না আসিতে শান্তি-সুধার যন্ত্রণা নিবারণ হইল এবং ঐ ঔষধ খাইতে খাইতে রোগ মুক্ত হইয়া স্বর্ণকান্তি লাভ করিল।

কুম্ভের স্নান শেষ হইলে গোস্বামী মহাশয় দরিদ্র-গণকে ১০০০৲ টাকার বস্ত্র বিতরণ করেন; এবং মহাত্মা-

গণের অভিপ্রায়ানুসারে ২২০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া রাম-যাদব বাগ্‌চী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত আপন কনিষ্ঠা কন্যা প্রেমসখীর বিবাহ দেন। এই এলাহাবাদ নগরেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়, বিবাহের পর তাঁহাকে আরও ৫০০৲ টাকা পাত্রপক্ষকে দিতে হইয়াছিল।

ভদ্র পরিবারের যেরূপ কুলজী আছে, এই কুম্ভমেলার সাধুগণের সেইরূপ কুলজী আছে; ঘটকগণ যেমন দেশের লোকের কুলজী রক্ষা করেন, সেইরূপ কুম্ভমেলার ঘটকেরাও সাধুগণের কুলজী রক্ষা করেন; তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সুবৃহৎ পুস্তক আছে, আবহমান কাল হইতে তাহারা আপন আপন পুস্তকে সাধুগণের জীবনী ও মেলায় আগমন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন, তাহারা মহান্ত-গণের নিকট বৎসর বৎসর বহু টাকা পারিতোষিক পাইয়া থাকেন; মহান্তগণ তাহাদিগকে হাতী, ঘোড়া, উট, গরু ও নগদ বহু টাকা প্রদান করিয়া থাকেন।

মেলা শেষ হইলে তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বিদায় লইতে আসিলেন, গোস্বামী মহাশয় দরিদ্র; কোথায় কি পাইবেন, এক থান কাপড়, ও ৫৲ টাকা নগদ দিয়া বিদায় করিলেন। ঘটকগণ ইহা পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন, এবং আপনাদের পুস্তকে গোস্বামী মহাশয়ের নাম, ধাম, ধর্ম্ম, কুম্ভে আগমন বৃত্তান্ত সমস্ত লিখিয়া লইলেন।

গুরুশক্তি বা কুণ্ডলিনী শক্তির প্রকাশ।

কুম্ভের স্নান শেষ হওয়ার কয়েক দিন পরে আমি গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতি লইয়া বোলপুর চলিয়া আসিলাম, প্রয়াগের উৎকৃষ্ট জলবায়ুতে আমার শরীর সারিল বটে, কিন্তু জীবনের কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না; আমি যে পাষণ্ড সেই পাষণ্ডই থাকিলাম; যেমন গিয়াছিলাম তেমনি ফিরিয়া আসিলাম। এত সাধুসঙ্গ, দেবদর্শন, পরিভ্রমণ, গঙ্গাস্নান, প্রসাদ ভক্ষণ, গুরু সন্নিধানে বাস কিছুতেই কিছু হইল না। কেবল একটীমাত্র উপকার হইল। গোস্বামী মহাশয়ের দরিদ্রতা ভাবিয়া দীক্ষার পর হইতে যে দারুণ যন্ত্রণা পাইতেছিলাম, সেইটা দূর হইল।

শ্রীভগবদ্গীতায় একটী শ্লোক আছে—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং।"

যে ব্যক্তি অনন্য ভক্ত হইয়া আমার সেবা করে, সেই নিত্যাভিযুক্ত ভক্তগণের ধনাদি-লাভ রক্ষা ইত্যাদি সমস্ত ভার আমি স্বয়ং বহন করি।

এই শাস্ত্রবাক্যে এতদিন আমার আদৌ বিশ্বাস ছিল না, এইবার গোস্বামী মহাশয়ের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া এই শাস্ত্র বাক্যে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। আমি পূর্ব্ব হইতে গোস্বামী মহাশয়কে জানি। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। যখন কতকগুলি ব্রাহ্ম তাঁহার কার্য্যকলাপের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি বন্ধু বান্ধবের অনুরোধ মান, সম্ভ্রম, আধিপত্য, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গ লইয়া ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া দিয়া একেবারে গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। কাল খাইবেন কি এ কথা মুহূর্ত্ত মাত্র ভাবিলেন না। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার মাসহারা বন্ধ করিয়া দিল। তিনি আকাশবৃত্তি অব-লম্বন করিলেন। ভগবান্ দেন খাইবেন, নতুবা উপবাস করিয়া থাকিবেন। কাহারও নিকট যাচ্ঞা নাই, কাহারও নিকট অভাব জানান নাই। তিনি বলিয়াছিলেন "অন্যের নিকট অভাব জানানও যা, আর আমার পক্ষে ব্যভিচার করাও তাই।" যাহারা ভগবানে একেবারে আত্ম সমর্পণ করেন, ভগবান তাঁহাদের প্রতি উদাসীন হন না; তাঁহাদের সমস্ত অভাব মোচন করেন ও সমস্ত আপদ বিপদ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন।

গোস্বামী মহাশয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে লাগিল, তিনি অনেকগুলি শিষ্যের সমস্ত ব্যয় ভার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রয়াগ আসিলেন; এখানে কি উপায়ে ব্যয় সংকুলান হইবে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিলেন না; পরে আদেশ করিলেন "আজ যাহা উপস্থিত হইবে তাহা কল্যকার জন্য সঞ্চয় করিবে না।" তিনি কোন্ সাহসে এইরূপ আদেশ করিলেন? তিনি কাহার বলে বলীয়ান্? একমাত্র ভগবানের উপর তাঁহার একান্ত নির্ভর ছিল, তাঁহাতেই তিনি আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন, সমস্ত বল ভরসা একমাত্র তিনিই। ভগবান্ তাঁহার সমস্ত ভার স্বয়ং বহন করিতেন।

একদিন ঢাকাতে আমি তাঁহাকে একটী গল্প বলিয়াছিলাম। গল্পটী এই—"ইংলণ্ডে একজন সাহেব রাস্তায় একটী অনাথ বালক দেখিয়া তাহাকে কুড়াইয়া আনিয়া প্রতিপালন করিতে থাকেন। ক্রমে আরও ২।১টী অনাথ বালক জুটিলে তিনি একটী অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। একদিন আহারের কোন সংস্থান নাই, বালকগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া সাহেবের নিকট আহার চাহিতে লাগিল; সাহেব বলিলেন, তোমরা যোড়হাতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর। বালকেরা তাহাই করিতে লাগিল; এমন সময়ে একটা লোক আসিয়া দরজায় আঘাত করিল; সাহেব

খানি রেজেষ্টারী লেফেফা দিলেন, সাহেব তাহা খুলিয়া দেখিলেন, কে তাহাকে অনেক টাকার নোট পাঠাইয়া দিয়াছেন। সাহেব তৎক্ষণাৎ হোটেলে গিয়া খাবার কিনিয়া আনিয়া বালকদিগকে দিলেন।"X এই গল্পটি শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিয়াছিলেন "প্রার্থনা কি আবার করিতে হয় ? প্রার্থনার পূর্ব্বেই তিনি সমস্ত অভাব মোচন করিয়া থাকেন।" কুম্ভ মেলায় গোস্বামী মহাশয়ের এই কথায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। X

গোস্বামী মহাশয়ের ব্যবহার এতই মধুর এবং তাঁহার এমনি প্রগাঢ় ভালবাসা, যে শিষ্যগণ মধ্যে সকলেই মনে করিতেন, গোস্বামী মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক ভাল বাসেন। আমারও তাই ধারণা। যে কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে উপস্থিত হইতেন, তৎক্ষণাৎ তাহার দুঃখ যন্ত্রণা দুর হইয়া যাইত। যদিও গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আমার মতের ঐক্য ছিল না, তথাপি আমি তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না।

প্রয়াগ হইতে কলিকাতায় আসিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব দেখিবার জন্য গোস্বামী মহাশয় শ্রীধাম নবদ্বীপ গমন করেন। তথা হইতে কলিকাতায় আসিলেই আমি সন ১৩০০ সালের চৈত্র মাহায় তাঁহাকে দর্শন করিতে কলিকাতায় যাই। কলিকাতায় কয়েক দিন, তাঁহার নিকট পরমানন্দে কালযাপন

করিয়া বোলপুর আসিবার জন্য অনুমতি চাহিলে তিনি পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "এই লোকটীকে সঙ্গে লইয়া যাউন। বোলপুরে ইহাকে একটী কুটীর করিয়া দিবেন আমার জন্যও একখানি কুটীর করিবেন; আমিও বোলপুর গিয়া থাকিব।" আমি "যে আজ্ঞে" বলিয়া গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করতঃ শ্যামাকান্ত বাবুকে সঙ্গে লইয়া বোলপুরে আসিলাম।

এই সময় পণ্ডিত শ্যামাকান্ত বাবুর শরীর অসুস্থ ছিল, তিনি গুরু আজ্ঞায় ভিক্ষা করিয়া খাইতেন। তিনিও ব্রাহ্ম। তাঁহার যজ্ঞোপবীত, তিলক, মালা কিছুই ছিল না। পূর্ব্ব হইতে তাঁহার সহিত আমার বিশেষ সদ্ভাব ছিল, সুতরাং বোলপুরে আসিয়া এক সঙ্গে সাধন ভজনে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

বোলপুরের পূর্ব্ব প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিতা; তাহার পূর্ব্ব সীমায় সুবিস্তৃত প্রান্তর; এই প্রান্তরে পূর্ব্ব-মুখ হইয়া দাঁড়াইলে দেখা যায় অনন্ত আকাশ অনন্ত প্রান্তরে নামিয়া মিলিত হইয়াছে; একটী বৃক্ষ কিম্বা গ্রাম দেখা যায় না; দক্ষিণ ও উত্তর দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত কোন বসতি নাই। এই প্রান্তরের স্থানে স্থানে ঝরণা আছে, ঝরণার জল সুমিষ্ট ও স্বাস্থ্যকর। একটী উৎকৃষ্ট ঝরণার নিকট শ্যামাকান্ত-

আশ্রম * প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই আশ্রমে পণ্ডিত মহাশয়ের জন্য একখানি পূর্ব্বদ্বারি ঘর, গোস্বামী মহাশয়ের জন্য একখানি পূর্ব্বদ্বারি ঘর, ও আমার নিজের জন্য একখানি দক্ষিণদ্বারি ঘর প্রস্তুত হইতে লাগিল। ঘর প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত পণ্ডিত মহাশয় আমার বাসার নিকট একটা ক্ষুদ্র গৃহে থাকিয়া গুরু আজ্ঞায় ভিক্ষার দ্বারায় জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময় আমি প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া উভয়ে একত্রে সাধন ভজনে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম।

গুরুশক্তি (কুণ্ডলিনী শক্তি) বলিয়া একটা জিনিষ আছে তাহা আমি এ পর্য্যন্ত জানিতাম না। মনে করিতাম, একটা শাস্ত্র বাতলাইয়া দিতে পারিলেই গুরু হওয়া যায়। এখন শাস্ত্র ছাপা হইয়াছে, বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে ; এই সব পুস্তক পড়িলেই মন্ত্র জানিতে পারা যায়। মন্ত্রের জন্য একজন গুরুর দরকার কি ? একমাত্র পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়া চলিতাম, তজ্জন্য ব্রাহ্মাবস্থায় নিজে শাস্ত্র নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া সাধন ভজন করিয়াছিলাম।

* পণ্ডিত শ্যামাকান্ত বাবুর সাধন ভজন জন্য যে আশ্রম প্রস্তুত হইতে লাগিল তাহার নাম থাকিল শ্যামাকান্ত আশ্রম।

১৩০১ সাল আষাঢ় মাস বেলা ৮টার সময় আমি বৈঠকখানায় বসিয়া লেখা পড়া করিতেছি, পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও বোলপুরের ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টার বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র নিকটে বসিয়া আছেন, একঘর মক্কেল। এমন সময় এক জন ভিখারী ভিক্ষা করিতে আসিয়া অন্দরের দরজার নিকট করতাল বাজাইয়া "নিতাই গৌর সীতানাথ দয়া কর হে" বলিয়া গান ধরিল। আপনারা কেহ ১২৭১ সাল ২০ আশ্বিন ষষ্ঠীর দিনের সৃষ্টিধ্বংসকারী বাত্যা দেখিয়াছেন? অন্ততঃ কাগজেও তাহার বৃত্তান্ত পড়িয়া থাকিবেন। ভিখারী যেমন "নিতাই গৌর" বলিয়া নাম ধরিয়াছে অমনি ঐ নাম আমার শ্রুতিগোচর হওয়ায় সেই ১২৭১ সালের ২০ আশ্বিনের ঝড়ের ন্যায় আমার মধ্যে প্রলয়কারী ঝড় উপস্থিত হইল; হাত হইতে কলম খসিয়া পড়িল, আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম; যখন নাসারন্ধ্র দিয়া বাহির হইতে আমার ভিতরে বাতাস প্রবল বেগে প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন মনে হইতে লাগিল এক ঘর বাতাস আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল; আবার বহির্গমন সময়েও ঠিক সেইরূপ যেন একঘর বাতাস বাহির হইতে লাগিল। তখন পেট পিট যেন সমান হইয়া যাইতে লাগিল। অজগরের ভীষণ গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ হইতে

যন্ত্র সকল ছিঁড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। ঝড় যেমন মাঝে মাঝে একটু নরম হয় আবার পরক্ষণেই প্রবলবেগে বহিতে থাকে নিতাই গৌরের নাম শ্রুতিগোচর হইবামাত্র আমার মধ্যে ঝড়ের প্রাবল্য বৃদ্ধি ও "দয়া কর হে" ইত্যাদি শ্রবণ পথে প্রবিষ্ট হইবার সময় একটু নরম পড়িতে লাগিল। আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম।

ভিখারী ভিক্ষা লইয়া চলিয়া গেল; কিন্তু আমার মধ্যে ঝড়ের বিরাম হইল না। যন্ত্রণা ও কমিল না। যখন যন্ত্রণা অসহ্য হইল, তখন শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কাহার সাধ্য তাহাকে রোধ করে? আমাকে যেন উড়াইয়া লইয়া যাইবার মত করে। আমি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রাণপণে পুনঃ পুনঃ শ্বাসরোধের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ শ্বাস রোধ হইল। ঝড় থামিল, নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইল, শরীরের সমস্ত যন্ত্রণা মুহূর্ত মধ্যে ঘুচিয়া গেল, আমি বেশ সুস্থ হইলাম।

এই সময় মনে হইতে লাগিল শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ হইলে জীবন রক্ষা হয় না, একথা কি সত্য? আমিত বেশ দেখিতেছি শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হইলেও মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। রাজা রা-

প্রোথিত ছিলেন ; ৪০ দিন কেন ? আমাকে যদি কেহ ৪০ বৎসর প্রোথিত করিয়া রাখেন, আমি অনায়াসে থাকিতে পারি, আমার কোন কষ্ট হয় না।

আবার ভাবিলাম, শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নিতান্ত মূর্খ নহেন, তাঁহারা অনেক পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, নিশ্বাসের সহিত Oxygen গ্যাস দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দূষিত রক্তকে শোধন করে, আর প্রশ্বাসের সঙ্গে রক্তের দূষিত অংশ Carbonic acid রূপ নির্গত হইয়া যায়, ইহাতেই জীব বাঁচিয়া থাকে। আমার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া রহিয়াছে ; Oxygen অভাবে রক্ত দূষিত হইয়া বিপদ ঘটিবে না ত ?

এই সকল চিন্তায় আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, যেমন ভয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অমনি শরীর গরম বোধ হইতে লাগিল, মাথার খুলীতে যেন ধাক্কা লাগিতেছে বোধ হইতে লাগিল ; সুতরাং আমি ভাবী বিপদের আশঙ্কা করিয়া নিশ্বাস ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই নিশ্বাস পড়ে না। কত ফোঁ ফাঁ করিলাম, কিছুতেই নিশ্বাস পড়িল না ; ভয় অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল ; প্রাণপণে নিশ্বাস ফেলিবার চেষ্টা করিতে করিতে হঠাৎ নিশ্বাস পড়িল। যেমন নিশ্বাস পড়িল, অমনি সেই পূর্ব্বের ন্যায় প্রলয়কারী ঝড়। আমার সমস্ত হৃদয়-তন্ত্রী যেন

চেষ্টা করিয়া যেমন ঝড় নিবারণ করিলাম, অমনি শ্বাসরোধ হইল। এই প্রকারে একবার প্রলয়কারী ঝড়, একবার শ্বাসরোধ চলিতে লাগিল। আমি পুরুষকারের শেষ পর্য্যন্ত পরিচালনা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, শ্বাসবন্ধ (কুম্ভক) হইলেও বাচি না ঝড়েও (প্রাণায়াম) বাঁচি না। শেষে জীবন আশায় নৈরাশ হইয়া কাতর হইয়া পড়িলাম।

এতক্ষণ পুরুষকার লইয়াই ছিলাম, গুরুকে স্মরণ হয় নাই, এখন বিপন্ন অবস্থায় স্মরণ হইল। আমি কাতর প্রাণে গোঁসাইকে ডাকিতে লাগিলাম; "আজ প্রাণ যায় গুরু রক্ষা কর।" এইরূপ ডাকিতে ডাকিতে ঝড় মন্দীভূত হইতে লাগিল, ক্রমে থামিয়া গেল।

আমি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, পণ্ডিত মহাশয় আমার পিটের শিরদাঁড়াটা উপর দিক হইতে নীচের দিকে খুব বল পূর্ব্বক মলিতেছেন। তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হরিদাসবাবু, আজ আপনার শুভ দিন, গোঁসাই এতদিন আপনার মধ্যে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, আজ সেই বীজের অঙ্কুর হইল।" নবীনবাবু ও মক্কেলগণ সকলে একেবারে অবাক হইয়া রহিলেন।

এইবার আমি যেন এক নূতন মানুষ হইলাম; আমার নিকট সমস্ত নরনারী পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, সমস্তই নতন; কাম ক্রোধ লোভ মোহ ইত্যাদি ...

গণের অত্যাচার আমার উপর আর নাই ; নিন্দা, প্রশংসা লাভ, ক্ষতি কল্পনা, জল্পনা, বাসনা, কামনা ও সর্ব্বপ্রকার অশান্তি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, আমার সমস্ত হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, সংসার-বুদ্ধিলোপ পাইয়াছে। নেশায় শরীর টল্‌মল করিতেছে। ভিতরে আনন্দের উৎস খুলিয়া গিয়াছে, আমার শরীর এত পাতলা যে মনে হইতেছে যেন আমি আকাশের উপর দিয়া চলিতে পারি। কায কর্ম্মকরিবার শক্তি আদৌ নাই, এমন কি একটী দস্তখত করি এমন সামর্থ্যও আমার নাই, আমার মনে হইল এই পর্য্যন্ত ওকালতী শেষ।

মুহুরীকে বলিলাম আমার ওকালতী শেষ হইয়াছে, এই তোমরা নিজ নিজ পথ দেখ ; দপ্তর বন্ধ হইল ; মক্কেলগণ চলিয়া গেল, নবীনবাবু বাসায় গেলেন। কেবল পণ্ডিত মহাশয় কাছে থাকিলেন। আমি নেশায় বিভোর ; এই সময় হইতে নিতাই গৌর বা রাধাকৃষ্ণের নাম শ্রুতি পথে প্রবেশ করিলে আর রক্ষা নাই, অমনি দারুণ প্রাণায়াম উপস্থিত ও দেহটা টল্‌টলায়মান।

এক্ষণ ভাবিতে লাগিলাম এ আবার কি হইল ? এত বয়স হইয়াছে, জীবনে এমন অবস্থাত কখনও হয় নাই ? এ কি হইল ? ইহা কি দ্রব্যগুণের ফল ? আমি বরাবর ডাল চচ্চড়ী ভাত খাইয়া আসিতেছি ; পূর্ব্বে যা খাইতাম এখনও তাই খাইতেছি দ্রব্যগুণের ফল কি প্রকারে হইবে ?

তবে কি শারীরিক কোন ক্রিয়ার ফল? গোস্বামী মহাশয় একটু প্রাণায়াম ও ২।১টা কুম্ভক করিতে বলিয়াছেন, তাত অনেক দিন যাবত করিতেছি, তাহাতে এমন কেন হইবে? তবে কি নামের শক্তি? নামের আবার শক্তি কি? সেত কথার কথা; কয়েকটা শব্দ বইত নয়? আমি কারণ অনুসন্ধান জন্য গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। পরে একটু সুস্থ হইলে কলিকাতা গিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া আসিবার মনস্থ করিলাম।

এই অবস্থাটা আমার প্রায় এক মাস ছিল; তখন দিবারাত্রি আমি যেন অমৃত পাথারে ভাসিতাম; তাহার পর অবস্থাটা ক্রমে ছুটিয়া গেল। আমি যেমন ছিলাম তেমনি হইলাম, সংসার ও ওকালতী পূর্ব্ববৎ করিতে লাগিলাম।

এই সময় গোস্বামী মহাশয় সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট ১৪।২ নম্বর ভাড়াটীয়া বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আমি তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম;—

আমি—আপনি আমার মধ্যে কি করিয়াছেন? আমি নিতাই গৌর কি রাধাকৃষ্ণ মানি না, অথচ তাঁহাদের নামে আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে।

গোঁসাই- আপনি মানুন, আর নাই মানুন, যিনি * মানিবার তিনি মানিয়াছেন, এইবার আপনাকে কানে ধরিয়া মানাইবেন; তিনি যখন আপনার মধ্যে হাসিবেন, তখন আপনি হাসিবেন; তিনি যখন আপনার মধ্যে কান্দিবেন, তখন আপনি কান্দিবেন, তিনি নাচিলে আপনি নাচিবেন।

আমি—আমার ইষ্ট-মন্ত্রের সহিত নিতাইগৌর বা রাধাকৃষ্ণের কোন সংস্রব নাই, তবে কেন ইঁহাদের নামে আমাকে আকুল করিয়া ফেলে?

গোঁসাই—আপনি মনে করেন ইঁহারা আলাহিদা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা আলাহিদা নহেন, সবই এক।

আমি—দীক্ষা-তত্ত্বটী কি?

গোঁসাই—জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই দেহে অবস্থিতি করিতেছেন; মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইবামাত্র ভগবানের মায়াশক্তি দ্বারায় জীব আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; তখন মনে করে আমিই কর্ত্তা; প্রকৃতপক্ষে ভগবান যে কর্ত্তা তাহা তাহার বোধ থাকে না; যিনি প্রাণস্য প্রাণ, চক্ষুশ্চক্ষু তাঁহাকে একেবারে ভুলিয়া যায়। সূর্য্য যেমন

* যিনি অর্থাৎ যে দেবতাকে গোস্বামী মহাশয় শিষ্যের দেহ-

মেঘ দ্বারায় আচ্ছন্ন হয়, জীবও তদ্রূপ মায়া-শক্তি দ্বারায় আচ্ছন্ন হয়। গুরু, শিষ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এই মায়া-মেঘ অপসারিত করিয়া দেন ; এবং পরমাত্মাকে জাগ্রত করিয়া শিষ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আমি—গুরু কি প্রকারে জীবাত্মাকে মায়া-মেঘ হইতে মুক্ত করেন ?

গোঁসাই—কৃপাদৃষ্টি দ্বারায়।

আমি—পরমাত্মা দেহের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন ; তিনি কিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন ?

গোঁসাই—শক্তিরূপে।

আমি—কই আমরাত তাহা টের পাই না।

গোঁসাই—এই শক্তি জাগ্রত না হইলে মানুষ ইহা টের পায় না।

আমি—কি প্রকারে এই শক্তি জাগ্রত হয় ?

গোঁসাই—কোন প্রবল শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ দ্বারায় এই শক্তি জাগাইয়া লইতে হয়।

আমি—প্রবল শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষেরা কি প্রকারে এই শক্তি জাগাইয়া দেন ?

গোঁসাই—প্রদীপে তেল শলিতা থাকিলেও উহা আপনা আপনি জ্বলে না, একটা জ্বলন্ত প্রদীপের সংস্পর্শে আনিতে হয়। তেমনি এই শক্তি

প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে নিহিত থাকিলেও উহা জাগ্রত হয় না। প্রবল শক্তি-সম্পন্ন কোন মহাপুরুষের প্রবলশক্তির সংসর্গে ইহা জাগিয়া উঠে। *

আমি—মানুষ নিজে কি এই শক্তি জাগাইতে পারে না ?

গোঁসাই—কদাচ না, তবে বুদ্ধ দেবের মত লোক হইলে ইহার সম্ভাবনা।

আমি—এই শক্তি জাগ্রত না হইলে কি ক্ষতি হয় ?

গোঁসাই—ভজন-সাধনের ফল স্থায়ী হয় না। কিছুকাল ভজন সাধন দ্বারায় প্রাণের একটা ভাল অবস্থা লাভ হইলে, অল্পদিন পরেই সে অবস্থা চলিয়া যাইবে, কিছুতেই স্থায়ী হইবে না।

আমি—মন্ত্র প্রদানের প্রয়োজন কি ?

গোঁসাই—মন্ত্র শব্দ নহে,মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতাকে, গুরু, মন্ত্রে সমন্বিত করিয়া শিষ্যকে প্রদান করেন। পরমাত্মা যেমন শক্তিরূপা, মন্ত্রও তাই। মন্ত্র ও মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা একই।

আমি—সিদ্ধমন্ত্র কাহাকে বলে ?

গোঁসাই—যে মন্ত্র জপ করিয়া কোন মহাত্মা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সেই মন্ত্রকে সিদ্ধমন্ত্র বলে।

---

* মহাপুরুষগণ নিজের প্রবলশক্তি বলে যে অন্যের শক্তি জাগাইয়া দেন, ইহাকেই "শক্তি সঞ্চরণ" বলে।

আমি—আপনি কেন আমাকে দীক্ষা দিলেন ?

গোঁসাই—আমি ত্রিতাপ জ্বালায় বড়ই দগ্ধ হইয়াছি, আপনারাও আমার ন্যায় ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হইতেছেন ; নিজের দুঃখ দেখিয়া আপনাদের দুঃখ নিবারণ করিবার জন্য দীক্ষা দিয়াছি,নিজের রূপ-যৌবন-সম্পন্না স্ত্রী যেমন কেহ অন্যকে দিতে ইচ্ছা করে না, সেইরূপ বহু সাধনের এই ধন কেহ অন্যকে দিতে চাহে না ; আপনাদের বড়ই ক্লেশ দেখিয়া আমি দিয়াছি।

আমি—শিষ্যের জন্য গুরুর কি কোন দায়ীত্ব আছে ?

গোঁসাই—হাঁ আছে, যত দিন শিষ্য উদ্ধার না হইবে, তত দিন গুরুর উদ্ধার নাই, এজন্য যদি গুরুকে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

আমি—গোঁসাই ! আপনি এমন কাজ কেন করিলেন ? আপনি কি আর লোক পান নাই ? এই মহা-পাষণ্ডকে কেন দীক্ষা দিয়াছেন ? আপনি বেনা বনে মুক্তা ছড়াইয়াছেন।

গোঁসাই—আমি প্রত্যহ আপনাদিগকে পূজা করি। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়া কেহ কি পূজা না করিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারে ? আপনাদের দেহ

করিয়াছি। এখন আপনাদের সহিত তাঁহার পরিচয় নাই; তিনি যে কি আদরের ধন তাহা আপনারা জানেন না; আপনারা এখন তাঁহার আদর যত্ন করিতে পারিবেন না, এই জন্য আমি প্রত্যহ তাঁহার পূজা করিয়া থাকি।

আমি—প্রত্যেক শিষ্যের মধ্যে কি তাঁহাকে পূজা করিতে হয়? না এক স্থানেই পূজা করিলেই হয়?

গোঁসাই—এক স্থানে পূজা করিলেই হয়।

আমি—কি প্রকারে তাঁহার পূজা করিতে হয়?

গোঁসাই—গুরুদত্ত নামজপই তাঁহার প্রকৃত পূজা।

আমি—গুরু ব্যতিরেকে কি ভগবত প্রাপ্তির উপায় নাই?

গোঁসাই—গুরু ব্যতিরেকে ভগবত প্রাপ্তি অসম্ভব, ভগবানকে লাভ করিবার পক্ষে সদ্‌গুরুর কৃপালাভ ভগবানের অব্যর্থ নিয়ম।

আমি—সদ্‌গুরু কাহাকে বলে?

গোঁসাই—মনুষ্যদেহে ভগবানের আবেশ।

আমি—আপনি কি সদ্‌গুরু?

গোঁসাই—হাঁ।

আমি—প্রাকৃত গুরু দ্বারায় কি ভগবত প্রাপ্তি অসম্ভব?

গোঁসাই—হাঁ, প্রাকৃত গুরু অনর্থের কারণ।

আমি—আমাদের দেশে যে সকল প্রাকৃতগুরু (সাধারণ

গুরু) দীক্ষা দিতেছেন, তাঁহাদের এই দীক্ষার দ্বারায় কি শিষ্যের কোন উপকার হয় না?

গোঁসাই—হাঁ, অনেক উপকার হয়; সাধারণ গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া নিষ্ঠাপূর্ব্বক ভজন করিলে অনেক উপকার আছে। এই সকল গুরুগণ একটা চিরপ্রণালী রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, ইহাতে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইতেছে।

আমি—সকল সময়েই কি সদ্‌গুরুর আবির্ভাব হয়?

গোঁসাই—না, যখন ধর্ম্মের অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত হয়, কেবল সেই সময় সদ্‌গুরুর আবির্ভাব হয়।

আমি—আপনি আমাদিগকে যে সাধন দিয়াছেন তাহাতে কি লাভ হইবে?

গোঁসাই—এই পৃথিবীতে যত প্রকার সাধন প্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাতে মানুষ যাহা কিছু লাভ করিতে পারে তৎসমূদয় লাভ হইবে, তদতিরিক্ত প্রেমভক্তি লাভ হইবে।

আমি—কতদিনে এই অবস্থা লাভ হইতে পারে?

গোঁসাই—২ দিন, ১০ দিন, ২ বৎসর ১০ বৎসর, ৫০ বৎসর, প্রারব্ধকর্ম্ম শেষ করিতে পারিলেই অবস্থালাভ হইবে।

আমি—কিসে প্রারব্ধকর্ম্ম শেষ হইবে?

আমি—আমাদের কি নামাপরাধ আছে ?

গোঁসাই—না।

আমি—নামাপরাধ কি হইল ?

গোঁসাই—গুরু, নামাপরাধ নষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

আমি—আমি যদি মনে মনে কুচিন্তা করি, আর নাম করি, তাহা হইলে কি নামের ফল পাইব ?

গোঁসাই—হাঁ, অবশ্য পাইবে, নাম শব্দ নহে—শক্তি, বস্তু-শক্তি কোথায় যাইবে ?

আমি—এই সাধন এত দিন কোথায় ছিল ?

গোঁসাই—নির্জ্জন পাহাড়ের মধ্যে যেমন ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী লোক চক্ষের অন্তরালে ধীরে ধীরে প্রবাহিতা হয়, তেমনি এই সাধন অতি সন্তর্পণে সন্ন্যাসী-দের ভিতর গুরু-পরম্পরায় এতকাল চলিয়া আসিতেছিল ; এই সাধন কখনও গৃহস্থলোকে পায় নাই, দেশের অত্যন্ত দুরবস্থা দেখিয়া মহা-পুরুষগণ এইবার গৃহস্থগণকে প্রদান করিলেন।

আমি—আর কি আমাদিগকে কর্ম্মসূত্রে জড়ীভূত হইতে হইবে ?

গোঁসাই—না। গুরু, কর্ম্মসূত্র ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। কর্ম্মসূত্র ছিন্ন না হইলে জীবের উদ্ধার হয় না।

আমি—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামে আমাকে অভিভূত করে,

গোঁসাই—তিনি পূর্ণতম ভগবান্। এই সাধন তাঁহার নিজস্ব সাধন।

সংকীর্ত্তন আরম্ভ।

যদিও গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আমার মতের ঐক্য ছিল না, কিন্তু গুরু-আজ্ঞা আমি সাধ্যমত প্রতিপালন করিতাম; ইচ্ছা বা আলস্য পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতাম না। শ্যামবাজারের বাটীতে যে অবধি গোস্বামী মহাশয় আমাকে ভক্তিশাস্ত্র (চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত) পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন, সেই অবধি আমি উহা নিত্য পাঠ করিতাম, স্নানের পর প্রত্যহ অন্ততঃ এক পরিচ্ছেদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠের নিয়ম ছিল। প্রথম প্রথম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে কোন উপকার পাইতাম না, বরং কবিরাজ গোস্বামীর উপর বিরক্তি জন্মিত। গুরু-শক্তি প্রকাশের পর হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে লাগিলাম। ইহা একেবারে হৃদি-কর্ণ-রসায়ন। শ্রীচরিতামৃত যতবারই পড়ি, ততবারই যেন নূতন। ইহাতে ধর্ম্মের উচ্চতম সিদ্ধান্ত সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মানুষের শক্তিতে এই-রূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করা অসম্ভব। কবিরাজ গোস্বামী যে

"মদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না জুয়ায় তবু রহিতে না পারি ॥"

একথার বিন্দুমাত্র ভুল নাই; মানুষ বিদ্যা-বুদ্ধি বলে এরূপ গ্রন্থ কখনই রচনা করিতে পারে না। ভগবত-শক্তি বলে যে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ইহাতে আর সংশয় নাই। মানুষ বিদ্যা ও বুদ্ধি বলে এই গ্রন্থের সমস্ত সিদ্ধান্ত ঠিক বুঝিতে পারে না। ইহা বুঝিতে হইলে গভীর সাধনার আবশ্যক। ভক্তিলাভ না হইলে ইহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইবে না। পূর্ব্বে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া যেমন কবিরাজ গোস্বামীর উপর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, এখন হইতে আবার তাঁহার উপর তেমনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি জন্মিতে লাগিল।

গুরু আজ্ঞায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আমার নিত্য পাঠ্য হইয়াছিল; ইহার এক স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু আমার পূর্ব্ব-পুরুষ সত্যরাজ খাঁ * ও তাহার পুত্র রামানন্দ বসুকে বলিতেছেন,—

কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্ট ডোরী লৈঞা ॥

---

* ইনি আমার উর্দ্ধতন দশম পুরুষ; ইহার নাম লক্ষ্মীকান্ত বসু, উপাধী সত্যরাজ খাঁন্। দিল্লীর বাদসাহ এই উপাধি তাঁহাকে

গুণরাজ খাঁন্ * কৈল শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
"নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর॥
তবে রামানন্দ † আর সত্যরাজ খাঁন্।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু নিবেদি চরণে॥
প্রভু কহে কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম-সংকীর্ত্তন॥

---

* ইনি সত্যরাজ খাঁনের পিতা, শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের রচয়িতা, বাঙ্গলা ভাষার আদি কবি। ইনি বঙ্গদেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। আবুল ফরেজ পারস্য ভাষায় ইঁহার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার নাম মালাধর বসু। দিল্লীর বাদসাহ ইঁহাকে গুণরাজ খাঁন্ উপাধি প্রদান করেন।

† ইনি সত্যরাজ খাঁনের পুত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। ভক্ত বৈষ্ণবেরা প্রত্যহ ইহাঁর বন্দনা করেন। যথা বৈষ্ণব বন্দনায় "বসুবংশে রামানন্দ বন্দিব যতনে, যাঁর বংশে চৈতন্য বিনা অন্যে

এই পাঠ পড়িয়া বাসায় কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও নিত্য নাম-সংকীর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিলাম। যদিও আমার নাম-সংকীর্ত্তনে প্রবৃত্তি ছিল না, তথাপি "বিষস্য বিষমৌষধি" জ্ঞানে বাসায় নাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমার মুহুরী রাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বেশ খোল বাজাইতে পারিত। পণ্ডিত মহাশয় মুল গায়েন হইলেন, আর ২।৪ জন পাড়ার যুবক দোহার জুটিয়া গেল; প্রত্যহ সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় নাম-সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল; সন্ধ্যার পর সমস্ত কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিলাম। মক্কেলগণকে বলিয়া দিলাম সন্ধ্যার পর কোন কাজ হইবে না। ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তনীয়া দলের পরিপুষ্টি হইতে লাগিল। কীর্ত্তনের ধ্বনি ও ভাবের তরঙ্গে চারিদিক প্রতিধ্বনিত ও তরঙ্গায়িত হইতে থাকিল।

তখন বোলপুরে মদ্য, মাংস ও ব্যভিচারের স্রোত অজস্রভাবে প্রবাহিত ছিল; প্রতিবেশীরা খোল করতালের ধ্বনি সহিতে পারিত না। একে খোল করতালের ধ্বনি তাহাদের কর্ণে বিষ ঢালিয়া দিত, তাহাতে আবার অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইতে থাকায় তাহাদের নিদ্রার মহাবিঘ্ন ঘটিত। তাহারা অত্যন্ত জ্বালাতন হইতে লাগিল। আমি তখন বোলপুরের সর্ব্বপ্রধান উকিল, একজন প্রভাবশালী লোক ছিলাম; কাহারও

আগুন মনেই জ্বলিতে থাকিল. কেহ কেহ বলিতে লাগিল, “সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল, কাঁশার বাদ্য বড় অমঙ্গল ; হরি-বাবু সব মাটী করিলেন, এবার নিশ্চয় অনাবৃষ্টি হইবে।” কেহ কেহ বলিতে লাগিল, “বিষম বিভ্রাট উপস্থিত, এবার দুর্ভিক্ষ না হইয়া যায় না ;” আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিল, “আমাদের বোলপুরের বাস উঠিল ; সমস্ত রাত্রি চোকেপাতায় করিতে পাই না, সমস্ত রাত্রি কানের কাছে খোল কর্ত্তালের শব্দ, কাণ ঝালা পালা করে।” এইরূপ নানা লোক নানা অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া সশঙ্কচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিল।

আমার প্রতিবেশীগণ মধ্যে একজন কৃতবিদ্য পদস্থ লোক ছিলেন, তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তিনিও মনে মনে মহাবিরক্ত হইয়া প্রকাশ্যে বলিতে লাগি-লেন “এই লোকটার একটা Principle নাই, যখন যে দলে মিশে তখন সেই দলেই মত্ত হইয়া পড়ে। যখন ব্রাহ্ম ছিল তখন গোঁড়া ব্রাহ্ম, কিছুই মানিত না, আবার দিন কয়েকের মধ্যে একেবারে বৈষ্ণব, দিন রাত খোল কর্ত্তালের বিরাম নাই”। আমাদের কোর্টের কোন একজন প্রাচীন বৈষ্ণব উকিল আমার ব্রাহ্মাবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। এক্ষণ আমাকে দেখিয়া মহাসুখী হইলেন ; লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, “হরিবাবুর প্রকৃতি বুঝা ভার, ইঁহাকে চিনিবার যো নাই,

এতকালের গোঁড়া ব্রাহ্ম এখন এমনি বৈষ্ণব হইয়াছেন যেন আমাদিগকে হার মানিতে হইয়াছে; না হবেন কেন? যে বংশের ছেলে।"

সংকীর্ত্তনের দল ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিপক্ষগণ মহা উৎপাত মনে করিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল। এই সময় ১৩০১ সালের ভাদ্র মাহায় ভক্তিভাজন বাবু হরিমোহন চৌধুরী (ইনি গোস্বামী মহাশয়ের একজন শিষ্য) আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একে পণ্ডিত মহাশয়ের ভাব-তরঙ্গে বোলপুর তরঙ্গায়িত, তাহার উপর হরিমোহনবাবুর ভাবের প্রবল তরঙ্গ আসিয়া মিশ্রিত হইল; বোলপুরে কোটালে বান ডাকিল। দিবা রাত্রি কীর্ত্তন আর উদ্দণ্ড নৃত্য, বোলপুর টলটলায়মান। আমি পণ্ডিত মহাশয় ও হরিমোহনবাবুর অঙ্গে যে সব ভাবের বিকার দর্শন করিয়াছি, তাহা বর্ণন করিবার আমার সাধ্য নাই। ইঁহাদের দেহে স্বেদ, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ প্রভৃতি অষ্ট-স্বাত্বিক লক্ষণ সকল যথাশাস্ত্র প্রকাশ পাইত; এক এক আছাড়ে ঘর দুয়ার কম্পান্বিত, দেহ যেন চুরমার হইয়া যাইত। ইহাদের শরীরে কখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবেশ, কখনও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবেশ, কখনও শ্রীকৃষ্ণের আবেশ, কখনও বা সখীগণের আবেশ, কখনও বা পৌর্ণমাসীর আবেশ দেখিতে পাইতাম। যখন তাঁহারা ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন আমি

ফুল-চন্দন-দুর্ব্বা ইত্যাদি লইয়া তাঁহাদের চরণে অর্পণ করতঃ পূজা করিতাম। কাহাকেও তাঁহাদের দেহ স্পর্শ করিতে দিতাম না।

আমার বাড়ীতে এই সব কীর্ত্তি হইত, আর বাহিরে বিপক্ষ দল ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিত; তাহারা আমাদের ছায়া স্পর্শ করিত না। হরিমোহনবাবু বড় ভাবুক লোক, একদিন তিনি লতা-পুষ্প-পত্রে সুসজ্জিত হইয়া সংকীর্ত্তন বাহির করিলেন, হরিমোহনবাবু যেন মত্ত মাতঙ্গ। ভাব-ভরে তাঁহার দেহ টলটলায়মান। কীর্ত্তনের রোল উঠিল। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য, বোলপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কীর্ত্তন দেখিতে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। হরি নামের ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

এই সকল দেখিয়া বিপক্ষ লোকেরা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল, তাহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তাহারা প্রতিশোধ লইবার মানসে এই সংকীর্ত্তনের এক Caricature (কুৎসা) বাহির করিল। কতকগুলা লোক বৈষ্ণব সাজিল, তাহাদের গলায় মালা, কপালে তিলক ও ছাপা, পরণে বহির্ব্বাস, গায়ে হরাবলী, মস্তকে নামাবলী, কোমরে কানিতে গ্রন্থ বাঁধা। দুই পাট খড়মের কাটের বগুলায় দড়ি বান্দিয়া একপাট কান্ধের এপাশে ও একপাট

নিকট আসিয়া বলিল "আমরা সংকীর্ত্তন করিব, আপনার খোল করতাল একবার প্রয়োজন।" আমি লোকটীকে বৈষ্ণব জ্ঞানে প্রণাম করিয়া খোল করতাল বাহির করিয়া দিলাম।

বোলপুরে তখন খোল করতাল ছিল না, বিপক্ষগণ এইরূপে খোল করতাল সংগ্রহ করিয়া বৈষ্ণব সাজিয়া বাজারে কীর্ত্তন বাহির করিয়া আমার বাসার দিকে আসিতে লাগিল। তাহারা নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী ও মুখ-ভঙ্গী করিয়া ও মাঝে মাঝে রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়া চারি-দিকে লোক হাঁসাইতে লাগিল। অনেক লোক এই তামাসা দেখিতে জুটিল। রাস্তায় খুব হাঁসির রগড় উঠিল।

এই সময় হরিমোহনবাবু আশ্রম হইতে আমার বাসায় আসিতেছিলেন. দূর হইতে খোল করতালের ধ্বনি শুনিয়া প্রমত্ত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া ভক্তিভরে এই সংকীর্ত্তন সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দিয়া পড়িলেন। ইহারা যে কুৎসাকারীর দল, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল না। হরিমোহনবাবুর ভাব দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহারা কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে আপন আপন গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এই Caricature এর বিষয় আমি কিছুই জানিতাম না; ৪।৫ দিন পরে একজন লোক বিষণ্ণ-ভাবে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল "আমরা বড়ই

অপরাধ করিয়াছি আমাদিগকে আপনি ক্ষমা করুন।” আমি বলিলাম “কি হইয়াছে ? আমিত কিছু জানি না।” সেই লোকটা সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল এবং কহিল, “যে লোকটা এই কুৎসার প্রধান উদ্যোগী, সে ইতিমধ্যে কলেরা রোগে মারা পড়িয়াছে, একজন রক্তামাশয় রোগে মরমর হইয়াছে ; দুই জন দারুন জ্বরে শয্যাগত ; আমারও খুব জ্বর হইয়াছিল, এখনও সারিতে পারি নাই, বড় কাহিল আছি”। আমি বলিলাম “খবরদার, এমন কায আর কখনও করি’ না ; ভগবানের নামে কি ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে আছে ?”

হরিমোহনবাবু আশ্রমের শোভা দেখিয়া পরম পুলকিত হইয়াছিলেন। অনন্ত প্রান্তরে যেন অনন্ত আকাশ মিশিয়া গিয়াছে, এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার ভাব প্রবণ হৃদয় একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি আশ্রমের গৃহের মধ্যে আসন না করিয়া, আশ্রমস্থিত একটী বটবৃক্ষ তলে আপনার আসন করিলেন। ঐ স্থানে একটা গর্ত্তে একটা বৃহৎ বিষধর সর্প বাস করিত ; হরিমোহনবাবু তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। দিবারাত্রি ঐ স্থানে সাধনমগ্ন থাকিতেন। রৌদ্রের তাপ, বৃষ্টি, কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। গায়ের উপর দিয়া ২।৩ পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহার আহারের কোন চেষ্টা ছিল না। বাসা হইতে নিত্য তাঁহার জন্য আহার

যাইত ; তিনি সময়ে সময়ে উপবাস করিয়া থাকিতেন তথাপি কাহারও নিকট আহার চাহিতেন না। একবার দুই দিন অনাহারে থাকিয়া বাসায় আসিলেন ; তাঁহার উপবাসের কথা শুনিয়া আমরা বড়ই সন্তপ্ত হইলাম। তখন তিনি মা মা বলিয়া আমার পরিবারের কোলে বসিলেন, তিনি নিজের সন্তানের ন্যায় তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিলেন। তৎকালীন হরিমোহনবাবুর অবস্থা যিনি একবার চক্ষে দেখিয়াছেন, তিনি আর কখনও ভুলিতে পারিবেন না। হরিমোহনবাবু কিছুদিন বোলপুরে থাকার পর শ্রীবৃন্দাবন চলিয়া গেলেন।

যদিও প্রবল গুরু-শক্তির আক্রমণে, আমার মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তথাপি আমি শান্তি-নিকেতনের ব্রহ্মোপাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। উপাসনার দিন নিয়মিতরূপে তথায় উপস্থিত হইতাম, রীতিমত তাহাতে যোগ দিতাম। একদিন পণ্ডিত মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া শান্তি-নিকেতনে উপস্থিত হইলাম। উপাসনাকালীন পণ্ডিত মহাশয়ের খুব ভাব হইল, তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নৃত্যাদি করিলেন। উপাসনার পর অঘোরবাবু আহারের জন্য অনুরোধ করায় পাছে এখানকার কিছু খাইলে জ্বর হয়, এই আশঙ্কায় পণ্ডিত মহাশয় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন ; পরে বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হওয়ায় কিছু ফল ও দুগ্ধ পান করিলেন। আমি অন্নভোজন

করিলাম। তদপর বাসায় আসিলে আমার শরীরে জ্বর-ভাব হইল, শ্যামাকান্তবাবু একেবারে লেপ মুড়ি দিয়া পড়িলেন, দারুণ জ্বর ও কম্প। তিনি বলিলেন উচ্ছিষ্ট ভোজনই এই জ্বরের কারণ। কয়েকদিন খুব ভুগিয়া আরোগ্য লাভ করিলেন।

আশ্বিন মাহায় পূজার ছুটি হইলে গুরু-সন্নিধানে যাইব, এজন্য উৎকণ্ঠায় কালযাপন করিতেছি, হঠাৎ পণ্ডিত মহাশয় বিষম রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। আমি তাঁহাকে ফেলিয়া আর কলিকাতা যাইতে পারিলাম না। তাঁহাকে বাসায় আনিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা লইয়া বিব্রত থাকিলাম; এইভাবে সমস্ত বন্দটা কাটিয়া গেল। প্রায় দুই মাস রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় আরোগ্য লাভ করিলেন।

পরিবর্ত্তন আরম্ভ।

গুরু-শক্তি প্রকাশের পর হইতে আমার জীবনের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। পদ্মার খরতর স্রোতে যেমন তাহার পাহাড় দুড়দাড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, প্রবল গুরু-শক্তির প্রভাবে আমার ধর্ম্মমত, বিশ্বাস, আচার, ব্যবহার সমস্তই চুরমার হইতে লাগিল। আমার মধ্যে সামাল সামাল পড়িয়া গেল। বহুকালের চিন্তা ও আলোচনা দ্বারায় আমি আমার নিজের যে মত ও বিশ্বাস গড়িয়া লইয়াছিলাম, বহুকাল যাবত আমি তদনুরূপ আচরণ করিয়া আসিতেছি,—আমার মধ্যে উহারা বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমি কিছুতেই উহাদিগকে পরিত্যাগ করিব না, অথচ এমনি অবস্থা হইতে লাগিল যে উহাদিগকে ত্যাগ না করিয়া আর স্থির থাকিতে পারি না; কে যেন জোর করিয়া ছাড়াইয়া দিতে লাগিল।

যদিও বংশগত সংস্কার বশতঃ আমি মদ্য, মাংস পেঁয়াজ, রশুন, ইত্যাদি তামস আহার কখনও করি নাই; বাল্যকালেই মৎস্যাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষায় জাতি-বিচার ও সদাচার আমার মধ্যে ছিল না। যাহার তাহার হাতে বা যাহার তাহার

সঙ্গে আহার করিতে আমার আপত্য ছিল না; শুচি অশুচি জ্ঞান ছিল না; উচ্ছিষ্ট বিচার করিয়া চলিতাম না; আচার ব্যবহারের কোন একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না; যাহা অভিরুচি হইত তাহাই করিতাম। এখন হইতে ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি বা তাঁহাদের লীলার চিত্রপট দর্শনে পূর্ব্বে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতাম, এখন হইতে সেই সব মূর্ত্তি বা চিত্রপট দেখিয়া প্রাণে একটা পরম তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলাম; কখন কখন অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আমার মনে বিশ্বাস নাই, অথচ অবস্থায় এইরূপ হয়। পূর্ব্বে সাধু সন্ন্যাসী বা তাহাদের বেশ দেখিলে ঘৃণা ও ক্রোধের উদয় হইত, এখন আর তাহা হয় না; এখন দেখিলে প্রাণটা জুড়াইয়া যায়। শাস্ত্র-পাঠ বিরক্তিকর ও উহার বর্ণনা কেবল গাঁজাখুরী মনে হইত, এখন কিন্তু মনে হইতে লাগিল সবই সত্য; শাস্ত্র-পাঠে বেশ তৃপ্তি বোধ হইতে লাগিল। চিন্তা-বিচারে একরূপ, কিন্তু প্রাণ অন্যরূপ। চিন্তা-বিচারে বিশ্বাস নাই, প্রাণ আপনা হইতে বিশ্বাস করিয়া বসে। এ রোগের কি আর ঔষধ আছে?

পূর্ব্বে কাপড় না ছাড়িয়া বা স্নানাদি না করিয়া আহার করিতাম, এখন আর সে অবস্থায় আহার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পূর্ব্বে শৌচ ক্রিয়ার পর কাপড় ছাড়িতাম

না, এখন কাপড় না ছাড়িয়া আর থাকিতে পারি না; যতক্ষণ কাপড় না ছাড়িব ততক্ষণ শরীর ঘিন্ ঘিন্ করিতে থাকিবে। থুতু বা কুলকুচ জলের ছিটা গায়ে লাগিলে, পূর্ব্বে তাহা আমলে আসিত না, এখন যতক্ষণ তাহা ধৌত না করিয়াছি, ততক্ষণ আর মনের অশান্তি দূর হয় না। যাহার তাহার হাতে বা যাহার তাহার সঙ্গে বসিয়া একত্রে আহার করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না; পূর্ব্বে সাধু-সন্ন্যাসীগণকে যে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করিতাম, এখন তাঁহাদের যথেষ্ট মর্য্যাদা না করিয়া থাকিতে পারি না। কোন সাধুরবেশ দেখিলেই একটা উপাসনার কায হইয়া যায় ও গুরু-শক্তি ভিতরে জাগিয়া উঠে। পূর্ব্বে ভগবত-প্রসঙ্গে তৃপ্তি পাইতাম না, এখন ঐসব কথাই ভাল লাগে; সংসার ও গ্রাম্য কথায় বেশ তৃপ্তি পাইতাম, এখন ঐসব কথায় আমার গায়ে যেন বিষ ছড়াইয়া দেয়। পূর্ব্বে সংসারের কায-কর্ম্ম তৃপ্তির সহিত করিতাম; এখন বিরক্তির সহিত দায়ে পড়িয়া করিতে হয়। পূর্ব্বে স্ত্রী ও সন্তান ভাল লাগিত এখন আর তাহারা মনে তৃপ্তি দিতে পারে না। সংসারের যাহা কিছু করি কেবল দায়ে পড়িয়া।

আমি চিন্তা ও বিচার করিয়া পূর্ব্বাবস্থায় থাকিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু প্রবল গুরু-শক্তি *

* সদ্গুরু কর্ত্তৃক যাঁহাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হয় নাই

আমার সমস্ত চেষ্টাই বিফল করিয়া দিতে লাগিল। আমাকে বলপূর্ব্বক নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া গড়িতে লাগিল। আমার প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল।

"অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে"
"বাহিরে না কহে কভু প্রকাশে হৃদয়ে॥"

গোস্বামী মহাশয় আমাকে এ পর্য্যন্ত আমার মত-বিরুদ্ধ কোন কথা বলেন নাই; *কারণ তিনি জানিতেন আমি তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিব না; বরং মতবিরুদ্ধ কথা শুনিয়া শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িব। এই ভাবিয়া তিনি আমাকে কোন কথা না বলিয়া ভিতর হইতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়া তুলিলেন। এই শক্তি একমাত্র গোস্বামী মহাশয়েরই দেখা গেল, অন্যত্র কুত্রাপি দেখা যায় না।

আমি পূর্ব্বে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট অনেক ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলাম; এখন আমাকে তাঁহার নিকট বড়ই লজ্জিত হইতে হইল। দেখা হইলে তিনি মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাঁসিতেন, আমি লজ্জায় অধোবদন হইতাম।

এই পৃথিবীতে যত দুরূহ কার্য্য আছে, শ্বাসে শ্বাসে নাম,

নাই, তাঁহারা এই গুরুশক্তির কথা বুঝিতে পারিবেন না; আমার বুঝাইবার চেষ্টা করাও বিফল; কারণ প্রাকৃত-জগতে ইহার সাদৃশ্য কিছু নাই। গুরুশক্তিকুলকুণ্ডলিনী শক্তি বা ভগবতশক্তি একই

গুরুদত্ত নাম জপ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। যদিও গোস্বামী মহাশয় নাম চলাচলের পথ দুরস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি নাম করিতে হইলে প্রাণান্ত হইতে হইত। কে যেন টিপিয়া ধরিত, শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইত, অর্দ্ধ ঘণ্টা প্রাণায়ামের দ্বারায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, হদ্দ দুই মিনিট নাম চলিত, তাহার পরই বন্দ। কাহার সাধ্য যে নামকে চালায়। গুরু-শক্তি প্রকাশের পর হইতে এই শক্তি আসিয়া নামের সহায় হইল। এই শক্তি নামকে পরিচালিত করিতে লাগিল। আমি একটু আয়াস পাইলাম। নামের কাঠিন্য কমিয়া গেল।

নাম ও শক্তি বড় আদরের জিনিস, ইঁহাদের একটু অনাদর হইলে আর রক্ষা নাই; অহঙ্কার, গ্রাম্য কথা, পর-নিন্দা ও খেলা (তাস পাশা ইত্যাদি) করিলে এই শক্তি বা নামের খোঁজ খবর পাইবার উপায় নাই। ইহারা তৎক্ষণাৎ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন। ভিতরটা একেবারে শুকাইয়া যাইত। আমাকে আবার অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া ইঁহাদিগকে আনিতে হইত। দেখিলাম ইঁহারা কাহারও বশ নয়, কেবল আদর, যত্ন, দীনতার বশ। যিনি পুরুষকারের বলে নাম করিতে যাইবেন, তিনি নিশ্চয়ই অকৃতকার্য্য হইবেন। দীন-হীন কাঙ্গাল হইয়া নামের পদানত থাকিয়া নাম করিলে, তবে নামের কৃপা হইবে ও নাম চলিতে থাকিবে; গুরু-শক্তিও

নামের সহিত কায করিতে থাকিবে। গুরু-শক্তি নামের সহায় না হইলে নাম করা বিড়ম্বনা মাত্র। যাহা হউক গুরু-শক্তি প্রকাশের পর হইতে নামের কঠোরতা অনেক পরিমাণ ঘুচিয়া গেল; ক্রমে এই শক্তি আমার মধ্যে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমার আনন্দ ও উৎসাহ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরীক্ষা।

—:*:—

বোলপুরের আশ্রমের কুটীর প্রস্তুত হইলে পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় তথায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন; লোকালয় হইতে বহুদূরে জনশূন্য সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে একাকী রাত্রিযাপন করা সহজ কথা নহে; বলশালী সাহসী লোকেরও থাকিতে সাহস হয় না। ইহার উপর কিছুদূরে স্রোতস্বতী তীরে প্রকাণ্ড শ্মশান ভূমি; নিকটে একটা বিল্ববৃক্ষে এক ব্রহ্মদৈত্য বাস করে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে; সেখানে বহু লোকে ঐ ব্রহ্ম দৈত্যের ভোগ দেয় ও পূজা করে। আবার আশ্রমে বিষধর সর্পের ভয়ানক দৌরাত্ম্য।

পণ্ডিত মহাশয় গুরু-আজ্ঞায় হাতে প্রাণ করিয়া এই নির্জ্জন প্রদেশে একাকী বাস করিতে লাগিলেন। অল্প বয়সে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল, সেই অবধি আর তিনি দার-পরিগ্রহ করেন নাই; কন্দর্প-শরে সদাই জর্জ্জরিত

হইত, সেই সময় তাঁহার মনে হইত যেন মাথাটা ফাটিয়া যাইতেছে তখন তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেন।

পণ্ডিত মহাশয়কে নির্জ্জনে থাকিতে দেখিয়া ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে কুপথগামী করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা পাইতে লাগিল। আশ্রমের নিকটবর্ত্তী ঝরণায় বহু স্ত্রীলোক জল আনিতে যায়। দুষ্টাগণ নানা ছলে পণ্ডিত মহাশয়ের মন ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ ছল করিয়া বুকের কাপড় খুলিয়া দিত; কেহ সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিত; কেহ নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিত; কেহ কেহ জল আনিবার ছল করিয়া ঝরণা হইতে জল লইয়া বাটী অভিমুখে গমন করিত, কিছুদূর গিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক কলসী হইতে জল ফেলিয়া দিয়া আবার জল আনিবার ছলনায় রাস্তা হইতে ফিরিয়া আসিত।

এক দিন রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় পণ্ডিত মহাশয় আপন নির্জ্জন কুটীর মধ্যে বসিয়া নাম করিতেছেন, এমন সময় কোন ভদ্র বংশীয়া এক সুন্দরী যুবতী স্ত্রী নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া—নানা উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী হস্তে লইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের কুটীর মধ্যে প্রবেশ করত খাবার জিনিসগুলি পণ্ডিত মহাশকে দিলেন। তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন; "যে অবধি এখানে আপনার কুটীর প্রস্তুত হইতে আরম্ভ

আপনার সেবা করিয়া পরমানন্দে কালযাপন করিব স্থির করিয়াছি, এ অতি নির্জ্জন স্থান। আপনার বয়স অল্প, অন্য স্ত্রীলোক সঙ্গে নাই,কেমন করিয়া একাকী থাকিবেন ? আপনি এই স্থানে ভজন করিবেন, আর আমি আপনার সেবা করিব।” নির্জ্জন কুটীর মধ্যে রাত্রিকালে রূপসী ও যুবতী স্ত্রীলোক দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় ভীত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ যুবতীকে একটা সাষ্টাঙ্গ দিয়া বলিলেন “মা, তোমাদের কৃপা ব্যতিরেকে কাহার সাধ্য যে এখানে একাকী ভজন করে। আশীর্ব্বাদ কর যেন এখানে অনন্য মনে ভজন করিতে সমর্থ হই ?” এই বলিয়া তিনি কুটীর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের ভাব দর্শন করিয়া ও তাঁহার মুখে মাতৃসম্বোধন শ্রবণ করিয়া স্ত্রীলোকটী মহা অপ্রতিভ হইলেন ; আর কোন কথা বলিতে সাহসী হইলেন না, খাবার গুলি দিয়া আশায় নিরাশ হইয়া মনোতুঃখে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পণ্ডিত মহাশয় এই স্ত্রীলোকটীর মনস্তুষ্টির জন্য খাবার গুলি লইলেন বটে—কিন্তু কিছুই খাইলেন না। রাখাল বালকগণকে দিবার জন্য রাখিয়া দিলেন। পরদিন মনে করিলেন, কামুকীর প্রদত্ত জিনিস, যাহা আমার আহার্য্য নহে তাহা কাহাকেও দিতে নাই,এই ভাবিয়া সমস্ত খাবার গুলি ফেলিয়া দিলেন।

এই সময় পণ্ডিত মহাশয়ের অন্য প্রকার আরও পরীক্ষা উপস্থিত হইল; পণ্ডিত মহাশয়ের সাধুতা চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়ায়, তাঁহাকে একজন মহা-পুরুষ জ্ঞানে নানা স্থান হইতে নানা লোক আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল, কেহ বলেন, স্ত্রীর সন্তান হয় না এমন একটা উপায় করিয়া দিউন, যাহাতে সন্তান হয়; কেহ বলেন, বহুকাল হইতে উৎকট রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছি ইহার একটা প্রতীকার করুন। কেহ বলেন আমার স্ত্রীর মৃতবৎসা রোগ তাঁহাকে একটা ঔষধ দিউন; এইরূপ এক একজন এক একটা বাহানা লইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল।

কিসে ধর্ম্মলাভ হইবে, কিসে দুস্তর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, কিসে ত্রিতাপ জ্বালা দূরীভূত হইবে, একথা কেহ বলে না। এই সমস্ত লোক পণ্ডিত মহাশয়ের আশ্রমে আসিতে থাকায় তাঁহার সাধন ভজনের বিঘ্ন হইতে লাগিল। ইহাদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন, "আমি ডাক্তার বা কবিরাজ নহি. চিকিৎসকের আবশ্যক হইলে চিকিৎসকের নিকট গমন করুন। আমার নিকট কেন আসিয়াছেন? আমার দ্বারায় কোন উপকার হইবে না।" পণ্ডিত মহাশয়ের

সাধু? যদি রোগ ভাল করিতে না পারিবে, যদি অপুত্রকে পুত্র দিতে না পারিবে তবে আবার সাধু কিসের? তাহারা হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইত। এইরূপ বহু লোক ফিরিয়া গেলে যখন সকলে টের পাইল, পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট ঔষধ আদি পাওয়া যায় না ও তাঁহার দ্বারায় সংসারের কোন উপকার হয় না, তখন এই সকল লোকের উৎপাত দূর হইল।

পণ্ডিত মহাশয়ের যেরূপ খ্যাতি ছিল তাহাতে তিনি ঔষধাদি বিতরণ ও শিষ্য করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার প্রতিপত্তি ও ধনৈশ্বর্য্যের সীমা থাকিত না। তিনি বেশ জানিতেন এ সব ভক্তি লাভের মহা অন্তরায় এজন্য তিনি এ সব কার্য্য বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

গুরু দর্শনে সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে গমন।

—*—

১৩০১ সালের আশ্বিন মাহার পূজার ছুটী হইয়াছে,— গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন করিতে যাইবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, কিন্তু শ্যামাকান্ত বাবু বিষম রক্তামাশয় রোগে শয্যাশায়ী, কাযে-কাযেই তাঁহাকে ফেলিয়া আমার কলিকাতা যাওয়া হইল না। বন্ধটা রোগের সেবাতেই কাটিয়া গেল। ব্যারাম ভাল হইলে শ্যামাকান্ত বাবুকে সঙ্গে লইয়া ঐ সনের কার্ত্তিক মাহায় কলিকাতায় রওনা হইলাম। এই সময় গোস্বামী মহাশয় সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট ১৪।২ নং বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের পূজা করিবার জন্য পণ্ডিত মহাশয় কতকগুলি পদ্ম ফুল, কয়েকটা ধান্যের শীষ ও কয়েক গাছা দূর্ব্বা সঙ্গে লইলেন এবং বাসায় পৌছিয়া গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন; আমিও প্রণাম করিয়া নিকটে বসিলাম। গোস্বামী মহাশয় পরমানন্দ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে খুব আপ্যায়িত করিলেন। আমি বলিলাম মহাশয় আপনাকে দেখিবার জন্য প্রাণটা বড়ই ছট্‌ফট্‌

করিতেছিল, কেবল পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যারাম জন্য সমস্ত পূজার ছুটিটা কাটিয়া গেল, কোন ক্রমে আসিতে পারিলাম না। তিনি উত্তর করিলেন "পূজার সময় বাড়ী বাড়ী নৈবেদ্য খাইয়া বেড়াইতে হইবে এ সময় একজনকার ঘাড়ে না চাপাইলে চলে কই।" আমি তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলাম।

এই সময় হইতে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত নানা বিষয়ের গল্প গুজব হইত, প্রসঙ্গক্রমে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার বাল্যজীবন, ব্রাহ্মজীবন, প্রচার কার্য্যে যে-সকল বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্ত, তাঁহার কুলদেবতা শ্যামসুন্দরের কথা, অভীষ্ট লাভ না হওয়ায় প্রাণের অশান্তি, অভীষ্ট লাভের আশায় ভারতবর্ষের বিবিধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নিকট গমন, ভারতের নানা দেশ পর্য্যটনের বিবরণ, সাধুসঙ্গ ও গুরুলাভের বিস্তারিত বিবরণ, তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের পরিবর্ত্তন, ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের কারণ ও তাহার জীবনের বিবিধ ঘটনাবলীর কথা বিস্তারিতরূপে শুনাইতেন।

আমি গোস্বামী মহাশয়ের আশ্চর্য্য জীবনের কথা শুনিয়া বিমোহিত হইতাম, এবং একটু ফুরসুৎ পাইলেই তাঁহার কাছে বসিয়া ঐ সকল কথা পাড়িতাম। তিনি আমার নিকট তাহা বিবৃত করিতেন।

গোস্বামী মহাশয়ের জীবন ...

ঘটনা প্রায়ই সংক্ষেপে আপন আপন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমি গোস্বামী মহাশয়ের জীবন চরিত লিখিতেছি না, নিজের জীবন বৃত্তান্তও বর্ণন করিতেছি না, কোন কোন সতীর্থের একান্ত অনুরোধে, গোস্বামী মহাশয় আমার জীবনে যেটুকু লীলা করিয়াছেন, আমি কেবল তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি, সুতরাং গোস্বামী মহাশয়ের আত্মকাহিনী এখানে লিখিত হইল না; কেবল পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণার্থ তাঁহার জীবনের ২।৪টী ঘটনা তাঁহার নিজ মুখে যেমন শুনিয়াছি ঠিক সেইমত লিখিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

১। গোস্বামী মহাশয় শৈশবকালে একটা বিবাহ উপলক্ষে বরযাত্রগণের সঙ্গে বিবাহ বাড়ীতে গিয়াছিলেন, গাত্রে অলঙ্কার ছিল; প্রথম রাত্রে বিবাহ শেষ হইলে বর ও কন্যাপক্ষীয় লোকেরা নিদ্রাভিভূত হয়। সেই সময় দেশে অত্যন্ত চোর ডাকাইতের উপদ্রব ছিল; লোক-জন নিদ্রাভিভূত হইলে একদল দস্যু গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক টাকা, গহনা ও জিনিস পত্র অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় তাহারা নিকটস্থ একটা জঙ্গলে ঘটস্থাপনা করিয়া মহা-নন্দে কালী পূজা করে, এবং বলিদান দিবার জন্য শিশু গোস্বামীকে নিদ্রিতাবস্থায় কোলে করিয়া লইয়া যায়।

লুক্কায়িত ভাবে দেখিতেছিল ; বলিদান দিবার জন্য দস্যুরা শিশু-গোস্বামীকে উৎসর্গ করিয়া ভেলীর উপর শোয়াইয়া দিয়া যেমন খড়গাঘাত জন্য খড়গ উত্তোলন করিল, অমনি এই পাগলটা পশ্চাৎ দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া ঘাতকের হাত হইতে খড়গখানি কাড়িয়া লইয়া জিব বাহির করিয়া কালীঠাকুরাণী যে ভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন, ঠিক সেই ভাবে দাঁড়াইয়া গেল। দস্যুগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে সমস্ত জিনিস পত্র ফেলিয়া ছুটিয়া পালাইয়া গেল। গৃহস্থের বাটীর প্রাচীর মধ্যে একটা জল নিকাশের মুরী ছিল ; সেই মুরীটা কাটিয়া বিস্তৃত করত ঐ স্থান দিয়া জনৈক দস্যু গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করত সদর দরজার খিল খুলিয়া দেওয়ায় সমস্ত দস্যুরা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। পাগল শিশু-গোস্বামীকে কোলে তুলিয়া লইয়া এই মুরীর দ্বারে রাখিয়া দিয়া খড়গহস্তে কালীর বেশে হুঙ্কার করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত হইলে বাড়ীর লোক জাগ্রত হইয়া দেখিল তাহাদের টাকাকড়ি অলঙ্কার ইত্যাদি বহু সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে এবং শিশু-গোস্বামীকে পাওয়া যাইতেছে না। চারিদিকে হাহাকার উত্থিত হইল, তখন ঐ পাগলটা ইসারা করিয়া কালী পূজার স্থান, অপহৃত জিনিস পত্র, শিশু-গোস্বামী যে স্থানে শায়িত আছেন ও যে প্রকারে তাঁহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল তৎসমুদয়

ইসারা করিয়া দেখাইয়া দিল। সেই পাগল কাহারও সহিত কথা কহিত না; এই প্রকারে পাগল দ্বারায় শৈশবকালে গোস্বামী মহাশয়ের একবার জীবন রক্ষা হইয়াছিল।

বিন্ধ্যাচল অঞ্চল ভ্রমণকালে দস্যু হইতে ব্যাঘ্র দ্বারায় গোস্বামী মহাশয় যেরূপ রক্ষিত হইয়াছিলেন তাহা গোস্বামী মহাশয়ের শ্রীমুখে এইরূপ শুনিয়াছি; বিন্ধ্যাচল ভ্রমণকালে পথভ্রষ্ট হইয়া গোস্বামী মহাশয় একদিন এক ভীষণ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করেন; সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া সন্ধ্যার সময় এক সাধুর গোফায় উপস্থিত হন; সাধু তাঁহার অনশনের কথা শুনিয়া নিজের নিকট বসাইয়া কিছু ফল ও জল খাইতে দিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাহা খাইয়া সুস্থ হইলেন।

এই অরণ্য মধ্যে এক দল দস্যু বাস করিত; সাধুটী নিঃসঙ্গ বলিয়া তাহারা তাঁহার উপর কোন উপদ্রব করিত না; গোস্বামী মহাশয়কে অরণ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে গভর্ণমেণ্টের কোন গুপ্তচর মনে করিয়া তাঁহার প্রাণ-সংহারে কৃতসংকল্প হইল।

রাত্রি ৮টা বাজিয়াছে, গভীর মেঘ গর্জ্জন হইতেছে, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশে বিদ্যুৎ খেলিতেছে অরণ্য নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন, এমন সময় গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল। যেমন বন্দুকের শব্দ হইল, অমনি একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র থাবা গাড়িয়া বসিয়া

ঘ্যা ঘ্যা শব্দ করিতে লাগিল ; তাহার চক্ষু দীপকের ন্যায় জ্বলিতেছে, সে বৃহৎ লাঙ্গুল মাটীর উপর আছড়াইতেছে। গোস্বামী মহাশয় এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হই-লেন। সাধুটী তাঁহাকে বলিলেন "আপনি গোফার ভিতরে আমার পশ্চাতে থাকুন, দস্যুরা আপনার প্রাণ-বধার্থ আসিতেছে, পথে একটা ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আটক পড়িয়াছে। আপনি নীরবে থাকিবেন, কোন কথা কহিবেন না।" গোস্বামী মহাশয় সেই ভাবেই থাকিলেন ; গোফার দ্বারে সাধুটী, ধুনী জ্বালিয়া বসিয়া থাকিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইতে লাগিল ; কিন্তু ব্যাঘ্রটা মরিল না ; পথও ছাড়িয়া দিল না।

এই গোফায় আসিবার আর একটা পথ আছে ; এইবার দস্যুরা সেই পথে ঘুরিয়া আসিল, গোফার নিকটবর্ত্তী হইলে আর একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র ঐরূপ রাস্তার উপর থাবা গাড়িয়া বসিয়া ঘ্যা ঘ্যা শব্দ করিতে লাগিল। ব্যাঘ্রটাকে মারিয়া অন্তত তাড়াইয়া দিবার জন্য দস্যুগণ বারম্বার গুলি চালাইতে লাগিল; কিন্তু এ ব্যাঘ্রটাও মরিল না, নড়িলও না। ক্রমে প্রবল বেগে ঝড় বহিতে ও অশনিপাত হইতে লাগিল। দস্যুরা চলিয়া গেল। রাত্রি ১॥০ দেড় ঘটিকার সময় ঝড় জল থামিল, মেঘ কাটিয়া গেল, চন্দ্র উদয় হইল ; এই সময় সাধুটি, গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি আর এখানে ক্ষণকাল

থাকিবেন না, এই পথে এখান হইতে প্রস্থান করুন।” গোস্বামী মহাশয় গোফা হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। যখন ভোর হইয়াছে তখন বিন্ধ্যদেবীর মঙ্গল আরতির কাঁশরের শব্দ শুনিতে পাইলেন। গোস্বামী মহাশয় বিন্ধ্যদেবীর মন্দিরের দুয়ারে আসিয়া বসিলেন। বেলা ৮টার সময় দস্যুদল আসিয়া গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করিয়া যোড়হাতে বলিতে লাগিল;—

দস্যুগণ—মহারাজ, ক্ষমা কিজিয়ে। আপ্‌কো পাস বহু অপরাধ কিয়া।

গোঁসাই—ক্যা হুয়া? হামত কুচ জান্তা নেহী।

দস্যুগণ—হাম লোক ডাকু হ্যায়; আপ্‌কো মারনেকা ওয়াস্তে কাল হাম লোক গিয়া; বজ্রাঘাত মে হাম লোককা চার আদমী মর গিয়া; দো আদমীকো বহুত বেমারী হুয়া; আপ্‌ ক্ষমা কিজিয়ে।

গোস্বামী মহাশয় দস্যুগণের মুখে এই সব কথা শুনিয়া তাহাদিগকে সদুপদেশ দিয়া সান্ত্বনা করিলেন এবং বলিলেন কদাচ দস্যুবৃত্তি করিও না। তাহারা গোস্বামী মহাশয়কে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

গোস্বামী মহাশয় যে সকল সাধুসঙ্গ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ২।১টার কথা লিখিতেছি। একদিন বৈকালে কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীটের উপর দিয়া গোস্বামী মহাশয়

যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন একজনচামার রাস্তার পার্শ্বে বসিয়া জুতা সেলাই করিতেছে; রাস্তা দিয়া অনেক লোক যাতায়াত করিতেছে। একটী ভদ্রলোকের পায়ে ছেঁড়া জুতা দেখিয়া চামার বলিল ;—

চামার—মহাশয় আপনার জুতাটা দিন, সেলাই করিয়া দিই।

ভদ্রলোক—আমার কাছে পয়সা নাই, জুতা সেলাই করিতে হইবে না।

চামার—জুতাটা বড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দিন না, সেলাই করিয়া দিই।

ভদ্রলোক—আমার কাছে পয়সা নাই, কেমন করিয়া সেলাই করাইব?

চামার—পয়সা দিতে হইবে না, দিন, জুতাটা সেলাই করিয়া দিই।

এই বলিয়া চামার জুতা লইয়া সেলাই করিয়া দিল; ভদ্রলোকটী জুতা পায়ে দিয়া চলিয়া গেল। চামার পয়সা চাহিল না। গোস্বামী মহাশয় চামারের কথা শুনিয়া লুকায়িতভাবে তাহার কার্য্য কলাপ দেখিতে লাগিলেন। চামার অনেকের জুতা সেলাই করিয়া দিল। বেলা অবসান হইলে প্রস্থান করিল। সন্ধ্যার সময় নগর প্রান্তে একটা জঙ্গলে জুতা সেলাইয়ের জিনিষ পত্র রাখিয়া চামার গঙ্গাস্নান করত ফোঁটা তিলক করিয়া

একটা প্রকাণ্ড বাটীতে প্রবেশ করিল। এমন সময় একখানি ঘোড়গাড়ী চড়িয়া একটী ভদ্রলোক ঐ বাটীতে প্রবেশ করিলেন। অনেক ঘৃত,ময়দা, ইত্যাদি বিবিধ জিনিষ পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। লুচী, তরকারী, হালুয়া ইত্যাদি প্রস্তুত হইল। শাঁক, ঘণ্টা, ঘড়ি, করতাল বাজাইয়া ঠাকুরের আরতি হইল, পরে ভোগ হইলে প্রারম্ভ আরম্ভ হইল।

এই সমস্ত ঘটনা গোস্বামী মহাশয় লুক্কায়িতভাবে দেখিতেছিলেন, এই সময় সেই চামার-বেশধারী সাধুটী গোস্বামী মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন ;—

সাধু—আও, ইধার আও, প্রসাদ লেও।

গোঁসাই—তুমিত এতক্ষণ জুতা সেলাই করিতেছিলে, এখনি যে আবার সাধুর দলে ? একি ?

সাধু—আরে হামত সাধু নেহি হ্যায় ; হাম চামার হ্যায়।

গোঁসাই—আপনি ঠিক করিয়া বলুন, ব্যাপার কি ?

সাধু—গুরুজীকো পাস্ হামারা কুচ কসুর হুয়া, এসিওয়াস্তে গুরুজী বোলা, হিঁয়াসে ভাগো, তোম চামার হ্যায়। গুরুজী খাপ্পা হোনেসে, হাম্ বহুত রোনে লাগা ; তব হুকুম হুয়া, যাও বার বরিস্ আদমী লোককো পায়কো জুতা সেলাই কর। আট বরিস হো গিয়া, আউর

গোস্বামী মহাশয় এই সাধুর কীর্ত্তি ও প্রেম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন; তখন মনে করিলেন এই শ্রেণীর লোকের মধ্যেত বেশ ভাল লোক আছেন? পূর্ব্ব হইতে তাঁহার মধ্যে যে সাধু বিদ্বেষ ছিল, এই সময় হইতে তাহা দূর হইতে আরম্ভ হইল। গোস্বামী মহাশয় প্রসাদ লইয়া বাসায় ফিরিলেন।

এই ঘটনার অনেক দিন পরে গোস্বামী মহাশয় একবার দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। তথায় বেড়াইতে বেড়াইতে পাহাড়ের এক নির্জ্জন রমণীয় স্থানে দেখিলেন, একজন উলঙ্গ সাধু একখানি পাথরের উপর একাকী বসিয়া আছেন। গোস্বামী মহাশয় এই সাধুকে দেখিয়া বলিলেন;—

গোঁসাই—আপ্ নেঙ্গা হ্যায়, হিঁয়া কাহে আয়া? হিঁয়া সাহেব লোক, বিবিলোক হর্‌দম্ আওতা হ্যায়, আপকো নেঙ্গা দেখ্‌নেসে চাবুক মারেগা।

সাধু—আরে, হাম্‌তো হিঁয়া হরদম্ আওতা হ্যায়, কোই হাম্‌কো পছন্তা নেহি।

এই কথা বলিয়া তিনি সেই পাথরের উপর বসিয়া থাকিলেন। গোস্বামী মহাশয় দেখিলেন তাঁহার দেহটা যেন কাঁচের দ্বারায় নির্ম্মিত, ভিতরে একটা আলো জ্বলিতেছে; ঠিক যেন একটা লণ্ঠনের মধ্যে বাতি জ্বলিতেছে। গোস্বামী মহাশয় সাধুটীকে বলিলেন "কামের জন্য বড় জ্বালাতন হইতেছি, কিসে কাম যায় বলিয়া দিউন।" সাধু

প্রাণায়াম করিবার উপদেশ দিয়া প্রাণায়াম দেখাইয়া দিলেন। তখন গোস্বামী মহাশয় বলিলেন; "আপনি আমার গুরু হউন।" সাধু উত্তর করিলেন "আমি তোমার গুরু নই, তোমার গুরু আছেন, দুই বৎসর মধ্যে তোমার গুরু লাভ হইবে" এই বলিয়া সাধু তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের সহিত একবার তান্ত্রিক সাধনের কথা হইয়াছিল; তিনি বলিয়াছিলেন, তান্ত্রিক সাধন ভাল, কিন্তু বড়ই বিপদ সঙ্কুল; কেউটে সাপের সঙ্গে খেলা এক ছোবলেই প্রাণ যায়; স্ত্রীলোক ও মদ্য লইয়া সাধন করা সহজ ব্যাপার নহে। এই বলিয়া গয়া পাহাড়ের চক্রের কথা বলিলেন্। তিনি আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহা আমি ঠিক লিখিতেছি। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, আমি তান্ত্রিক গুরুর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমার সাক্ষাতে চক্রে বসিলেন। প্রায় ১২। ১৩ জন লোক উপস্থিত। এমন সময় একটী স্ত্রীলোক আসিয়া যে ভাবে কালী দাঁড়ায়, সেই ভাবে জিব বাহির করিয়া হাত তুলিয়া পা ফারাক করিয়া দাঁড়াইলেন। গুরু তাঁহার অঙ্গে জলের ছিটা দিবামাত্র স্ত্রীলোকটী অজ্ঞান হইয়া গেলেন। এই স্ত্রীলোকের চৈতন্য লোপ হইলে, গুরু তাঁহাকে উলঙ্গ করিলেন এবং সকলকে বলিলেন 'তোমরা

তাঁহার মনে হইল তিনি যেন পাঁচবছরের বালক; তিনি গড়াইয়া ঐ স্ত্রীলোকের পায়ের তলায় পড়িয়া গেলেন, তান্ত্রিক গুরু ঐ স্ত্রীলোকটীর মস্তকে, স্কন্ধে, হাতে, কেশেতে ও পায়ে ফুল দিয়া পূজা আরম্ভ করিলেন। পূজা শেষ হইলে স্ত্রীলোকটীকে কাপড় পরাইয়া দিলেন, এবং ঐ স্ত্রীলোকটীর ও সাধকগণের অঙ্গে শান্তিজল ছিটাইয়া দিলেন। শান্তিজল ছিটাইয়া দিবামাত্র সকলের চৈতন্য হইল; স্ত্রীলোকটী চলিয়া গেলেন।

গোস্বামী মহাশয় বলিলেন নেশার জন্য মদ্য পান, বা ব্যভিচারের জন্য ভৈরবী গ্রহণের ব্যবস্থা হয় নাই। সুরার এমনি একটা গুণ আছে, যে সুরা পান করিলে যাহার যে প্রকৃতি তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। কামুকের কামরিপু উত্তেজিত হয়, ক্রোধীব্যক্তির ক্রোধ প্রকাশ হইয়া পড়ে, নিন্দুকব্যক্তি পরনিন্দা করিতে থাকে এইরূপ যাহার যে প্রকৃতি তাহা আর গোপন থাকে না। প্রকৃত পক্ষে ভৈরবীই গুরুস্থানীয়। ভৈরবকে তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিতে হয়। ভৈরবী, ভৈরবকে সুরাপান করাইয়া তাহার পরীক্ষা করিতে থাকেন। যদি সুরাপান করাইয়া বুঝিতে পারেন, যে ভৈরবের ইন্দ্রিয় দমন হয় নাই, দুষ্প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহা হইলে আর তাহাকে সুরাস্পর্শ করিতে দেন না, সাধন পন্থায় পরিচালিত করিতে থাকেন। যে-সে

অগ্রসর ও গুরু হইবার উপযুক্ত, কেবল তিনিই ভৈরবী হইতে পারেন। অসংযত-ইন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের এই পন্থায় কদাচ পদার্পণ করা কর্ত্তব্য নহে। পতন অবশ্যম্ভাবী।

গোস্বামী মহাশয় সকল সম্প্রদায়ের সাধকগণের সহিত মিশিয়া সাধন-ভজন করিয়াছিলেন। বাউল সম্প্রদায়ের সহিত সাধনকালে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন ! বীরভূম জেলার অন্তর্গত কোটা-শূরের ক্ষেপা-মায়ের এক আকড়া আছে। ইহা বাউল সম্প্রদায়ের লোকগণের এক প্রধান আড্ডা। এই আক-ড়ায় থাকিয়া গোস্বামী মহাশয় বাউল সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া কিছু দিন তাহাদের সঙ্গে সাধন-ভজন করেন। তৎপর তাহারা গোস্বামী মহাশয়কে চারুচন্দ্র * খাইতে বলে। গোস্বামী মহাশয় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন ;—

গোঁসাই—ইহা খাইলে কি হইবে ? ইহাতে কি ভগবত প্রাপ্তি হইবে ? যদি এই সব খাইলে ভগবত প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে আমি হাঁড়ী হাঁড়ী খাইতে প্রস্তুত আছি।

বাউলগণ—না, ইহাতে ভগবত প্রাপ্তি হইবে না ; তবে শরীর সুস্থ থাকিবে ও দীর্ঘজীবন লাভ হইবে।

গোঁসাই—শরীর নশ্বর, এক দিন না এক দিন ইহা বিনাশ

* মল, মূত্র শোণিত, শুক্র। বাউলগণ ইহাকে চারুচন্দ্র বলে।

প্রাপ্ত হইবেই হইবে। ইহার জন্য এই কদর্য্য আহার কেন করিব ?

বাউলগণ—তোমাকে খাইতেই হইবে। তুমি আমাদের দলে মিশিয়া আমাদের গুহ্য ব্যাপার সব জানিয়াছ, এখন যদি না খাও, তোমাকে বলপূর্ব্বক খাওয়াইব, এবং মারিয়া তোমার হাড় চূর্ণ করিয়া ফেলিব। এই বলিয়া বল প্রয়োগের উপক্রম করিল।

গোঁসাই—তোরা জানিস্ আমি কে ? আমি শান্তিপুরের অদ্বৈত-বংশীয় গোস্বামী, এদেশে আমাদের বহু শিষ্য আছে, তোদের এত স্পর্দ্ধা ! যে আমাকে তোরা এমন কথা বলিস্ ! আমি একটা ডাক দিলে এখনি কত লোক আসিয়া তোদের উপযুক্ত শিক্ষা দিবে।

অদ্বৈত-বংশীয় গোস্বামীর কথা শুনিয়া বাউলগণ ক্ষ্যান্ত হইল। তাহারা গোস্বামী মহাশয়কে আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

গোস্বামী মহাশয় বলিতেন সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই ২।৪ টী করিয়া ভাল লোক দেখিয়াছি, কিন্তু প্রাণ জুড়ায় এমন একটী লোকও কোথাও দেখি নাই।

অনল হইতে রক্ষা সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয় নিজে

ড়ের উপর দিয়া তিনি যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, পাহাড়স্থ শুষ্ক ঘাসে রাখালেরা অগ্নি প্রদান করিয়াছে; অগ্নি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া গোস্বামী মহাশয়কে বেষ্টন করিয়াছে। তাঁহার কোন দিকে পলাইবার উপায় নাই এই অবস্থায় তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া এক লম্ফ প্রদান করিয়া নীচে পড়িলেন; এক জন মহাপুরুষ হাত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইলেন। গোস্বামী মহাশয় ভূমিতে পড়িলে তাঁহার হাড় চুরমার হইয়া যাইত। এই মহাপুরুষ এই মহাবিপদে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

একবার প্রচার-কার্য্যে ভ্রমণকালে গোস্বামী মহাশয় মনের আবেগে ব্রহ্মপুত্র-নদী সাঁতার দিয়া পার হইয়া গিয়া পথ ভুলিয়া একটা অরণ্যে প্রবেশ করেন। রাস্তা জানা না থাকায় বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত কোন গ্রাম পাইলেন না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িলেন। এমন সময় বনমধ্যে দেখিলেন, একটা হরিণ প্রাণভয়ে তাঁহার সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া পলাইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখিলেন একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র ঐ হরিণকে অনুসরণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। আবার কিছুক্ষণ পরে দেখিলেন, একটা বন্য মহিষ গোস্বামী মহাশয়কে দেখিয়া তাঁহাকে মারিবার জন্য সিং খাড়া করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে তাঁহার দিকে ছুটিয়া

না দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন। ঠিক এই সময় হঠাৎ একটা প্রবল বাতাস উপস্থিত হওয়ায় নিকটস্থ কেশেবনের কেশেগুলি শুইয়া পড়িল। কুম্ভকারগণ ঐ স্থান হইতে মাটি লইত; তজ্জন্য তথায় একটা গর্ত্ত হইয়াছিল; প্রবল বাতাসে কেশেগুলি শুইয়া পড়ায় গোস্বামী মহাশয় ঐ গর্ত্তটা দেখিতে পাইলেন। তিনি হস্তস্থিত ছাতাটা ফেলিয়া দিয়া দৌঁড়িয়া গিয়া ঐ গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন। বাতাস চলিয়া যাওয়ায় সেই কেশেগুলি আবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। গোস্বামী মহাশয় ঐ কেশেগুলির অন্তরালে গর্ত্তমধ্যে লুক্কায়িত থাকিলেন।

মহিষটা ছুটিয়া যখন দেখিল তাহার শীকার লক্ষ্য স্থানে নাই, তখন তাহার ক্রোধের সীমা থাকিল না। সে সিং ও ক্ষুর দ্বারায় সেখানকার মাটি বিদারণ করিতে লাগিল; ছাতাটা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিল। সেই স্থানটায় পুনঃপুনঃ মল-মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ করিয়া ক্রোধের শান্তি হইলে মহিষটা চলিয়া গেল।

মহিষটা চলিয়া গেলে গোস্বামী মহাশয় গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া হাঁটিতে লাগিলেন; সন্ধ্যার পর রাত্রি ৮টায় গোয়ালার একটা বাথানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থান মানুষের বাসোপযোগী নহে, গো-রক্ষকগণ টং বান্ধিয়া তাহার উপরে থাকে। গোস্বামী মহাশয়কে একাকী

আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, গোস্বামী মহাশয় আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বলিলেন; গোয়ালাগণ বলিল "এখানে ক্ষণকাল থাকা কর্ত্তব্য নহে, এখনি বাঘে মারিয়া ফেলিবে।" এই বলিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে প্রস্থান করিতে বলিলেন। ছয় ক্রোশ দূরে গ্রাম আছে; ৪জন লোক দেউটী জ্বালিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সেই গ্রামে লইয়া চলিল। গোস্বামী মহাশয় নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, একটু বিশ্রাম করিতেও পাইলেন না। গ্রামে আসিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা হইল।

ভগবান্ যাঁহার দ্বারায় মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, তাঁহাকে কিরূপে রক্ষা করিয়া আসেন, গোস্বামী মহাশয়ের জীবনী তাহার অতি উজ্জ্বল প্রমাণ।

গোস্বামী মহাশয়ের কুলদেবতা শ্যামসুন্দরের প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা লিখিতেছি। গোস্বামী মহাশয় শান্তিপুর হইতে ঢাকা যাইবার সময় তাঁহার এক জ্ঞাতি-খুড়ো তাঁহার হাতে ২৬টি টাকা দিয়া বলিলেন, "ঢাকার কারীগর খুব ভাল, এবার শ্যামসুন্দরের জন্য একটি ভাল রকম চুড়া গড়াইয়া আনিও, যদি কিছু বেশী লাগে নিজ হইতে দিও এখানে আসিলে মিটাইয়া দিব।" খুড়োর কথানুসারে গোস্বামী মহাশয় শ্যামসুন্দরের জন্য ঢাকায়

দিলেন। শ্যামসুন্দর এই চূড়া পরিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট প্রকাশ হইয়া বলিলেন ;—

শ্যামসুন্দর—আয় না ? আমাকে কেমন সাজিয়াছে একবার দেখ্ সে না ?

গোঁসাই—না, আমি যাব না, আমি ব্রাহ্ম, পরিমিত কোন দেবতা আমি স্বীকার করি না।

শ্যামসুন্দর—তা, হলেই বা ব্রাহ্ম, আমাকে ত ভালবাসিস্। দেখ্‌তে দোষ কি ? আয়না দেখ্‌বি, আমাকে কেমন সাজিয়াছে।

গোঁসাই—আমাকে ওকথা বলিতে নাই, আমি ব্রাহ্ম, আমাদিগকে ঠাকুর দেবতা দেখিতে নাই।

শ্যামসুন্দর—তোকে ব্রাহ্ম কর্‌লে কে ?

গোঁসাই—কে করিয়াছে ?

শ্যামসুন্দর—আমিইত ব্রাহ্ম করিয়াছি।

গোঁসাই—কেন আমাকে ব্রাহ্ম কর্‌লেন ?

শ্যামসুন্দর—ব্রাহ্ম না কর্‌লে তুই কি আমাকে চিন্‌তে পার্‌তিস্।

এই কথার পর গোস্বামী মহাশয় শ্রীমন্দিরে গিয়া শ্যামসুন্দরের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিলেন। তিনি যেন শ্রীমন্দির আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয় এমনি ডাহা ব্রাহ্ম ও সংস্কার এতই বদ্ধমূল যে তিনি শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিতে পারিলেন না।

গোস্বামী মহাশয় এই ব্যাপার তাঁহার ব্রাহ্ম বন্ধুবান্ধবের নিকট ব্যক্ত করিলে, তাঁহারা অবিশ্বাস করিয়া বলিয়াছিলেন, "গোঁসাইজার বৈষ্ণব বংশে জন্ম, না জানি ইহার পর আরও কত কি দেখিবেন।"

আধ্যাত্ম রাজ্যের ব্যাপার অতি গুহ্য এবং নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য; আমরা মায়া মোহে আচ্ছন্ন; মায়ার অন্ধকার ভেদ করিয়া আমাদের দৃষ্টি চলে না। ভগবান্ তাঁহার ভক্তকে লইয়া কতই যে আমোদ আহ্লাদ করেন, সাধারণ লোকে তাহা কি বুঝিতে পারে? যতদিন মায়া, ততদিন আমাদের নিকট সকলই উপন্যাস। জন্মান্ধ কি সূর্য্য দেখিতে পায়?

গয়া পাহাড়ে দীক্ষা সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন; "কিছুকাল পূর্ব্বে বাগ-আঁচড় গ্রামে আসিলে তিনি একদিন স্বপ্ন দেখেন যে, সিংহ শার্দ্দুল প্রভৃতি বিবিধ হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ একটা ভয়ানক জঙ্গলে গোস্বামী মহাশয় একাকী বাস করিতেছেন; জঙ্গল ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন; সঙ্গের সঙ্গী কেহ নাই; জঙ্গল হইতে বাহির হইবার কোন উপায় নাই; বাহির হইবার যতই চেষ্টা করেন, ততই পথ হারাইয়া জঙ্গলের মধ্যে ঘুড়িয়া বেড়ান ও কণ্টক আদিতে শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। হিংস্রক জন্তুগণের বিকট চীৎকারে প্রাণ সদাই সশঙ্কিত। তাহারা যেন প্রতিমূহুর্ত্তে তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে; এমন সময়

উপরে একটা আলো দেখিতে পাইলেন; দোকানের সাইন-বোর্ডে যেমন এক খানা হাত আঁকা থাকে, সেই আলোকের মধ্যে ঠিক সেইরূপ এক খানা হাত আঁকা দেখিলেন; হাতের তর্জ্জনী একটা দিক দেখাইয়া দিতেছে। তর্জ্জনীর নির্দ্দেশ অনুসারে গোস্বামী মহাশয় চলিতে লাগিলেন মাথার উপর দিয়া জ্যোতির্ম্ময় হাত খানা যাইতে লাগিল। ক্রমে তিনি এই ভীষণ অরণ্য, কত তরঙ্গায়িত নদ, নদী, গ্রাম, নগর, পাহাড়, পর্ব্বত পার হইয়া গেলেন; অবশেষে একটা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে একটা মন্দির, সম্মুখে মহাবীরের প্রতিমূর্ত্তি, এই মহাবীর তাঁহাকে হাত নাড়িয়া ইসারা করিয়া একটা স্থান দেখাইয়া দিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে গোস্বামী মহাশয় তাহার জনৈক বন্ধু এক ব্রহ্মচারীর সহিত গয়াতে গিয়া ঠিক এই স্বপ্ন দৃষ্ট স্থান দেখিতে পাইলেন। সেই মন্দির সেই মহাবীরের প্রতিমূর্ত্তি; একদিন আকাশ-গঙ্গা-পাহড়াস্থ রঘুবরদাস বাবাজীর আশ্রমে গোস্বামী মহাশয় আপন বন্ধু ঐ ব্রহ্মচারী ও বাবাজী মহাশয়ের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময় রাখাল বালকেরা আসিয়া খবর দিল, উপর পাহাড়ে এক সাধু আসিয়াছেন। সাধুর সেবার জন্য গোস্বামী মহাশয় কিছু আহার্য্য সঙ্গে লইয়া বাবাজী মহাশয় ও ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত উপর পাহাড়ে গিয়া সাধুকে

মহাশয় আপন আপন কার্য্যে স্থানান্তরে চলিয়া গেলে গোস্বামী মহাশয় একাকী আশ্রমে থাকিলেন।

আশ্রমে একাকী থাকিতে বিরক্তি বোধ হওয়ায় গোস্বামী মহাশয় কিছু গাঁজা সঙ্গে লইয়া উপর পাহাড়ে সাধুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন; সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন;—

সাধু—তোম্ কোন্ হ্যায়, ক্যা কাম্ করতা হ্যায়?

গোঁসাই—আমি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক। আমি দেশে দেশে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকি।

সাধু—ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম? ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হাম জান্তে হ্যায়। কলিকাতা মে ব্রাহ্ম-সমাজ হ্যায়। রাজা রামমোহনরায়, একঠো বড়া আদমী থা; আগাড়ী ওহি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম স্থাপন কিয়া, ওলোক বেলাত গিয়া। কেশববাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কো হাম্ পছান্তা হ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সকল কথা বলিয়া সাধু ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিবৃত্ত বলিতে লাগিলেন; ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত বলা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল গোস্বামী মহাশয়কে অভিভূত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যতই ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিবৃত্ত বিবৃত করিতে লাগিলেন, ততই গোস্বামী মহাশয়ের দেহ অবশ হইতে লাগিল; যখন গোস্বামী

সাধ্য থাকিল না, তখন ঐ সাধু গোস্বামী মহাশয়কে বলপূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া আপন কোলে স্থাপন করত বলিলেন ;—

সাধু—হাম্ আজ তোম্‌কো এক চিজ্ দেগা।

গোঁসাই (অস্পষ্ট স্বরে কথা বলিবার সাধ্য নাই ; কণ্ঠ-নালী অবশ) তুমি কি দিবে ?

সাধু—তোমকো হাম ভগবানকো নাম দেগা।

এই বলিয়া ঐ সাধু গোস্বামী মহাশয়ের কর্ণে মহামন্ত্র প্রদান করিলেন। গোস্বামী মহাশয় ক্ষণকাল মধ্যে সুস্থ হইয়া সাধুকে প্রণাম করিয়া জ্ঞানশূন্য হইলেন। তিন ঘণ্টা পরে চেতন হইলে, দেখিলেন আকাশ-গঙ্গা-পাহাড়ের উপর তিনি একাকী পড়িয়া রহিয়াছেন, সে স্থানে কেহ নাই। আকাশ-গঙ্গা-পাহাড়ে অনেকক্ষণ সাধুকে অন্বেষণ করিলেন ; কিন্তু কোথাও তাঁহার দর্শন না পাওয়ায় নীচে আসিয়া বাবাজী মহাশয় প্রভৃতিকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন ; তাঁহারা সকলে পাহাড়ে উঠিয়া চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও সাধুর দর্শন না পাওয়ায় আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

এইরূপে ১২৯০ সালের আষাঢ় মাহায় আকাশ-গঙ্গা-পাহাড়ে অলৌকিকভাবে গোস্বামী মহাশয়ের দীক্ষা-কার্য্য

একদিন একটা লোক দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় মনে করিলেন এই লোকটীকে যেন তিনি কোথাও দেখিয়াছেন, কিন্তু ঠিক করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে তাঁহার মনে হইল তিনি যেন সেই আকাশ-গঙ্গা-পাহাড়ের সাধু। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন ;—

গোঁসাই—আপনাকে চেনো চেনো করিতেছি. আপনি কি আমাকে আকাশ-গঙ্গা-পাহাড়ে দীক্ষা দিয়াছিলেন ?

লোকটী—হাঁ, আমিই দীক্ষা দিয়াছিলাম।

গোঁসাই—আপনি অমন করিয়া আমাকে কেন দীক্ষা দিয়াছিলেন ? দীক্ষা দিয়া আর দেখা দিলেন না ? কোন কথা বলিলেন না ?

লোকটী—তুমি যে ছেলে ? তোমাকে কি কিছু বলতে আছে ? তোমাকে কোন কথা বলিলে তুমি কি তাহা শুনিবে ? না বিশ্বাস করিবে ? এখন কেমন ? হিন্দু শাস্ত্রে কি বিশ্বাস হইয়াছে ?

গোঁসাই—আজ্ঞে হাঁ, অনেকটা হইয়াছে।

লোকটী—প্রেম-সাগর ও হঠযোগ-দীপিকা পাঠ করিবে।

গোঁসাই—কোথায় পাইব ?

লোকটী—বাজারে পাইবে। ।৶০ ছয় আনার বেশী মূল্য

গোস্বামী মহাশয় ঐ দুইখানি পুস্তক খরিদ করিয়া আনিয়া পাঠ করিয়া দেখিলেন, তাহাতে যে সকল ব্যাপার বর্ণিত আছে তৎসমুদয় তাঁহার জীবনে লাভ হইয়াছে। এই সময় হইতে গোস্বামী মহাশয় প্রকৃত হিন্দু হইতে লাগিলেন। যদিও গুরু আজ্ঞায় তাঁহাকে আরও কিছুদিন ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সময় হইতেই তাঁহার ব্রাহ্ম-জীবন শেষ হইল।

কথা-প্রসঙ্গে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার জীবনের অনেক স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতেন; সহৃদয় পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ জন্য এখানে একটি স্বপ্নের কথা বলি। একদিন গোস্বামী মহাশয় রাস্তা দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন কতকগুলি বৈষ্ণব মহোৎসব করিতেছেন. গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদের নিকট গিয়া প্রসাদ চাহিলে তাঁহারা তাঁহাকে মহোৎসবের প্রসাদ দিলেন। গোস্বামী মহাশয় প্রসাদ হস্তে লইয়া "জয় মহাপ্রসাদ" বলিয়া আকাশের দিকে উঠিতে লাগিলেন। উপরে উঠিয়া নিম্নে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কত নদ. নদী, পাহাড়, পর্ব্বত, সাগর, অরণ্য, গ্রাম, নগর ইত্যাদি দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন. লোক-লোকান্তরে গেলেন, অবশেষে গোলকে গিয়া উপস্থিত হইলেন; তথায় দেখিলেন অপূর্ব্ব শোভান্বিত গৃহে সিংহাসনোপরি রাধাকৃষ্ণ বিরাজিত। যেমন বাঁশী দর্শন

হয়, সেইরূপ দর্শন হইতে লাগিল; রাধাকৃষ্ণ এক একবার মিশিয়া এক হইতেছেন, আবার পৃথক্ হইয়া দুই দুই হইতেছেন। এইরূপ দর্শন করিয়া প্রণাম করতঃ তিনি নিম্নে নামিতে লাগিলেন। লোক-লোকান্তর হইতে কত দেবতা ও মনুষ্য আসিয়া তাঁহার নিকট আগ্রহ সহকারে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন; তিনি তাঁহাদিগকে কিছু কিছু দিয়া নামিতে লাগিলেন। নামিবার কালীন পৃথিবীর সেইরূপ শোভা দেখিতে পাইলেন; অবশেষে দিল্লীর নিকট একটা স্থানে অবতরণ করিলেন।

গোস্বামী মহাশয় এইরূপে অবতরণ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন; প্রসাদ বিতরণের জন্য কত লোককে ডাকিলেন, কিন্তু কেহই প্রসাদ লইতে অগ্রসর হইল না। অবশেষে পাণ্ডুয়া ষ্টেশনের নিকট একটা স্থানে কেবলমাত্র একটী লোক মহাপ্রসাদ লইল। ইহার পর গোস্বামী মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

এই স্বপ্ন বৃত্তান্তে মহাপ্রসাদের মহিমা আর দেশের লোকের দুরবস্থা উভয়ই প্রদর্শিত হইয়াছে; মহাপ্রসাদের অপার মহিমা হইলেও দেশের লোক তাহা চাহে না। দেশের লোকের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে অবস্থানকালীন গোস্বামী মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া তাঁহার অলৌকিক

জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী শুনিতাম। আমি দিবা-রাত্রি তাঁহার কাছে থাকিতাম। আমি প্রতিদিন তাঁহার প্রতি অধিকতররূপে আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। তদপর ছুটি ফুরাইলে তাঁহার নিকট বিদায় হইয়া বোলপুরে ফেরত আসিলাম।

এই সময় হেমেন্দ্রবাবু ও তাঁহার স্ত্রী সুশীলাবালা কলিকাতাতেই থাকিতেন, আমি কিন্তু আর তাঁহাদের বাসায় যাইতাম না। সুশীলাবালার উপর সেই পরলোক-বাসী আত্মার আবির্ভাব লোপ পাইয়াছে। আমি ভাবিতাম Spirit যাহা বলিয়াছিল, তাহার কি হইল? আমার সদ্-গুরু লাভ হইল, জীবনের প্রভূত কল্যাণ হইল,একথা সত্য, কিন্তু তিনি যে বলিয়াছিলেন যোগাভ্যাস কর তাহার কি হইল? যোগাভ্যাসের কথাটা কি প্রলোভন বাক্য?

ক্রমে দেখিলাম Spirit এর কথা মিথ্যা নহে, যোগের প্রত্যেক অঙ্গ আমার মধ্যে এক একটী করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল।

—*—

শান্তিপুরে শ্যামসুন্দর ও নবদ্বীপে মহাপ্রভুদর্শন।

দিনের পর যতই দিন যাইতে লাগিল, সাধনে ততই অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; গুরু-শক্তির প্রভাবে ক্রমশঃ ভগবত উপাসনা এত মধুর লাগিতে লাগিল, যে একাকী অমৃত আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিলাম না; মনে হইতে লাগিল পৃথিবীর সমস্ত লোক যদি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গিয়া শক্তি লাভ করত ভগবত উপাসনায় জীবন যাপন করে, তবেই আমার তৃপ্তি হয়। দারুণ ভব-যন্ত্রণা দূর করিবার ও ভগবত উপাসনায় মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবার অভিপ্রায়ে আমার সম্বন্ধি শ্রীযুক্ত কালিকৃষ্ণ সরকার, রামকৃষ্ণ সরকার ও কন্যা সরোজিনী দাসীকে দীক্ষা দেওয়াইবার অভিলাষে ১৩০১ সনের মাঘ মাহায় আমি সপরিবারে গুরুসন্নিধানে গমন করিলাম। ভক্তি-ভাজন পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও আমার সঙ্গে গুরুদর্শনে চলিলেন। আমি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করিলে, তিনি আমাকে দেখিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিলেন এবং নিকটে

বসাইয়া শারীরিক ও পারিবারিক কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি পারিবারিক সমস্ত কথা গোস্বামী মহাশয়কে জ্ঞাপন করিয়া বলিলাম ;—

আমি—এখন আমার শারিরীক অবস্থা মন্দ নহে ; কিন্তু সময়ে সময়ে বিশেষ উপাসনায় আমি শান্তি নিকেতনে গিয়া থাকি। শান্তিনিকেতনে গেলেই আমার জ্বর ভাব হয়। শান্তিনিকেতনে কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর স্থান, অসুখের কোন কারণ নাই, কিন্তু আমার ঐ স্থান সহ্য হইতেছে না।

গোঁসাই—সেখানে কিছু খাও নাকি ?

আমি—প্রাতঃকালে চেয়ারে বসিয়া টেবিলে একটু চা খাই।

গোসাই—ছি, ছি, ছি, উচ্ছিষ্ট খাওয়া তোমাদের নিষেধ, টেবিলে চা খাও এ কেমন কথা ?

আমি—চায়ের পেয়ালা ঠেকাঠেকি হয় না, পরের উচ্ছিষ্ট চা, বা কোন জিনিষ খাই না।

গোঁসাই—উচ্ছিষ্ট আর কাহাকে বলে ? ঠাকুর বাবুদের টেবিল উচ্ছিষ্ট, চেয়ার উচ্ছিষ্ট, উহাদের বিছানা পত্র আসবাব সমস্তই উচ্ছিষ্ট। উচ্ছিষ্ট চেয়ারে বসিয়া উচ্ছিষ্ট টেবিলে চা খাইলে উচ্ছিষ্ট খাওয়া হইল না ? এই উচ্ছিষ্ট খাওয়াতেই তোমার জ্বর হয়।

আমি—পৃথিবীশুদ্ধ লোক ত উচ্ছিষ্ট খাইতেছে, আমিও ত কখন উচ্ছিষ্টের বাচ বিচার করিয়া চলি নাই; উচ্ছিষ্ট খাওয়ার দরুণ কাহারও ত কখন জ্বর হইতে দেখি নাই বা শুনি নাই। উচ্ছিষ্ট খাইলে জ্বর হয় এ আবার কেমন কথা?

গোঁসাই—সাধন পাইয়াছ, এখন আর উচ্ছিষ্ট খাওয়া সহ্য হইবে না, ভগবানের নামে গুরুশক্তির বলে প্রতিনিয়ত তোমাদের দেহের রক্ত ও দেহের প্রত্যেক পরমাণু বিশুদ্ধ হইতেছে; তোমাদের দেহের বিশুদ্ধ রক্তের সহিত অপবিত্র আহার জনিত দূষিত রক্ত আর মিশিবে না। উচ্ছিষ্ট আহার করিবা মাত্র বমি হইয়া যাইবে, অথবা পেটের পীড়া উপস্থিত হইবে। যদি তাহা না হইয়া পরিপাক হইয়া আহার্য্য বস্তু রক্তে পরিণত হয় তাহা হইলে জ্বর হইবে। যতদিন এই অপবিত্র রক্ত জ্বর দ্বারায় বিশুদ্ধ হইয়া না যাইবে, তত দিন শরীর সুস্থ হইবে না।

আমি—গুরু-ভাইগণের মধ্যে কেহ কেহ উচ্ছিষ্টের বিচার করিয়া চলেন না; কেহ কেহ মাংস পর্য্যন্ত আহার করিয়া থাকেন; তাঁহাদের ত কোন অনিষ্ট হইতে দেখি না।

গোঁসাই—গুরুশক্তি বলে যাহাদের শরীরের রক্ত বিশুদ্ধ

> হয় নাই, তাহাদের উচ্ছিষ্ট আহার সহ্য পায়, কিন্তু তাহাতে গুরু-শক্তি ম্লান হইয়া যায় গুরু-শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইতে পায় না। প্রাণে শুষ্কতা আইসে। কাহার কাহার খুব অনিষ্ট হয়, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। আমি এই জন্য পরিবারবর্গকে সর্ব্বদাই সাবধান করিতাম, তথাপি অভ্যাস দোষে তাঁহারা সময়ে সময়ে আমাকে উচ্ছিষ্ট খাওয়াইতেন ; উচ্ছিষ্ট উদরস্থ হইবামাত্র আমার বমি হইত ও মুখ দিয়া রক্ত উঠিত ; আমি ইহার জন্য পরিবার-বর্গকে সময় সময় বড়ই তিরস্কার করিতাম।

গোস্বামী মহাশয়ের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া অবধি আর আমি শান্তি-নিকেতনের কোন বস্তু আহার করিতাম না। তথায় খুব সাবধানে থাকিতাম। তথায় গেলে পূর্ব্বে যেরূপ শরীরে জ্বরভাব হইত এখন হইতে আর সেরূপ জ্বরভাব হইত না।

শান্তি-নিকেতনের আশ্রমধারী অঘোরবাবু বন্ধুলোক, তাঁহার সহিত সদালাপ ও ব্রহ্মোপাসনার জন্য শান্তিনিকে-তনে যাইতাম। ক্রমে দেখিতে পাইলাম ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা প্রণালীতে উপাসনা করিয়া কোন ফল পাই না ; জীবনেরও কোন উন্নতি হয় না। একমাত্র ইষ্টমন্ত্র জপে যথেষ্ট উপকার পাই, জীবনের যাত্রা কিছু পরিবর্ত্তন ও

উন্নতি একমাত্র ইষ্টমন্ত্র জপেই হইতেছে। এই সব দেখিয়া ব্রাহ্ম-সমাজেরউপাসনাপ্রণালী মতে উপাসনা করিয়া সময় ক্ষেপণ করা অপেক্ষা ইষ্টমন্ত্র জপ করাই কর্ত্তব্য ভাবিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা একেবারে পরিত্যাগ করিলাম। সুতরাং আমার শান্তি-নিকেতনে যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল।

কিছু দিন পরে আমি একবার শিউড়ী গিয়াছিলাম; তথাকার জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রগতি মুস্তফী আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন; তিনি আগ্রহ করিয়া তাঁহার বাসায় আহার করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। মুস্তফী মহাশয় ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, তখন তিনি স্বপাক আহার করিতেন। আমি তাঁহার বাসায় আহার করিতে সম্মত হইলাম।

আমি নিরামিষ আহার করি, আমার আহারের নিয়ম মুস্তফী মহাশয় সবিশেষ জানিতেন, তিনি আপন স্ত্রী ও পাচিকা বামুনঠাকুরাণীকে খুব সাবধান করিয়া দিলেন। খাবার প্রস্তুত হইলে আমি আহারে বসিলাম। বামুন-ঠাকুরুণের কীর্ত্তি দেখিলাম। আমি নিরামিষ আহার করিয়া থাকি,সেই জন্য মাছের তরকারী হইতে মাছ বাছিয়া রাখিয়া আমাকে তরকারী দিয়াছেন। মাছ ভাজার কড়াইয়ে আলু, পটোল, ভাজিয়া আমাকে খাইতে দিয়াছেন; আলু পটোলের মধ্যে মাছের কাঁটা আছে। ২।৪ গ্রাস ভাত

মুখে দিবার পর আমি বামুন ঠাকুরুণের এই সব কীর্ত্তি টের পাইলাম। কম্প দিয়া আমার দারুণ জ্বর আসিল। আমি উঠিয়া তাড়াতাড়ি আঁচাইয়া শুইয়া পড়িলাম। দু'খানা লেপেও কম্প নিবারণ হয় না। কি হইল, কি হইল বলিয়া মুস্তফী মহাশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন. আমি বলিলাম জ্বর হইয়াছে; কোন চিন্তা নাই। বেলা ১০ টার সময় শীত করিয়া জ্বর আসিয়াছিল, রাত্রি ১১ টার সময় শীত নিবারণ হইল। শেষ রাত্রে জ্বরগায়ে বোলপুর আসিয়া স্নান্ আহার করিয়া সুস্থ হইলাম। বামুন ঠাকুরুণের আচার আচরণ দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইল, নিশ্চয়ই তিনি আমাকে উচ্ছিষ্ট আহার করাইয়াছেন।

বোলপুরে একটা Christian Mission আছে। এই বৎসর মহাত্মা যীশুর জন্মদিনে যীশুর কথা মনে হওয়ায় প্রাণটা কেমন করিতে লাগিল। আমি চার্চ্চে চলিয়া গেলাম, মহাত্মা যীশুখৃষ্টের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে চাহিলে পাদরীসাহেব বলিলেন, "আমাদের প্রতিমূর্ত্তি রাখিবার নিয়ম নাই, যাহা হউক আমার নিকট একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে, আপনাকে আনিয়া দেখাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি একখানি চিত্র আনিয়া আমার হাতে দিলেন, পট খানিতে মহাত্মা যীশুর cuusifiction (ক্রুশাবদ্ধ) অঙ্কিত হইয়াছে। একে ভাবে মন গর গর হইয়া আছে তাহাতে

থামাইতে পারি না; পাদরীসাহেব ও উপস্থিত উপাসক মণ্ডলীর হৃদয় দ্রবীভূত হইল, তাঁহাদের মধ্যে এই ভাবের স্রোত ছড়াইয়া পড়িল তাহারা অতিসরল ভাবে উপাসনা ও গান করিলেন।

উপাসনা শেষ হইলে একটী খৃষ্টান মহিলা কিছু Christmas cake (বড় দিনের পিটে) ও কিছু ফল আনিয়া আমাকে খাওয়াইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি খাইতে অস্বীকৃত হইলাম, অবশেষে তাঁহার বিশেষ অনুরোধ এড়াইতে না পাড়িয়া নিজে ইন্দারা হইতে জল তুলিয়া আনিয়া একটা কমলালেবু ধৌত করিয়া অর্দ্ধেক অংশ খাইয়া তাঁহাদের প্রীতিসম্পাদন পূর্ব্বক বাসায় ফিরিলাম।

বাসায় আসিবার কিছু পরেই আমার ভয়ানক বমি হইতে লাগিল, প্রাণ আর বাঁচে না। পুনঃ পুনঃ বমি হইতে থাকায় পণ্ডিত মহাশয় বমির কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বমির কোন কারণ বিদ্যমান নাই, অবশেষে Christian Mission houseএ কমলালেবু খাওয়ার কথা বলিলাম। পণ্ডিত মহাশয় এই কমলালেবু খাওয়ার কথা শুনিয়া আমাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিলেন; এবং ঠাকুরের চরণামৃত ও মহাপ্রসাদের কণিকা আমাকে খাওয়াইয়া দিলেন। আমি বুঝিলাম এই কমলালেবু খাওয়াই এই বমির কারণ।

উচ্ছিষ্ট বা অপবিত্র আহার করিলে শরীরে সহ্য হইবে না, গুরুশক্তিও ম্লান হইয়া যাইবে, একথা আমি পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতাম না, কারণ চিন্তা-বিচারে এসব কথা বুঝিবার উপায় নাই দীক্ষার পর উচ্ছিষ্ট ভোজনে ক্রমাগত পাঁচ বৎসরকাল উপর্য্যুপরি জ্বরগ্রস্ত হওয়ায় গোস্বামী মহাশয়ের কথায় আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। আমি আহারাদি সম্বন্ধে খুব সাবধান হইলাম। নিমন্ত্রণ খাওয়া বা পরের বাড়ীতে খাওয়া একেবারে পরিত্যাগ করিলাম। সদাচার-বিশিষ্ট বিশেষ আত্মীয় লোক ব্যতীত কাহারও বাড়ীতে আহার করিতে আমার সাহস হয় না।

যদি কোন গতিকে আমার উচ্ছিষ্ট ভোজন হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়, অথবা পেটের পীড়া উপস্থিত হয়, আহার্য্য বস্তু পরিপাক হইয়া রক্তে পরিণত হইলে জ্বর হয়। এই জ্বরের লক্ষণ স্বতন্ত্র ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারি। অন্য কারণে জ্বর হইলে এক প্রকার যন্ত্রণা হয় আর উচ্ছিষ্ট আহার জনিত জ্বর হইলে অন্য প্রকার যন্ত্রণা হয়; ইহা বুঝাইবার নহে।

এই সমস্ত অসুখের ভয়ে, এই অনাচারের দিনে কাহারও বাড়ীতে আহার করিতে সাহস হয় না। এজন্য আমাকে কতলোকে কত কথা বলিয়া থাকেন। লোকেত আমার অবস্থা বুঝে না, মনে করে আমি অহঙ্কারে গোঁড়া-মীর বশবর্ত্তী হইয়া

আহারে আমার শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, একথা বলিবারও নহে, বুঝাইবারও নহে। আমি যে এত কথা লিখিলাম, সাধারণ লোকে যে ইহা বিশ্বাস করিতে পারিবে তাহা বোধ হয় না। কেবল সত্যের অনুরোধে লিখিলাম।

গোস্বামী মহাশয় শ্যামবাজারের বাটীতে আমাকে ভক্তি-শাস্ত্র পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন, আমি সেই অবধি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গোস্বামী-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া আসিতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও যে কুলীন-গ্রাম* গিয়াছিলেন এ কথা কোন গ্রন্থে উল্লেখ নাই, অথচ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যের এই রূপ বর্ণনা আছে যথা—

"কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ।
যদুনাথ, পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ॥
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামিজন।
সবেই চৈতন্যপ্রিয় চৈতন্য প্রাণধন॥
প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্য জন বহু দূর॥
কুলীনগ্রামির ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম, সেহো কৃষ্ণ গায়॥"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এই পাঠ দেখিয়া আমার মনে বড়ই একটা খট্‌কা বাধিল। যে ব্যক্তি কখনও কুলীনগ্রাম

গেল না, কুলীনগ্রামের লোকের চরিত্র দেখিল না, তাহাদের সঙ্গ করিল না, সে ব্যক্তি কেমন করিয়া কুলীনগ্রাম সম্বন্ধে এত উচ্চ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। এই খট্‌কা নিবারণ জন্য আমি একদিন গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম।

আমি—মহাশয়! শ্রীমন্মহাপ্রভু কি কখনও কুলীনগ্রাম গিয়াছিলেন?

গোঁসাই—হাঁ তিনি গিয়াছিলেন।

আমি—কখন গিয়াছিলেন?

গোঁসাই—সন্ন্যাস গ্রহণের পর রাঢ় দেশ ভ্রমণ কালীন।

আমি—কোন গ্রন্থেত ইহার উল্লেখ দেখিনা?

গোঁসাই—সব কথা গ্রন্থে থাকে না।

এ সম্বন্ধে আর কোন কথা গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা উচিত মনে করিলাম না। গুরু বলিলেন, আমি শুনিলাম। বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিছুই হইল না।

যদিও এখন আমার জীবনের অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তথাপি এখনও আমি মূর্ত্তি পূজার ঘোর বিরোধী শ্রীবিগ্রহই গুলিকে ইট্-কাট্ পাথর বই আর কিছু বলিতাম না। গোস্বামী মহাশয়ের কুলদেবতা শ্যামসুন্দরের অঙ্গহানি হওয়ায় পূজা বন্ধ ছিল; এই সময় গোস্বামী মহাশয় তাঁহার জ্ঞাতিগণের অনুরোধে শ্যামসুন্দরের এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া শান্তিপুরে পাঠাইয়া দেন। এক

খানা প্রস্তর ভাস্কর দ্বারায় খোদিত হইয়া ভগবান্ হইয়া গেল একথা আমার মনে স্থান পায় না। গোস্বামী মহাশয় পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতেছেন মনে করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

আমি—মহাশয়! আপনি নাকি শ্যামসুন্দরের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন ?

গোঁসাই—আমাদের কুলদেবতা শ্যামসুন্দরের অঙ্গহানি হওয়ায় পূজাবন্ধ ছিল, জ্ঞাতিগণের অনুরোধে শ্যামসুন্দরের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান হইয়াছে।

আমি—কি প্রকারে প্রতিষ্ঠা করিলেন্ ?

গোঁসাই—প্রতিষ্ঠা আর কি হইবে? ভাস্কর শ্যামসুন্দরের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া আনিয়া যেমন কাছে দিল, অমনি শ্যামসুন্দর হাসিয়া উঠিলেন। ইঁহার আবার প্রতিষ্ঠা কি? আমি জ্ঞাতিগণকে বলিলাম এই শ্যামসুন্দরকে সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করগে।

আমি—অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে ভাস্করের নিকট যে প্রস্তরখণ্ড ছিল, তাহা আবার ভগবান্ হইয়া গেল, ইহা কি প্রকারে সম্ভবে ?

গোঁসাই—ভগবান্ সর্ব্বত্র, সর্ব্বকাল, সর্ব্বভূতে বিরাজমান, এক স্থানে ক্রমাগত ভক্তি করিতে

থাকিলে ভক্তিবলে তিনি সেইস্থানে প্রকাশিত হন। এই প্রকারে বিগ্রহ মূর্ত্তিতে ভগবত্তা সংস্থাপিত হয়।

আমি—শ্যামসুন্দর আপনার নিকট আসিবামাত্রই ত হাসিয়া উঠিলেন?

গোঁসাই—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় না হইতে পারে এমন কি আছে?

আমি—ভগবানত সর্ব্বভূতে বিরাজমান, যদি কেহ একটা বৃক্ষকে ভগবান বোধে ভক্তি করে তবে কি তাহাতে তাহার ভগবৎ প্রাপ্তি হইবে?

গোঁসাই—হয়, তাহার ভগবত প্রাপ্তি হইবে; ভগবান প্রথমত বৃক্ষরূপে তাহার নিকট প্রকাশিত হইবেন; পশ্চাৎ নিজের প্রকৃত বিগ্রহ তাঁহাকে দেখাইবেন।

এই সব কথোপকথনের পর গোস্বামী মহাশয় বলিতে-লাগিলেন "হরিদাস এক জায়গায় প্রাণ ঢালিতে পারিলেই হইল। প্রাণেরই দরকার; একটা ঘটনা বলি শুন" এই বলিয়া বলিতে লাগিলেন। "কলিকাতা তালতলার এক বাটীতে এক মুসলমান যুবক বাস করিত। ঐ বাটীর অপর পার্শ্বে রাস্তা পার এক বাটীতে জনৈক খ্রীষ্টান বাস করিত। ঐ খৃষ্টানের এক যুবতী কন্যা ছিল। যুবক

থাকিত, দালানের জানালা দিয়া, কখনও ছাদে উঠিয়া ঐ যুবতীকে দেখিত। ক্রমে এই ব্যাপারটা প্রকাশ হওয়ায় যুবতীর পিতা আপন দালানের জানালা ও ছাদে উঠিবার সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিল। যুবক এই যুবতীকে দেখিতে না পাইয়া খৃষ্টানের বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ঐ যুবতীকে দেখিত। তাহাকে এরূপ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করাতেও যুবক শুনিত না। অবশেষে খৃষ্টানের বাটীর চাকরেরা মণিবের হুকুম মত তাহাকে প্রহার জুড়িল। যুবক মার খাইয়াও বেহায়ার মত দ্বার-দেশে উপস্থিত হইয়া যেমন উঁকি মারিত অমনি চাকরেরা দৌড়িয়া আসিয়া যুবককে ধরিয়া, বেদম প্রহার করিত। যদি কোন দিন ঐ খৃষ্টান আপন কন্যা সহ ঘোড়ার গাড়িতে কোথায়ও যাইতেন যুবক অমনি ছুটিয়া আসিয়া গাড়ির দরজার নিকট উপস্থিত হইয়া যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। আর চাকরেরা তাহাকে বেদম প্রহার করিত। যুবকের লজ্জা-শরম নাই,জীবনের প্রতি দৃষ্টিও নাই। সে সময় সময় এত আঘাত প্রাপ্ত হইত যে, তাহাকে শয্যা-শায়ী হইয়া থাকিতে হইত। অবশেষে যুবক এই যুবতীলাভে বঞ্চিত হইয়া ঐ তালতলার এক ফকিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল।

যুবক—আমার প্রাণ যায়, আপনি আমাকে রক্ষা করুন

যুবক—আমার বাটীর পার্শ্বে এক খৃষ্টান যুবতী আছেন, আপনি তাঁহাকে মিলাইয়া দিউন। ঐ যুবতীকে না পাইলে আমি বাঁচিব না।

ফকির—ইহার আর আশ্চর্য্য কি? আমি সেই যুবতীকে মিলাইয়া দিব। তোমাকে একটা কাজ করিতে হইবে।

যুবক—আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন আমি তাহাই করিব।

ফকির—তোমাকে এক খানা কম্বল মুড়ী দিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করত তিন দিন তিন রাত্রি একাগ্রচিত্তে ঐ যুবতীকে ধ্যান করিতে হইবে। অন্য কোন চিন্তা করিতে পারিবে না।

যুবক—ইহা আমার পক্ষে বেশী কি? আমি ঐ চিন্তাতেই দিবা-নিশি কাল যাপন করিতেছি।

এই বলিয়া যুবক ফকিরকে সেলাম করিয়া উঠিয়া গেল এবং ঐ তালতলার পথ পার্শ্বস্থ একটা অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নে কম্বল মুড়ী দিয়া অনাহারে পড়িয়া রহিল। এই ব্যাপারটা চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তৃতীয় দিনে যুবকের এই অবস্থা দেখিয়া যুবতীর প্রাণ বিগলিত হইল; সে মনে করিল আমার জন্য যখন একটা লোক দণ্ডিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হইয়াও আমাকে ভুলিতে পারিল না, আবার মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়া আমার জন্য অনশনে পড়িয়া রহিয়াছে, তখন আমি উহাকেই বিবাহ করিব। এই মনে

করিয়া যুবতী পিতা মাতার নিকট আপন মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন। পিতা অনেক নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন।

পিতা—যুবক দরিদ্র ও মূর্খ, উহাকে বিবাহ করা উচিত নয়; বিবাহ হইলে তোমাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইবে। যুবক উন্মাদগ্রস্ত উহার বুদ্ধি বিবেচনা নাই।

যুবতী—অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, আমি উহাকে বিবাহ করিব। আমি বিবাহ না করিলে লোকটা মরিয়া যাইবে। যে আমার জন্য মরিতে পারে, তাহাকে কি আমি পরিত্যাগ করিতে পারি?

পিতা—যুবক মুসলমান, তোমরা খৃষ্টান; কেমন করিয়া বিবাহ হইবে?

যুবতী—হয় আমি মুসলমান হইব, না হয় তাহাকে খৃষ্টান করিয়া লইব।

পিতা—তবে তোমার যেমন অভিরুচি সেইরূপ করিতে পার।

যুবতী পিতৃ আজ্ঞা পাইয়া যুবকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল।

যুবতী—তোমাকে আর অনশনে পড়িয়া থাকিতে হইবে না, উঠ, আমি তোমাকে বিবাহ করিব।

যুবক—(যুবতীকে অভিবাদন করিয়া বলিল) আর আমার বিবাহের প্রয়োজন নাই, আমার সাদী হইয়াছে ; তোমার মঙ্গল হউক।

যুবতী—কাহার সহিত তোমার সাদী হইয়াছে ?

যুবক—খোদার সহিত আমার সাদী হইয়াছে, আপনি গৃহে যান।

যুবতী পিতৃগৃহে চলিয়া গেলেন, যুবক এই অবস্থায় আপন গুরু সেই ফকির সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া আপন পরিবর্ত্তনের কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং মাসাবধি গুরু সন্নিধানে অবস্থিতি করিয়া সংসার পরিত্যাগ করতঃ তপস্থার্থ চট্টগ্রামের পাহাড়ে চলিয়া গেলেন এই লোকটী পরম সাধু হইয়াছেন।

এই আখ্যায়িকাটী বলিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "হরিদাস এক জায়গায় প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারিলেই হইল ; প্রাণেরই দরকার।"

২৬ মাঘ তারিখে কালীকৃষ্ণ সরকার, রামকৃষ্ণ সরকার ও সরোজিনী দাসীর দীক্ষা কার্য্য শেষ হইল। গোস্বামী মহাশয় শ্যামসুন্দর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শ্যামসুন্দর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াই হাঁসিয়াছিলেন ; এই শ্যামসুন্দরকে একবার দেখিতে হয় ; এইরূপ মনে করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতি লইয়া দিদিমা ও পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুর রওনা হইলাম।

শিয়ালদহ ষ্টেসনে গিয়া দার্জ্জিলিং মেলে উঠিয়া রাণাঘাটে নামিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ি করিয়া শান্তিপুরে উপস্থিত হইলাম এবং গোস্বামী মহাশয়ের পৈতৃক বাটীতে রাত্রি যাপন করিলাম।

বাটীর উত্তর অংশ গোস্বামী মহাশয়ের দাদার, দক্ষিণ অংশ গোস্বামী মহাশয়ের; মাঝে ৪।৫ হাত উঠান; গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্ম হওয়ায় পাছে তাঁহার মুখ দর্শন করিতে হয় এই আশঙ্কায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উঠানের মাঝামাঝী পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা একটা প্রাচার দিয়া লইয়াছেন। ১ হাত কি দেড় হাত উঠান আছে।

বাটীর দক্ষিণাংশে গোস্বামী মহাশয়ের একটী দোতলা দালান। উপরে একটী হল; নিম্নে দুইটী কুঠারী। সংস্কার অভাবে জীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে; সিঁড়িতে একটা বৃহৎ গর্ত্ত, ঐ গর্ত্তে একটা প্রকাণ্ড বিষধর সর্প বহুকাল হইতে বাস করিতেছে। বাড়ীটা পড়িয়া থাকায় নিম্নের পশ্চিম ধারের কুঠারীতে শ্যামসুন্দরের ভোগ পাক হয়। কুঠারীটা রান্নার ধূমে অন্ধকারময় হইয়া গিয়াছে, ঝুলে পরিপূর্ণ।

প্রাতঃকালে গোস্বামী মহাশয়ের দালানের উপরের হলে উঠিলাম; সেই হল এমনি শক্তিপূর্ণ যে, আমি তথায় স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না; আমাকে যেন ফেলিয়া দেয়; দেহের অভ্যন্তর থরথর করিতে লাগিল।

হল মধ্যে এই শক্তির * ব্যাপার দেখিয়া আমি পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকিলাম ; তিনিও উপরে উঠিয়া বেশ শক্তি অনুভব করিলেন ; কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া আমি নামিয়া আসিলাম।

মধ্যাহ্নে ভোগ প্রস্তুত হইলে শ্যামসুন্দরকে শ্রীমন্দির হইতে বাহির করিয়া ভোগমন্দিরে (সেই কালীপড়া ঝুলপূর্ণ রান্না ঘরে) আনা হইল। মন্দির হইতে শ্যামসুন্দরকে বাহির করায় তাঁহার পরিধেয় পীত বসনের একটু ফুঁপীমাত্র আমার নয়ন গোচর হইল শ্যামসুন্দর নয়নগোচর না হইতেই এই ফুঁপীটুকু দেখিয়াই আমি একেবারে অসামাল হইয়া পড়িলাম। গুরু-শক্তির প্রবল ক্রিয়া আরম্ভ হইল ; ভীষণ প্রাণায়াম উপস্থিত ; সর্ব্বাঙ্গ অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল ; বিবিধ অঙ্গচেষ্টা আরম্ভ হইল ; প্রাণায়ামের গর্জ্জন হইতে লাগিল ; আমি আর আপনাকে সামলাইতে পারিলাম না। গোস্বামী মহাশয়ের জ্ঞাতিগণ স্ত্রী পুরুষ অনেকে সমবেত হইয়া এই ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

---

* যেস্থানে কোন প্রবল শক্তিশালী মহাপুরুষ তপস্যা করেন সেই স্থানে বহুকাল যাবত তাঁহার সেই শক্তি থাকিয়া যায়। যাঁহাদের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়া তপস্যা দ্বারায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন কেবল তাঁহারাই এই শক্তি অনুভব করিতে পারেন। অপরে এই শক্তি অনুভব করিতে পারে না।

ইতিমধ্যে শ্যামসুন্দর আসিয়া ভোগে বসিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রাণের মধ্যে অমৃতের প্রবাহ বহিতে লাগিল। শরীর ও প্রাণের মধ্যে যে সমস্ত ক্রিয়া হইতে লাগিল তাহাতে আমার কোন কৃতিত্ব নাই। আমি কেবল দ্রষ্টা স্বরূপে দেখিতে ও প্রাণের মধ্যে ভোগ করিতে লাগিলাম। শ্যামসুন্দর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি * ইহাতে

---

* ব্রহ্মবাদ সোজা কথা, মানুষ বুঝিবার চেষ্টা করিলে, বেশ বুঝিতে পারে ; পরমাত্মতত্ত্ব বা যোগতত্ত্ব ইহা অপেক্ষা অনেকটা কঠিন ; ইহা সহজে বোধগম্য হইবার নহে। আবার অবতারবাদ ও লীলাতত্ত্ব আরও কঠিন। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর মানব ও ইতর জন্তুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীতে আসিয়া নানা কার্য্য করিয়া যান, একথা মানুষকে কি কেহ বুঝাইতে পারে ? তপস্যার দ্বারায় অবতারতত্ত্ব ও লীলাতত্ত্ব অন্তরে প্রকাশিত না হইলে, ইহা কেহই বুঝিতে পারে না। আবার বিগ্রহতত্ত্ব সর্ব্বোপরি দুর্ব্বোধ্য। প্রগাঢ় প্রেমভক্তি লাভ না হইলে এই বিগ্রহতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। পুরীতে গোস্বামী মহাশয়ের ২টী শ্রীবিগ্রহ ছিল। একটী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি অপরটী শ্রীজগন্নাথমূর্ত্তি। গোস্বামী মহাশয় প্রত্যহ এই দুই বিগ্রহের পূজা করিতেন। এই দুই বিগ্রহ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত কথা কহিতেন। গোস্বামী মহাশয় বলিতেন "যে বিগ্রহ আমার সহিত কথা কহে না আমি তাঁহার মস্তকে তুলসী দিই না।" গ্রন্থকার নিজেও বিগ্রহ মূর্ত্তির অনেক কাণ্ড কারখানা দেখিয়াছেন। এই অবিশ্বাসের যুগে সে

যে ভগবত্তা সংস্থাপিত হইয়াছে তাহাও আমি বিশ্বাস করিতাম না। ইহাত একখণ্ড প্রস্তর মাত্র ইহাই আমার ধারণা ছিল ; তথাপি এই মূর্ত্তি দর্শন দূরে থাকুক অঙ্গের বস্ত্রের একটু ফুঁপী দেখিয়া আমার এই অবস্থা হইল।

আমরা ৩ দিন গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিলাম; প্রত্যহ শ্যামসুন্দরের প্রসাদ পাইতাম। শান্তিপুরে আর আর গোস্বামিগণের বাটীতে যে সব বিগ্রহ সেবা আছে তাহা দর্শন করিতে লাগিলাম। পণ্ডিত মহাশয় যেখানে যান সেইখানেই ভাবাবেশে নৃত্য করিতে থাকেন ও আছাড় খাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তিনি ভাবাবেশে শরীর ধারণে অসমর্থ, পথে চলিয়া যাইতে আছাড় খান ও ধূলায় ধূষরিত হন। ভাবের বিরাম নাই; আমি নিকটে থাকিয়া সতর্ক ভাবে তাঁহার দেহ রক্ষা করি ও ধরিয়া আস্তে আস্তে গোস্বামী মহাশয়ের বাটীতে লইয়া আসি।

সব কথা প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য মনে হওয়ায় তৎসম্বন্ধে কোন কথা লিখিত হইল না। যাঁহারা বলেন, নিম্ন অধিকারীর জন্য মূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে তাঁহারা বিগ্রহতত্ত্ব বুঝেন না। তাঁহারা প্রত্যক্ষ ভগবানের পূজা না করিয়া কল্পনা ও বিশ্বাসের পূজা করিয়া থাকেন। ভগবান্ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, অতএব এই বিগ্রহ মধ্যেও আছেন ইহা বিগ্রহতত্ত্ব নহে। বিগ্রহতত্ত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হইলে এই বিগ্রহই ভগবান্ এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে।

শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর স্থান বাবলা, একদিন বাবলা গিয়া তাঁহার তপস্যার স্থান দেখিয়া আসিলাম। পূর্ব্বে এই স্থানেই শান্তিপুর ছিল; ক্রমে গঙ্গাগর্ত্ত হইয়াছে; এক্ষণকার শান্তিপুর অনেক দূরে অবস্থিত। বাবলায় অদ্বৈত প্রভুর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব সেবা করেন।

শান্তিপুরে তিন রাত্রি বাস করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইবার মানসে দিদিমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার কন্যার বাটী উস্থুদপুরে উপস্থিত হইলাম। তথায় রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে পণ্ডিত মহাশয় সহ শ্রীধাম নবদ্বীপ পৌঁছিলাম।

আমরা আর কখনও নবদ্বীপ ধামে যাই নাই। তথায় আমাদের সহিত কাহারও আলাপ নাই, আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার জন্য দিদিমা উস্থুদপুরের জামাইয়ের কোন আত্মীয়কে আমাদের সঙ্গে দিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে ঠাকুর দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। লোকটা কৃষ্ণ বহির্মুখ বৈষ্ণবদ্বেষী তাহার সঙ্গ কুসঙ্গ মনে হওয়ায় আমরা তাহাকে বিদায় দিয়া দুইজনে তিন রাত্রি শ্রীধাম নবদ্বীপে যাপন করিলাম।

আমরা ক্রমে ক্রমে সমস্ত ঠাকুর বৈষ্ণবের আকড়া, ঠাকুর বাড়ী, হাট, বাজার, দোকান পাট সমস্ত পরিদর্শন করিলাম। এখানে ধর্ম্মের একটা স্রোত সর্ব্বদাই প্রবাহিত

হইতেছে। কোথায়ও ভোগ পূজা আরতি ; কোথায়ও সঙ্কীর্ত্তন, কোথায়ও শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ। একটা না একটা আছেই আছে। কাল মাহাত্ম্যে এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে অনেকটা ব্যবসাদারী ঢুকিয়াছে। পয়সা ভিন্ন কথাটী নাই ঠাকুর দেবতা, ভাগবতপাঠ সংকীর্ত্তন ইত্যাদি অর্থোপার্জ্জনের এক একটা উপায় হইয়াছে। নিষ্কিঞ্চন লোক বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে যেরূপ ব্যবসাদারী আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে এখানে ভক্তি রক্ষা করিয়া চলা সুকঠিন। যেমন একটা ভাব লইয়া কোন ঠাকুর বাড়ী ঢুকিবেন, অমনি দারওয়ান আসিয়া পথ আটক করিবে; পয়সা না দিলে ঢুকিবার হুকুম নাই। এই গোলযোগে প্রাণের ভাবটুকু শুকাইয়া না গিয়া কি থাকিতে পারে? দরওয়ান দিগের উৎপাতে প্রত্যেক ঠাকুর বাড়ীতে আমাদের ভাব ভক্তি শুকাইয়া যাইতে লাগিল, সরল প্রাণে শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রবেশ করিয়াছিলাম, থাকিতে থাকিতে সব শুকাইয়া গেল।

একদিন বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া গঙ্গা দর্শনে যাইতেছি এমন সময় বামদিকে একটা বাড়ীতে শাস্ত্র পাঠ হইতেছে শুনিয়া ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। বোধ হইল ঐ বাড়ীটা কোন বৈষ্ণবের আকড়া, মাটীর ঘর; ঘরের উচ্চ দাওয়ায় একজন বৈষ্ণব এক প্রকাণ্ড হাতের লেখা পুঁথী পাঠ করিতেছেন, নিকটে অনেকগুলি

লোক বসিয়া শ্রবণ করিতেছেন। উঠানের একপার্শ্বে অনেকগুলি স্ত্রীলোক বসিয়া পাঠ শ্রবণ করিতেছেন

আমরা ঐ বাটীতে প্রবেশ করিয়া পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য উঠানে মাধবীতলায় বসিলাম ; সেই সময় যাহা পাঠ হইতেছিল তাহার মর্ম্ম এই "এমন সময় রাঢ় দেশের মধ্যে প্রসিদ্ধ কুলীন গ্রামে মহাপ্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভুর আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া গ্রামস্থ স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে ছুটীলেন ; যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা পুষ্করিণী হইতে জল আনিতেছিলেন তাঁহারা কলসী ফেলিয়া ছুটিলেন, যাঁহারা গৃহকার্য্য করিতেছিলেন তাঁহারা গৃহকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ছুটিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি"—বিপিনে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রজবালাগণ যেমন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া কৃষ্ণ দর্শনে ধাবিত হইয়াছিলেন এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য কুলীন গ্রামবাসিগণ সেইমত উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়াছিলেন গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে। আমি পাঠক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম ;—

আমি—গ্রন্থখানির নাম কি ?

পাঠক—শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

আমি—আমি শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ করিয়াছি তাহাতেত

পাঠক—শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অনেক অংশ লোপ পাইয়াছে; এ অতিপ্রাচীন গ্রন্থ; ছাপার পুঁথিতে সমস্ত নাই।

এদিকে পাঠ শ্রবণে পণ্ডিত মহাশয়ের মহাভাবাবেশ হইল তাঁহার বিবিধ অঙ্গচেষ্টা হইতে লাগিল; সকলে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। পাঠকমহাশয় পাঠ বন্ধ করিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। সমস্ত শ্রোতাগণের দৃষ্টি পণ্ডিত মহাশয়ের উপরে পতিত হইল।

পণ্ডিত মহাশয় একটু প্রকৃতিস্থ হইলে আমাকে ইসারা করিয়া বলিলেন "চল এখানে আর থাকা কর্ত্তব্য নহে" আমি তাহাকে লইয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। আমাদের কেহ পরিচয় জানে না, পরিচয় জানিবার জন্য পিছু পিছু লোক ছুটিল; আমাদিগকে দাঁড়াইবার জন্য ডাক দিয়া বলিল; আমরা ছুঁয়া ধরা দিলাম না, দ্রুতপদে চলিয়া গেলাম। একজন স্ত্রীলোক হাঁক দিয়া বলিল "আমি চিনিয়াছি তোমরা সেই গোঁসাইয়ের শিষ্য।"

শ্রীধাম নবদ্বীপে আমরা তিন দিন বাস করিয়া উস্থদপুর হইয়া শান্তিপুরে চলিয়া আসিলাম। তথায় আর অবস্থিতি না করিয়া দিদিমাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা

আসিলাম। গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে দেখিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

গোঁসাই—শ্যামসুন্দর কেমন দেখিলে ?

আমি—(লজ্জিতভাবে) শ্যামসুন্দরের কথা আর কি বলিব ? তাঁহার বস্ত্রের একটু ফুঁপী দেখিয়াই আমি অসামাল। তাঁহার দয়ার কথা কি বলিবার আছে ? এই পাষণ্ডের উপর এত দয়া।

গোঁসাই—তোমরা শ্যামসুন্দরকে কীর্ত্তন শুনাইয়াছিলে,

আমি—সামান্য ভাবে কেবল করতাল বাজাইয়া।

গোঁসাই—নবদ্বীপে গিয়া মহাপ্রভুর দর্শন করিয়াছিলে ?

আমি—আজ্ঞে হাঁ।

গোঁসাই—নবদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছিলে ?

আমি—এটা আমাদের খেয়াল হয় নাই। আমরা শান্তিপুরে আপনার দালানের উপরের হলে উঠিয়াছিলাম ; ঐ হল এমনি শক্তিপূর্ণ যে, আমরা তথায় স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারি নাই।

গোঁসাই—যে স্থানে কোন প্রবলশক্তিশালী লোক কিছুকাল তপস্যা করেন, সেখানে তাঁহার শক্তি বহুকাল যাবত থাকিয়া যায়। কোন শক্তিশালী লোক তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র

তদপর গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আমাদের শান্তিপুরে ও নবদ্বীপে ভ্রমণের প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। আমি শ্রীবিগ্রহ মানিতাম না ; বিগ্রহগুলিকে ইট কাট পাথর বই আর বলিতাম না। এবার শ্যামসুন্দর যে কেমন পাথর তাহা তিনি দেখাইলেন। ভক্তি দ্বারাই ইট কাট পাথরেও যে ভগবত্ত্বা সংস্থাপিত হয় এখন বিশ্বাস হইল, আর কোন সন্দেহ থাকিল না।

গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু কুলীন গ্রামে গিয়াছিলেন, কোন গ্রন্থে একথা লিখিত না থাকায় আমি গুরুবাক্যে ততটা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই ; মনে করিয়াছিলাম গোস্বামী মহাশয় হয়ত আন্দাজী কথা বলিলেন, না হয় কোথায়ও কাহার নিকট গল্প শুনিয়াছেন। এইবার বাবাজীর আকড়ায় এই সন্দেহ ঘুচিল। বুঝিলাম গোস্বামী মহাশয় ত্রিকালজ্ঞ ; আর তিনি কখনও মিথ্যাকথা বা আন্দাজী কথা বলেন না।

গোস্বামী মহাশয়ের আর্থিক অভাব আমি চিরকালই দেখিয়া আসিতেছি। কখনও তাঁহাকে এক কপর্দ্দক সঞ্চয় করিতে দেখি নাই। স্ত্রী ও শাশুড়ী যদি কখনও কিছু সঞ্চয় করিতেন তিনি সুকৌশলে তাহা বাহির করিয়া লইয়া খরচ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহারা গৃহস্থালার কোন জিনিস খরিদ করিলে অথবা কখনও একখান গহনা

গড়াইলে তাঁহাদের আর তাহা ব্যবহার করিতে হইত না। কোন না কোন উপায়ে গোস্বামী মহাশয় তাহা বিক্রয় করাইয়া ফেলিতেন। অর্থ বা আসবাব লইয়া তাঁহার নিকট থাকিবার যো ছিল না। নিঃসম্বল অবস্থায় সকলকে থাকিতে হইত।

কলিকাতায় থাকিতে দোকানদার খাবার চাউল ডাল ঘি ময়দা আদি যোগাইত, টাকা পয়সা আমদানি হইলে তাহাকে দেওয়া হইত। ইহার কোন হিসাব পত্র থাকিত না, দোকানদার যাহা পাওনা বলিত তাহাই লইত। গোস্বামী মহাশয় টাকা পয়সা বা আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহের কোন সংশ্রবে থাকিতেন না; কেবল আহারের সময় জিজ্ঞাসা করিতেন, সকলের আহার হইয়াছে? গুরু আহারে না বসিলে শিষ্যেরা আহার করিতে বসিবেন না একথা শুনিলে সকলের পারণ হইয়াছে যতক্ষণ না শুনিতেন ততক্ষণ আহারে বসিতেন না।

সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাটীতে থাকার সময়াবধি একজন বামাচারী সাধুকে প্রত্যহই গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিতে দেখিতাম। ইহার নব্য বয়স, পরিধানে গৈরিক বসন, হস্তে নরকপাল, গলায় রুদ্রাক্ষ ও হাড়ের মালা, অঙ্গে ভস্মমাখা নেশায় চক্ষু রক্তবর্ণ, কপালে সিন্দুরের টীপ; হাতে একটা ত্রিশূল।

এই বামাচারী সাধুটী আমাদের সম্পূর্ণ বিপক্ষ;

গঙ্গাজল তুলসী স্পর্শ করিলে তাঁহার ধর্ম্ম যায়, কারণ এই সকল জিনিষ তাঁহার পক্ষে অশুচি। আর মদ্য বা অস্থি স্পর্শ করিলে আমাদের ধর্ম্ম যায়; কারণ এই সকল জিনিষ আমাদের পক্ষে অশুচি। তাঁহার পন্থাও আমাদের পন্থা ঠিক্ বিপরীত। এই লোকটী প্রায় প্রত্যহই গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিতেন। তিনি আসিবামাত্র গোস্বামী মহাশয় মহা সমাদর করিয়া তাঁহাকে পৃথক আসন দেওয়াইতেন; প্রায় ১৲ হিসাবে প্রত্যহ গাঁজা আনাইয়া দিতেন। তিনি নিকটে বসিয়া অনবরত গঞ্জিকা সেবন করিতেন আর মাঝে মাঝে "মা মা" বলিয়া গান করিতেন। গাঁজার ধূমে ঘর অন্ধকারময় হইয়া যাইত, দুর্গন্ধে আমাদের ঘরে থাকা দায় হইত। গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আমাদের কোনরূপ কথাবার্ত্তা হইতে পাইত না। রাত্রি ৭॥০ টার পর গোস্বামী মহাশয় ১৲ টাকার পরিমাণ উৎকৃষ্ট খাবার আনাইয়া তাঁহাকে খাইতে দিতেন। তিনি আহার করিয়া স্বস্থানে চলিয়া যাইতেন। এত অর্থাভাব সত্বেও গোস্বামী মহাশয় কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই প্রত্যহ সমান আদর সমান যত্ন। তাঁহার নিকট সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। সকল সম্প্রদায়ের সাধুকে সমভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তাঁহার ধৈর্য্যের সীমা ছিল না। কাহারও ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর তাঁহাকে কটাক্ষ করিতে কখনও দেখি নাই। গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায়

অনাসক্ত ধৈর্য্যশীল, উদার প্রকৃতির লোক কদাচ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই সময় কলিকাতা নিবাসী শ্রদ্ধেয় কালিকৃষ্ণ ঠাকুরের জনৈক কর্ম্মচারী গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিয়া কোন শিষ্যের দ্বারায় জানাইলেন "কালিকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের ইচ্ছা যে গোস্বামী মহাশয়ের পায়ের ধূলা একবার তাঁহার বাড়ীতে পড়ে" ইহাতে গোস্বামী মহাশয় সেই কর্ম্মচারীকে বলিলেন "আসন ছাড়িয়া কোথাও গেলে আমার শরীর বড়ই অসুস্থ হয় এজন্য আমি আসন ছাড়িয়া কোথায়ও যাই না।" পরদিন ঐ কর্ম্মচারী পুনরায় আশ্রমে আসিয়া গোস্বামী মহাশয়কে জানাইলেন কালিকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন কি? তাহাতে গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেন "আমার এখানে কাহারও আসিবার নিষেধ নাই, যখন যাহার ইচ্ছা হয় তিনিই আসিয়া থাকেন; ঠাকুর মহাশয়ের ইচ্ছা হইলে অনায়াসে আসিতে পারেন।" শ্রদ্ধেয় ঠাকুর মহাশয় পরদিন শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের সহিত কেবলমাত্র একখানি সাদা ধূতি পরিয়া ও চাদর গায়ে দিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিয়া প্রণাম করিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার যথোচিত সম্মান করিয়া বসিবার জন্য এক খানা স্বতন্ত্র আসন দেওয়াইলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার

পর শ্রদ্ধেয় ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করিয়া উঠিলেন এবং মনোরঞ্জন বাবুর দ্বারায় গোস্বামী মহাশয়কে মাসিক ২০০৲ টাকা হিসাবে অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব করিলেন। এই কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় মনোরঞ্জন বাবুকে বলিলেন "ঠাকুর মহাশয় সরল প্রকৃতির লোক, অনেকে সাধু সাজিয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে। ঠাকুর মহাশয়কে বলিবেন আমার ব্যয় কোন রকমে চলিয়া যাইতেছে আমাকে সাহায্য করিবার প্রয়োজন নাই"।

ধনী বা বিষয়ীর সংশ্রবে কোন সাধুরই থাকা কর্ত্তব্য নহে; বিষয়ীর সংশ্রবে অনেক সিদ্ধ পুরুষেরও পতন হইয়াছে এই সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয় এক দিন একটা গল্প বলিয়াছিলেন। গল্পটী এই, মীননাথ একজন সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। এক দিন তিনি প্রিয় শিষ্য গোরক্ষনাথের সহিত যাইতেছেন এমন সময় এক রাজবাটী দেখিতে পাইলেন। মীননাথকে রাজবাটী প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া প্রিয় শিষ্য গোরক্ষনাথ বলিলেন।

গোরক্ষনাথ—প্রভু আপনি কোথায় যাইতেছেন? এ যে রাজবাটী।

মীননাথ—বেস ত, রাজা রাজ্য পালন করিতেছেন, রাজার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া আসি। রাজা ভাল হইলেই প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল।

স্থান, বিষয়ীর সংসর্গ হইতে আমাদের দূরে থাকাই কর্ত্তব্য; নতুবা পতনের যথেষ্ট সম্ভাবনা।

মীননাথ—আমারা সিদ্ধপুরুষ আমাদের কি আর পতন আছে?

গোরক্ষনাথ—তবে প্রভু আপনি যান, আমি চলিলাম।

এই বলিয়া গোরক্ষনাথ চলিয়া গেলেন। মীননাথ রাজবাটী প্রবেশ করিলেন। রাজা সূর্য্যসম তেজস্বী-সন্ন্যাসী দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং সমাদর করিয়া মীননাথকে আসনে বসাইলেন। রাজার আদর যত্নে মীননাথ প্রীত হইয়া রাজ-সন্নিধানে কিছু দিন থাকিয়া রাজকার্য্যের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে লাগিলেন। রাজা আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় এই সন্ন্যাসীর আদেশ মত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। প্রজাপুঞ্জ পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী রাজার ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইল। কিছু দিন পরে রাজা সন্ন্যাসীকে আপন কন্যা ও রাজ্যের কতক অংশ দান করিবার প্রস্তাব করিলেন। মীননাথ মনে করিলেন, তিনি সিদ্ধপুরুষ তাঁহার ঔরসে রাজকন্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে সে নিশ্চয়ই একটা মহাপুরুষ হইবে। মহাপুরুষ রাজা হইলে রাজ্যেরও

পাণিগ্রহণ করায় দোষ কি ? এই ভাবিয়া মীননাথ রাজ-কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মতি প্রদান করায় রাজা কন্যাসহ অর্দ্ধেক রাজত্ব মীননাথকে দান করিলেন।

মীননাথ রাজ্যেশ্বর হইয়া রাজকন্যার সহ পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে রাজকন্যা এক সুকুমার পুত্র প্রসব করিলেন। মীননাথ পুত্ররত্ন লাভ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। সন্তানকে বুকে করিয়া লালন-পালন করিতে লাগিলেন। এদিকে দাম্পত্য-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন।

কিছু দিন এই ভাবে কাটিয়াগেলে গোরক্ষনাথ গুরু-জীর খবর লইবার জন্য রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাজবাটী প্রবেশ করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি রাজবাটীর পার্শ্বস্থ রাস্তায় ঢক্কা বাজাইতে আর গোরক্ষা আসিয়াছে বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কয়েক দিনের পর মীননাথের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল। গোরক্ষনাথের কথা মীননাথের স্মৃতিপথে উদয় হইলে তিনি অমাত্যবর্গ সঙ্গে লইয়া রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া গোরক্ষনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মীননাথ আপন সুখৈশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য গোরক্ষনাথকে অন্দরে লইয়া আসিলেন। মীননাথ গোরক্ষনাথকে আপন মহিষী, রাজ-প্রাসাদ, সাজসজ্জা, অশ্বশালা, হাতীশালা, প্রমোদ-উদ্যান, সেনানিবাস ইত্যাদি তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইলেন। পুত্রকে

কোলে লইয়া গোরক্ষনাথকে বলিলেন এই দেখ আমার সন্তান; যেমন রূপবান তেমনি সুশীল।

মীননাথ গোরক্ষনাথের সেবার জন্য দাস-দাসী নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপন সৌভাগ্য ও সুখৈশ্বর্য্যের কত কথাই বলিতে লাগিলেন। সমস্ত দিনে একবার ও ভগবানের নাম লইলেন না।

গোরক্ষনাথ দেখিলেন, গুরুজী সংসার মোহে এমনি মত্ত হইয়াছেন যে, তাঁহার সাধন, ভজন, শক্তি, সামর্থ্য সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মীননাথ একদিন আপন বালককে স্নান করাইয়া আনিবার জন্য গোরক্ষনাথের সঙ্গে দিলেন। গোরক্ষনাথ কুমারকে সঙ্গে লইয়া স্নানের ঘাটে গেলেন এবং কুমারের পা ধরিয়া এমনি আছাড় মারিলেন যে, বালকের সমস্ত দেহ চুরমার হইয়াগেল; বালক মুহূর্ত্তমধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইলে গোরক্ষনাথ ঐ মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া মীননাথের নিকট উপস্থিত হইলেন। মীননাথ সন্তানের মৃতদেহ দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। রাজবাটীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। মীননাথ গোরক্ষনাথকে তিরস্কার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন. উন্মত্তের ন্যায় ধূলায় পড়িয়া আছাড় পিছাড় করিতে লাগিলেন। গোরক্ষনাথ বেগতিক দেখিয়া মৃত পুত্রটীকে বাঁচাইয়া দিয়া

এই আপনার পুত্র গ্রহণ করুন। মীননাথ পুত্র পাইয়া পরম আনন্দলাভ করিলেন। গুরুর এই অবস্থা দেখিয়া গোরক্ষনাথ গুরুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

গোরক্ষনাথ—প্রভু আপনি কি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছেন? আপনার পূর্ব্বাবস্থা একবার স্মরণ করুন।

মীননাথ—গোরক্ষনাথ, তোমার কথা শুনি নাই, বাস্তবিকই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমি সংসারের মায়া-মোহ ধনৈশ্বর্য্যে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আমার সমস্ত শক্তি ও সাধন ভজন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন আমার উপায় কি বল।

গোরক্ষনাথ—আর এখানে কদাচ থাকিবেন না; অদ্য রাত্রেই রাজ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবেন। আমি এই নগর প্রান্তে বৃক্ষতলে থাকিব, আপনি তথায় আমার সহিত মিলিত হইবেন।

গোরক্ষনাথ—গুরুর সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া নগর প্রান্তে বৃক্ষতলে আসিয়া গুরুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভোর হইতে না হইতে মীননাথ একটা গাঁটরী মাথায় লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। গোরক্ষনাথ গুরুকে দর্শন করিয়া প্রণাম করত জিজ্ঞাসা

গোরক্ষনাথ—আপনার মাথায় ওকি ?

মীননাথ—আমার অনেক মণি-মুক্তা হীরা জহরৎ ছিল সেই সব মোট বান্ধিয়া আনিয়াছি।

গোরক্ষনাথ দেখিলেন গুরু সংসার মোহে এমনি মোহিত যে তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান একেবারেই লোপ পাইয়াছে; তিনি রাজ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন অথচ মণি-মানিক্যগুলি রাখিয়া আসিতে পারেন নাই। তিনি গুরুকে বলিলেন "আমি থাকিতে আপনি কেন মোট বহিয়া যাইবেন ? দিন, আমার মাথায় দিন, আমি মোট বহিয়া যাইতেছি" এই বলিয়া গোরক্ষনাথ গুরুজীর মস্তক হইতে মোটটা নামাইয়া লইয়া নিজের মস্তকে লইলেন। মীননাথ বনপথে রওনা হইলেন; গোরক্ষনাথ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মোট মাথায় করিয়া চলিতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে নানা কথা-বার্ত্তা চলিতে লাগিল। গোরক্ষনাথ যতই যাইতে লাগিলেন এক এক মুঠা রত্নরাজী মোট হইতে বাহির করিয়া গুরুর অলক্ষিতে দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে গাঁটরীর সমস্ত ধনরত্ন ফুরাইলে গাঁটরীর কাঁথা খানা ছুড়ীয়া ফেলিয়া দিলেন। এইরূপে বহুদূর অগ্রসর হইলে মীননাথ পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন গোরক্ষনাথের মস্তকে বোচ্‌কাটা নাই। মীননাথের মাথা ঘুরিয়াগেল। তিনি ভয় বিহ্বল চিত্তে গোরক্ষনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

মীননাথ—আমার গাঁটরিটা কই? তোমার মাথায় ত
দেখিতেছি না?

গোরক্ষনাথ—সমস্ত রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছি।

এই কথা শুনিয়া মীননাথ দুঃখে অভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। গোরক্ষনাথ গুরুর এই অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "প্রভু আপনি কি সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন? এমন কত মণি মাণিক্য আমার প্রস্রাবে উৎপন্ন হয়।" এই বলিয়া গোরক্ষনাথ প্রস্রাব ত্যাগ করিতে লাগিলেন আর বহুমূল্য রত্নরাজী সেই প্রস্রাব হইতে উৎপন্ন হইতে লাগিল, মীননাথ আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন; এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার মোহ দূরীভূত হইল। তিনি প্রিয়শিষ্য গোরক্ষনাথের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "গোরক্ষনাথ আমার ত সর্ব্বনাশ হইয়াছে; এখন আমার উপায় কি হইবে?" গোরক্ষনাথ বলিলেন "এইবার সাবধান হউন, আর কখন বিষয়ীর সংস্রবে যাইবেন না।" তিনি শিষ্য হইয়া আপন গুরু মীননাথকে দীক্ষা দিলেন। মীননাথ পুনরায় সাধন ভজন করিয়া সিদ্ধাবস্থা লাভ করিলেন।

গোস্বামী মহাসয় বলিলেন, সাধুগণের পক্ষে বিষয়ীর সঙ্গ হলাহল বিশেষ। তাঁহাদের নির্জ্জনে তফাতে থাকাই কর্ত্তব্য। আমার এই কলিকাতায় থাকা নিতান্ত

বিষয়, কোন পাহাড় পর্ব্বতের গুহায় বা জঙ্গলে পড়ে থাকাই উচিত। কেবল কয়েকটী লোককে দীক্ষা দিবার জন্য গুরু আজ্ঞায় এই স্থানে রহিয়াছি।

গোস্বামী মহাশয় যে ঘরে এখানে থাকিতেন এই সময় সেই ঘরে অত্যন্ত ছারপোকার উপদ্রব হয় এমন উপদ্রব আমি আর কখনও দেখি নাই। যে কোন সময়ে হউক ঘরের মধ্যে কোন ব্যক্তি বসিবামাত্র মুহূর্ত্ত মধ্যে উপরের কড়ি হইতে হাজার হাজার ছারপোকা পিপড়ের সারিরন্যায় সারিবন্দি হইয়া নামিয়া আসিয়া আগন্তুক ব্যক্তিকে কামড়াইতে আরম্ভ করিত। কাহার সাধ্য মারিয়া শেষ করে! গোস্বামী মহাশয়ের মস্তকে অন্যূন দুই হাজার ছারপোকা থাকিত। জটার আশ্রয় পাইয়া তাহারা এমনি কেল্লা করিয়া বসিয়াছিল যে কাহার সাধ্য তাহাদিগকে মস্তক হইতে অন্তরিত করে? আমাদের এই ঘরে তিষ্ঠান দায়-হইয়া উঠিল। গোস্বামী মহাশয় কিন্তু নিরুদ্বেগ।

ছারপোকা নষ্ট করিবার জন্য নানা লোকে নানা উপায় বিধানের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; কেহ বলে কিটীংস্ পাউডার (Keatings Powder) আন; কেহ বা অন্য উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু গোস্বামী মহাশয় নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ। মুখে কথাটী

আমি—ছারপোকার কামড়ে এখানে কাহারও তিষ্ঠিবার উপায় নাই আপনি কেমন করিয়া নিরুদ্বেগ থাকেন? আপনার মাথায় ও গায়ে হাজার হাজার ছারপোকা।

গোসাই—আমার কোন কষ্ট নাই।

আমি—ইহারা যে আপনার গায়ের সমস্ত রক্ত শোষণ করিয়া ফেলিবে?

গোসাই—ইহারা আমাকে কামড়ায় না।

আমি—ইহারা সকলকে কামড়াইয়া অস্থির করে আর আপনাকে কামড়ায় না কেন?

গোসাই—হিংসাবৃত্তি চলিয়া গেলে কোন জীব মানুষকে হিংসা করে না। মশা ছারপোকাও কামড়ায় না। একটা ঘটনা বলি শুন।

এই কথা বলিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিতে লাগিলেন। ঢাকার হাতীখানার এক সাহেব * শীকার করিবার জন্য গারো পাহাড়ের নিকট এক জঙ্গলে গমন করেন। তথায় এক প্রকাণ্ড বাঘকে মারিবার জন্য গুলী করেন। বাঘের আস্ফালন ও গর্জ্জনে সাহেবের হাতীটা দৌড়িয়া ছুটিয়া পলায়; সাহেব হাতী হইতে পড়িয়া গিয়া প্রাণভয়ে বৃক্ষ তলায় এক সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাঘটা নিকট-বর্ত্তী হইয়া ঘূর্ণিত লোচনে গর্জ্জন করিতে থাকায় সাধু

* মেরী সাহেব।

হাত নাড়িয়া বাঘকে বলিলেন "যাও এখান হইতে চলিয়া যাও"। এই কথা শুনিয়া বাঘটা চলিয়া গেল; ইহা দেখিয়া সাহেব সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সাহেব—এই বাঘটা কি আপনার পোষা ?

সাধু—না, এ বাঘ আমার পোষা নহে; বনের বাঘ বনে থাকে, আমিও এই বনে থাকি।

সাহেব—আপনি এখানে থাকেন, বাঘে আপনায় কোন অনিষ্ট করে না? আপনার কোন ভয় হয় না?

সাধু—ভয় কি? এই জঙ্গলে ব্যাঘ্রাদি নানা হিংস্র জন্তু বাস করে আমিও বাস করি। হিংসা যতক্ষণ আছে ততক্ষণই ইতর জন্তু হইতে ভয়; হিংসাবৃত্তি চলিয়া গেলে কোন জীব মানুষের হিংসা করে না। আপনি কি বাঘ খান?

সাহেব—না, আমি বাঘ খাই না।

সাধু—বনের বাঘ বনে থাকে, এই দূর জঙ্গলে আসিয়া তবে বাঘ মারিবার প্রয়োজন কি? এই বাঘ এখন একটু তফাতে লুকাইত ভাবে আছে আপনাকে আজ বিনাশ করিবে।

বাঘের গর্জ্জনে ও আস্ফালনে সাহেবের হাতীটা সাহেবকে ফেলিয়া দিয়া দূরে পলাইয়া গিয়াছিল; সাহেবের সঙ্গের লোকও ভয়বিহ্বল চিত্তে পলাইয়া গিয়াছিল সাহেব

শরণাপন্ন হইলেন; তখন ঐ সাধু সাহেবের কাতরতা দেখিয়া তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন। সাধু সাহেবকে বলিয়া দিলেন কদাচ হিংসা করিও না।

সাহেব ঢাকায় আসিয়া আমিষ আহার একেবারে পরিত্যাগ করিলেন; ব্রাহ্মণ পাচক রাখিয়া নিরামিষ আহার করিতে লাগিলেন। কোন জীবহিংসা করিতেন না। অপর সাহেবেরা মনে করিল এই সাহেব পাগল হইয়াছে। কিছুদিন তিনি ঢাকায় থাকিয়া অন্যত্র চলিয়া যান

গোস্বামী মহাশয়ের মধ্যে হিংসাবৃত্তি আদৌ ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন কল্পনাতেও যখন মনোমধ্যে হিংসার উদয় হইবে না তখনই হিংসাবৃত্তি গিয়াছে বুঝিতে হইবে। এই অহিংসাবৃত্তি একা গোস্বামী মহাশয়েতেই দেখিলাম।

এতদিন গোস্বামী মহাশয়কে পৌত্তলিক এবং তাঁহার বুদ্ধি অতি স্থূল মনে করিতাম; নিজকেই খুব বুদ্ধিমান্ ও সদ্বিবেচক মনে করিতাম। গোস্বামী মহাশয়ের আচার-ব্যবহার কার্য্যকলাপের উপর সর্ব্বদাই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতাম; কোন্ স্থানে তাঁহার দুর্ব্বলতা, তাহাই ধরিবার চেষ্টা করিতাম। ক্রমে যতই তাঁহার সঙ্গ করিতে লাগিলাম ততই তাঁহার প্রতি অধিকতর রূপে আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম; তাঁহার জীবনে কোথায়ও একটু খুঁত দেখিতে পাইলাম না। বোলপুরে আসিবার জন্য তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া প্রণাম করতঃ বলিলাম :—

আমি—ব্রাহ্ম-সমাজের উত্তপ্ত বাতাসে ভিতরটা একেবারে খাঁক হইয়া গিয়াছে; বিশ্বাস শ্রদ্ধা ভক্তি সমস্ত একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; অবস্থা অতীব শোচনীয়।

গোঁসাই—ভিতরটা যেমন শুকাইয়া গিয়াছে, তেমনি অনেক উপকারও হইয়াছে। সংস্কার বর্জ্জন নামে বৌদ্ধদের মধ্যে একটী সাধন আছে, তাহাদিগকে প্রথমে দুই বৎসর এই সাধন করিয়া সমস্ত সংস্কার পরিত্যাগ করিতে হয়; সংস্কার ত্যাগ হইলে তবে সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই সংস্কার বর্জ্জনের কায তোমার মধ্যে হইয়া গিয়াছে। এখন যে বিশ্বাস জন্মিবে তাহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইবে। পুরাতন জীর্ণ দালান মেরামত করিলে তত মজবুত হয় না, কিন্তু যদি বনিয়াদ পর্য্যন্ত সমস্ত তুলিয়া ফেলিয়া নূতন গাঁথনী আরম্ভ করা যায় তাহা হইলে দালান খুব মজবুত হয়। সত্য দশবার বাজাইয়া লইবে; যাহা প্রত্যক্ষ না হইবে তাহা কদাচ বিশ্বাস করিবে না; ভক্তি না আসিলে গুরুকে, এমন কি ভগবানকেও প্রণাম করিবে না। যদি কর তাহা হইলে কপটতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।

আমি—একি মহাশয়! সম্বন্ধে গুরুজন অথচ দুরাচারী বলিয়া তাঁহার প্রতি মনে মনে যদি ঘৃণা থাকে, তবে তাঁহাকে দেখিয়া কি প্রণাম করিব না? এরূপ করিলে সমাজে যে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইবে?

গোঁসাই—মনে ভক্তি আনিতে চেষ্টা করিবে; কাহারও দোষ দেখিবে না। মানুষের গুণ দেখাই ভাল।

আমি—আপনাকে অধিক আর কি বলিব, সমস্ত ভারই আপনার।

গোঁসাই—কিছু বলিতে হইবে না, কিছু বলিতে হইবে না।

তদপর আমি পণ্ডিত মহাশয় ও পরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া বোলপুর চলিয়া আসিলাম।

—*—

পণ্ডিত মহাশয়ের বোলপুর ত্যাগ ও প্রত্যাগমন।

আমরা বোলপুর ফেরত আসিলে কিছু দিন পরে ১৩০১ সালের ফাল্গুন মাহায় গোস্বামী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনধাম গমন করেন। পণ্ডিত মহাশয়ও তাঁহার সহিত শ্রীবৃন্দাবনধাম যাইবার অভিপ্রায়ে বোলপুর আশ্রম হইতে চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার সহিত একত্র সাধন ভজনে পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছিলাম, তিনি আমার পরম সুহৃদ্ ছিলেন, তাঁহার বিরহে অত্যন্ত মনঃকষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলাম। পণ্ডিত মহাশয় আশ্রম হইতে চলিয়া যাওয়ায় স্থানীয় বহু লোক অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকগণ মধ্যে একটা মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল; তাহাদের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগায় তাহারা গালাগালি আরম্ভ করিল। তাহারা মনে করিল ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকগণের দৌরাত্ম্যে পণ্ডিত মহাশয় বোলপুর ত্যাগ করিয়া গেলেন। তাহারা আপনা আপনির মধ্যে এইরূপ গালাগালি করিতে লাগিল; "গুখেকোর বেটীদের দৌরাত্ম্যে গোঁসাঞি (লোকে পণ্ডিত মহাশয়কে এখানে গোঁসাই বলিত) বোলপুর হইতে চলিয়া গেলেন, হারাম-

জাদীদের জ্বালায় গোসাঞি এখানে টিকিতে পারিলেন না; আবার যদি কখনও গোঁসাই এখানে আসেন, তাহা হইলে যে গুখেকোর বেটী গোঁসাইর দিকে কুদৃষ্টি করিবে এই মুড়ো খ্যাংরার দ্বারায় তাহার বিষ ঝাড়িয়া দিব ইত্যাদি ইত্যাদি।" তাহারা বড়ই দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইল। কেহ কেহ আমাকে শুধাইতে লাগিল "গোঁসাই কি এখানে আর আসিবেন না? তিনি থাকাতে এই স্থানের অনেক উপকার হইয়াছিল।" যাহা হউক পণ্ডিত মহাশয়ের বোলপুর ত্যাগে এখানকার আপামর সাধারণ সকলেই দুঃখিত হইয়াছিল।

১৩০২ সালের ভাদ্র মাহায় গোস্বামী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে কলিকাতায় ফেরত আসিলে পণ্ডিত মহাশয় বোলপুর আসিলেন; তাঁহার আগমনে আপামর সাধারণ সকলেই পরমানন্দ লাভ করিলেন। এইবার ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকেরা পণ্ডিত মহাশয়ের এক প্রকার বডিগার্ড হইল। তাহারা সাধারণ স্ত্রীলোক মণ্ডলীর উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিল; কাহার সাধ্য যে আর পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি কুদৃষ্টি করে, বা তাঁহাকে কোন রূপে প্রলোভন দেখায়? তাহারা সকলেই পণ্ডিত মহাশয়কে পরম শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে লাগিল। তাহারা নিজের জীবনেও অনেকটা উপকার পাইল।

ঝরণাটা বোলপুর হইতে কিছু দূরে নির্জ্জন প্রান্তর

মধ্যে অবস্থিত। পণ্ডিত মহাশয় আশ্রমে থাকায় সকল স্ত্রীলোকই আপনাকে নিরাপদ ভাবিয়া স্বচ্ছন্দে যে কোন সময়ে ঝরণায় জল আনিতে যাইত। তাহাদের অন্তরে আর কোন ভয় ভাবনা হইত না।

পণ্ডিত মহাশয় প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া খাইতেন; এক বাড়ীর অধিক তাঁহাকে ভিক্ষা করিতে হইত না; যাহার বাড়িতে তিনি ভিক্ষা করিতে যাইতেন সে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিত। অনেকে ভিক্ষার জন্য অগ্রমুখী নিমন্ত্রণ করিত; বহু লোকে এইরূপ নিমন্ত্রণ করায় পণ্ডিত মহাশয় সকল সময় সকলের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিতেন না।

পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গগুণেই ১৩০২ সনের ভাদ্র মাহায় আমাদের কোর্টের তৎকালীন Accountant বাবু হরিদাস সিংহ দীক্ষা প্রাপ্ত হইলেন।

জেলা বীরভূমের অন্তর্গত বাতিকার গ্রামে সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণব বংশে বাবু হরিদাস সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে তিনি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সদাহার ও সদাচার ছিল না; চরিত্রও দূষিত ছিল। দীক্ষা প্রাপ্তির ৫ দিন পরে তিনি আপন বাটী বাতিকার মোকামে যাওয়ায় তাঁহার পরিবারস্থ সকলে তাঁহাকে দেখিয়া নিতান্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িল; গ্রামের লোক তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল; কেহ কেহ বলিতে লাগিল ইনি

বায়ুগ্রস্ত হইয়াছেন, সুচিকিৎসার প্রয়োজন; কেহ কেহ বলিতে লাগিল ইনি ভূতগ্রস্ত হইয়াছেন, ওঝার চেষ্টা দেখা কর্ত্তব্য; হরিদাস বাবুর স্ত্রী অত্যন্ত কান্দিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্ঞাতি খুড়া বাবু বিহারিল্লাল সিংহ একজন পরম ভক্ত বৈষ্ণব; তিনি ভক্তি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; তিনি হরিদাস বাবুর দীক্ষা প্রাপ্তির কথা পূর্ব্বে টের পাইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, ব্যামহও নহে ভূতও নহে, কোন চিন্তা নাই ইনি মহাপুরুষের নিকট মহামন্ত্র লাভ করিয়া এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন; ইঁহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। এই কথা শুনিয়া সকলে আশ্বস্ত হইল।

এই সময় বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহের (আমার সেই মিড়িয়ানের স্বামী) সহিত আমার একদিন দেখা হইল। হেমেন্দ্রবাবু বলিলেন,—

হেমেন্দ্রবাবু—এখন গোঁসাই যা তা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন;

আমি—গোঁসাঞি কি বলেন?

হেমেন্দ্রবাবু—তিনি বলেন শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত স্থান ইহার প্রত্যেক বৃক্ষের পত্রে পত্রে রাধাকৃষ্ণের নাম লেখা।

আমি—তুমি তাঁহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলে?

হেমেন্দ্র বাবু—আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আমার

আমি—তাহাতে তিনি কি বলিলেন?

হেমেন্দ্র বাবু—তিনি বলিলেন যদি কুলধর্ম্ম বজায় করিতে পার তবে ভবিষ্যতের জন্য একটা পথ পাইবে।

এই সকল কথোপকথনের পর হেমেন্দ্র বাবু বলিলেন গোঁসাইয়ের বুদ্ধি বিবেচনা দিন দিন বিকৃত হইতেছে, বৃন্দাবন হইতে আসাবধি আরও খারাপ হইয়া পড়িয়াছে এই সব কথা শুনিয়া আমার মনটা বিষণ্ণ হইল; মনে করিলাম গোঁসাই যাহা দেখেন দেখুন এ সব অবিশ্বাস্য কথা সাধারণের নিকট বলেন কেন? ইহাতে কেবল লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

১৩০২ সনে আশ্বিন মাহায় পূজার ছুটী হইলে কার্ত্তিক মহায় আমি সপরিবারে গুরু দর্শনে কলিকাতায় রওনা হইলাম। আমার সম্বন্ধির স্ত্রী সুশীলাবালা দাসী, আমার মধ্যম ভ্রাতার বিধবা পত্নী রাজলক্ষ্মী দাসী ও আমার কর্ম্মচারী শ্রীনাথ সরকারকে সাধন দেওয়াইবার জন্য সঙ্গে লইলাম। ১৪।২ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে তখনও গোস্বামী মহাশয় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বাসায় লোকারণ্য, স্ত্রীলোকদের থাকিবার স্থানাভাব এজন্য দিদিমা নীচের একটা ঘরে আমার স্ত্রীর ও শ্রীনাথ সরকারের [illegible]নের ব্যবস্থা করিবার জন্য গোস্বামী মহাশয়কে জ্ঞাপন করায় তিনি বলিলেন—

দিদিমা—সরকারটী বৃদ্ধ লোক। তফাতে এক কোনে থাকিবে।

গোঁসাই—হলেই বা বৃদ্ধ, পুরুষত বটে। স্ত্রী পুরুষ কদাচ এক ঘরে থাকিবে না। বার বৎসর বয়স হইলে পুত্রও মাতার নিকট শয়ন করিবে না। যে ঘরে স্ত্রীলোক একা থাকিবে সে ঘরে কোন পুরুষের যাওয়া উচিত নয়, আর যে ঘরে একা পুরুষ থাকিবে সে ঘরে কোন স্ত্রীলোকের ও যাওয়া কর্ত্তব্য নয়।

গোস্বামী মহাশয়ের কথা শুনিয়া দিদিমা আমার স্ত্রীর ও সরকারের স্বতন্ত্র ঘরে শয়নের ব্যবস্থা করিবার জন্য নীচে নামিয়া গেলেন; গোস্বামী মহাশয় আমাদের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন;

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবান্ ইন্দিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

মা, ভগ্নি, অথবা কন্যার সহিতও নির্জ্জনে উপবেশন করিবে না, কারণ বলবান ইন্দ্রিয় সকল বিদ্বান ব্যক্তিকেও (তত্ত্বজ্ঞানীকেও) আকর্ষণ করে।

গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক আওড়াইয়া বলিলেন, "স্ত্রী পুরুষ কদাচ একত্র থাকিবে না। শাস্ত্রের অনুগত হইয়া না চলিলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। কাশীর দণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক পাঠ করিয়া মনে

করিয়াছিলেন, ব্যাসদেব ভ্রান্ত ; তিনি ঠিক লিখিতে পারেন নাই। ইন্দ্রিয় সকল বলবান হইলেও তাহারা তত্ত্বজ্ঞানীকে কখনও আকর্ষণ করিতে পারে না। এই ভাবিয়া তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ শ্লোকের "মপিকর্ষতি" পাঠ বদলাইয়া তাহার স্থানে "নহি কর্ষতি" পাঠ লিখিলেন।"

ভগবান ব্যাসদেব দণ্ডীস্বামীর এই ধৃষ্টতা দেখিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য মায়া বিস্তার করিলেন। একদিন বেলা অবসানে আকাশে মেঘের সঞ্চার হইল; দেখিতে দেখিতে আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; দারুণ মেঘ গর্জ্জন আরম্ভ হইল, আকাশে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল; প্রবল ঝড় বহিতে লাগিল; করকা সহ বৃষ্টি পাত আরম্ভ হইল।

এই দুর্য্যোগে দণ্ডীস্বামী দেখিলেন একটী যুবতী নিতান্ত বিপন্ন হইয়া প্রাণেরভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাহার আশ্রমের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে প্রবল বাতাসে ঐ যুবতীর পরিধানের বস্ত্র স্থানভ্রষ্ট হওয়ায় বিদ্যুতের আলোকে তাহার গুহ্যাঙ্গ দণ্ডীস্বামীর নয়নগোচর হইল। দণ্ডীস্বামী নির্ব্বিকার ও নির্ভীক; তিনি ঐ যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

দণ্ডীস্বামী—ভয় নাই! ভয় নাই! তুমি আমার আশ্রমে আইস।

আপনি পুরুষ মানুষ, আমি স্ত্রীলোক, আমি কেমন করিয়া আপনার আশ্রমে যাইব?

দণ্ডীস্বামী—তোমার চিন্তা কি? আমি দণ্ডীস্বামী, এখানে তোমার ভয় ভাবনার কোন কারণ নাই। আমার নিকট স্ত্রী পুরুষ দুইই সমান।

যুবতী—তথাপি আপনি পুরুষ।

দণ্ডীস্বামী—তুমি জান না যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহাদের উপর রিপুগণের আধিপত্য থাকে না।

যুবতী—আপনার আশ্রমে একখানি মাত্র ঘর দেখিতেছি; এক ঘরে কোন ক্রমেই থাকিতে পারিব না।

দণ্ডীস্বামী—আচ্ছা তুমি ঘরের ভিতরে থাকিবে আমি বাহিরে থাকিব।

যুবতী স্বামীজীর কথামত তাহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভান করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া খিল আটিয়া দিল, স্বামীজী বাহিরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাত্রি হইল; ঝড় জল থামিয়া গেল; মেঘ কাটিয়া গেল; আকাশ পরিষ্কার হইল। চন্দ্রোদয় হইল জ্যোৎস্নায় চারিদিক ঝলমল করিতে লাগিল।

বিদ্যুৎ ঝলকে দণ্ডীস্বামী যুবতীর যে গুহ্যাঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন, সেই দৃশ্যটা তাঁহার অন্তরে আন্দোলিত হইতেছিল; এই আন্দোলনে দণ্ডীস্বামীর ভিতরে কন্দর্পের

অবশেষে আত্মহারা হইয়া যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

দণ্ডীস্বামী—কপাট খোল আমাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দাও।

যুবতী—আমি স্ত্রীলোক, একাকী এই গৃহমধ্যে রহিয়াছি, রাত্রিকাল, আপনি এই ঘরে প্রবেশ করিবেন, এ কেমন কথা!

দণ্ডীস্বামী—আমি কন্দর্পশরে নিতান্ত নিপীড়িত, কপাট খোল আমার প্রাণ রক্ষা কর।

যুবতী—ছি, ছি, ছি, আপনি দণ্ডীস্বামী; আপনাকে কি এমন কথা বলিতে আছে? আমি অবলা, নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোক; বিপদে পড়িয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি; বিশেষ অদ্য আমি আপনার অতিথি। কোথায় আপনি আমার ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন? না আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন!

দণ্ডীস্বামী—এখন ও সব কথা রাখ, দ্বার খুলিয়া দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।

যুবতী বেগতিক দেখিয়া শক্ত করিয়া খিল আঁটিয়া দিয়া গৃহমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। দণ্ডীস্বামী কপাট ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য কপাটে দুমদাম করিয়া লাথি মারিতে লাগিল। কপাট যখন

করিবার জন্য পরোলে উঠিলেন। যেমন পরোল দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবেন অমনি পরোলে আটকাইয়া গেলেন। দেহের অর্দ্ধেক অংশ বাহির দিকে ও অর্দ্ধেক অংশ ভিতর দিকে থাকিয়াগেল। তিনি গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য অনেক ছ্যাঁচড়া-ছ্যাঁচড়ী করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, তখন বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু এমনি আটকাইয়া গিয়াছেন যে বাহিরেও আসিতে পারিলেন না। পরোলের উপর ঝুলিতে লাগিলেন।

ক্রমে প্রভাত হইল যুবতী গৃহ হইতে বাহির হইয়া দণ্ডীস্বামীর শিষ্যগণ ও গণ্যমান্য কাশীবাসীকে দণ্ডীস্বামীর সংবাদ দিলেন। তাঁহারা দণ্ডীস্বামীর আশ্রমে ছুটীয়া আসিলেন। শিষ্যগণ স্বামীজীকে পরোলে ঝুলিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

শিষ্যগণ—প্রভু একি? আপনার এ অবস্থা কেন?

দণ্ডীস্বামী—আগে পরোল হইতে আমাকে নামাইয়া লও পরে বলিব; এখন আমার প্রাণ যায়।

শিষ্যগণ তাড়াতাড়ি হাতাহাতি করিয়া গুরুকে পরোল হইতে নামাইলেন। দণ্ডীস্বামী মহাজ্ঞানী, এখন তাঁহার বেশ চৈতন্য হইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন ব্যাসদেবকে অবজ্ঞা করায় তাঁহাকে এই প্রতিফল ভোগ করিতে হইল।

যেখানে "বিদ্বাংসমপি কর্ষতি" একবার লিখিত ছিল, সেই খানে তিনবার লিখিলেন "বিদ্বাংসমপি কর্ষতি, বিদ্বাংসমপি কর্ষতি, বিদ্বাংসমপি কর্ষতি"।

গোস্বামী মহাশয় এই আখ্যায়িকাটী বলিয়া নানা উপদেশ দিলেন, তিনি বলিলেন স্ত্রী পুরুষ কখনও মেসা-মেসী করিবে না। সাবধানে স্বতন্ত্র ভাবে থাকিবে ইহার ব্যতিক্রম হইলে নিশ্চয়ই বিপথগামী হইতে হইবে।

শিষ্যগণকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি কোন স্ত্রীলোককে আপনার ঘরে প্রবেশ করিতে দিতেন না। এমন কি তাঁহার বৃদ্ধা শাশুড়ী ও বালিকা কন্যা পর্য্যন্তও তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিতে পাইতেন না। স্ত্রীলোকেরা চীকের আড়াল হইতে তাঁহাকে দর্শন করিত এবং ঘরের বাহিরে দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিত।

আমার কর্ম্মচারী শ্রীনাথ সরকার, আমার সম্বন্ধির স্ত্রী সুশীলাবালা ও আমার মধ্যম ভ্রাতার বিধবা পত্নী রাজলক্ষ্মী দাসীর দীক্ষা কার্য্য শেষ হইল। আমার সঙ্গে আমার কনিষ্ঠা কন্যা শান্তসুশীলা ছিল, তখন তাহার বয়স ২॥ বৎসর মাত্র। গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম এ মেয়েটা আর বাকী থাকে কেন? তিনি মেয়েটীকে খুব আদর করিয়া আমাকে বলিলেন "এ এখন নিতান্ত বালিকা, এখন থাকুক।"

"শ্রীবৃন্দাবন ধাম অপ্রাকৃত স্থান, ইহার প্রত্যেক বৃক্ষলতার পাতায় পাতায় রাধাকৃষ্ণের নাম লেখা ; একদিন পরিক্রমার সময় একটা কদম্ব বৃক্ষের তলে বসিয়া ভাবিলাম, এই বৃক্ষের পাতায় দোনা হইয়াছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাখালগণ সহ সেই দোনায় অন্ন খাইয়াছিলেন ; আহা! সে লীলা দর্শন হইল না, আমি নিতান্ত হতভাগ্য এই ভাবিয়া নিতান্ত কাতর প্রাণে যেমন বৃক্ষের দিকে উৰ্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, অমনি একটা ডালে একটী দোনা দেখিতে পাইলাম, আবার চাহিতে চাহিতে দেখি, আর একটা ডালে আর একটী দোনা রহিয়াছে ; কিছুক্ষণ চাহিয়া দেখি সমস্ত বৃক্ষটা দোনাময় হইয়া গেল।"

আমি চিরকালের অবিশ্বাসী লোক, আমার মধ্যে হাজার পরিবর্ত্তন হইলেও অসম্ভব কোন কথা আমার মনে স্থান পাইত না ; হেমেন্দ্র বাবুর মুখে গোস্বামী মহাশয়ের এইরূপ কথা শুনিয়া মনটা বিচলিত হইয়াছিল, এখন গোস্বামী মহাশয়ের নিজের মুখে এই অসম্ভব কথা শুনিয়া আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলাম না। গোস্বামী মহাশয়কে বিদ্রূপ করিয়া বলিলাম "মহাশয় বৃক্ষের পত্রে পত্রে কোন্ অক্ষরে রাধাকৃষ্ণের নাম লেখা দেখিলেন? বলি ইংরাজী, না বাঙ্গলা, না দেবনাগরী, না পারসী? অসম্ভব কোন কথা বলিতে নাই ; আপনি জানেন পাতার

হইয়াছে, এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহাতে দোনা হয়, ইংরাজীতে তাহাকে Pitcher plant বলে” এই সব কথা বলিয়া শিষ্য হইয়া গুরুর উপর একটা বিস্তৃত lecture ঝাড়িলাম। গোস্বামী মহাশয় ও উপস্থিত সমস্ত লোক চুপ করিয়া থাকিলেন। অন্য গুরু হইলে আমার ধৃষ্টতা কখনই সহ্য করিতেন না, কিন্তু গোস্বামী মহাশয় অন্তর-দর্শী, আমার অন্তরের দুরবস্থা দেখিয়া সব সহ্য করিলেন ও আমাকে ক্ষমা করিলেন। আমি বরাবরই দেখিতেছি গোস্বামী মহাশয় যেন একটা বিগ্রহ মূর্ত্তি, স্তব স্তুতি, গালী গালাজ, নিন্দা প্রশংসা তাঁহার নিকট সব সমান। কিছুতেই তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারিত না।

আমি মহা পাষণ্ড হইলেও গোস্বামী মহাশয়ের আদরের কথনও ক্রুটী ছিল না। কিছুদিন তাঁহার সহবাসে পরমানন্দে কাটাইয়া বোলপুর চলিয়া আসিলাম; তিনিও কয়েক দিন পরে অগ্রহায়ণ মাহায় ঢাকা রওনা হইলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্ম।

বোলপুরে ক্রমে ক্রমে গুরু ভাই ভগ্নীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকায় বোলপুরে নাম সংকীর্ত্তন ক্রমে প্রবল আকার ধারণ করিতে লাগিল। আমার বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর প্রত্যহ নামসংকীর্ত্তন হইত; সুতরাং সন্ধ্যার পর আমার সমস্ত কায কর্ম্ম বন্ধ হইল। সন্ধ্যা হইলে মক্কেলগণের সহিত আর কোন কথা নাই। প্রায় রাত্রি ১০।১১টার পূর্ব্বে সংকীর্ত্তন বন্ধ হইত না; ভাবের তরঙ্গে ঘর দুয়ার যেন ভাঙ্গিয়া যাইত। এই সময় পণ্ডিত মহাশয় বোলপুরে আমার বাসায় আসিয়া কিছুদিন ছিলেন, আশ্রমে যাইতেন না।

ক্রমশঃ সংকীর্ত্তন দলের বেশ পরিপুষ্টি হইতে লাগিল, এই দলের এমনি নেশা জন্মিল যেন তাহাদের সংসারে আর আস্থা নাই, তাহারা সর্ব্বদা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট থাকিতে চায় এবং নাম গানে দিন যাপন করিতে পারিলেই সুখী হয়।

১৩০২ সালের ৩০ অগ্রহায়ণ প্রাতঃকালে চা খাওয়ার পর হইতে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল; রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন চলিল, কেবল আহারের সময় অল্পক্ষণ মাত্র

বিশ্রাম ছিল ; ভাবের তরঙ্গ সমস্ত দিন ও রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত সমভাবেই চলিয়াছিল ; তদপর সংকীর্ত্তন শেষ হইলে সকলে আহার করিতে আপন আপন বাটী চলিয়া গেল। রাত্রি দুই প্রহরের পর আহারান্তে আমরা সকলে শয়ন করিলে নাথুরিয়া নিবাসী বাবু রসিকলাল দত্ত একাকী শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত গান করিলেন। ভোরের সময় আমরা কয়েক জন পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে, প্রভাতী গান আরম্ভ হইল। এই সময় পণ্ডিত মহাশয় আমাকে বলিলেন ;—

পণ্ডিত—আজ বোধ হয় আপনার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে।

আমি—আপনি কি প্রকারে বুঝিলেন ?

পণ্ডিত—আমার সম্মুখে একটা দৃশ্য পড়িল।

আমি—কিরূপ দৃশ্য পড়িল ?

পণ্ডিত—আমি দেখিলাম আমার সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র বালক উপস্থিত হইল, তাহার দুই হাতে করতাল, গলায় মালা, আবার ঐ মালায় হরিনামের ঝুলি ঝুলান রহিয়াছে। এই বালক অল্পক্ষণ দেখা দিয়া অদৃশ্য হইল।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় অন্দরে শঙ্খধ্বনি হইল ; ১ পৌষ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। হরির লুটের ছেলে শোক তাপ কিছুই নাই।

আমরা বাটীর ভিতর গিয়া দেখিলাম বালক তুলসীতলায় শয়ান রহিয়াছে। ক্ষণকাল পরে শিশুকে বারান্দায় উঠাইয়া লওয়া হইল।

প্রভাতেই সংকীর্ত্তনের দল উপস্থিত হইল হরির লুট দিবার জন্য বাটীর ভিতরে তুলসীমঞ্চ প্রদক্ষিণ করতঃ নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল; সংকীর্ত্তনের দল একেবারে উন্মত্ত,প্রায় সকলেরই বাহ্য জ্ঞান নাই; এই সময় কালীকৃষ্ণ ভায়ার প্রথম নাচ খুলিয়া গেল। তাঁহার নৃত্য এক অদ্ভুত ব্যাপার। ইহার পূর্ব্বে তিনি আর কখনও নাচেন নাই। এই তাঁহার প্রথম নাচ আরম্ভ হইল। তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া অতি মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন, তিনি ক্রমাগত নাচিতেছেন, জোরে জোরে পা ফেলিতে-ছেন কিন্তু ভূমিতে কেবলমাত্র পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি নাম মাত্র স্পর্শ হইতেছে। ঠিক যেন শূন্যোপরি নাচিতেছেন। সংকীর্ত্তন দলের গগনভেদী রোল, ঘন ঘন হুঙ্কার গর্জ্জন ও উদ্দণ্ড নৃত্যে বাড়িটা যেন কম্পিত হইতে লাগিল। বালক এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, উত্তর মুখে শয়ান ছিল, কিন্তু আপনা হইতে মস্তক ফিরাইয়া দক্ষিণ মুখী হইয়া একদৃষ্টে এই সংকীর্ত্তন দেখিতে লাগিল।

এমন শিশু আপনা হইতে ঘাড় ফিরাইতে পারে না, কিন্তু এই শিশু আপনা হইতে ঘাড় ফিরাইয়া যতক্ষণ

সংকীর্ত্তন হইল ততক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। একবারও পলক ফেলিল না।

বাটীর ভিতর সংকীর্ত্তন ও হরির লুট শেষ হইলে, সংকীর্ত্তনের দল পাড়ায় কীর্ত্তন করিতে বাহির হইলেন। বেলা দুই প্রহরের সময় কীর্ত্তন ফিরিল সকলে বাসাতেই আহার করিলেন।

উপর্য্যুপরি ৪ চারিটী কন্যা হইয়া এই প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, এবার গৃহিণী মনের আনন্দে খুব তেল সন্দেশ বিলাইতে লাগিলেন। গ্রাম গ্রামান্তর হইতে লোক ভাঙ্গিয়া আসিল; সকলকেই পরম যত্নে গৃহিণী নানা জিনিষ দিয়া বিদায় করিলেন।

এই দিন হইতে একমাস যাবত প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত নাম সংকীর্ত্তন ও প্রত্যহ মহোৎসব হইতে লাগিল। প্রত্যহ প্রাতঃকালে সকলে যেমন চা খাইতে বসিতাম, অমনি পণ্ডিত মহাশয়ের ভাবাবেশ হইত; তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিতেন; তাঁহার ভাবাবেশ দেখিবামাত্র কেহ না কেহ একটা গান ধরিতেন ইহাতে ভাবের তরঙ্গ বর্দ্ধিত হইতে দেখিবামাত্র একজন না একজন খোল পাড়িতেন অমনি একজন কর্ত্তাল বাজাইতে আরম্ভ করিতেন, এইরূপে কীর্ত্তন আরম্ভ হইত; কীর্ত্তনের তরঙ্গ অবর্ণনীয়। যেন এক-

গণের আলস্য নাই, ক্লান্তি নাই, ভাবের বিরাম নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই। অবিশ্রান্ত সমভাবে কীর্ত্তন চলিয়াছে। কাহারও ইচ্ছা নয় যে, কীর্ত্তন বন্ধ হয়। সকলেই মধুর নৃত্য করিতেছেন। সকলেই ভাবে বিভোর।

বেলা অতিরিক্ত দেখিয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া সকলে স্নান করিতে যাইতেন, খোল করতাল আসরেই পড়িয়া থাকিত। ইহারা যেমন স্নানে যাইতেন অমনি আর এক দল (যাহারা পূর্ব্বে কীর্ত্তনে যোগ দিতে পারেন নাই) আসরে নামিতেন। আবার সেইরূপ ভাবের তরঙ্গ, আবার নৃত্য, কীর্ত্তন, হুঙ্কার গর্জ্জন। কাহারও সহিত যুক্তি নাই, পরামর্শ নাই, কথা নাই বার্ত্তা নাই, আপনা আপনিই এইরূপ সংকীর্ত্তন চলিয়াছে। আহারের সময় সকলে মিলিয়া একত্র আহার করা হইত আর মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি উঠিত। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় যেমন চা পান আরম্ভ হইত অমনি সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্ত্তনের রোল উঠিত। রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত এই কীর্ত্তন চলিত। কীর্ত্তনীয়াগণের হুঙ্কার গর্জ্জনে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইত, এক এক আছাড়ে ঘর দ্বার যেন ভাঙ্গিয়া যাইত। কাহারও হাত ভাঙ্গিত, কাহারও পা ভাঙ্গিত, কাহারও মাথা দিয়া রক্ত পড়িত। তবুও কি কীর্ত্তনের বিরাম আছে! কীর্ত্তনীয়াগণ যেন

আর থাকিতে পারে না। বাড়ীর কায কর্ম্ম সব বন্ধ।

এই সময় দেশ দেশান্তর হইতে ভিন্ন ভিন্ন সংকীর্ত্তনের সম্প্রদায় আসিয়া ভগবানের লীলা গুণ শুনাইতে লাগিলেন। নানা স্থান হইতে বৈষ্ণবমণ্ডলীর আগমন হইতে লাগিলেন, প্রত্যহ মহোৎসব, গগনভেদী খোল করতালের ধ্বনি ও কীর্ত্তনীয়াগণের হুঙ্কার গর্জ্জনে বোলপুর তোলপাড় হইতে লাগিল। মুন্সেফ বাবু সিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় একদিন সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হরিদাসবাবু কি পাগল হইয়াছেন? খোল কর্ত্তালেরও বিরাম নাই, মহোৎসবেরও বিরাম নাই, ব্যাপার কি?" তাঁহাকে লোকে আর কি উত্তর দিবেন? সকলে চুপ করিয়া রহিলেন।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে, শিশুর জন্মোপলক্ষে বাবু তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী সুন্দর গান রচনা করিলেন, এই গান কীর্ত্তনীয়াগণ আপন মনে পাড়ায় পাড়ায় গান করিত। আমি অতি সামান্য লোক, কাহারও সহিত কোন কথা নাই পরামর্শ নাই, এই সমস্ত ঘটনা আপনা হইতে ঘটিতে লাগিল, ইহা অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার। মনুষ্য-জ্ঞানের অন্তরালে থাকিয়া কে যেন এই সমস্ত আয়োজন করিলেন। আমি দ্রষ্টা মাত্র ইহাতে আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না।

ঢাকায় আছেন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গোস্বামী মহাশয় এই সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা শিষ্যবৃন্দের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। শিশুর পূর্ব্বজন্মের কথাও বিবৃত করিয়াছিলেন। এ সব কথা আমি পশ্চাৎ জানিতে পারিয়াছিলাম। মহাপুরুষগণ দিব্য চক্ষে সমস্ত দেখিতে পান, তাঁহাদের অবিদিত কিছুই থাকে না।

প্রথম ধুলট (শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর জন্মতিথির পূজা)।

১৩০২ সাল মাঘ মাস শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় উৎসব (ধুলট) করিতেছেন, এখানেও এইবার ১লা মাঘ হইতে প্রথম উৎসব (ধুলট) আরম্ভ হইল। আমরা তন্ত্র মন্ত্র দেবার্চ্চনা কিছু জানি না. ছেলে খেলার ন্যায় বৈঠকখানায় রাধাকৃষ্ণের এক চিত্রপট স্থাপন করিয়া তাহার চারিদিকে ক্রোটন ও ফুল দিয়া সাজাইয়া এই রাধাকৃষ্ণের সম্মুখে নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। পূজা নাই, ভোগ নাই, আরতি নাই; দিবা রাত্রি খোল করতালের ধ্বনি ও ভক্তবৃন্দের হুঙ্কার গর্জ্জন; ভাবের ভরে কে কার ঘাড়ে পড়ে, কে কাকে ধরে তাহার ঠিক নাই; এক এক আছাড়ে যেন ঘর দ্বার চুরমার হইয়া যায়। পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতি থরহরি কম্পবান, দেহধারণে অসমর্থ। এই উৎসবে এক পয়সা ব্যয় নাই; কীর্ত্তনীয়াগণ কেবল কীর্ত্তন করে ও আপন আপন বাসায় গিয়া খায়।

কয়েকদিন এই ভাবে কাটীয়া গেলে বৃদ্ধ উকিলবাবু যশোদানন্দন সিংহ বলিলেন :—

যশোদাবাবু—তোমরা কি করিতেছ? অবিশ্রান্ত খোল করতালের ধ্বনি আর কীর্ত্তনের রোল? তোমাদের ঠাকুরের পূজা ভোগ বা আরতি কই? এ সব ত কিছু দেখি না।

আমরা—আমাদের সে সব বন্দোবস্ত নাই।

যশোদাবাবু—সে কি? ঠাকুর রাখিয়াছ ইহার ভোগ নাই, পূজা নাই, আরতি নাই, এ কেমন?

এই কথার পর তিনি কিছু দুগ্ধ, রম্ভা, চিনি আনিয়া একটা কাঁসার বাটীতে ছানিয়া দিলেন; সকলে মিলিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইল, "খাও ঠাকুর খাও" এই মাত্র মন্ত্র। তদপর সকলে একটু একটু প্রসাদ লইয়া নৃত্য আর কীর্ত্তন। যখন সংকীর্ত্তনের দল নাচিতে থাকিত তখন ঘরখানা কাঁাপিয়া উঠিত। কোন কোন দিন সন্ধ্যার সময় পিলসুজ হইতে প্রদীপটা লইয়া পণ্ডিত মহাশয় আরতি করিতেন। দেহ কি স্থির আছে যে স্থির-ভাবে আরতি করিবেন? হাত পা থর থর করিয়া কাঁপি-তেছে, প্রদীপটা ধরে থাকাই অসম্ভব, ইহার উপর আবার আরতি? তিনি প্রদীপটা হাতে লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রবল বেগে একবার ছুটিয়া পিছাইয়া যান আবার ছুটিয়া আগাইয়া আসেন; কখনও বা ঢবুড় হইয়া ঠাকুরের উপর পড় পড় হন। তাঁহার নিজের দেহের উপর নিজের

কর্ত্তৃত্ব নাই, তাঁহাকে ধরিয়া সামলাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে লোক ছুটিতে থাকে।

৯ই মাঘ সপ্তমীর দিন প্রাতে নগর সংকীর্তনে বাহির হইতে হইবে এইরূপ মনস্থ হইল। আমাদের কীর্তনের দলস্থ লোকগুলি আহার করিবেন এইরূপ রান্নার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমরা নগর সংকীর্ত্তনে বাহির হইলাম। বাসা হইতে রাস্তায় উপস্থিত হইলে চারিদিক হইতে শত শত লোক আসিয়া সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিলেন; ভাল ভাল বাজাইয়া ও ভাল ভাল গায়ক জুটিয়া গেল; সংকীর্ত্তনের গগণস্পর্শী ধ্বনি উঠিল। সংকীর্ত্তন দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে লোক সকল ছুটিয়া আসিল। রাস্তায় মহাভিড় পণ্ডিতমহাশয় ভাবভরে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্য করিতে করিতে একবার ছুটীয়া আগাইয়া যান আবার ছুটীয়া পিছাইয়া আসেন, এক একবার আছাড় খাইয়া অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যান; আবার চেতন হইবা মাত্র লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিয়া পূর্ব্ববৎ নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হন। তাঁহার কম্প, অশ্রুপুলক বৈবর্ণ্য প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের বিকার, লোকে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। পাছে তাঁহাকে কেহ স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় আমরা হাত ধরাধরি করিয়া তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া মণ্ডলীবদ্ধ

করিতে লাগিলেন, এক এক আছাড়ে তাঁহার দেহটা যেন চুরমার হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি যে স্থানে অচেতন হইয়া পড়িতে লাগিলেন, সেই স্থানে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কীর্ত্তন হইতে লাগিল, তদপর তাঁহার চৈতন্য হইলে সংকীর্ত্তন সেই স্থান হইতে একটু অগ্রসর হইবামাত্র চারিদিক হইতে লোক সকল ছুটীয়া আসিয়া সেই স্থানের মৃত্তিকা লইয়া অঙ্গে মাখিতে লাগিলেন, এই জন্য লোকের ছুটাছুটি ও হুড়াহুড়ী হইতে লাগিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে দোকানদার ও গৃহস্থগণ বাতাসা, রুদমা, পাটালী প্রভৃতি ছড়াইতে লাগিলেন। বোলপুরে মিষ্টান্নের অনেক দোকান আছে সে দিন দোকানের সমস্ত জিনিষ দোকানদার ও গৃহস্থগণ সকলে একেবারে লুটাইয়া দিতে লাগিলেন বৈকালে বাজারে একছটাকও মিস্টান্ন ছিল না। ছোট লোকের ছেলেরা এত মিষ্টান্ন কুড়াইয়া খাইয়াছিল যে, তাহাদের উদর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বেলা দেড়টার সময় সংকীর্ত্তন বাসায় ফিরিয়া আসিল।

আমাদের লোক খাওয়াইবার বন্দোবস্ত ছিল না, কিন্তু নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া গেলে পাড়ার লোকেরা আপনা' হইতে নানা তরকারি ও বিবিধ জিনিষ পত্র আনিয়া বাসায় উপস্থিত করিতে লাগিলেন; ইহাদের উৎসাহ ও আয়োজনে প্রচুর রান্না হইয়াছিল, বহুলোক পরমানন্দে ভোজন করিলেন।

এই ঘটনার পর হইতে বোলপুরের সাধারণ লোকের মধ্যে একটা নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল ; তাহাদের রুচি পরিবর্ত্তিত হইল ; অনেকেই ভজন সাধনে মনোনিবেশ করিলেন ; স্কুলের ছেলেরা টিফিনের সময় খেলা ধূলা আমোদ আহ্লাদ পরিত্যাগ করিল ; তাহারা ঐ সময়ে দলে দলে কেবল হরি কথায় কাল কাটাইতে লাগিল ; প্রহ্লাদ যেমন অসুর বালকগণকে লইয়া আপন শিক্ষক ষণ্ডামার্কের আশ্রমে হরিভজন করিতেন, তেমনি স্কুল বালক ধ্বজাধারী অপরাপর ছেলেদিগকে লইয়া টীফিন ও অবকাশের সময় ধর্ম্মালোচনায় কাল যাপন করিতেন। ছেলেরা দলে দলে গাছ তলায় কেবল হরিকথায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনেকে মৎস্য মাংসাহার পরিত্যাগ করিল। ছোট ছোট ছেলেরা আপনাদের পিতামাতাকে জিদ করিয়া আমিষ ভোজন ত্যাগ করাইতে লাগিল। সকলের মধ্যে যেন একটা ঘোর নেশা! পণ্ডিত মহাশয় যখন আশ্রম হইতে আমার বাসায় আসিতেন রাস্তার দুই ধারের দোকানদার গৃহস্থলোক ও তাহাদের ছেলেরা রাস্তায় ছুটীয়া আসিয়া তাঁহার পাদধূলি লইতে লাগিল লোকের ভীড়ে তাঁহার পথ চলা ভার হইয়া দাঁড়াইল এই জন্য তাঁহাকে লুকাইয়া মাঠে মাঠে আমার বাসায় আসিতে হইত ; তিনি সদর রাস্তায় চলা ফেরা করিতে

বোলপুরে পণ্ডিত মহাশয়ের এত সম্মান, তাঁহার কোন অভাব বা পিছু-টান ছিল না, শরীর সুস্থ, দিন দিন ধর্ম্ম জীবনের উন্নতি হইতে ছিল, তথাপি তিনি সর্ব্বদাই আমাকে বলিতেন ;—

পণ্ডিত—ভাই আমি বাঁচি না, ভিতরে বড়ই জ্বালা যন্ত্রণা ; আর সহ্য হইতেছে না।

আমি—দাদা, তোমার কিসের জ্বালা, আমাকে ভাঙ্গিয়া বল, আমার অর্থ আছে, লোক বল আছে, তোমার সমস্ত অভাব আমি দূর করিতে প্রস্তুত আছি, যে উপায় অবলম্বন করিলে তুমি সুখে থাকিতে পার সেই উপায় অবলম্বন কর।

পণ্ডিত—আমার জ্বালা যন্ত্রণা বুঝিবে না, এ যন্ত্রণা অহৈতুকী।

আমি তখন পণ্ডিত মহাশয়ের এই যন্ত্রণার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। পরে গোস্বামী মহাশয়কে এই জ্বালা যন্ত্রণার কথা বলায় তিনি বলিলেন ;—

গোঁসাই—সাধন পন্থায় সকল সাধকেরই এইরূপ জ্বালা যন্ত্রণা হইয়া থাকে। কাহারও এই জ্বালা যন্ত্রণা এড়াইবার উপায় নাই, বেদে ইহা ইন্দ্র দেবের অত্যাচার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

Progress) নামক পুস্তকে ইহার বর্ণনা আছে। প্রহ্লাদ আগুনে পুড়িয়া, বিষপানে জর্জ্জরিত হইয়া, অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সমুদ্র জলে নিমজ্জিত হইয়া ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন। আমার যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় আমি তিনবার আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম গুরুদেব আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আমি—এই যন্ত্রনা কি আমাদের সকলকেই ভোগ করিতে হইবে ?

গোঁসাই—নিশ্চয় ভোগ করিতে হইবে ? কাহারও এড়াইবার উপায় নাই।

আমি—এই যন্ত্রণার কারণ কি ?

গোঁসাই—বহু জন্মের অপরাধের কি একটা শাস্তিভোগ করিতে হইবে না ? যাহাদের যন্ত্রণা আরম্ভ হয় নাই, বুঝিতে হইবে ভবিষ্যতের জন্য তাহাদের যন্ত্রণা মজুত আছে।

আমি—গোঁসাই এ যে সর্ব্বনেশে কথা বলিলেন ?

গোঁসাই—যন্ত্রণা ভোগ ব্যতীত জীবন প্রস্তুত হয় না, দুরন্ত রিপুগণ, বাসনা ও কামনা সকল নষ্ট হয় না।

আমি—এইবারত মুস্কিল ? কেমন করিয়া যন্ত্রণা সহ্য করিব ?

গোঁসাই—তোমাদের যে প্রারব্ধ তাহা ভোগ করিতে হইলে কি আর রক্ষা আছে? আমি সামান্য একটু আঁচ দিই মাত্র; এই টুকু সহ্য করিতে না পারিলে চলিবে কেন? যন্ত্রণার সময় এক মাত্র ভগবানের নামই ভরসা, শ্বাসে শ্বাসে নাম করিবে, কদাচ নাম পরিত্যাগ করিবে না। নাম ব্যতীত সুস্থ হইবার উপায়ান্তর নাই। জ্বলন্ত দাবানলের মধ্য দিয়া তোমাদের পথ জানিবে।

গোস্বামী মহাশয়ের এই সমস্ত কথা আমার নিকট তখন প্রহেলিকা মনে হইয়াছিল। আমি ইহার কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। পরে বেশ টের পাইয়াছি।

পট্টডোরী প্রদান।

গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন সত্য বস্তু দশবার বাজাইয়া লইবে। প্রত্যক্ষ না হইলে কিছুই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে না, শুনা কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে না, এখন আমার মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামে ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠে প্রাণ আকুল হইয়া যায়। ক্রমাগত গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গ করিয়া ও তাঁহার জীবন দেখিয়া তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে হইয়াছে, তথাপি মূর্ত্তি পূজায় এতক আমার বিশ্বাস জন্মে নাই ; শ্রীগৌরাঙ্গ তত্বও আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আমার মনে হইত গুরু যখন বলিয়াছেন, প্রত্যক্ষ না হইলে কিছুই গ্রহণ করিবে না তখন শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব আমার নিকট প্রকাশিত না হইলে আমি কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিব না। এই ভাবে এতদিন চলিয়া গেল ; একদিন মনে হইল আমি এমন কি তপস্যা করিয়াছি যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু আমার নিকট প্রকাশিত হইবেন ? আমি চিরকাল তাঁহাকে অবিশ্বাস ও বিদ্রূপ করিয়াছি ; বহুকাল যাবত রাধাকৃষ্ণের কুৎসা করিয়াছি; আমার জন্য একটা আলা-

মুনীন্দ্র তপস্যা করিতে করিতে উই ঢিপিতে পরিণত হইয়াও যাঁহার দর্শন পায় নাই; আমি কেমন করিয়া আশা করিব যে সেই পরাৎপর পরমেশ্বর আমার নিকট প্রকাশিত হইবেন। আমি সত্য সত্যই ঘোর পাষণ্ড। গুরুর প্রত্যক্ষ আদেশ আমি পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘন করিয়াছি; অধিকন্তু তাঁহার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি। গুরু সম্মুখে ভগবত নিন্দা করিয়া নিতান্ত অপরাধের কায করিয়াছি; পট্টডোরী না দেওয়ায় মহাপ্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করা হইতেছে; তিনি আমার পূর্ব্ব-পুরুষ সত্যরাজ খাঁ ও তৎপুত্র রামানন্দ বসুকে প্রাতসন পট্টডোরী দিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন; যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীল চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—।

কুলীনগ্রামী রামানন্দ, সত্যরাজ খান।
তারে আজ্ঞাদিল প্রভু করিয়া সন্মান॥
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতিবর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ॥
এত বলি দিল তাঁরে ছিঁড়া পট্টডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি॥
এই পট্টডোরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান।
দশমূর্ত্তি ধরি যিঁহো সেবে ভগবান॥
ভাগ্যবান সত্যরাজবসু রামানন্দ।

প্রতিবৎসর গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ সঙ্গে।
পাটডোরী লইয়া আইসে অতিবড় রঙ্গে॥

শ্রীমন্মহা প্রভুর এই আদেশ ও গুরুবাক্য অবহেলন জন্য আমার অনুতাপ উপস্থিত হইল। আমি আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম; আমার অত্যন্ত আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হইল। আমি কাল বিলম্ব না করিয়া পট্টডোরী প্রস্তুত করাইবার জন্য রেশম সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

পট্টডোরী জিনিসটা কি, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণকে বুঝাইয়া বলা কর্ত্তব্য। ইহা রেশমের এক প্রকার স্থূলচেন বা কাছী। সাদা, কাল, লাল ও হরিদ্রা বর্ণের রেশম দিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়; দেখিতে বড়ই সুদৃশ্য; প্রতি-বৎসর দুইগাছী করিয়া পাঠাইতে হয়; ইহার এক এক গাছী লম্বায় ২৪ হাতের ন্যূন নহে; ষ্টীমারের রসির ন্যায় স্থূল। আটগাছী রসিতে একগাছী প্রস্তুত হয়; ছান্দে চারি রঙ্গের ফুল উঠিতে থাকায় দেখিতে মনোহর হয়। ইহা অত্যন্ত দৃঢ় সহজে ছিঁড়িবার নহে।

৺জগন্নাথদেব বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি, সহজে তাঁহাকে স্থানান্ত-রিত করা দুঃসাধ্য। একারণ চন্দনযাত্রা দোলযাত্রা প্রভৃতি বিবিধ যাত্রা প্রতিনিধি দ্বারায় সম্পন্ন করিতে হয়; কেবল রথযাত্রা ও স্নানযাত্রায় এবং অনবসরযাত্রায় স্বয়ং জগন্নাথ

রত্নবেদী হইতে যখন তাঁহার বিজয় আরম্ভ হয়, তখন পাণ্ডাগণ তাঁহাকে এই পট্টডোরী দ্বারায় বন্ধন করেন, এবং লোকে যেমন কাছী দিয়া রথ টানে তেমনি পাণ্ডাগণ এই পট্টডোরীর সাহায্যে তাঁহাকে টানিয়া বাহিরে লইয়া যান ও রথস্থ করেন। রথস্থ হইলে পাছে রথ হইতে পড়িয়া যান এই আশঙ্কায় রথোপরি থাম্বার সহিত এই পট্টডোরীর দ্বারায় ঠাকুরকে বন্ধন করিয়া রাখা হয়। স্নান পিঁড়ি বা গুণ্ডিচা মন্দিরে অবস্থিতি কালীন ঠাকুরকে এইরূপেই বন্ধন করিয়া রাখা হয়। যখন শ্রীমন্দিরে রত্নবেদীতে থাকেন তখন সময় সময় এই পট্টডোরী দ্বারায় ৺জগন্নাথ দেবকে সাজাইয়া দেওয়া হয়; তিনি ইহা মালাস্বরূপ আপন অঙ্গে ধারণ করেন; দেখিতে বেশ শোভা হয়।

আমরা পট্টডোরীর সেবাইত, একারণ রত্নবেদী হইতে ঠাকুরকে স্থানান্তরিত করিবার সময় চিরপ্রথানুসারে আমাদের একজনকে উপস্থিত থাকিয়া ঠাকুরকে বন্ধন করিবার অনুমতি দিতে হয়। আমরা বহুদূরবাসী, পূর্ব্বে রাস্তাতে বিপদ সঙ্কুল ছিল, প্রত্যেক বিজয় কালীন, আমাদের উপস্থিত থাকা সম্ভবপর নহে, একারণ পুরুষানুক্রমে পুরুষোত্তমে আমাদের প্রতিনিধি স্বরূপ একজন পাণ্ডা নিযুক্ত আছেন; তিনি এই সকল কাজের জন্য রাজসরকার হইতে কিছু কিছু পাইয়া থাকেন। এই সময় বৃদ্ধ ভুবনমিশ্র আমাদের প্রতিনিধি পাণ্ডা ছিলেন।

আমি অনুতপ্ত হৃদয়ে পট্টডোরী প্রস্তুতের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এমন সময় এক দিন সন্ধ্যার পর আমার বাসার নিকটস্থ রাস্তার উপর একজন বৃদ্ধ পাণ্ডা আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

পাণ্ডা—হরিদাস বাবু উকিলের বাসা কোথায়? আমি কোন্ পথে তাঁহার বাসায় যাইব?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাধুর বেশ দেখিয়া আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করতঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

আমি—আপনি কে, কোথা হইতে আসিতেছেন?

পাণ্ডা—(আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন) আমি ৺জগন্নাথ দেবের পাণ্ডা, পূরী হইতে আসিতেছি; আপনি কি হরিদাস বাবু?

আমি—আমি বাবু নহি একজন মহাপাষণ্ড। আমার নাম হরিদাস বসু।

পাণ্ডা রাস্তায় দাঁড়াইয়া আমার সহিত অনেক কথা-বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, আমার নাম জয়কৃষ্ণপাণ্ডা, আমি আপনাদের বাটী হইতে ৬০ বাটী বৎসর যাবত পট্টডোরী লইয়া যাইতেছি; বড়ই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, ১০।১২ বৎসর কাল ৺জগন্নাথ দেবের পট্টডোরী যায় নাই; যে সমস্ত পুরাতন পট্টডোরী ছিল তদ্দারায় এত দিন চলিল, এক্ষণ সমস্ত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; রথযাত্রার উপায় নাই; রাজা আমাকে পট্টডোরীর জন্য

পাঠাইয়াছেন ; রাজা বলিয়াছেন—“যে উপায়েই হউক পট্টডোরী আনিতেই হইবে। যদি কুলীনগ্রামের বসু বংশীয়েরা দরিদ্র হইয়া থাকেন, তাহাদিগকে টাকা দিয়া পট্টডোরী প্রস্তুত করাইয়া আনিতে হইবে।” পট্টডোরীর জন্য যত টাকা প্রয়োজন রাজসরকার দিতে প্রস্তুত আছেন। আমি মাসাধিক কুলীনগ্রামে আসিয়াছি পট্ট-ডোরীর কোন উপায় হইল না। তাহার পর জৌগ্রামে গেলাম, সেখানেও কোন উপায় হইল না ; তথায় একটী-লোক আপনার নাম করায় এখানে আসিয়াছি ; আপনি ইহার ব্যবস্থা করুন। এবার যাহাতে পুরুষোত্তমে পট্ট-ডোরী যায়, আপনাকে তাহার উপায় করিতেই হইবে। পট্টডোরী অভাবে সাল গাছের ছাল তুলিয়া ঠাকুরকে বন্ধন করিয়া রাখা হইতেছে এবং অতি কষ্টে যাত্রাদি নির্ব্বাহ হইতেছে, ঠাকুরের ক্লেশের সীমা নাই।

পূর্ব্ব হইতে আমার মন প্রস্তুত হইয়াছিল, পাণ্ডার এই কথা শুনিয়া আমার মন আরও দ্রবীভূত হইল। আমি মনে মনে ৺জগন্নাথ দেবকে প্রণাম করিয়া বলিলাম—“ঠাকুর, এত দয়া না হইলে আমার কি আর রক্ষা ছিল! যথার্থই পতিতপাবন নাম গ্রহণ করিয়াছ। তুমিই ধন্য, তুমিই [illegible] তোমার দয়া।”

অ[illegible] সঙ্গে করিয়া বাসায় আসিয়া আহা-[illegible]

আমি—এবার নিশ্চয়ই পট্টডোরী যাইবে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন।

পাণ্ডা—কত টাকা লাগিবে ?

আমি—টাকার প্রয়োজন নাই, আমার পৈতৃক সেবা, আমি সেবা চালাইব। আপনার উদ্বেগের কারণ নাই।

পাণ্ডা আমার বাসায় আহারাদি করিয়া পরদিন চলিয়া গেল। আমি সময় মত পট্টডোরী প্রস্তুত করিয়া পুরুষোত্তম পাঠাইয়া দিলাম। আমি পট্টডোরী ভাঙ্গিতে জানিতাম না। কাছীর ন্যায় পাকাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। যাহা হউক এবারকার মত ইহাতেই কাজ চলিল; পর বৎসরের জন্য পুরী হইতে ছিন্ন পট্টডোরীর নমুনা আসিল। আমি নানা স্থান হইতে শিল্পি আনাইলাম কিন্তু পট্টডোরীর নমুনা দেখিয়া কেহই পট্টডোরী প্রস্তুত করিতে পারিল না, তখন আমার মনে হইল, যে ব্যক্তি পূর্ব্বে পট্টডোরী প্রস্তুত করিতেন তিনি বাঁকুড়ায় আছেন। আমি তাঁহাকে বাঁকুড়া হইতে আনাইয়া তদ্দারায় বৎসর বৎসর পট্টডোরী প্রস্তুত করিয়া পুরীমোকামে পাঠাইতে লাগিলাম। শেষে নিজে শিক্ষা করিয়া নিজ হস্তে পট্টডোরী প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি।

কালাচাঁদ।

বোলপুরে যখন হরিনাম সংকীর্ত্তনের প্রবল বন্যা আরম্ভ হ'ল তখন কোথা হইতে একটা কাল কুকুর আসিয়া বাসায় উপস্থিত হইল। এই কুকুরটা অন্য কুকুরের ন্যায় ঝগড়া করিত না; খাবার দিলে যদি অন্য কুকুর আসিয়া সেই খাবারে মুখ দিত তাহা হইলে সে সরিয়া যাইত, আর উহা খাইত না; সংকীর্ত্তনের সময় কোথায়ও যাইত না। সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিত, সংকীর্ত্তনের দলকে রীতিমত প্রদক্ষিণ করিত। জিব বাড়াইয়া ভক্ত-দলের পদ-ধূলা গ্রহন করিত; হরিরলুট কুড়াইয়া খাইত। সংকীর্ত্তন বাহির হইলে, কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে যাইত। পাণ্ডত মহাশয় আদর করিয়া এই কুকুরের নাম রাখিয়া-ছিলেন"কালাচাঁদ"। তিনি কালাচাঁদ বলিয়া কুকুরকে ডাকি-তেন; এই কালাচাঁদ সংকীর্ত্তন দলের মধ্যে একজন গণ্য হইলেন। যখন সকলে আহারে বসিতেন, কালাচাঁদের জন্যও একটা স্বতন্ত্র পাত হইত। যেমন সকলে আহারে বসিত, কালাচাঁদও আপনার পাতে আহার করিত।

অল্পদিন পরেই কালাচাঁদের মধ্যে সাত্বিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল, সংকীর্ত্তন সময়ে তাহার [illegible]রে

রীতিমত স্বেদ ও কম্প হইত, চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া অশ্রুপাত হইত, এবং সে রীতিমত সমাধিস্থ হইত; তাহার আদৌ হুঁস থাকিত না। সংকীর্ত্তনে সে যখন সমাধিস্থ হইত তখন তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া উঠাইলে সে চারি পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিত না। হাত ছাড়িয়া দিলে নিমীলিত নেত্রে পড়িয়া যাইত। আমরা সকলে অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কুকুরের এমন ভাব কখনও দেখি নাই। কয়েক বৎসর এখানে থাকার পর কুকুরটা সকলের অজ্ঞাতে হঠাৎ কোথায় চলিয়া গেল। কেহ তাহার সন্ধান পাইল না। আমি গ্রাম গ্রামান্তরে খোঁজ করিলাম, কোথায়ও অনুসন্ধান পাইলাম না!

এবার ফাল্গুন মাহায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা সমারোহের সহিত নির্ব্বাহ হইল। ঠাকুরদের ভোগ পূজা কীর্ত্তনের অবধি রহিল না।

চৈত্রমাস হইতে আমার বর্ত্তমান মুহুরি তিনকড়ি সরকার, গৌরকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলরতন সরকার প্রভৃতির দীক্ষা কার্য্য শেষ হইল।

কুকুরের এই অবস্থা দেখিয়া আমার নিজের প্রতি নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। পরে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে এই কুকুরের কথা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি বলিলেন এই কুকুরটা অতি ভাগ্যবান, পুর্ব্ব জন্মে একজন পরম সাধু ছিল। অপরাধ বশতঃ কুকুরযোনি

প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্যাণ্ডারিয়ার আশ্রমেও এইরূপ একটা কুকুর ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

আমি—কুকুর আদি ইতর জন্তুর কি আত্মা আছে ?

গোঁসাই—ইতর জন্তু কেন বৃক্ষ লতাদিরও আত্মা আছে। অনেক মহাত্মা বৃক্ষদেহ ধারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছেন।

আমি—শুনিয়াছি শ্রীবৃন্দাবনে শিরোমণি মহাশয়ের ঠোরে এক বৃক্ষ আপনাদের কীর্ত্তন শুনিয়া নৃত্য করিয়াছিল ?

গোঁসাই—হাঁ, খুব নৃত্য করিয়াছিল।

আমি—গাছ কিরূপে নৃত্য করিয়াছিল ?

গোঁসাই—আদৌ বাতাস ছিল না, তথাপি কীর্ত্তন সময়ে বৃক্ষের ডালগুলি এমনি ভাবে দুলিতে লাগিল যে দেখিয়া বেশ বুঝা গেল বৃক্ষ নৃত্য করিতেছে।

আমি—বৃক্ষের কি জ্ঞান আছে ?

গোঁসাই—জ্ঞানময় দেবতা সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন—বৃক্ষের জ্ঞান নাই এ কথা কে বলেন ?

জ্যেষ্ঠ পুত্রের অন্নপ্রাশন।

১২৯৬ সালের আশ্বিন মাহায় সাধু অঘোরনাথের প্রেতাত্মা (spirit) যোগ শিক্ষার্থ আমাকে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে দীক্ষা দিলেন; যোগের কোন কথা বলিলেন না। আমিও তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। স্পিরিটের আবির্ভাবও বন্ধ হইয়া গেল। আমি ভাবিতে লাগিলাম এ ব্যাপারটা কি হইল? স্পিরিট যোগ শিক্ষার জন্য আমাকে যে এত কথা বলিলেন এ সব কি মিথ্যা? আমাকে গুরু সন্নিধানে পাঠাইবার জন্য স্পিরিট কি মিথ্যা প্রলোভন বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন? আমি একাল পর্য্যন্ত স্পিরিটের কথার কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই।

এতদিনের পর আমার আত্মদর্শন উপস্থিত হইল। একদিন বেলা ১টার সময় আমি বিছানায় বালিস ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছি, এমন সময় দেখি আমার সম্মুখে আর একজন দাঁড়াইল, আমি আস্তে আস্তে আসিয়া দাঁড়াইলাম; দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি প্রত্যেক লোম গাছটী পর্য্যন্ত

সুস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। ভাল আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব যেরূপ দেখা যায়, ইহাও ঠিক সেইরূপ।

ইহার পর মাঝে মাঝে ঠিক এইরূপ দর্শন হইতে লাগিল; দেব দর্শনও আরম্ভ হইল; আবার এক একটী করিয়া যোগাঙ্গ * সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমি যোগের কোন ধার ধারি না, অথচ আপনা হইতে এই সব ব্যাপার উপস্থিত হইতে লাগিল। আমি নিজের অবস্থা দেখিয়া নিজেই অবাক হইতে লাগিলাম। আত্ম-শক্তির কোনরূপ পরিচালনা নাই, কেবল গুরুদত্ত নামেই এই সব ব্যাপার আপনা হইতে উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন আসল আর নকলের প্রভেদ দেখিতে পাইলাম। ভগবানের নামে যে প্রাণায়াম হয়, হাজার চেষ্টাতেও সেরূপ প্রাণায়াম হয় না; তদ্রূপ অপরাপর অঙ্গগুলির আসল আর নকলের পার্থক্য দেখা যাইতে লাগিল।

আমি কলিকাতা গিয়া গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এসব কি? গুরুদত্ত নামে এমন হয় কেন? তিনি উত্তর করিলেন—যোগ সাধারণতঃ দুই প্রকার (১) হটযোগ, (২) রাজযোগ। হট যোগের যোগীকে

---

* যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি।

গুরু সন্নিধানে বিবিধ শারীরিক ক্রিয়া শিক্ষা করিতে হয় এবং বহু সাধনের প্রয়োজন হয় ; এই যোগে সিদ্ধ হইলে যোগী অষ্টাদশ সিদ্ধি * লাভ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে অষ্ট সিদ্ধি প্রধান। তিনি জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া

---

* অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা তথা,
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামবসায়িতা।

১। অনিমা—অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মাবস্থা, স্বীয় শরীরকে স্বেচ্ছানুসারে সূক্ষ্ম করিবার ক্ষমতা, এই শক্তি প্রভাবে যোগিগণ নিজ শরীর ইচ্ছানুরূপ সূক্ষ্ম করিয়া সকলের অলক্ষভাবে সর্ব্বস্থানে বিচরণ করেন।

২। লঘিমা—স্বীয় শরীরকে লঘু করিবার ক্ষমতা।

৩। ব্যাপ্তি—দেহ ইচ্ছানুসারে বিস্তৃত করিবার ক্ষমতা।

৪। প্রাকাম্য—ভোগেচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা, যোগী যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই লাভ করিবে।

৫। মহিমা—স্বীয় শরীরকে ইচ্ছানুরূপ স্থূল করিবার ক্ষমতা।

৬। ঈশিত্ব—সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা।

৭। বশিত্ব—সকলকে বশ করিবার ক্ষমতা।

৮। কামবসায়িতা—আপনার সর্ব্ব কামনা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা।

এই আট প্রকার সিদ্ধিকে অষ্টসিদ্ধি বলে।

সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণা যোগপারগৈঃ।
তাসামষ্টৌ মৎ প্রধানা, দশৈব গুণহেতবঃ ॥
অনিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।

যাইতে পারেন ; ইচ্ছামাত্রে বিবিধ জিনিষের সৃষ্টি করিতে পারেন ; দেওয়াল ভেদ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন ; জলের নীচে ডুবিয়া বা মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়া থাকিতে পারেন ; এইরূপ যোগী ইহাতে বিবিধ অলৌকিক শক্তি লাভ করেন। ইহাতে শরীর সুস্থ ও দীর্ঘজীবন লাভ হয়।

এই যোগে ধর্ম্মলাভ হয় না, ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই * ইহাতে ভগবৎ প্রাপ্তি দূরে থাকুক; সংসার ক্ষয়ই হয় না। কাম ক্রোধাদি রিপুগণের আধিপত্য সমভাবে থাকিয়া যায়। প্রবৃত্তি দমিত হয় না। ভারতবর্ষের নাথ-সম্প্রদায়ের যোগীরা এই সম্প্রদায়ভুক্ত ; ইহারা কাণে কাটের কুণ্ডল ধারণ করে, সাধারণতঃ ইহাদিগকে কাণফাটা যোগী বলে।

তোমাদের যে সাধন তাহা রাজযোগ। ইহার একমাত্র গুরু স্বয়ং ভগবান্ ; ইহাতে অবিশ্রান্ত গুরুদত্ত নাম জপ করিতে হয়। মনের মধ্যে একটু অহঙ্কার বা অভিমান উপস্থিত হইলে আর রক্ষা নাই ; সকলের পদানত

গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১।১৫।৩-৫ ॥

* অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ ॥ ১১।১৫।৩৪

ও অদোষদর্শী হইয়া নাম করিতে হইবে। নাম করিতে করিতে সমস্ত দেহ নামময় হইয়া যাইবে; ভাগবতীতনু লাভ হইবে। পঞ্চম পুরুষার্থ যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তাহা এই সাধনেই লাভ হইবে। ভক্তেরা যোগৈশ্বর্য্য চান না, তথাপিও সর্ব্বপ্রকার যোগৈশ্বর্য, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি তাঁহাদের লাভ হইয়া থাকে। ইঁহারা ভক্তিদেবীর দাসী—ভক্তিদেবী যেস্থানে যান, ইঁহারাও তাঁহার অনুগমন করেন।

হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্ব্বামুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যা শ্চেটিকা বদনুব্রতাঃ॥ নারদ পঞ্চরাত্রম্

হটযোগী গোরক্ষনাথ নিজের ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া নানকজীকে শিষ্য করিবার চেষ্টা করিতেন, গোরক্ষনাথ বলিতেন নানক! তুমি বসিয়া কি করিতেছ, আমার নিকট যোগ শিক্ষা কর, কত ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে। নানকজী ভগবদ্ভক্ত, তিনি বলিতেন—আমি যোগ বুঝি না, আমার কোন ঐশ্বর্য্যেরও প্রয়োজন নাই; ভগবানের পাদমূলে পড়িয়া থাকিতে পারিলেই জীবন সার্থক মনে করি। এই কথা শুনিয়া যোগৈশ্বর্য্য দেখাইয়া নানকজীকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য গোরক্ষনাথ একদিন বলিলেন,—নানক! চল একবার সিংহল বেড়াইয়া আসি। নানকজী বলিলেন—আমার যাইবার ক্ষমতা নাই, আপনি যান। গোরক্ষনাথ মুহূর্ত্ত মধ্যে সশিষ্য সিংহলে উপস্থিত হইলেন; তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন নানকজী বসিয়া রহিয়াছেন।

গোরক্ষনাথ নানকজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কেমন করিয়া এখানে আসিলে ? নানকজী উত্তর করিলেন--আমি কিছু জানি না, এমনি এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। একদিন গোরক্ষনাথ ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত করিয়া সমস্ত অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দিলেন এবং নানকজীকে ঠকাইবার জন্য তাঁহাকে বলিলেন—কোথাও একটু আগুণ পাইতেছি না, আমাকে একটু আগুণ দাও। নানকজী তৎক্ষণাৎ অগ্নি প্রদান করিলেন ইহাতে গোরক্ষনাথ অবাক হইয়া গেলেন। তৎপর নানা ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াও যখন নানকজীর নিকট পরাস্ত হইলেন, তখন নানকজীকে শিষ্য করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। আমাদের সাধন রাজযোগ, এই কথা শুনিয়া স্পিরিটের কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা আমার প্রতীতি হইল। রাজযোগ সুদুর্লভ, ইহা সকলের ভাগ্যে লাভ হয় না। কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ইহা লাভ করিয়া থাকেন। ভগবান কৃপা করিয়া যাঁহাকে দেন কেবল তিনিই প্রাপ্ত হন। ভক্তিশাস্ত্রে লিখিত আছে :—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ* কৃপায় পায় ভক্তি লতা বীজ† ॥

---

* গুরু কৃষ্ণ গুরুরূপী কৃষ্ণ অর্থাৎ সদ্‌গুরু ;
অন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুণ্বণাচার্য্য চৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।

† ভক্তিলতাবীজ—গুরুশক্তি বা ভগবৎশক্তি ...

মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদী যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদী পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হয়ে ধরে প্রেমফল।
ইহা মালী নিত্য সেচে শ্রবণ আদি জল॥
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুকি যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হাতি যৈছে না হয় উদ্গম॥

সাধারণকে বুঝাইয়া বলিবার ভাষা নাই, বলিলেও কেহ বুঝিবেন না। যাঁহাদের মধ্যে* সদ্‌গুরু কর্ত্তৃক শক্তি সঞ্চার হইয়াছে এবং সাধনবলে সেই শক্তি কতক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। জীব ভগবানের মায়া-শক্তি দ্বারায় অভিভূত। জীব-শক্তি দ্বারায় মায়া-শক্তি প্রতিহত করা অসম্ভব; এজন্য মায়াতীত অবস্থা লাভ করিতে হইলে এই ভক্তি লতাবীজ (ভগবতশক্তি বা গুরুশক্তি)

কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা ॥
নিষিদ্ধাচার কুটীনাটী জীব-হিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥
সেক জল পেয়ে উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হয়ে মূল শাখা বাড়িতে না পায় ॥
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বী মালী কল্পবৃক্ষ পায় ॥
তাঁহা সেই কল্প বৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন ॥
এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা উনবিংশ পরিচ্ছেদ রূপ-গোস্বামী প্রতি মহাপ্রভু বাক্য।

কঠোপনিষৎ প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় বল্লীর ২৩ শ্লোকে লিখিত আছে—

“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণু   লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূংস্বাম ॥

এই পরমাত্মাকে প্রকৃষ্ট বচন, মেধা বা বহু শাস্ত্র জ্ঞান দ্বারায় লাভ করা যায় না; যাহাকে ইনি বরণ করেন কেবল তাহার দ্বারাই ইনি লভ্য; তাঁহার নিকটে ইনি স্বকীয় তনু প্রকাশ করেন।

এই শ্লোকে যে বরণ করার কথা লিখিত হইয়াছে ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে সদ্‌গুরু রূপে তিনি যাহাকে নিজের শক্তির আশ্রয়ে গ্রহণ করেন। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে সদ্‌গুরুর নিকট ভগবত, শক্তি লাভ করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

এই শক্তি সঞ্চার ব্যাপারে বিদ্বান বুদ্ধিমান মেধাবী বা তপস্বী লোকের প্রয়োজন নাই। ভগবান্ সদ্‌গুরু-রূপে বালক-বৃদ্ধ-বনিতা মুর্খ যাঁহাকে ইচ্ছা তাঁহাকেই আপন শক্তির আশ্রয়ে গ্রহণ করিয়া আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাতে জাতির বিচার নাই, জ্ঞান গরিমার পার্থক্য নাই।'

শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলায় এই শ্রুতি-বাক্যটী অতি মধুর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বনমধ্যে বংশীধ্বনি করিলেন; গোপিগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে লইয়া রাসলীলা করিলেন। ভগবানের বংশীধ্বনিতে ব্রহ্ম কটাহ পর্য্যন্ত ভেদ হইয়া যায়; কত যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, ব্রহ্মজ্ঞানী,

শুনিতে পাইলেন না; ভগবানের গুণ গান কাহারও শ্রুতি-গোচর হইল না, কেবল নিরক্ষর বিদ্যাবুদ্ধি হীনা কতক গুলি গোপাঙ্গনা ভগবানের এই গান শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিতা হইলেন; আর ভগবান্ তাঁহাদিগকে লইয়া রাসলীলা * করিলেন। গোপীগণ "কৃষ্ণ গৃহীত চেতা" হইয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকায় ভাগবতকার দেখাইতেছেন ভগবত প্রাপ্তির পক্ষে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য কিছুরই প্রয়োজন নাই, ভগবান্ যাহাকে অঙ্গীকার করিবেন, কেবল সেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবেন।

যাঁহারা মনে করেন বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য বা তপস্যা বলে ভগবানকে লাভ করিবেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কেবল পুরুষকার বলে ভগবানকে লাভ করিতে যাওয়া আর সূর্য্যরশ্মি ধরিয়া সূর্য্যমণ্ডলে গমন করা একই কথা। গুরুশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে কাহার সাধ্য যে একটী রিপু বা একটী সামান্য প্রবৃত্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়?

মানুষ পুরুষকার বলে রিপুগণকে ও প্রবৃত্তি সকলকে কিছুদিনের জন্য দমন করিয়া রাখিতে পারে; তখন তাহারা পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় ভিতরে গর্জ্জন করিতে থাকিবে, কিন্তু দিন কয়েক পরে যেমনি পিঞ্জর ভাঙ্গিবে অমনি লম্ফ প্রদান করিয়া একেবারে তাহাকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে।

অনেক ধর্ম্ম প্রাণ লোকের সহিত আমার বহুকাল যাবৎ আলাপ আছে, আমার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও আছে; তাঁহারা জীবনভোর অকপটে যথেষ্ট সাধন-ভজন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এক গুরুশক্তির অভাবে ধর্ম্মপথে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ভাব যতটুকু ততটুকু আছে, বরং বার্দ্ধক্যে গাত্রশক্তির লাঘব হওয়ায় ধর্ম্মভাব ম্লান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা গুরুশক্তি লাভ করেন নাই তাঁহারা সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইবেন যে, কেবল পুরুষকার দ্বারায় তাঁহাদের সামান্য একটী প্রবৃত্তিরও হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই।

ভগবান সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, তিনি ইচ্ছা করিলে না করিতে পারেন, এমন কিছু নাই, একথা সত্য। কিন্তু তিনি যে নিয়ম করিয়াছেন সেই নিয়ম মত চলিতে হইবে। আম খাইতে হইলে আম গাছ হইতে আম লইতে হইবে; কাঁটাল তলায় আম পাওয়া যাইবেনা, আকাশ হইতেও ঝর্ ঝর্ করিয়া আম পড়িবে না। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে সদ্‌গুরুর নিকট গুরুশক্তি লাভ করিতে হইবেই হইবে; ইহা ভগবানের অব্যর্থ নিয়ম। এই নিয়ম চিরকাল চলিয়া আসিতেছে।

আদি গুরু নারায়ণ হইতে এই গুরুশক্তি চিরকাল

শিষ্য পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট এই শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীর নিকট এই শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেশের অত্যন্ত দুরবস্থা দেখিয়া ইদানীং গোস্বামী মহাশয় ভগবানের ইঙ্গিতে বহু গৃহস্থ ও উদাসীন লোককে এই গুরু-শক্তি বিতরণ করিলেন।

বর্ত্তমান গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শক্তির অভাব হওয়ায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ম্লান হইয়া পড়িতেছে।

১৩০৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে পুত্রের অন্নপ্রাশন হইল, এই উপলক্ষে কুলীনগ্রাম হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পুরোহিত ও আত্মীয় স্বজনগণ বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রাদ্ধাদি বৈদিক ক্রিয়াকলাপ দাদামহাশয় যথাশাস্ত্র সম্পন্ন করিলেন। আমার অন্তরে এমনি পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজা ব্যতিরেকে কোন অনুষ্ঠানই আমার মনে অনুষ্ঠান বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ পূজা ব্যতিরেকে অন্নপ্রাশনে আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমি শ্রীনিত্যানন্দ বংশীয়, আচার্য্য প্রভুর বংশীয় অনেক ভক্ত গৃহস্থ ও উদাসীন বৈষ্ণবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া পঞ্চতত্ত্বের পূজা করাইয়া ও ভোগ দেওয়াইয়া মহোৎসব আরম্ভ করিয়া দিলাম।

কীর্ত্তনের খুব জমাট হইল, একজন আচার্য্য বংশীয়

ভক্ত ব্রাহ্মণ (মাধবেন্দ্র চট্টরাজ) ছেলেকে কোলে লইয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। বালক ঐ ব্রাহ্মণের কোলে এমনি তেজের সহিত নাচিতে লাগিল, যে ব্রাহ্মণ আর ছেলেকে কোলে রাখিতে পারিলেন না ; আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার ছেলে এত তেজের সহিত নাচিতেছে, যে আমি উহাকে কোলে রাখিতে পারিতেছি না, তোমার ছেলে সামান্য ছেলে নয়, এই শিশুর কীর্ত্তনে এত অনুরাগ ও এমন অবস্থা।" মহোৎসব শেষ হইল, ভক্তগণ আপন আপন গৃহে চলিয়া গেলেন ; আমি পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে সাধন-ভজন ও নাম সংকীর্ত্তনে জীবন যাপন করিতে লাগিলাম।

গুরু দর্শনে কলিকাতা গমন।

—*—

এখানে জ্যেষ্ঠপুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গোস্বামী মহাশয় তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, এক মহাপুরুষ হরিদাস বাবুর সন্তানরূপে ভূমিষ্ঠ হইলেন। ঐ সন্তান পূর্ব্বে কে ছিলেন তাহাও বলিয়াছিলেন, এসব কথা এ পর্য্যন্ত আমি কিছুমাত্র টের পাই নাই। ১৩০৩ সালের ভাদ্র মাহায় কলিকাতা হইতে এক পত্র পাইলাম, তাহাতে লেখা আছে "আপনি পুত্রসহ কলিকাতায় আসিবেন"। এই পত্র পাইয়া আমি জন্মাষ্টমীর বন্ধে সপরিবারে কলিকাতা রওনা হইলাম। তখন গোস্বামী মহাশয় ৪৫ নং হ্যারিসন রোডের বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। আমি ঐ বাসায় উপস্থিত হইয়া গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করিলাম তাঁহার ঘরে কোন স্ত্রীলোক প্রবেশ করিবার নিয়ম ছিল না, একারণ বাহির হইতে কপাটের আড়ালে থাকিয়া আমার পত্নী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে দেখিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন ;—

গোঁসাই—কি, পুত্র হইয়াছে ?

আমি—আজ্ঞে বৃদ্ধবয়সে পুত্র; মহাবিপদ; অসময়ের সন্তান কোন কাযে লাগে না।

স্ত্রীকে দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, ছেলেকে কোল হইতে নামাইয়া দাও; তিনি ঘরের দরজার বাহির হইতে ছেলেকে নামাইয়া দিলেন; বালক হামাগুড়ী দিয়া দ্রুতবেগে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র দক্ষিণ হস্তের দ্বারায় আকর্ষণ করিল; ক্ষণ-কাল মধ্যে বস্ত্র ত্যাগ করিয়া হামাগুড়ী দিয়া ঘুরিয়া গিয়া গোস্বামী মহাশয়ের দক্ষিণ দিকস্থ শ্রীমদ্ভাগবত আদি সজ্জী-কৃত বিবিধ ভক্তিশাস্ত্রগুলির উপর আপন দক্ষিণ হস্ত অর্পণ করিল। তৎপর হামাগুড়ী দিয়া দ্রুতবেগে মায়ের কোলে গিয়া উঠিল। গোস্বামী মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

গোঁসাই—আপনার পুত্র কি বলিল তাহা কিছু বুঝিতে পারিলেন?

আমি—কই, ছেলেত কোন কথা বলে নাই; সেত কথা কহিতে শিখে নাই।

গোঁসাই—তোমার ছেলে দুইটী কথা বলিল। আমার গৈরিক বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া বলিল "বৈরাগ্য" ও ভক্তিশাস্ত্রে হস্তস্থাপন করিয়া বলিল "ভক্তি" এই জগতে বৈরাগ্য ও ভক্তি এই দুইটী মাত্র জিনিস আছে, এই কথা বলিল।

আমি—এই পুত্র এতদিন জন্ম লাভ করে নাই কেন?

গোঁসাই—পূর্ব্বে জন্ম হইলে তুমি কি ইহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতে?

আমি—ইনি কি কোন কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন?

গোঁসাই—না, ইহার কর্ম্মফল ভোগ করিবার কিছুই নাই।

আমি—ইনি কি নিয়তির অধীন?

গোঁসাই—না ইনি কোন নিয়তির অধীন নহেন, আপন ইচ্ছায় আসিয়াছেন, আপন ইচ্ছায় যাইবেন। যদি আদর যত্ন করিয়া রাখিতে পার তবে থাকিবে, নতুবা উড়পাখী উড়িয়া যাইবে।

আমি—যদি ইনি নিয়তির অধীন নহেন, কোন কর্ম্মফল ভোগ করিতেও আসেন নাই, তবে এই দুঃখ যন্ত্রণাময় পৃথিবীতে কেন আসিলেন?

গোঁসাই—বংশ উজ্জ্বল করিবার জন্য।

ইহার পর গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বালকের আর কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম না। ফলত শিষ্যগণ তাঁহার অসাক্ষাতে বলিলেন গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্বেই এই বালকের পরিচয় দিয়াছেন; ইনি আপনার পূর্ব্ব-পুরুষ সত্যরাজ খান (লক্ষ্মীকান্ত বসু)। গোস্বামী মহাশয় আদর করিয়া বালকের নাম রাখিলেন "গোপীজনবল্লভ"।

এইবার শুনিলাম গোস্বামী মহাশয়ের বসিবার আসনে

দেবমূর্ত্তি ও হরিনামের ছাপ পড়ে। একদিন তিনি আসন হইতে উঠিয়া পায়খানায় গেলে, দেখিলাম তাঁহার আসনে অতি সুন্দর চিত্র পড়িয়াছে; একটী শিবমন্দির, মন্দিরের ভিতর শিবলিঙ্গ, শিবলিঙ্গের উপর বিল্বপত্র; মন্দিরের উপর ত্রিশূল; ঢাকী ঢাক স্কন্ধে করিয়া বাজাইতেছে; অনেক লোকের সমাগম হইতেছে; তাহাদের অনেকেই পূজোপকরণ হাতে লইয়া শিবপূজা করিতে আসিয়াছে; আর কেহ কেহ দর্শক; তাঁহারা শিবপূজা দেখিতেছেন। আমি স্থিরভাবে এই চিত্রটী দেখিতে লাগিলাম। অতি সুনিপুণ চিত্রকর ব্যতীত এমন সুন্দর চিত্র কেহ আঁকিতে পারে না। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল আসনোপরি এই চিত্রটী থাকিল, তারপর মিলাইয়া গেল; আর নয়ন গোচর হইল না। আর একদিন ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত ভগবানের পাদ-পদ্ম, যোড়া যোড়া এই আসনোপরি পড়িতে দেখিলাম প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঐ পাদপদ্মের চিহ্ন আসনোপরি থাকিল; তাহার পর অদৃশ্য হইল।

এই সময় হইতে আরও আশ্চর্য্যজনক অনেক ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম। প্রত্যহ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ভগবদ্গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত আদি ভক্তি-শাস্ত্র পাঠ হইত। যখন ভগবদ্গীতা পাঠ হইত তখন অর্জ্জুনের রথোপরি শ্রীকৃষ্ণ অশ্বের রজ্জু ধরিয়া উপ-বিষ্ট আছেন এই চিত্র আসনোপরি পড়িত। যখন মহা-

ভারতের কোন যুদ্ধের বিবরণ পাঠ হইত তখন কুরু ও পাণ্ডব সেনার যুদ্ধ বিষয়ক চিত্র আসনোপরি পতিত হইত। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যখন যুদ্ধের বর্ণনায় সেনাপতির মস্তক ছেদন পাঠ শেষ হইত সেই সময় হইতে চিত্রস্থ সেনাপতির মস্তক আর দেখা যাইত না। কখন কখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠকালীন ভক্তগণের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন ও নৃত্য আসনোপরি অঙ্কিত হইত; এই সমস্ত প্রহেলিকার মধ্যে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি কিছুতেই প্রবেশ করিত না; আমি অবাক্ হইয়া দেখিতাম আর ভাবিতাম এ সব কি!

মহাভারত পাঠ আমার ভাল লাগিত না; সেই জন্য মহাভারত পাঠের সময় আমি অধিকক্ষণ সেস্থানে থাকিতাম না। একদিন মহাভারত পাঠান্তে গোস্বামী মহাশয় আমাকে বলিলেন;—

গোঁসাই—শুনিলে? আহা, দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠির সংবাদ কেমন মধুর? কি সারগর্ভ উপদেশ।

আমি—আপনি কি বলিতেছেন? দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠির সংবাদটা আবার পড়িবার না শুনিবার বিষয়? ইহাতে কি বর্ণিত হইয়াছে? দ্রৌপদী রাজ্য হারাইয়া ও অপমানিতা হইয়া দুঃখে ঘোর সংসারী স্ত্রী-লোকের ন্যায় ক্রন্দন করতঃ স্বামীগণের নিকট আপনাদের দুঃখ ক্লেশের কথা বলিতেছেন, আর

যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিতেছেন, ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকিলে পরিণামে মঙ্গল হইবে, জয়লাভ হইবে ; শত্রুগণ পরাজিত ও নষ্ট হইবে, নষ্ট রাজ্য উদ্ধার হইবে। গোঁসাই, এই সকল কথা কি পড়িবার না শুনিবার বিষয় ? সাংসারিক লাভ লোকসানের জন্য কি ধর্ম্ম ? রাজ্য থাকিলেই বা কি আর গেলেই বা কি ? যুধিষ্ঠির একথা ত বলিতে পারিলেন না, রাজ্য গিয়াছে বেশ হইয়াছে। তাঁহার রাজ্যভোগের লালসা রহিয়াছে, সেই লালসার জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান। এ ধর্ম্ম পালন করা আর না করা দুইই সমান ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া খুব একটা বড় রকম Lecture ঝাড়িয়া দিলাম।

গোঁসাই—(হাসিতে হাসিতে বলিলেন,) এসব কথায় তোমাদের মন উঠিবে কেন ? যাহারা নিবৃত্তি মার্গের লোক, যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিতে চায়, এই প্রবৃত্তি মার্গের ধর্ম্মে তাহাদের তৃপ্তি হইবে কেন ?

আমি—প্রবৃত্তি মার্গের ধর্ম্ম কি ?

গোঁসাই—সকাম ধর্ম্ম। স্বর্গাদি কামনা করিয়া অথবা কোন রাজ্য বা ঐশ্বর্য্য অথবা সিদ্ধি লাভের জন্য

ইহাতে সাধক অভিলষিত বস্তু লাভ করিয়া ভোগান্তে আবার জন্মমরণরূপ দুঃখার্ণবে পতিত হয়।

আমি—নিবৃত্তি মার্গের ধর্ম্ম কি ?

গোঁসাই—নিষ্কাম ধর্ম্ম; ভগবানকে লাভ করা ব্যতীত ইহাতে সাধকের অন্য কোন কামনা থাকে না। যাঁহারা ভগবানকে লাভ করেন, তাঁহাদিগকে আর জন্মমরণরূপ অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। তাঁহারা ভগবানের নিত্য লীলায় প্রবেশ করিয়া অনন্তকাল ভগবত-প্রেম-রস আস্বাদন করেন।

নন্দ-মহোৎসবের দিন কয়েকজন ভিক্ষুক গোয়ালা সাজিয়া কাঁধে ভার লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া নন্দ-মহোৎসবের গান করিতে লাগিলেন। তাহারা সে গান ঠিক জানে না, তাহাদের সুর, তাল কিছুই নাই; তথাপি তাহাদের এলো মেলো এই গান শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় ভাবাবেশে খুব নৃত্য করিতে লাগিলেন; এবং প্রত্যেক জনকে কাপড় ও টাকা দিয়া বিদায় করিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমে চিরদিনই অর্থাভাব, সুতরাং ঋণ করিয়া এই টাকা ও কাপড় দেওয়া হইল। আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঋণ করিয়া এত বিদায় দিবার

কি প্রয়োজন ছিল ? গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেন—“ইঁহারা আমাকে যে দৃশ্য দেখাইলেন, তাহার বিবেচনায় আমি ইঁহাদিগকে কি দিলাম ?”

একদিন গোস্বামী মহাশয় শিষ্যগণকে লক্ষ করিয়া রোষ প্রকাশ করতঃ তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন—“যদি বলি একটু প্রাণায়াম কর অমনি বলা হয় প্রাণায়াম করিতে পারি না ; যদি বলি একটু নাম কর অমনি বলা হয় আজ্ঞে নাম করিতে পারি না। ধর্ম্ম কি অমনি হইবে ? জন্ম জন্ম কত অপরাধ করিয়াছ,তাহার ভোগ কি ভুগিতে হইবে না ? অমনিই সব হইয়া যাইবে ? আমার পা টিপিয়া, আমাকে বাতাস করিয়া, আমার পায়ে তেল দিয়া, কেহ যে কিছু লাভ করিবে, একথা কেহ যেন মনে স্থান না দেয়। ইহাতে কিছুই হইবে না।”

গোস্বামী মহাশয়ের ভৎর্সনা শুনিয়া সকলে নির্ব্বাক নিস্তব্ধ। গোস্বামী মহাশয়কে উত্তেজিত দেখিয়া আমি বলিলাম ;—

আমি—আপনি এত রাগ করিতেছেন কেন ? এত তিরস্কারই বা কি জন্য ? গুরু কৃপা করিয়া নাম না করাইলে কাহারও কি সাধ্য আছে যে নাম করে ?

গোস্বামী—এই কথাটা বুঝিলেই ত হয় *।

আমি—শুনিয়াছি অন্যান্য সাধনে সাধ্য-বস্তু লাভ করিতে হইলে সাধন প্রয়োজন ; সাধন ব্যতীত সাধ্য-বস্তু লাভ হয় না। আর এই সাধনে একমাত্র গুরু কৃপায় সাধ্য- বস্তু লাভ হইয়া থাকে. একথা কি সত্য ?

গোঁসাই—হাঁ একথা সম্পূর্ণ সত্য।

আমি—তবেত কৃপা করিয়া অবস্থা খুলিয়া দিলেই হয়।

গোঁসাই—কাঁচা আম পাকাইলে পচিয়া যায়। বালকের হাতে মাণিক দিলে সে ফেলিয়া দেয়,মাণিকের মর্ম্ম সে বুঝে না।

আমি—নাম করা বড় কঠিন। আপনি কৃপা করিয়া নাম করাইয়া লইলেই ত হয়।

গোঁসাই—অন্নের গ্রাস মুখে তুলিয়া দিলেও তাহা গিলিতে

কারের সম্পূর্ণ পরিচালনা করিয়া সাধন করিতে করিতে যখন হায়রান হইয়া পড়ে, আত্মশক্তিতে আর কুলায় না, তখনই গুরু-কৃপার প্রতি দৃষ্টি পড়ে এবং বুঝিতে পারে গুরুকৃপা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

যথাহি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্
তংস্কন্ধেন স আধত্তে তথা সর্ব্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ॥ ৩৩
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ
সধ্রীচীনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্যতি॥ ৩৪

হয় ; গলাধঃকরণ করা আর না করা ভক্ষণ কারীর ইচ্ছাধীন।

আমি—সাধনের বড় ক্লেশ ; ধর্ম্ম লাভ করিতে এত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় কেন ?

গোঁসাই—অনায়াস-লভ্য বস্তুর আদর হয় না। ধর্ম্মলাভ করিতে অত্যন্ত ক্লেশ, বহু আয়াসে ধর্ম্মলাভ হয় এই জন্যই ধর্ম্মের এত গৌরব।

আমি—যদি সাধন না করি তবে কি হইবে ?

গোঁসাই—যেমন ছিলে তেমনি থাকিবে।

আমি—অনেকে বলেন নাম করিবার প্রয়োজন নাই, গুরুই সব করিবেন।

গোঁসাই—গুরুর প্রতি বিশ্বাস কই, মুখে বলিলে ত হয় না ?

এই সকল কথাবার্ত্তার পর গোস্বামী মহাশয় আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন।

এতদিন আমি মালা-তিলক ধারণ করি নাই ; মালা তিলক ধারণের জন্য ভিতরে বড় টান হইতে লাগিল, দিন দিন প্রাণ অস্থির হইতে লাগিল ; আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বলবতী হইল, একজন গুরুভাই আমার গলায় মালা পরাইয়া দিলেন ; আমি মালা-তিলক গ্রহণ করিলাম। এই বেশই এমনি যে গলায় মালা আর কপালে তিলক দেখিলেই গুরু-শক্তি জাগ্রত হয় ; একটা উপাসনার কাষ

গুরুশক্তির প্রভাবে আমি দিন দিন বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হইতে লাগিলাম। আমার ব্রাহ্মভাব তিরোহিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণ-কথা, কৃষ্ণ-লীলা ও গৌরাঙ্গ-লীলা আমার নিকট অত্যন্ত মধুর লাগিতে লাগিল, বৈষ্ণব দেখিলেই প্রাণটা পুলকিত হইতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয় আমাকে দেখিয়া মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিতেন আর আমি পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইতাম।

গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্ম সমাজ পরিত্যাগ করার পর হইতে অনেক ব্রাহ্ম তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হইয়াছিলেন,ক্রমে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা আরও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, "আমরা কত কষ্টে একটী লোককে ব্রাহ্ম করি, আর সেই লোকটী গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যাইবামাত্র হিন্দু হইয়া যায়; গোঁসাই বাঁচিয়া থাকিতে আমাদের ভদ্রস্থ নাই; শ্যামাকান্ত পণ্ডিত এক জন অতি বুদ্ধিমান প্রতিভাশালী লোক ছিল, গোসাঞীর ছাঁপায় পড়িয়া বোষ্টম হইয়া গেল"।

আমি এই সব কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম,—

আমি—মহাশয় ব্রাহ্মেরা আপনার মরণ তাকাইয়া আছে,

নাই ; আমরা কতকষ্টে একটা লোককে ব্রাহ্ম সমাজে আনি, আর সে গোঁসাঞীর নিকট যাইবামাত্র হিন্দু হইয়া যায়।

গোঁসাই—আমি মরিলে কি হইবে ? আমি যে রক্তবীজের ঝাড় রাখিয়া যাইব, তাহারা কি আর কিছু বাকি রাখিবে।

আমি—আপনার দেহান্তে এই সাধন দিবার অধিকারী কে হইবে ?

গোঁসাই—যে ব্যক্তি আমার ন্যায় অনন্যকর্ম্মা হইয়া অবিশ্রান্ত নাম করিতে পারিবে।

আমি—আমি দেখিতেছি যাঁহারা এই সাধন পাইতেছেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব হইয়া যাইতেছেন, তাহাদের পূর্ব্ব সংস্কার সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

গোঁসাই—এই জন্যই ত এত আয়োজন। ধর্ম্মের ছয়টী স্তর ; প্রথম নীতির ধর্ম্ম, বহু জন্ম এই ধর্ম্ম পালন করার পর মানুষ পঞ্চোপাসনার অধিকারী হয়। বহু জন্ম পঞ্চোপাসনার পর ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়। ব্রহ্মজ্ঞান ভেদ করিতে পারিলে, পরমাত্ম তত্ত্বে উপস্থিত হয় ; সাধনবলে এই পরমাত্ম তত্ত্ব ভেদ করিতে পারিলে; মানুষ রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বে পৌঁছে ; এই

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব ভেদ হইলে মানুষ শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্বে পৌঁছে। শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্বের উপর আর তত্ত্ব নাই। তোমাদিগকে কোন কথা বলিলে ত শুনিবে না। এইজন্য তোমাদের মধ্যে কেবল শক্তি সঞ্চার করিয়া নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেই সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ পাইবে।

আমি—এই অবিশ্বাসের যুগে মানুষ মুখের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে চায় না।

গোঁসাই—হাঁ মুখের কথায় কিছু হয় না। সমস্ত অবস্থার ভিতর দিয়া না আসিলে ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় না।

আমি—ব্রাহ্মেরা এক্ষণ ধর্ম্মের কোন্ স্তরে আছেন?

গোঁসাই—ইঁহারা এক্ষণ নীতির ধর্ম্ম যাজন করিতেছেন।

আমি—ব্রাহ্মগণ পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে যে ভাবে এক্ষণ সমাজ গঠন করিতেছেন তাহাতে যে নীতির ধর্ম্ম রক্ষা পাইবে তাহাত বোধ হয় না।

গোঁসাই—নীতির ধর্ম্ম রক্ষা না হইবার ই কথা।

এই সময় বাবু মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার * পুত্রের

---

* ইনি গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক শিষ্য। ইঁহার নিবাস বরিশাল জেলার অন্তর্গত বানরীপাড়া; ইনি পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের জনৈক প্রচারক ছিলেন। ইনি একজন সুবক্তা; ইনি স্বনামখ্যাত লোক ইঁহার অধিক পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই।

অন্নপ্রাশন উপলক্ষে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার বাসায় উপস্থিত হন। ঐ সময় তথায় কোন বামাচারী সাধু উপস্থিত হইয়া মদ চাহিলে গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে মদ আনাইয়া নিজেই তাহা শোধন করিয়া দেন। এই অন্নপ্রাশন উপলক্ষে মনোরঞ্জনবাবুর অনেকগুলি গণ্য মান্য ব্রাহ্ম বন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের এই ব্যবহারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহারা তাঁহার সমক্ষে কোন কথা না বলিয়া পরোক্ষে আপনাদের মধ্যে একটা মহা আন্দোলন করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় ক্রমে ক্রমে নীতিজ্ঞান বিরহিত হইয়া পড়িয়াছেন, এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার কুৎসা করিতে লাগিলেন; আমি ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম—

আমি—আপনার কিরূপ ব্যবহার, আপনি নাকি একজন লোককে মদ আনাইয়া দিয়াছেন। আবার ঐ মদ নিজ হস্তে শোধন করিয়া দিয়াছেন? ইহার জন্য ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা কত কথাই বলিতেছেন।

গোসাই—অতিথি উপস্থিত হইলে, তাঁহার যাহা প্রয়োজন, তাহা তাঁহাকে দিতে হইবে। নিজের রুচি অনুসারে অতিথি সেবা করা কর্ত্তব্য নয়। অতিথির পূজার জন্য মদ্যের প্রয়োজন হওয়ায় আমি

তাঁহাকে মদ্য আনাইয়া দিয়াছিলাম। সকলের ভজন-প্রণালী এক প্রকার নহে, যে ব্যক্তি যে পথের পথিক তাহাকে সেই পথের নিয়ম অনুসারে চলিতে হইবে। সে অন্যের পথে চলিবে না। তাঁহার পন্থায় মদ্য ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকায় আমাকে মদ্য আনাইয়া দিতে হইয়াছে, অতিথির প্রার্থনা মত মদ্য শোধন করিয়াও দিয়াছি।

আমি—নেশাখোর ব্যক্তি যদি নেশার জিনিষ চায়, তাহাকে কি তাহা দেওয়া কর্ত্তব্য ?

গোঁসাই—যাহারা নেশাখোর, না খেলে থাকিতে পারে না, অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে, যদি কেহ তাহাদিগকে কিছু না দেয়, তবে তাহারা কেমন করিয়া বাঁচিবে ? তাহারা অগত্যা চুরী করিতে বাধ্য হইবে ? ভগবান্ কি করেন ? অভাবগ্রস্ত বেশ্যারও উপপতি জুটাইয়া দেন। একজন সন্ন্যাসী গাঁজা ও আফিং খাইত। সে তিন দিন গাঁজা ও আফিং খাইতে না পাওয়ায় যাতনায় অধীর হইয়া, দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া এক জায়গায় একটা তারের থাম্বায় আসনের আঘাত করিতে লাগিল। আর চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "বেটী [illegible]

ধরিয়া মারিব, যদি আমাকে নাই দিবি তবে এমন অভ্যাস করালি কেন?" এই সময় একজন গাঁজা ও আফিং চোর পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া চোরামাল সহ রাস্তা দিয়া নীত হইতেছিল। পুলিশ প্রহরীর হঠাৎ বাহের পীড়া উপস্থিত হওয়ায় সে চোরকে রাস্তায় দাঁড়াইতে বলিয়া মলত্যাগের জন্য একটু আড়ালে যায়; এই অবসরে ঐ চোর সাধুকে আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়া ঐ গাঁজা ও আফিং আনিয়া বলেন "নাও এই গাঁজা আফিং নাও;" এই বলিয়া গাঁজা ও আফিং দিয়া চোর চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী গাঁজা ও আফিং পাইয়া বলিলেন, "বেটী এতক্ষণ দাও নাই, এখন মার খাইবার ভয়ে দিলি।" অতিথির ধর্ম্ম মতের ভ্রম থাকিলে, তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া অতিথি সেবা করিবে না। তখন তাহার ধর্ম্মতঃ যাহা প্রয়োজন তাহাই প্রদান করিতে হইবে; তাহার পরে তিনি যদি থাকেন তবে তাহার মতের অবৈধতা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমি—অতিথি কে?

গোঁসাই—যিনি কোন দিন আসেন নাই অথচ ক্ষুধার্ত্ত। ক্ষুধার সময় তাঁহাকে সংশোধন জন্য বলা নিষ্ঠুরতা

আমি—ধর্ম্মতঃ প্রয়োজন না হইলে কি নেশার দ্রব্য দেওয়া যাইতে পারে ?

গোঁসাই—যিনি কেবল নেশার জন্য মাদক দ্রব্য সেবন করেন, সে অথিতিকে মাদক দ্রব্য দিতে বাধ্য নও। মানুষ বাহিরের কার্য্য দেখে, ভগবান অন্তর্দ্দর্শী, তিনি অন্তরের উদ্দেশ্য দেখেন। চুরী করা লোকে পাপ বলিতেছে, এই চুরীই আবার কোন কোন স্থানে ভগবানের চক্ষে পুণ্য হইতেছে।

আমি—আপনার নিন্দা শুনিলে মনে বড় কষ্ট হয়।

গোঁসাই—কি করিবে ? যখন কেহ নিন্দা করিবে তখন সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবে, প্রতিবাদ করিবে না। অহঙ্কার, অভিমান ভাল নয়, ইহাতে সমস্ত ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। পরনিন্দা করিতে নাই ও শুনিতে নাই।

আমি—অহঙ্কার অভিমান যায় কিসে ?

গোঁসাই—শ্বাসে শ্বাসে নাম করিবে। জীবের সেবা করিবে। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের পায়ে নমস্কার করিবে; এমন কি গুয়ের পোকাকেও ঘৃণা করিবে না। অহঙ্কার হইলে সিদ্ধ যোগীদেরও পতন হয়। গয়ায় যে বাবাজী * ছিলেন,

* রঘুবর দাস বাবাজী।

তিনি একজন অতি শক্তিশালী লোক ছিলেন। আকাশের পক্ষী সকল তাঁহার আদেশে ঠোঁটে করিয়া কাণ খুটিয়া দিয়া যাইত। রাত্রিকালে বাঘ আসিয়া তাঁহার পায়ে লুটাইত। বিষধর সর্পগণ তাঁহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। অসময়ে ২০০।৪০০ শত অতিথি উপস্থিত হইলে, তিনি আসন হইতে না উঠিয়া তাঁহাদিগকে লুচী মণ্ডা ইত্যাদি নানা উপাদেয় সামগ্রী ভোজন করাইতেন। আমি তাঁহার নিকট থাকিতাম, এজন্য সচক্ষে এই সমস্ত ঘটনা দেখিয়াছি।

লোকের জলাভাব দূর করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমের নিকটস্থ পাহাড়ের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে তিনি দণ্ড দ্বারায় আঘাত করায় প্রস্তর ভেদ হইয়া এক প্রস্রবণ বাহির হয়, ঐ প্রস্রবণ এখনও প্রবাহিত হইতেছে। বাবাজী নিজের শক্তি দেখিয়া অত্যন্ত অহঙ্কৃত হইয়া উঠেন। তিনি মানুষকে আর মানুষ জ্ঞান করিতেন না। ক্রমে ভগবান্ তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ করিলেন। তাঁহার কোন বন্ধু মৃত্যু-কালীন তাঁহাকে তাঁহার বিধবা পত্নীর অভিভাবক থাকিতে বলিয়া যান। বাবাজী মহাশয় বন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নীকে আপন আশ্রমে লইয়া আসেন। তাঁহার বিশ্বাস যে তাঁহার পতন অসম্ভব; তিনি মায়া মোহের

করিলেও তিনি তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করিলেন না। ঐ আশ্রমে স্ত্রীলোক সহ থাকিতে থাকিতে বাবাজী মহাশয়ের পতন হইল ; স্ত্রীলোকটীর গর্ভের সঞ্চার হইল ; ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমুদয় শক্তি নষ্ট হইয়া গেল। তিনি গয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এক মুষ্টি অন্নের জন্য তাঁহাকে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইল। স্ত্রীলোকটীকে লইয়া তিনি কিছুদিন পাবনায় থাকিলেন ; তথায় ঐ স্ত্রীলোকটী ও তাহার গর্ভজাত সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় বাবাজী মহাশয়ের চৈতন্য হইল। তিনি নিজের পূর্ব্বাবস্থা ভাবিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ইহার পর তিনি আবার নিঃসঙ্গ হইয়া সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমি গোস্বামী মহাশয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলাম এবং বলিলাম আমি অত্যন্ত অপরাধী ও উচ্ছৃঙ্খল ; আপনি আমাকে বহু বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন ; আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন, আমার অত্যন্ত ভয় হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "তোমায় কিছু বলিতে হইবে না।" আমি কয়েকদিন গোস্বামী মহাশয়ের নিকট থাকিয়া সপরিবারে বোলপুর

সরলনাথের আগমন।

—:*:—

শ্রীযুক্ত সরলনাথ গুহ ঠাকুরতার নিবাস বরিশাল জেলার অন্তর্গত বানরীপাড়া; ইনি শ্রদ্ধেয় বাবু মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের জনৈক আত্মীয়। পাঠদ্দশায় ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন, পরে সমাজচ্যুত হইয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ইঁহাকে সমাজে উঠাইয়া লইবার চেষ্টা করায় সমাজের লোক সকল সমবেত হইয়া সরলনাথ ও আর আর ব্রাহ্ম যুবকদিগকে জিজ্ঞাসা করেন "তোমরা নীচ জাতির সহিত একত্র ভোজন করিয়াছ কিনা, ও অখাদ্য খাইয়াছ কিনা?" যে সকল ব্রাহ্ম যুবক নিকৃষ্ট জাতির সহিত একত্র ভোজন বা অখাদ্য খাওয়া অস্বীকার করতঃ মিথ্যা কথা বলিল, সমাজ জানিয়া শুনিয়াও তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সরলনাথ মিথ্যা কথা বলিবার লোক নহেন, কাযে কাযেই তিনি সমাজচ্যুত থাকিলেন এবং পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। ইঁহার শরীর রুগ্ন, লেখাপড়া যৎ-

পরিত্যক্ত হওয়ায় গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রয়ে আসিয়া থাকেন। ইনি কিছুদিন পোষ্টাফিসের চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন; গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "তুমি একটা ঠিক দিতে দশটা ভুল কর, সরকারী কায করিয়া কি কয়েদ খাটিবে? চাকরী ছাড়িয়া দাও"।

সরলনাথ চাকরী পরিত্যাগ করতঃ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট রহিলেন। হাট বাজার বা অন্য কোন কায করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না, একারণ সরলনাথ কেবল গোস্বামী মহাশয়ের পায়খানার জল দিতেন। যাহার তাহার কাপড় একখানা টানিয়া লইয়া তদ্দারা পায়খানা যাইবার রাস্তা পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। অন্য লোকের কাপড় লইয়া তদ্দারায় পায়খানা যাইবার রাস্তা পরিষ্কার করিলে লোকে বিরক্ত হইবে তাহা সরলনাথের বোধ ছিল না। বুদ্ধি বিবেচনা তাঁহার বড় একটা ছিল না।

সরলনাথ আদৌ সাধন-ভজন করিতে পারিতেন না। যখন আপনা আপনি তাঁহার ভিতরে নাম চলিত তখনই তাঁহার সাধন হইত। সাধন-ভজনের জন্য তাঁহার কোন চেষ্টাই ছিল না। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে নাম করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বলিতেন, কিন্তু বসিয়া নাম করা তাঁহার সাধ্যের অতীত, সুতরাং সে চেষ্টা তিনি আদৌ করিতেন না।

গণের সঙ্গে একত্রে থাকিতে অশান্তি বোধ করায় সরলনাথ এই সময়ে বোলপুরে আসিয়া এখানকার আশ্রমে রহিলেন। আশ্রমের মধ্যে আমার নিজের ব্যবহার জন্য যে ঘর ছিল সেই ঘরে ইনি থাকিতেন। পণ্ডিত মহাশয় পৃথক্ ঘরে থাকিতেন। উভয়েই ভিক্ষা করিয়া নিজ হস্তে আপন আপন ঘরে রন্ধন করিয়া খাইতেন। সরলনাথের রন্ধন করিবার ক্ষমতা নাই, ডাল ভাত প্রায়ই পুড়াইয়া ফেলিতেন, এজন্য পণ্ডিত মহাশয়কে সময় সময় সাহায্য করিতে হইত।

সরলনাথ বেশ নাম সংকীর্ত্তন করিতে পারিতেন। তিনি বোলপুর আসায় এখানকার নাম সংকীর্ত্তন প্রবলতর আকার ধারণ করিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার বৈঠকখানায় যে কীর্ত্তন হইত, তাহাতে এমনি ভাবের তরঙ্গ উঠিত যে আমাকে হাতে প্রাণ লইয়া থাকিতে হইত। এক এক জনের এক এক আছাড়ে ঘর দুয়ার যেন চুরমার হইয়া যায়। পাছে ইহারা আমার গায়ে পড়ে এই ভাবনা। গায়ে পড়িলে দেহটা একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। প্রত্যহই ফুটাফুটী ও রক্তারক্তি হইত। কালীকৃষ্ণ ভায়া উন্মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন। অনেক সময় তাঁহার পা আদৌ ভূমিতে পড়িত না। কেবলমাত্র পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ভূমিতে স্পর্শ হইত।

দুইটা ডানার মত হইত, এবং ভাবাবেশে প্রকাণ্ড একটা হাড় গিলার মত চলিত ও বিকৃত তীব্র রব করিত। পণ্ডিত মহাশয়ের দেহটা সময় সময় একখানা নৌকার মত হইয়া তীরবেগে বৈঠকখানার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ ছুটাছুটী করিত। পণ্ডিত মহাশয়ের পৃষ্ঠদেশ ভূমিতে সংলগ্ন থাকিত, হাত পা উপর দিকে বাঁকিয়া থাকায় দেহখানা একখানা নৌকার আকার ধারণ করিত। এবং আপনা হইতে তীরবেগে বৈঠকখানার মধ্যে প্রবাহিত হইত। দেহের এইরূপ গতি নিতান্ত অসম্ভব। কিন্তু ভাবের বিচিত্র গতি,—যে ব্যক্তি স্বচক্ষে এই সব দৃশ্য না দেখিয়াছে সে ব্যক্তি বুঝিতে বা বিশ্বাস করিতে পারিবে না। অন্যান্য অঙ্গচেষ্টা যে কত প্রকার হইত তাহা আর কি লিখিব? বালক বালিকাগণ অজ্ঞান হইয়া দেওয়ালে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। কীর্ত্তনের সময় দেখিলে বোধ হইত তাহাদিগকে বোল্ট দিয়া কে যেন দেওয়ালের সহিত আটকাইয়া দিয়াছে। ডাকিলে সাড়াশব্দ নাই, হাত দিয়া নাড়িলে চৈতন্য নাই। পার্শ্বস্থ কুঠারীতে মেয়েদের কান্নার রোল উঠিত। আমি এই সমস্ত ঘটনা দাঁড়াইয়া দেখিলাম, ভক্ত বৃন্দের শরীর রক্ষায় নিযুক্ত থাকিতাম ও তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতাম।

এই সময়ে প্রায়ই আমি আশ্রমে থাকিয়া সাধন-

ভজন করিতাম। সংসারের কোন কায করিতাম না। বাবু হরিদাস সিংহও আশ্রমে থাকিতেন। পণ্ডিত মহা-মহাশয় রান্নার কায করিতেন, ও শ্রীনাথ সরকার টহলের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। আশ্রমেই স্নানাহার হইত, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকলে মিলিয়া বাসায় আসিতাম। সন্ধ্যার পর কীর্ত্তন আরম্ভ হইত।

সরলনাথ প্রত্যহ আহারান্তে খোল শিক্ষা করিবার জন্য থুলুক গ্রামে যাইতেন। বেলা অবসানে আসিয়া আমাদের সহিত আশ্রমে মিলিত হইতেন। দুষ্টা স্ত্রীলোকগণ ইঁহাকেও মুগ্ধ করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বোলপুরের জনসাধারণ লোক সরলনাথকেও অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য ও বিশুদ্ধ চরিত্র দেখিয়া সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন। সরলনাথের ভাবের ও সংকীর্ত্তন কালের অঙ্গচেষ্টা ও চীৎকারের কথা গোস্বামী মহাশয়ের গোচর করিলে তিনি বলিয়া-ছিলেন, "সরলনাথের দেহে গড়ুরের আবেশ হয়।" এই সময় এই সকল ভক্ত সঙ্গে আমি বড় সুখে ছিলাম। আমার অন্তরে নিয়ত আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইত।

আসন প্রাপ্তি।

—:*:—

আশ্বিন মাস, আবার পূজার ছুটী হইল, পাগল মন মাতিয়া উঠিল, গুরু দর্শনে কলিকাতা ছুটিলাম। গোস্বামী মহাশয় খুব আদর যত্ন করিলেন। বোলপুরের সংকীর্ত্তনের ব্যাপার সমস্ত শুনিলেন; আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

আমি—বোলপুরের বাসায় এত কীর্ত্তন হয়; লোকে ভাবে গদগদ, অনেকে দেহ ধারণে অক্ষম, সাধনের বাহিরের লোকও অজ্ঞান হইয়া পড়ে, আমি যে কাঠ, সেই কাঠ; আমাকে কীর্ত্তন ভাল লাগে না, খোল কর্ত্তালের ধ্বনিতে কানে ঝালা পালা লাগে। এমন কেন হয়?

গোসাই—যদি চাকে মধু থাকে, আর সেই চাকে কেহ কাটি দেয়, তাহা হইলে মধু পায়; আর যে চাকে মধু নাই তাহাতে কাটি দিলে কেবল ডাঁশের কামড় খাইতে হয়।

আমি বুঝিলাম আমার অন্তর শুষ্ক, ইহাতে মধু নাই, কাযে কাযেই আমার এই দুরবস্থা, যে কীর্ত্তনে পাষাণও

গলিয়া যায়, আমার দুষ্ট মন কিছুতেই গলে না। আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—

আমি—এই দুরবস্থা কিসে দূর হইবে? কিসে মধু সঞ্চয় হইবে?

গোঁসাই—শ্বাসে শ্বাসে অবিশ্রান্ত নাম কর; নাম ভিন্ন উপায় নাই। নামে সকল দুরবস্থা দূর হইবে।

গোস্বামী মহাশয়ের আসনের জন্য একখানা মোটা কম্বল পাট করিয়া পাতা হইত তাহার উপর একখানি গৈরিক কাপড় বিছান হইত, ইহাই গোস্বামী মহাশয়ের আসন। এই আসনের উপর তিনি দিবারাত্রি বসিয়া থাকিতেন।

একদিন ভক্তমালের কথা উঠিল, ভক্তগণের প্রসঙ্গ হইতে লাগিল; আমি বলিলাম—"ভক্ত হনুমান, যিনি বুক চিরিয়া রাম নাম দেখাইয়াছিলেন।" গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেন—"বুক কি আবার চিরিতে হয়? এমনিই দেখা যায়।" এই বলিয়া ক্ষণকাল পরে আমাকে নিকটে যাইবার জন্য ডাকিলেন; আমি তাঁহার কাছে গিয়া বসিলাম; গোস্বামী মহাশয় আসনের দিকে দৃষ্টি-পাত করিতে বলায় আমি চাহিয়া দেখিলাম, আসনে "কৃ" পড়িয়াছে। এই "কৃ"র প্রতি চাহিয়া থাকিতে থাকিতে দেখিলাম "কৃ"র দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটী

পুটুলি পড়িল। গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম একি! "কৃ" দেখিলাম, আবার ক্ষণকাল পরে দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটা পুটুলী দেখিতেছি; গোস্বামী মহাশয় বলিলেন হয়ত "কৃষ্ণ' হইবেন। দেখিতে দেখিতে পুটুলির বাম পার্শ্বে একটা "ষ্ণ" যোগ হইয়া "কৃষ্ণ" শব্দ হইল। আমি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। ঐ আসনের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, আসনে রাধা কৃষ্ণের এক সুন্দর ছবি পড়িল। একটী মৃণালযুক্ত পদ্মের উপর রাধাকৃষ্ণ জড়াজড়ী অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, এক বাঁশী উভয়েই ধরিয়াছেন; এমন সুন্দর চিত্র আমি কখনও দেখি নাই; চিত্রকরের সাধ্য নাই যে এমন সুন্দর ছবি চিত্রিত করে। আমি গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম, আমি শুনিয়াছি আপনার দেহেও নাকি দেব-মূর্ত্তির চিত্র পড়ে? তিনি বলিলেন, "হাঁ পড়িয়া থাকে; পূর্ব্বে আমি এসব কিছু বুঝিতাম না, এখন দেখিতেছি সত্য সত্যই পড়ে।" এই কথা বলিতে বলিতে রাধাকৃষ্ণের এক সুন্দর ছবি গোস্বামী মহাশয়ের দক্ষিণ উরুদেশে পড়িল; তারপর আসনের উপর নিতাই গৌরের এক সুন্দর ছবি পড়িল। আমি এই সব দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি? আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; কেন এরূপ

হয়? তিনি বলিলেন "ভগবানের নামের মহিমা।" "ভগবদ্ভক্তের রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা সমস্তেই ভগবানের নামাঙ্কিত হইয়া যায়।" "ভগবদ্ভক্ত যে সকল বস্ত্রাদি ব্যবহার করেন তাহাতেও নামাঙ্কিত হয়, এমন কি যে বৃক্ষতলে বা গৃহে তিনি নাম করেন সেই বৃক্ষের গুঁড়ী, ডাল, পাতা, ঘরের ইট, কড়ি, বরগা সমস্ত জিনিসেই ভগবানের নামাঙ্কিত হইয়া যায়।" "শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার জলে একটী বৈষ্ণবের একখানি অস্থি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে হরি নামাঙ্কিত ছিল।"

গোস্বামী মহাশয় যে ঘরে বসিয়াছিলেন, সেই ঘরের দেওয়ালে একখানি চিত্রপট টাঙ্গান ছিল। এই সকল কথোপকথনের পর গোস্বামী মহাশয় আমাকে ঐ চিত্র পটখানি দেখিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন ঐ চিত্রপট খানিতে একটা কাল্পনিক ব্যাপার অঙ্কিত হয় নাই। উহাতে সত্য ঘটনা চিত্রিত হইয়াছে। ঐ চিত্রপটে দেখিতে পাইবে, চিত্রিত বৈষ্ণবের আলখাল্লায় দেব-মূর্ত্তি সকল চিত্রিত হইয়াছে। আমি গোস্বামী মহাশয়ের কথানুসারে দেওয়ালের চিত্রপটে দেখিলাম চিত্রিত বৈষ্ণবের আলখাল্লায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি সকল চিত্রিত রহিয়াছে। এই বৈষ্ণবের বিবরণ জানিতে চাওয়ায় গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—শ্রীবৃন্দাবনে নাগজী নামে এক বৈষ্ণব বাস করিতেন। তিনি প্রতিদিন শ্রী[illegible]

পরিক্রমা করিতেন। একদিন পরিক্রমা করিবার সময় তাঁহার মস্তকের জটা একটা বৃক্ষের ডালে জড়াইয়া যাওয়ায় তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি যোড়হস্তে ধ্যানস্থ হইয়া তিন দিন দাঁড়াইয়া থাকিলেন, আপন হস্তে ঐ জটা খুলিবার কোন চেষ্টা করিলেন না। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ রাখালবেশে বৈষ্ণবের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ হস্তে তাঁহার জটা খুলিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব ভক্তি-বলে রাখালরূপী ভগবানকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—"আরে লালা, তেরা চুড়া কাঁহা, তেরা বংশী কাঁহা, তেরা পীতাম্বর কাঁহা তেরা নূপুর কাঁহা।" তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজরূপ দেখাইয়া নিজের মূর্ত্তিতে জটা খুলিলেন। আমি চিত্রখানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে লাগিলাম।

গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—"শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত স্থান, ইহার প্রত্যেক বৃক্ষ লতায় পাতায় পাতায় রাধাকৃষ্ণের নাম লেখা।" এই কথা বলাতে তাঁহাকে পূর্ব্বে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিলাম, এখন এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আমার অহঙ্কার চূর্ণ হইল। অধ্যাত্ম রাজ্যের অপ্রাকৃত ব্যাপার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও অবিশ্বাসী লোকের গোচর হয় নাই। আমি মায়াবদ্ধ জীব, আমি ইহার কি বুঝিব? এতদিন নিজেকে বড়

আমার চৈতন্য হইল। আমি বুঝিলাম, আমি নিতান্ত অপদার্থ ও নির্ব্বোধ; গোঁসাইর উপর কটাক্ষ করাই নির্বুদ্ধিতার ফল। "শ্রীবৃন্দাবনের প্রত্যেক বৃক্ষ লতার পত্রে পত্রে রাধাকৃষ্ণের নাম লেখা" এই কথায় অবিশ্বাস করিয়াছিলাম, এখন গোস্বামী মহাশয়ের আসনে বস্ত্রে ও গাত্রে ভগবানের নাম ও চিত্র অঙ্কিত দেখিয়া অবিশ্বাসের কোন কারণ থাকিল না। বুঝিলাম যাহার চক্ষু আছে, সেই দেখিতে পায়, আর যার ভাগ্য আছে তাহার নিকটই এই সব ব্যাপার প্রকাশিত হয়। পুরুষোত্তম গিয়া কেহ জগন্নাথ দেব দর্শন করিয়া আসে, আবার কেহ পুঁই মাচা দেখিয়া ফিরিয়া আসে। *

আমি পূর্ব্বে গোস্বামী মহাশয়কে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, শিষ্য হইয়া গুরুর উপর কত lecture ঝাড়িয়াছিলাম, কত সময় অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলাম, এখন সেই সকল কথা স্মরণ হওয়ায় নিজের প্রতি একটা ঘৃণা উপস্থিত হইল; আমি আপনাকে নিজকৃত অপরাধের জন্য শত শত ধিক্কার দিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম;—

---

* শ্রীলঘুভাগবতামৃতে বর্ণিত আছে:—

বৈশ্লেষিকক্লমোদ্রেকবিবশীকৃতচেতসাম্।

প্রেষ্ঠানাং সকৈসবায়ং রাগং প্রাদুর্ভবেদসৌ

"দুর্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে ।"
ধন্য সেই প্রভু তারে চুলে ধরে আনে ॥"

গোঁসাই, আমি ত জাহন্নবে গিয়াছিলাম, যে সকল অপরাধ করিয়া আসিয়াছি তাহাতে আমার মহারৌরবে স্থান হইত না। আপনি পরম দয়াল, আমাকে মহানরকে পতিত হইতে দেখিয়া কেবল কৃপা করিয়া আমার চুলের মুটী ধরিয়া নিজ পদপ্রান্তে লইয়া আসিয়াছেন। আপনি না থাকিলে আমার কি আর রক্ষা ছিল! "অযাচিত এহেন পতিত হেরি, যো পঁহু যাচি দেওল হরি নাম।" আমি আপনাকে আর কি বলিব, সমস্ত ভারই ত গ্রহণ করিয়াছেন—এক্ষণ আপনার ব্যবহারের একটা কিছু আমাকে দিউন। হয় একটী কৌপীন, না হয় একখানা বহির্বাস, অথবা অন্য যাহা কিছু একটা দিউন। এই কথা বলার পর গোস্বামী মহাশয় আসন হইতে উঠিয়া গেলেন, ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া যে গৈরীক বস্ত্রখণ্ডে ভগবানের নাম ও মূর্ত্তি পড়িয়াছিল, সেই গৈরিক বস্ত্রখণ্ড আসন হইতে তুলিয়া লইয়া নিজহস্তে আমাকে প্রদান করিলেন। আমি ঐ বস্ত্রখানি মস্তকে গ্রহণ করিয়া বোলপুরে লইয়া আসিয়া অদ্যাপি সযতনে রক্ষা ও পূজা করিতেছি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাভাবের

বস্ত্রাদিতে ভগবানের নাম ও মূর্ত্তি অঙ্কিত হইবার কোন বর্ণনা দেখিতে পাই না। সুদ্ধু কি গোস্বামী মহাশয়ের দেহ ও বস্ত্রাদিতে দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত হইত, গোস্বামী মহাশয় পাদ প্রক্ষালন করিলে সেই জল শুকাইবামাত্র সময় সময় তথায় দেব-মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া যাইত। এই জন্য ইদানীং গোস্বামী মহাশয় লোক চক্ষের অন্তরালে পাদ প্রক্ষালন করিতেন।

"লোকে নাহি দেখি যাহা শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসী চূড়ামণি॥"

একদিন গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বহুবিধ ভাবের বিষয় পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এরূপ ভাবের বর্ণনা ত দেখিতে পাই না? গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেন, "ভাবের বিকার অকথ্য, ইহাতে দেহ হইতে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন হইয়া দূরে চলিয়া যাইবে ও আবার স্বস্থানে আসিয়া জোড়া লাগিতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এরূপ ভাব হইতে পারিত; কিন্তু যাহা কিছু ভাব প্রকাশ পাইত তাহাতেই ভক্তগণ শোক দুঃখে আকুল হইয়া পড়িতেন; এইজন্য তিনি ভাব সম্বরণ করিয়া চলিতেন"।

এই সকল কথোপকথনের পর আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—

আমি—আমাদের মধ্যে কাহার কাহার বেশ ভাব হয়, আর কাহার কাহার আদৌ ভাব হয় না, এরূপ কেন হয়?

গোঁসাই—যাহাদের দেহের গঠন অনুকুল, প্রবল গুরুশক্তির প্রভাবে তাহাদের ভাব হয়; যাহাদের দেহের গঠন অনুকুল নহে ও যাহাদের মধ্যে গুরুশক্তি প্রবল হয় নাই—তাহাদের ভাব হয় না।

আমি—বিবিধ লোকের মধ্যে বিবিধপ্রকার ভাব দেখা যায় কেন?

গোঁসাই—ভাব তিন প্রকার। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক; সাত্ত্বিক-ভাব মনোমুগ্ধকারী, এই ভাব দেখিলে লোকের উপকার হয়। রাজসিক-ভাব তদ্রূপ মনোমুগ্ধকারী নহে, ইহাতে কখনও লোকের উপকার হয়, কখনও হয় না। এই ভাবে প্রধানত তেজের ক্রিয়াই দেখা যায়। তামসিক ভাব উৎপাতজনক। তমোগুণের নৃত্য প্রায়ই বেতালা হইয়া লম্ফ ঝম্ফ হয়; নৃত্যকারীর পদাঘাতে ঘরের জিনিসপত্র ভাঙ্গিয়া যায়, দর্শকবৃন্দের উপরে পড়িয়া তাহাদিগকে আহত করে; বালকবৃন্দ ভয় পাইয়া চীৎকার

আমি—চেষ্টা করিয়া ভাব আনা উচিত কিনা ?

গোঁসাই—কদাচ নহে।

আমি—ভাব উপস্থিত হইলে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত কিনা।

গোঁসাই—ভাব উপস্থিত হইলে সম্বরণের চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। যখন সম্বরণে একেবারে অসমর্থ হইবে তখনই ছাড়িয়া দিবে। বিজাতীয় লোক-সমক্ষে সর্ব্বতোভাবে ভাব সম্বরণ করিবে।

আমি—ভাব উপস্থিত হইলে আমাদের কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য।

গোঁসাই—ভাবের যথোচিত মর্য্যাদা দেওয়া কর্ত্তব্য, ভাব বড় আদরের জিনিস, একটু অনাদর, একটু অমর্যাদা হইলেই চলিয়া যায়। ভাব সামান্য বস্তু নহে, ইহা সহজে লাভ হইবার নহে। ভক্তিরসামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে :—

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা,
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ।
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে,
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥"

ভাবের অঙ্কুর মাত্র জন্মিলে নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল

সাধকের মধ্যে প্রকাশ পায় যথা—তিনি ক্ষমাশীল হয়েন অর্থাৎ কেহ তাঁহাকে নির্য্যাতন বা অপমান করিলে তিনি ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহার প্রতিশোধ লয়েন না. অথবা ক্ষোভের কারণ উপস্থিত সত্ত্বেও যে তাহাতে অক্ষুভিত চিত্ততা তাহার নাম ক্ষান্তি (ভরসি)। ভগবৎসম্বন্ধ বিনা বৃথা কার্যে বা ক্রীড়া কৌতুকে সময় নষ্ট করেন না। তাঁহার অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হয়, অর্থাৎ তাঁহার সংসারাশক্তি থাকে না তিনি অতি মাননীয় ব্যক্তি হইলেও আপনাকে অতি হীন বলিয়া মনে করেন। ভগবান্ নিশ্চয়ই তাঁহাকে কৃপা করিবেন এই আশায় তিনি উৎকণ্ঠার সহিত কালযাপন করেন। সদা সর্ব্বদা ভগবানের নামগানে তাঁহার রুচি হয়। ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে তাঁহার আসক্তি জন্মে এবং ভগবানের লীলাস্থলীতে তাঁহার প্রীতির উদয় হয়।

আমি—আমাদের অনেকের মধ্যেই এই সমস্ত লক্ষণ দেখা যায় না, অথচ কীর্ত্তনে তাঁহাদের বেশ ভাব হয়।

গোঁসাই—প্রবল গুরুশক্তির প্রভাবে সংকীর্ত্তনে চিত্ত বিগলিত হইয়া এই ভাব উপস্থিত হয়। কিন্তু ভজন পরিপক্ক না হইলে এই ভাব স্থায়ী হয় না। ভজন নষ্ট বা অপরাধ হইলে গুরু-শক্তি ম্লান হইয়া যায়; তখন ভাবও নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বে যাহাদের খুব ভাব হইত

গুরুশক্তি ম্লান হওয়ায় তাহাদের ভাব হয় না।

আমি—ভাবের কি কোন উপকারিতা আছে?

গোঁসাই—আছে; ইহাতে শরীরের গুণত্রয় নষ্ট হয় এবং আত্মাও কামক্রোধাদি অশেষ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়।

আমি—অনেকে ভাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। তাহারা বলে এই ভাবুকতাই দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ইহাতে ভারতবাসী জড়প্রকৃতিগ্রস্ত হইয়াছে। কর্ম্মই মনুষ্য জীবনের মহত্ত্বের পরিচায়ক।

গোঁসাই—যাহারা এ কথা বলে তাহাদের মধ্যে আদৌ ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা নিত্যবদ্ধ জীব, নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া অশেষ সংসার যন্ত্রণা ভোগ করে, ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতে থাকে, এবং কামক্রোধাদির দাস হইয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করে।

আমি—তবে কি মানুষ কর্ম্ম করিবে না?

গোঁসাই—মানুষ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, ভগবান যাহার দ্বারায় যে কায করাইয়া লইবেন, তাহাকে সে কায করিতেই হইবে।

আমি—কর্ম্ম শেষ হইয়াছে কখন জানা যাইবে?

গোঁসাই—যখন বাসনা কামনা থাকিবে না।

আমি—কর্ম্মদ্বারায় কি কর্ম্ম শেষ হয় না?

গোঁসাই—কর্ম্মদ্বারায় কেবল কর্ম্মবন্ধন বাড়িয়া যায়; নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারায় কর্ম্ম শেষ হইতে পারে, কিন্তু বাসনা থাকিতে নিষ্কাম কর্ম্ম করা সুকঠিন।

আমি—কিসে বাসনার নিবৃত্তি হইবে?

গোঁসাই—শ্বাসে শ্বাসে নাম দ্বারায়।

ইহার পর কয়েক দিন আশ্রমে পরমানন্দে কাটাইয়া গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত আসনের বস্ত্রখানি মাথায় বাঁধিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া বোলপুর চলিয়া আসিলাম।

শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর জন্মোৎসব করিবার আদেশ প্রাপ্তি।

—:*:—

১৩০৩ সাল পৌষ মাস বড় দিনের বন্ধ হইলে গুরু দর্শনের জন্য প্রাণে এমনি আবেগ উপস্থিত হইল যে, আর আমি বোলপুরে স্থির থাকিতে পারিলাম না; কলিকাতা ৪৫ নং হ্যারিসনরোডের সেই বাটীতে ছুটিয়া চলিলাম। গোস্বামী মহাশয় পরম সমাদরে আমাকে গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে গোস্বামী মহাশয়ের যে সকল অবস্থা প্রকাশ পায় নাই, এখন ক্রমে ক্রমে সেই সব অবস্থা প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি সর্ব্বদাই মহাভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। নামে পুনঃ পুনঃ সমাধি উপস্থিত হইত; লোকজনের সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন না। ২।১টা কথা না কহিলে শিষ্যগণ দুঃখিত হইবেন, এইজন্য যেন দায়ে পড়িয়া তাঁহাদের সহিত ২।১টা কথা কহিতেন। ভাব সম্বরণ করিয়া আসনে স্থির থাকা বড় সহজ কথা নহে; ভাব সম্বরণ করিয়া থাকিতে তাঁহার মুখমণ্ডল ও চক্ষু লাল হইয়া

যাইত। ভগবানের নামে সমাধিস্থ হওয়া আমি কখনও শুনি নাই, এবং শাস্ত্রেও পড়ি নাই। কোন মহাপুরুষের জীবনে এই অবস্থাও ঘটে নাই; অন্ততঃ ইহার বর্ণনা নাই। গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে ইহা স্বচক্ষে দেখিলাম।

গোস্বামী মহাশয় যখন ভগবানের পবিত্র নাম শিষ্য-গণকে প্রদান করিতেন ও তাঁহাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতেন, তখন শিষ্যগণের জন্মজন্মার্জ্জিত সমস্ত পাপরাশি, নিজে গ্রহণ করিতেন। শিষ্যগণকে নিষ্পাপ ও পবিত্র করিয়া দীক্ষা কার্য্য সমাধা করিতেন। এক জগাই মাধাইয়ের পাপ হরণ করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌরবরণ কাল হইয়া গিয়াছিল; গোস্বামী মহাশয়কে সহস্র সহস্র শিষ্যের পাপরাশি গ্রহণ করিতে হইত। এই জন্য সময় সময় তাঁহার শরীরে অত্যন্ত যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। ভগবানের রাজ্যে অপরাধ করিয়া কাহারও নিস্তার পাইবার উপায় নাই, অপরাধের শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে। শিষ্যগণ জন্ম জন্ম কত অপরাধ করিয়াছে; তাহাদিগকে সেই সকল অপরাধের শাস্তি ভোগ করিতে হইলে, তাহাদের আর উদ্ধার হয় না। এজন্য সদ্‌গুরু শিষ্যের সমস্ত পাপরাশি নিজে গ্রহণ করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন।

গোস্বামী মহাশয়ের শরীর যখন দুর্ব্বল থাকিত, তখন তিনি বুঝিতেন শিষ্যের পাপরাশির যন্ত্রণা তাঁহার শরীরে সহ্য হইবে না, তখন তিনি কাহাকেও দীক্ষা দিতেন

না। শরীর সবল হইলে দীক্ষা দিতেন। দীক্ষা প্রদান মাত্রেই তাঁহার শরীর মলিন হইত, মুখমণ্ডল বিষণ্ণ হইত এবং কাতর হইয়া আসনে বসিয়া পড়িতেন। তাঁহাকে কিছুকালের জন্য অবসন্ন দেখা যাইত। শিষ্যের পাপ-রাশির দুর্ভোগ কাটিয়া গেলে আবার তিনি সুস্থ হইতেন।

এক এক সময় গোস্বামী মহাশয় বহু শিষ্যকে দীক্ষা দিতেন, ক্রমাগত দীক্ষা দিতে থাকায় সময়ে সময়ে তাঁহার শরীরে এত জ্বালা-যন্ত্রণা উপস্থিত হইত যে, তিনি আর দেহ মধ্যে অবস্থিতি করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে শরীর হইতে বাহির হইয়া তফাতে থাকিতে হইত; আবার শরীর হইতে তফাতে থাকা ভগবানের নিয়ম নহে এই ভাবিয়া গোস্বামী মহাশয় আবার দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেন। তাঁহার নিজের কোন ভোগ ছিল না, তিনি কেবল শিষ্যগণের দুর্ভোগ ভোগ করিতেন।

গোস্বামী মহাশয় প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত আদি ভক্তি শাস্ত্র পাঠ করিতেন। তিনি বলিতেন—"শাস্ত্র অক্ষর নহে, পুস্তক বা শ্লোক নহে; প্রত্যেক অক্ষর বা শ্লোকের রূপ আছে, তাহারা জীবন্ত, আমি যখন শাস্ত্র পাঠ করি পাখীর ঝাঁকের ন্যায় শ্লোকগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে আমার

আছে, সত্ত্ব রজ তমোগুণেরও রূপ আছে; ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।" এই সমস্ত বিষয় আমার জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর, চিন্তা বিচারে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই; তবে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট থাকিয়া যে সমস্ত অবস্থা দেখিলাম। তাহাতে তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। মায়াবদ্ধ জীবের নিকট অপ্রাকৃত রাজ্যের সমস্ত বিষয়ই অন্ধকার ময়। পূর্ব্বে বড় বুদ্ধিমান ছিলাম, এখন দেখিয়া শুনিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়াছি।

একদিন রাত্রি ৩টা বাজিয়াছে, গোস্বামী মহাশয় যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন, আমরা কয়েক জন নিকটে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছি, এমন সময় তিনি "দূর গুখেকোর বেটী, দূর গুখেকোর বেটী" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার ধমক দিতে লাগিলেন। আমাদের মনে হইল গোস্বামী মহাশয় স্বপ্ন দেখিয়া স্বপ্নাবস্থায় ঐরূপ চীৎকার করিতেছেন। আমরা গোস্বামী মহাশয়কে জিতনিদ্র বলিয়া জানি। তিনি আদৌ নিদ্রা যান না। প্রকৃতপক্ষে গোস্বামী মহাশয় যদি জিতনিদ্র হইবেন, তবে স্বপ্ন দেখিবেন কেন? হয়ত তিনি আসনে বসিয়া বসিয়া নিদ্রা যান। মনে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম।

আমি—আপনি কাহাকেও অপ্রিয় বাক্য বলেন না, আজ

"দূর গুখেকোর বেটী দূর গুখেকোর বেটী" কাহাকে বলিতে ছিলেন ?

গোঁসাই—তোমাদের সকলকে নিদ্রিত দেখিয়া একটা প্রেত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, সে লক্ষ্মীর আকার ধারণ করিয়া আসিতেছিল, সহসা ঠাওরাইবার উপায় ছিল না। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, এখানে লক্ষ্মীর আগমনের ত কারণ নাই, তবে লক্ষ্মী এখানে কি জন্য আসিবেন। একটু স্থিরভাবে দেখাতে বুঝিলাম, এটা লক্ষ্মী নহে, একটা প্রেত। তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে বারম্বার নিষেধ করিলাম, সে কিছুতেই কথা শুনে না, এ কারণ তাহাকে ধমক দিয়া তাড়াইয়া দিলাম।

আমি—প্রেতটা কিজন্য গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল ?

গোঁসাই—এই লোকটার পুর্ব্বে ধর্ম্মভাব ছিল, অপরাধ জন্য প্রেত যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রেতগণের বড়ই কষ্ট, সর্ব্বদাই তাহাদিগকে জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়; কোন ভক্তলোকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারিলে আরামে থাকিতে পায়, তোমাদিগকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া তোমাদের মধ্যে কাহারও ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবার মানসে এখানে আসিতেছিল।

আমি—এই স্থানে সর্ব্বদা ভগবানের নাম হইতেছে কেমন করিয়া প্রেতটা এখানে আসিয়া ভক্তগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে ?

গোঁসাই—যতক্ষণ নাম চলে, ততক্ষণ প্রবিষ্ট হইতে পারে না, নাম বাদ হইলেই প্রবিষ্ট হইতে পারে।

আমি—প্রেত দেহ মধ্যে প্রবেশ করিলে কি ক্ষতি হয় ?

গোঁসাই—যাহার মধ্যে প্রেত প্রবেশ করে, সে একেবারে শুকাইয়া যায় ; সাধন-ভজন করিতে পারে না, প্রেতটা কিন্তু আরামে থাকে ।

আমি—প্রেতটা লক্ষ্মীর বেশ ধরিয়া আসিয়াছিল ; আপনি কি প্রকারে বুঝিলেন, যে এটা প্রেত ?

গোঁসাই—প্রেতগণ সকল দেবতার মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে, কিন্তু দেবতার বিশেষ বিশেষ চিহ্ন সকল ধারণ করিতে পারে না। লক্ষ্মীর গলদেশের মালার পুষ্পের পাপড়ীগুলি মলিন ও শুষ্ক ছিল, ইহাতেই বুঝিলাম, এটা লক্ষ্মী নহে, একটা প্রেত।

আমি—শুনিয়াছি মানুষ সাধন বলে প্রেতসিদ্ধ হইয়া থাকে প্রেত তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া চলে, ইহা কি সত্য ?

গোঁসাই—হাঁ, মানুষ সাধন বলে প্রেতসিদ্ধ হইয়া থাকে,

প্রেতসিদ্ধ হইলে, সেই প্রেত তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া কায করে। শ্রীবৃন্দাবনে একটা প্রেতসিদ্ধ লোক নারায়ণ স্বামী নাম গ্রহণ করিয়া সকলকে নারায়ণ দেখাইয়া অনেক অর্থোপার্জ্জন করিত, বহু লোকে তাহার শিষ্য হইয়াছিল। একদিন আমাকে নারায়ণ দেখাইবেন বলায় আমি তাহার নিকট নারায়ণ দেখিতে গিয়াছিলাম; লোকটা আমাকে একটা ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া নিজের বশীভূত প্রেতটাকে নারায়ণ মূর্ত্তি ধরিয়া আসিতে ইঙ্গিত করায় সে নারায়ণ মূর্ত্তি ধরিয়া আসিল। লোকটা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি নারায়ণ দেখিতেছেন।" আমি দেখিয়া বলিলাম "একি, এত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নহে? আপনি আমাকে কি দেখাইতেছেন?" এই কথা বলিতে না বলিতে "আমাকে কোথায় আনিয়াছিস্? এ যে ভক্ত, আমি আর থাকিতে পারিতেছি না" এই কথা বলিয়া প্রেতটা পলাইয়া গেল। যাহারা প্রেতসিদ্ধ, তাহাদিগকে সর্ব্বদা অশুচি থাকিতে হয়; গৃহমধ্যে ময়লার গন্ধ পাওয়া যাইতে লাগিল, একটু পরে লোক-টার কাণে বিষ্ঠা দেখিতে পাইলাম। লোকটাকে বলিলাম "তুমি একটা প্রেত বশীভূত করিয়া

মূর্খ লোক সকলকে নারায়ণ দেখাইবার ভাণ করিয়া প্রবঞ্চনা করিতেছ?" তাহাতে লোকটা পায়ে ধরিয়া বলিল, মহাশয়, এই করিয়া খাই আপনি শ্রীবৃন্দাবনে এ কথাটা প্রকাশ করিবেন না। আমি যতদিন শ্রীবৃন্দাবনে ছিলাম, ততদিন এই কথা প্রকাশ করি নাই, ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

আমি—আমি মনে করিয়া ছিলাম আপনি স্বপ্নাবস্থায় চীৎকার করিতেছেন। আপনি কি আদৌ নিদ্রা যান না?

গোঁসাই—না, আমি আদৌ নিদ্রা যাই না, কোন স্বপ্নও দেখি না।

আমি—নিদ্রা অভাবে শরীরে কোন ক্লেশ বা গ্লানি বোধ হয় না? আমাদের এক রাত্রি জাগিলে তিন দিন ঘুমাইয়াও আশ মেটে না।

গোঁসাই—কিছু না। আমার কোন গ্লানি হয় না। নিদ্রাকর্ষণ আদৌ হয় না।

আমি—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অধিক কি বৃক্ষ লতা পর্য্যন্ত নিদ্রা যায়। শাস্ত্রে এমন কোন মহাপুরুষের নাম শুনি নাই, যিনি নিদ্রাকে জয় করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ণতম ভগবান্, তিনিও নিদ্রা যাইতেন। এক মাত্র রামায়ণে

শুনিয়াছি লক্ষণ মহাশয় ১২ বৎসর নিদ্রা যান নাই, আজ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি আপনি নিদ্রা জয় করিয়াছেন। এই রামায়ণ শাস্ত্র গ্রন্থ নহে, ইহা ঐতিহাসিক কাব্য।

গোঁসাই—নামামৃত পান করিতে থাকিলে চক্ষে কি নিদ্রা আসে? না শরীরে আলস্য উপস্থিত হয়? নাম সর্ব্ব শক্তি সমন্বিত। ইহাতে না হইতে পারে এমন কিছু নাই।

আমি—নাম করিবার কি কালাকাল আছে?

গোঁসাই—না, অবিশ্রান্ত নাম করিবে। প্রথম প্রথম নাম করা বড় কঠিন। শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া যায়, গায়ে যেন কণ্টক বিদ্ধ হইতে থাকে। রাত্রি দেড়টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মহাপুরুষগণ বহির্গত হন, এই সময় নাম করিলে তাঁহারা নিকটে আসিয়া সাহায্য করেন; সে সময় নিদ্রা যাইলে বা কুকর্ম্ম করিলে তাঁহারা চলিয়া যান।

আমি—মহাত্মাদিগের আগমন কি জানিতে পারা যায়?

গোঁসাই—কখন কখন ফুলের গন্ধ, কখনও বা হোমের গন্ধ, কখন কখন গাঁজার গন্ধ বিস্তার করিয়া মহাপুরুষগণ আপনাদের আগমন বার্ত্তা সাধক গণকে জানান। সাধনকালে যখন এইরূপ গন্ধ পাইবে, তখন বুঝিবে যে কোন মহাপুরুষের

আগমন হইয়াছে! সাধন কালে আপনি কি এরূপ গন্ধ কখনও পান নাই?

আমি—অনেক সময় এইরূপ গন্ধ পাইয়াছি। ইহা যে মহাপুরুষগণের আগমনের ইঙ্গিত তাহা জানিতাম না।

গোঁসাই—নামে অবহেলা করিবেন না; নামের কৃপা হইলে এমনি অবস্থা হইবে যে, নাম না করিয়া আর থাকিতে পারিবেন না?

আমি—কিসে নামের কৃপা হইবে?

গোঁসাই—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম করিতে করিতে নামের কৃপা হইবে।

আমি—গোঁসাই সংশয় ত যায় না।

গোঁসাই—সংশয় আত্মার একটা অবস্থা, যেমন কাম ক্রোধ আদি ভিতরে থাকিলে কিছুতেই তাহাদিগকে অতিক্রম করা যায় না, সেইরূপ সংশয় থাকিতে কিছুতেই তাহা নষ্ট হয় না। এক মাত্র নাম দ্বারায় সংশয় বিনষ্ট হইবে, তখন আপনা হইতে বিশ্বাস আসিবে। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করা ব্যতিরেকে সংশয় বিনষ্ট হইবার উপায়ান্তর নাই।

এইবার কিছুদিন গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বেশ আনন্দে কাটাইয়া ছুটী ফুরাইলে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বোলপুর আসিবার অনুমতি চাহিলে তিনি বলিলেন—

গোঁসাই—যাও, বোলপুর গিয়া শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎসব করগে।

আমি—আমার টাকা নাই, কেমন করিয়া জন্মোৎসব করিব ?

গোঁসাই—কোন রকমে কুলাইয়া যাইবে, অধিক ব্যয় করিবার আবশ্যক নাই। সামান্যভাবে উৎসব করিলেই চলিবে।

আমি—আমি তন্ত্র, মন্ত্র, নিয়ম, প্রণালী কিছুই জানি না, কেমন করিয়া কি করিতে হইবে বলুন।

গোঁসাই—অধিক আর কিছু নহে, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু, এই তিন প্রভুর তিনখানি আসন সারি সারি করিবে; তারপর এই তিন আসনের সম্মুখে ভোগের সামগ্রী সাজাইয়া দিবে; তাহার পর কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া ভোগারতি গান করিবে। এই গানই মন্ত্র জানিবে।

শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর জন্মোৎসব করিবার জন্য আমি এইরূপে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উপদিষ্ট হইয়া বোলপুর চলিয়া আসিলাম।

শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর জন্মোৎসব।

আমি কলিকাতা হইতে বোলপুর আসিয়া প্রাণপণে সাধন-ভজনে নিযুক্ত থাকিলাম। এতদিনের পর নামের তীব্রতা দূর হইয়াছে ; নাম-সাধন অনেকটা সহজ হইয়াছে ; ধর্ম্মবন্ধু পণ্ডিত মহাশয় ও সরলনাথ ভায়ার সঙ্গে ভজন-সাধনে সুখ-সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলাম। গুরুকে পরীক্ষা করিতে নাই ; যে ব্যক্তি গুরুকে পরীক্ষা করে গুরু তাহাকে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করেন। একবার পণ্ডিত মহাশয় গুরুকে পরীক্ষা করিতে গিয়া বিলক্ষণ টের পাইয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে থাকা কালীন তাঁহার নিকট যাইবার জন্য তিনি ঢাকা হইতে শ্রীবৃন্দাবন রওনা হন। অর্থাভাবে তাঁহাকে পথ হাঁটিয়া যাইতে হইয়াছিল। সাধ্যপক্ষে কাহারও নিকট অভাব জানান বা ভিক্ষা করা উচিত নহে, একারণ তিনি কাহারও নিকট পাথের খরচ না পাইয়া একাকী নিঃসম্বল অবস্থায় শ্রীবৃন্দাবন রওনা হইলেন। প্রত্যহ রাস্তা হাঁটিয়া যাইতেন ; তাঁহার আহার বা থাকিবার কোন অভাব হইত

এবং রাত্রিকালে থাকিবার স্থানও মিলিত। একদিন তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইল, তিনি গুরুকে পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি সংকল্প করিলেন আহার অথবা রাত্রিযাপনের স্থানের কোন চেষ্টা করিবেন না; গুরু তাঁহাকে খাইতে বা থাকিবার স্থান দেন কিনা এইটী দেখিবেন। যে দিন পণ্ডিত মহাশয় এইরূপ গুরুকে পরীক্ষা করিতে সংকল্প করিলেন, সেই দিন তাঁহার আদৌ আহার জুটিল না; রাত্রিকালে তিনি একজন কৃষকের একটা ভাঙ্গা ঘরে আশ্রয় লইলে সেও তাঁহাকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিল; পণ্ডিত মহাশয় অগত্যা রাস্তার ধারে পড়িয়া থাকিলেন। প্রাতঃকাল হইতে আবার হাঁটিতে লাগিলেন, সেদিনও কোথাও আহার জুটিল না। বেলা অবসানে পথশ্রান্তি ও ক্ষুধায় নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; তাঁহার ভোকচর্ম্মনি লাগিবার উপক্রম হইল। তিনি একটা দোকানে গিয়া একমুটা চিঁড়া ভিক্ষা চাহি-লেন, দোকানদার তাঁহাকে লাঠি লইয়া মারিতে আসিল, অবশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক ধরমশালায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,তথায় কতকগুলি সাধু রহিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাদের নিকট আহার চাহিলে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

সাধুগণ—তোম্ কোন্ হ্যায় ?

পণ্ডিত—হাম্ বাঙ্গালী আদমী।

সাধুগণ—ক্যা, সাধু * হ্যায় ?

পণ্ডিত—হাঁ, হাম সাধু হ্যায়।

সাধুগণ—তোম্ কুচ শাস্ত্র পাঠ কিয়া ?

পণ্ডিত—হাম বড়া ভুখা হ্যায়, হামারা জান্ যাতা, থোড়া খানা দেও, পিছাড়ী বাত পুচ। (সাধু বলিয়া টের না পাইলে ইহারা খাবার দিবে না জানিয়া শেষে পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন) হাম বহুত শাস্ত্র পাঠ কিয়া।

সাধুগণ—গীতা পাঠ কিয়া ?

পণ্ডিত—হাঁ, গীতা পাঠ কিয়া।

সাধুগণ—আচ্ছা, হাম্ লোককো গীতা শুনাও।

পণ্ডিত মহাশয় দেখিলেন, ইহারা পণ্ডিত মহাশয়কে সাধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে না। আহারাভাবে প্রাণ যায়, অগত্যা তিনি বাধ্য হইয়া গীতার প্রথম অধ্যায়ের কতকগুলি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। সাধুগণ পণ্ডিত মহাশয়কে সাধু জানিয়া আহার দিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের প্রাণ রক্ষা হইল। গুরুকে পরীক্ষা করায় পণ্ডিত মহাশয় বড়ই অনুতপ্ত হইলেন। তৎপর কানপুর উপস্থিত হইলে মন্মথবাবু † তাঁহাকে গাড়ী ভাড়া দিয়া শ্রীবৃন্দা-

---

* সাধু—উদাসীন।

† বাবু মন্মথ মুখোপাধ্যায়, ইনি কাণপুরের উকিল, গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক শিষ্য।

বন পাঠাইয়া দিলেন। লোকে বলে "স্বভাব যায় না মলে, আর ইল্লত যায় না ধুলে" কথাটা মিথ্যা নহে। আমি এতকাল গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গ করিলাম। তাঁহার দেবোপম চরিত্র দেখিলাম। তাঁহার অমানুষী শক্তির পরিচয় পাইলাম। মহাপুরুষের যাবদীয় লক্ষণ তাঁহার মধ্যে দর্শন করিলাম, তথাপি সংশয় মিটিল না। দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আমিও গুরুকে পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন "শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর জন্মোৎসব করগে, অর্থের জন্য ভাবিও না, কোন রকমে কুলাইয়া যাইবে"। কি প্রকারে অর্থাগম হয়, কেমন করিয়া উৎসবের ব্যয় কুলাইয়া যায়, ইহা দেখিবার জন্য আমি বোলপুর আসিয়া উৎসবের কোন আয়োজন করিলাম না; অর্থ সংগ্রহের কোন চেষ্টা করিলাম না। হাওলাত করিয়াও কাযটা নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম, কিন্তু সে সব কিছুই করিলাম না; চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলাম। উৎসব আরম্ভের ৪ দিন বাকী থাকিতে পলসা নিবাসী অদ্বৈতচন্দ্র রায় আমার নিকট আসিয়া ৯০৲ টাকা আমার হাতে দিয়া বলিলেন "বাবু এই ৯০ টাকা গ্রহণ করুন, আর যাহা পাইবেন তাহা শীঘ্রই মিটাইয়া দিব" এই টাকা পাইয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল, গুরুবাক্যের সত্যতা উপলব্ধি হইল, আমি তাড়াতাড়ি উৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার অন্তরের

দুরবস্থা দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিলেন।

১৩০৩ সাল ২০শে মাঘ হইতে উৎসব আরম্ভ হইল; গুরুর আদেশমত শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর আসন সারি সারি সংস্থাপিত হইল; সেই সঙ্গে গুরুরও একখানি আসন স্থাপিত হইল। এবার ভোগ, পূজা, আরতির, সুবন্দোবস্ত হইল। প্রত্যহ ভোর বেলায় মঙ্গল আরতি ও প্রভাতী গান, প্রাতে বাল্যভোগ হইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ, বেলা দুই প্রহরের সময় ভোগ ও ভোগারতি গান, তৎপর প্রসাদ বিতরণ ও আহারাদির ব্যবস্থা, আহারান্তে শাস্ত্র পাঠ, সন্ধ্যারতির পর কীর্ত্তন আরম্ভ, রাত্রি দুই প্রহরের সময় ভোগ, তৎপর লোক খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইল। ২০শে মাঘ হইতে ২৬শে মাঘ পর্য্যন্ত ঠিক এইরূপ ব্যবস্থামত উৎসব চলিতে লাগিল। তখন ব্যবসাদার কীর্ত্তনের সম্প্রদায় আনাইয়া গান করান হইত না, কেবল এখানকার যুবকবৃন্দ সংকীর্ত্তন করিত; আমার মুহুরি রাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামসংকীর্ত্তনের একজন অদ্বিতীয় বাদক ছিলেন; তাহার হাত দুইখানি ও আঙ্গুলগুলি যেন লোহার দ্বারায় নির্ম্মিত। তাহার সঙ্গে অন্যান্য লোকও খোল বাজাইত। প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত নামসংকীর্ত্তন হইত। কেবল আহারাদি ও শাস্ত্রপাঠের সময় বন্ধ থাকিত। ...

এমনি ভাবের তরঙ্গ উঠিত যে, বাদক ও গায়কগণের সংজ্ঞা থাকিত না, তাহারা উন্মত্ত হইয়া গান কীর্ত্তন এবং অবিশ্রান্ত নৃত্য করিত। এক এক ঝাছাড়ে তাহাদের দেহ যেন চুরমার হইয়া যাইত। কে কাহার উপর পড়ে, আর কে কাহাকে ধরে! এক এক সময় এক এক জনের উপর কতকগুলা লোক জড়াজড়ী করিয়া পড়িত। আবার তাহাদের উপর, আর কতকগুলা লোক আসিয়া পড়িত। এইরূপে অনেক লোক তাল পাকাইয়া প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি যাইত। কাহারও হাত ভাঙ্গিত, কাহারও পা ভাঙ্গিত, কাহারও মাথা ফুটিয়া রক্ত পড়িত, ইহাতে কাহারও দৃক্‌পাত নাই। সকলেই উন্মত্ত; ঘর দ্বার কম্পমান। খুলী উন্মত্ত হইয়া খোল বাজাইতেছে, খোলসহ সজোরে লম্ফ প্রদান করিতেছে; আগাগোড়া দুন্দের উপর খোল চলিয়াছে; বাদকের হাত ফাটিয়া রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, রক্তে খোল ভিজিয়া লাল হইয়া যাইতেছে; দৃকপাত নাই। সংকীর্ত্তন সময় কাহার সাধ্য যে এই দলের মধ্যে প্রবেশ করে? যাহাদের ভাব হইত না, তাহারা প্রাণ লইয়া সসব্যস্ত, পাছে উন্মত্ত সংকীর্ত্তনের দলের লোক তাহাদের গায়ে পড়ে। যাহাদের গায়ে পড়িবে তাহারাও আর সহজে রক্ষা পাইবে না, তাহাদের শরীর চুরমার হইয়া যাইবে। কীর্ত্তনের বিরাম নাই, ভাবেরও বিরাম নাই,

মাস দারুণ শীত, কিন্তু সংকীর্ত্তনের দল ঘর্ম্মাক্ত কলেবর; দুইখানি সুবৃহৎ পাখা দ্বারায় এই কীর্ত্তনের দলের উপর অবিশ্রান্ত বাতাস চালান হইত। তাহাদের হুঙ্কার গর্জ্জনে চারিদিক কম্পান্বিত হইত। ভাবের সময় এক একজনের দেহে মত্ত সিংহের বল হইত। আমাকে রাশীকৃত গ্লিসারিন, বেলের আটা ও কালী সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইত। খুলীগণ গ্লিসারিন্ মাখাইয়া হাত শক্ত করিত এবং ফাটা আঙ্গুলে বেলের আঠা ভরিয়া ন্যাকড়া দিয়া শক্ত করিয়া বান্ধিয়া খোল বাজাইত। এক এক সময় দেখা যাইত এই সংকীর্ত্তনের দলের লোকগুলাকে কে যেন [illegible] গাছ তারে বান্ধিয়া নাচাইতেছে। সকলে সংজ্ঞাহীন, তাহাদের চক্ষু মুদিত, অথচ সমভাবে তালে তালে নাচিতেছে। সমভাবে পদবিক্ষেপ হইতেছে, নাচিতে নাচিতে সমভাবে অগ্রসর হইতেছে আবার সমভাবে পিছাইয়া আসিতেছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমভাবে পরিচালিত করিতেছে। এদৃশ্য যে না দেখিয়াছে, সে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। সংকীর্ত্তন সময়ে স্ত্রীলোক মহলে আছাড় পিছাড় ও ক্রন্দনের অবধি থাকিত না। কীর্ত্তন শুনিতে যাইবার সময়, তাহারা গায়ের গহনাগুলি খুলিয়া রাখিয়া ও শক্ত করিয়া কাপড় পরিয়া যাইত। গায়ে গহনা থাকিলে এক আছাড়েই তাহা চুরমার হইয়া যাইবে। স্ত্রীলোক-

কারখানা হইত তথাপি কেহ অঙ্গে বেদনা বোধ করিত না বা কাতর হইত না।

২৭শে মাঘ প্রাতে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইল। লোকে লোকারণ্য, ধ্বজা পতাকায় আকাশ সমাচ্ছন্ন। বাসা হইতে সংকীর্ত্তন বাহির হইতে না হইতে স্ত্রীলোক মহলে ক্রন্দনের রোল উঠিল। তাহারা গৃহমধ্যে আছাড় পিছাড় করিতে লাগিল। সংকীর্ত্তনের দল কোমর বান্ধিয়া নগর-সংকীর্ত্তনে বাহির হইবার জন্য প্রভুগণের অনুমতির প্রার্থনায় যেমন আসনে সাষ্টাঙ্গ দিলেন, অমনি তাঁহাদের অঙ্গে কম্পা উপস্থিত হইল। তাঁহাদের মন ভাবে গর গর; অবিলম্বে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, কিছুক্ষণ আসনের নিকট কীর্ত্তন করতঃ একটু ভাব সম্বরণ করিয়া তাঁহারা নগর-সংকীর্ত্তনে বহির্গত হইলেন।

রাস্তায় লোকারণ্য, সংকীর্ত্তনের দল, ভাব ভরে কম্পান্বিত কলেবর, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিল; তাঁহাদের গভীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। খোল করতালের ধ্বনি সহ সংকীর্ত্তনের গগণভেদী রোল উঠিল। ভক্তগণ উদ্দণ্ড নৃত্যে মেদিনী কাঁপাইয়া প্রমত্ত সিংহের ন্যায় সংকীর্ত্তন লইয়া চলিল। এক এক আছাড়ে তাহাদের হাড়গোড় চূর্ণ হইয়া যায়। এক একজন এমন লম্ফ প্রদান করে যে দূরে গিয়া আছাড়

আসিয়া উপস্থিত হয়। পণ্ডিত মহাশয়ের দেহ রক্ষার জন্য কতকগুলি লোক হাতাহাতী করিয়া এক মণ্ডলী রচনা করিলেন। এই মণ্ডলীর মধ্যে তিনি নৃত্য করিয়া চলিলেন, মাঝে মাঝে আছাড় খাইয়া অচেতন হইতে লাগিলেন। পাছে কেহ তাঁহার দেহ স্পর্শ করে, এইজন্য মণ্ডলীর মধ্যে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। তাঁহার অবস্থা দেখিবার জন্য লোকের ভীড় হইত। তাঁহারা মণ্ডলীর বাহির হইতে তাঁহাকে দর্শন করিত। সংকীর্ত্তনের দল তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কীর্ত্তন করিত।

সংজ্ঞা লাভের পর যখন পণ্ডিত মহাশয় নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেন তখন এই সব লোক ছুটিয়া গিয়া যে স্থানে তিনি অচেতন থাকিতেন সেই স্থানের ধূলী লইতেন। এত লোকে ধূলী লইত যে যায়গাটা গর্ত্ত হইয়া যাইত। ভক্তগণের নৃত্যে রাস্তার ধূলা গগন আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, পথের দুই পার্শ্বের গৃহস্থ ও দোকানদার-গণ রাশি রাশি বাতাসা, কদ্‌মা, পাটালী ইত্যাদি ছড়াইতে লাগিল; দরিদ্র লোকের ছেলেরা এত কুড়াইয়া খাইতে লাগিল যে তাহাদের উদর পূর্ণ হইয়া গেল। এইবার পথের অনেক দর্শক লোক, সংকীর্ত্তন শুনিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। এক স্থানে একটা ঘোটক এই সংকীর্ত্তনের কোলাহলে লাফাইতে লাগিল; কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় হাত তুলিয়া যেমন তাহাকে স্থির হইতে বলিলেন, অমনি সে

স্থির হইয়া দাঁড়াইল। কালাচাঁদ বরাবর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

বেলা ৩টার সময় সংকীর্ত্তন ফিরিয়া আসিল। আমার কন্যাগণ কক্ষে পূর্ণঘট লইয়া জলের ঝারা দিয়া সংকীর্ত্তন বাসার মধ্যে লইয়া আসিলেন। বাসার অঙ্গনে খুব কীর্ত্তন হইতে লাগিল; সংকীর্ত্তনের রোলের সহিত স্ত্রীলোকগণের ক্রন্দনের ধ্বনিতে আকাশ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। যথাকালে দধিমঙ্গল আনান হইল। দধিমঙ্গল শেষ হইলে, প্রচুর হরিরলুট দেওয়া হইল, তাহার পর সংকীর্ত্তন শেষ হইল। ভক্তগণ আসনে সাষ্টাঙ্গ দিয়া প্রভুদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন।

স্নানাহার অন্তে ভক্তগণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার প্রক্কাল হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত কাঙ্গালী ভোজন হইল। আজ শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর জন্ম-তিথির পূজা, যত লোক উপস্থিত হইবে, যত্নের সহিত আহার পাইবে। গরীব লোকেরা যত পারিল আহার করিল, আর যত পারিল বাঁধিয়া লইয়া গেল। এবারকার মত উৎসব শেষ হইল।

শিশু গোপীজন-বল্লভ চলিতে বা কথা কহিতে শিখে নাই, এই উৎসবের সময় সে চাকরের কোলে উঠিবার জন্য হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করিত; চাকর কোলে করিলে পায়ের

এই মত কাছারী বাটীটা প্রদক্ষিণ করিয়া সিঁড়ির নিকট আসিয়া ধড়মড় করিয়া চাকরের কোল হইতে নামিয়া পড়িত এবং প্রণাম করতঃ আবার হাত তুলিয়া চাকরের কোলে উঠিয়া ঐরূপ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিত। এইরূপে কাছারী-বাটী প্রত্যহ প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিত। একদিন এই ব্যাপারটা স্থির হইয়া দেখিয়া বুঝিলাম, আমার কাছারি ঘরে ঠাকুরের আসন সংস্থাপিত হইয়াছে, এখন উহা আর কাছারী-বাটী নহে, উহা ঠাকুর ঘর। বালক চলিতে বা কথা কহিতে শিখে নাই, ইঙ্গিতে চাকরের কোলে উঠিয়া ঠাকুর ঘর পরিক্রমা করিতেছে। বালক সংকীর্ত্তনের দলকেও ঐরূপ পরিক্রমা করিত। সংকীর্ত্তন সময়ে চাকরের কোলে থাকিয়া ঝাঁকি মারিয়া এমনি নৃত্য করিত যে চাকর তাহাকে কোলে রাখিতে পারিত না। ঐ সকল অবস্থা দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় এই বালক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিল না। বালকের মাতা তাহাকে অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিতে লাগিলেন। ইহার পর অনেক সময় বালকের সুবুদ্ধি ও ধর্ম্মভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে সে সমস্ত অবস্থা লোপ পাইল। বাবাজী একেবারে মায়ামুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। এখনকার অবস্থা দেখিলে তাহাকে সাধারণ বালক বই আর কিছুই মনে হয় না।

এই সময় জন্মভূমি কুলীনগ্রাম একেবারে ভক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল ; লোকে নানা প্রকার অনাচার, দলাদলী মালি মোকদ্দমায় মাতিয়াছিল ; গ্রামের কল্যাণের জন্য দৈনিক নাম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে কুলীন গ্রামে খোল করতাল পাঠাইয়া দিলাম। দাদা মহাশয় সঙ্গীত প্রিয় লোক ছিলেন, তিনি বোলপুর হইতে বাটী গিয়া পাড়ার লোক লইয়া একটী নাম-সংকীর্ত্তনের দল গঠন করিলেন, এবং বৈঠকখানায় প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে নাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমি মাঝে মাঝে কুলীনগ্রামে গিয়া এই সংকীর্ত্তনের দলকে নানা প্রকারে উৎসাহ দিতে লাগিলাম। সংকীর্ত্তন দলের বেস পরিপুষ্টি সাধন হইতে লাগিল। বোলপুর হইতে মাঝে মাঝে খোল করতাল পাঠাইয়া দিতে লাগিলাম। কুলীনগ্রাম গিয়া গ্রামবাসীকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলাম। তাহাদের কুলীনগ্রামের পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিলাম। গ্রামবাসীগণ মালি মোকদ্দমার দলাদলী পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। পাড়ায় পাড়ায় প্রত্যহ নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। দেবসেবায় সকলে মনোনিবেশ করিল। গ্রামের লোক পরমানন্দে কাল যাপন করিতে লাগিল। তাহারা যেন একটা নূতন জীবন লাভ করিল।

কন্যাগণের দীক্ষা জন্য কলিকাতা গমন।

ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির বন্ধ উপস্থিত হইল ; আমার দ্বিতীয়া কন্যা সুভাষিনী দাসী, তৃতীয়া কন্যা নবনলিনী দাসী, জ্যেষ্ঠ জামাতা জগৎপ্রিয় নন্দী ও শাশুড়ী হরিপ্রিয়া দাসীকে দীক্ষা দেওয়াইবার জন্য আমি সপরিবারে কলিকাতা রওয়ানা হইলাম। এবার আমার সঙ্গে আমার ভগ্নি চম্পকলতা-দাসী, গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্য কলিকাতা চলিলেন। ১৩০৩ সাল ১৮ই ফাল্গুন প্রাতে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া টিকিট খরিদ করত ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় আমার প্রতিবেশী বোলপুর মোকামের যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম তাহার সর্ব্বশরীরে কম্প হইতেছে, মুখ দিয়া স্পষ্টরূপে কথা বলিতে পারিতেছে না, বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন এত কাঁদিতেছ ? কি হইয়াছে ? ব্যাপার কি বল ?" যোগেশ বলিল "বাবু !

আমাকে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট লইয়া চলুন, আমি তাঁহার নিকট দীক্ষা লইব।" আমি বলিলাম "তোমার এই অবস্থা কেন হইল?" তাহাতে যোগেশ বলিল "শেষ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম, গোস্বামী মহাশয় আমার নিকট দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, তুই কি করিতেছিস? আমার নিকট আয়, তোকে দীক্ষা দিব। তাঁহাকে দেখিয়া অবধি আমার শরীরে কম্প হইতেছে, এখনও থামিতেছে না; মা ও বাবাকে এই স্বপ্নের কথা বলায়, তাঁহারা দীক্ষা লইবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন।" আমি যোগেশকে বলিলাম, তুমি গোস্বামী মহাশয়কে কেমন করিয়া চিনিলে? তাহাতে যোগেশ বলিল "আপনার বাসায় তাঁহার ফটো দেখিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া আমি যোগেশের জন্য আর এক খানা টিকিট খরিদ করিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া লুপ-মেলে কলিকাতা রওনা হইলাম।

এইবার ৪৫ নং হ্যারিসনরোডে গোস্বামী মহাশয়ের বাসায় না উঠিয়া, ঐ বাটীর নিকটস্থ আমার কোন আত্মীয় জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর বাসায় উঠিলাম। তিনি তখন সপরিবারে তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই লোকটীর আধ্যাত্মিক অবস্থা আমি কিছুই জানিতাম না, কেবল মাত্র জানিতাম ইনি সুশিক্ষিত, সুসভ্য ও ব্যয়শীল।

এই কুটুম্ব মহাশয় ধর্ম্মের কোন ধার ধারিতেন না। বৈষ্ণবগণের উপর খড়্গহস্ত। হরিনাম বা কর্ত্তালের ধ্বনি

তাঁহার নিকট অত্যন্ত বিরক্তি জনক। প্রাতঃকালে ভিখারীরা আসিয়া পাছে হরিনাম উচ্চারণ করিয়া অথবা কীর্ত্তনের শব্দ করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করে, এই আশঙ্কায় তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে চারি পাঁচ আনা পয়সা লইয়া বৈঠক খানায় বসিতেন। কোন ভিখারী প্রাতে "জয় রাধে শ্রীরাধে" বলিতে না বলিতে তাহাকে ২।১ টা পয়সা ফেলিয়া দিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন। বাবু জানিতেন ২।১ টা পয়সা না দিলে ব্যাটারা রাস্তায় দাঁড়াইয়া ঘ্যানর ঘ্যানর করিয়া বেজার করিবে, কিন্তু ২।১ টা পয়সা পাইবা মাত্র চলিয়া যাইবে, এই জন্য বিরক্তির সহিত বৈঠক খানার জানালা দিয়া পয়সা দূরে নিক্ষেপ করিতেন। দরিদ্রকে দান করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

বড় লোকের ইয়ার বড়লোক, এই জন্য অনেকগুলি ধনাঢ্য, ইংরাজী শিক্ষিত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও পেন্সন্ প্রাপ্ত রাজপুরুষ প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে বাবুর বাসায় আসিয়া একত্রে চা-পান ও গল্প-গুজব করিতেন। বাবু মদ্য-মাংসেও বেশ পটু ছিলেন, যৌবনে ব্যভিচারেও যে লিপ্ত ছিলেন না এমত নহে। বাবুর মধ্যে খুব সাহেব্রী ভাব প্রবেশ করিয়াছিল। গুণের মধ্যে তিনি বিষয়াশক্তি শূন্য, বদান্য লোক ছিলেন।

আমি অনেকগুলি স্ত্রীলোক লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের

নিকট যাইতেছি, ইহাতে তিনি মনে মনে আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; কুটুম্ববিধায় মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। আমি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া লজ্জা ও ঘৃণায় নিতান্ত ম্রিয়মান হইলাম। একবার মনে হইতে লাগিল, ইহার বাসা হইতে লোকজন লইয়া চলিয়া যাই, আবার মনে হইল এরূপ করিলে নিতান্ত ধাষ্টাম হইবে; বিশেষ ইহার স্ত্রীর সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ, ইহার স্ত্রী মনে ব্যাথা পাইবেন, এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া মনোদুঃখে বাবুর বাসাতেই কোন রকমে মাথা গুজিয়া থাকিলাম।

আমাদের আগমন উপলক্ষে বাবুর ইয়ারমহলে (অবশ্য আমার অসাক্ষাতে) অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ চলিতে লাগিল। তাহারা আমাকে নিতান্ত অপদার্থ ও বেকুব লোক মনে করিলেন। কন্যা নলিনীর বয়স ৭ বৎসর, কিন্তু দেখিতে ৫ বৎসরের অধিক মনে হয় না। এই পাঁচ বৎসরের মেয়ের দীক্ষা হইবে ইহা একটা হাসির কথা। ইয়ার মহলে অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসি-ঠাট্টার পর আর তাঁহারা আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। আমাকে অপ্রতিভ করিবার জন্য উপহাস করিয়া বলিল "মহাশয় একি? পাঁচ বৎসরের মেয়ের দীক্ষা?"

আমি জানি, যে যেমন লোক, তাহার সঙ্গীও তেমনি। এই সব ধনগর্ব্বিত, পদ ও শিক্ষাভিমানী অসংযত লোক-

গুলাকে কিছু শিক্ষা না দিলে, ইহারা উত্তরোত্তর বাড়াবাড়ি করিবে; এই ভাবিয়া ইহাদের চৈতন্য সম্পাদনার্থ আমি তীব্র ভাষায় এক lecture ঝাড়িলাম। আমি বলিতে লাগিলাম;—সন্তানের জন্য পিতার অনেকটা দায়িত্ব আছে; সন্তানকে সৎশিক্ষা প্রদান, তাহার নৈতীক জীবনের উন্নতি সাধন করা, সকল পিতারই কর্ত্তব্য। যে পিতা মনে করেন, অর্থোপার্জ্জন করিয়া সন্তানের জন্য বহু অর্থ রাখিয়া যাইবেন, সন্তান সুখে সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত। ধনের দ্বারায় কেহ কখনও সুখী হয় না। ধন বিষম কালকুট। ইহা মানুষকে অমানুষ করে। ধন, উপার্জ্জনে কষ্ট, রক্ষায় কষ্ট, আর নাশে কষ্ট। ধনীলোক মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না; অহঙ্কার ও অভিমানে স্ফীত হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করে। দয়া-দাক্ষিণ্য সদ্‌গুণে বঞ্চিত হয়। তাহারা নিজের সাংসারিক সুখে উন্মত্ত থাকে, দরিদ্রের দুঃখ কষ্টে তাহাদের প্রাণ বিগলিত হয় না। আবার অর্থাশ্রক্তি বলবতী হইলে, মানুষ কৃপণ হইয়া পড়ে, এই কৃপণতা মহাপাপ। এই কৃপণতা যাহার মধ্যে প্রবেশ করে, সে সমস্ত সদ্‌গুণে বঞ্চিত হয়। কৃপণ ব্যক্তি অর্থের মমতায় কোন সাধু কার্য্য করিতে পারে না। অধিক কি নিজের ও পরিবারবর্গের ব্যারাম হইলে, অর্থনাশ ভয়ে, সুচিকিৎসারও বন্দোবস্ত

স্তব। আত্মীয়-স্বজনের দুঃখ-দরিদ্রতায় একেবারে উদাসীন, তাহাদের প্রতি ফিরিয়াও চাহেন না; অর্থই তাহার জীবন সর্ব্বস্ব। কিসে অর্থ সঞ্চয় হইবে, তিনি দিবারাত্রি এই চিন্তায় নিমগ্ন। ধনীলোকের আর একটা বিপদ যে, কোন সাধুলোক তাহাদের ছায়াস্পর্শ করেন না। কেবল তোষামোদকারী স্বার্থপর লোক দ্বারায় তাহারা পরিবেষ্টিত থাকে। তোষামোদকারী স্বার্থপর লোকের চাটুবাক্যে তাহারা প্রতিনিয়ত স্ফীত ও অহঙ্কৃত হইতে থাকে। ন্যায় ও সত্যের প্রতি তাহাদের আস্থা থাকে না, একটু অভিমানে আঘাত পড়িলে আর রক্ষা নাই।

লোকে মনে করে ধন ও উচ্চপদ লাভ হইলেই তাহারা সুখী হইবে; কিন্তু ভাবিয়া দেখুন ইহাতে কি মানুষের সুখ হয়? আপনাদের ধনও আছে, উচ্চ পদও আছে, আপনারা কি সুখী হইতে পারিয়াছেন? মানুষ ত্রিতাপ জ্বালায় যে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইতেছে, সে জ্বালা কি ধন বা উচ্চপদে নির্ব্বাপিত হয়? আজ পুত্রবিয়োগ, কাল পত্নি-বিয়োগ, নানা উৎকট পীড়া, ভয়, ভাবনা—একটা না একটা ফ্যাঁসাদ, সকল পরিবারেই লাগিয়া আছে। কোন না কোনরূপ অশান্তি সকলেই ভোগ করিতেছেন, কিন্তু ইহার প্রতিবিধান কেহই দেখিতে পাইতেছেন না। এখন লোকে এমনই মোহান্ধ হইয়া

আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, এই যে ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতেছে, ইহার কারণ কি? কিসে এই ত্রিতাপ নষ্ট হয়, এসব প্রশ্ন আদৌ মনোমধ্যে উদয় হয় না। কেবল ধন, মান, যশ, প্রভুত্ব, ইন্দ্রিয়-ভোগ ইত্যাদি লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। ইহারা মনে করে, এই সব লাভ হইলেই জীবন সার্থক হইল।

ইন্দ্রিয়-সুখ, মনুষ্যদেহে ও ইতর জীব-দেহে সমান। মানুষ আহার, নিদ্রা, মৈথুন করিয়া থাকে, ইতর জীবেও তাই করে। ইহাতে উভয়েরই সমান সুখ। বিচার করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে মানুষ অপেক্ষা পশু জীবনে অধিক সুখ। পশু সকল নিয়মিত আহার-নিদ্রার বশবর্ত্তী থাকায় তাহাদের শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। মানুষ অনিয়ম করিয়া পীড়িত হইয়া পড়ে, বিবিধ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করে। বড়লোকে জিহ্বার লালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য ক্ষুধা না হইলেও পুনঃ পুনঃ প্রচুর আহার করে, সুতরাং আহার জনিত তৃপ্তি তাহারা ভোগ করিতে পায় না, বরং উৎকট রোগগ্রস্থ হয়। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা না হইলেও স্ত্রীসঙ্গ করে, সুতরাং স্ত্রীসঙ্গের সুখ তাহারা অনুভব করিতে পায় না। ধনী লোকে অযথা ইন্দ্রিয়-পরিচালনা করায় তাহাদের ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া পড়ে, এজন্য তাহাদিগকে নানা ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। আমি অনেক বড় লোকের কথা শুনিয়াছি

ডাক্তার কবিরাজ ব্যতীত একদিনও চলিবার উপায় নাই। কিন্তু যিনিই যাই করুন—বিকল ইন্দ্রিয় কি আর স্বভাব প্রাপ্ত হয়? ভোগ-বাসনা প্রবল, অথচ চরিতার্থ করিবার উপায় নাই, ইহা অপেক্ষা আর গুরুতর শাস্তি কি হইতে পারে? ধনীলোকেরা নিদ্রাকর্ষণের পূর্ব্বেই শয্যায় শয়ন করিয়া কেবল এপাশ ওপাশ করিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করে। তাহাদের না আছে আহারে সুখ, না আছে স্ত্রীসঙ্গে সুখ, না আছে নিদ্রায় সুখ।

"চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জ্জীবং চিন্তা দহতি জীবিতং॥"

মানুষ সহস্র প্রকার দুশ্চিন্তায় সদাই জর্জ্জরীভূত। কখন মনে হইতেছে, ছেলেটা মূর্খ হইল, এ কি করিয়া খাইবে? মেয়েটা বিধবা হইল,তাহার দশায় কি হইবে? মনিব ধমক দিয়া কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন, তাঁহাকেই বা কিসে সন্তুষ্ট করিব? ইত্যাদি ইত্যাদি মনোমধ্যে নানা দুশ্চিন্তা উদয় হইয়া মানুষকে অস্থির করিয়া ফেলিতেছে। পশু-জীবনে এ সব চিন্তা নাই। বৎস একটু বড় হইলে যদি গাভীর দুগ্ধ খাইতে যায়, গাভী অমনি তাহাকে চাইট মারিয়া তাড়াইয়া দেয়। কিন্তু মানুষ, ছেলের ছেলে সুখে স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবে বলিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া ধনোপার্জ্জন করিতে থাকে। মৃত্যুর পর তাহার

সংসারে যে অর্থের প্রয়োজন নাই, একথা আমি বলি না। সংসারটা চলিয়া যায় এরূপ অর্থাগম হইলেই যথেষ্ট হইল। অধিক ধনও ভাল নয়, দারিদ্র্যও ভাল নয়। ভগবানের অন্নছত্রে বিশ্বসংসার প্রতিপালিত হইতেছে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, ইহসংসারে তাহার অভাব হয় না।

যে পিতা সন্তানের জন্য প্রচুর অর্থ রাখিয়া যান, তিনি অনিষ্টই করিয়া থাকেন। ধনীর সন্তানগণ প্রায়ই স্বার্থপর, চরিত্রহীন লোক দ্বারায় পরিবেষ্টিত হয়। এই সব লোক তাহাদিগকে নানা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া বিপথগামী করে। পিতার কষ্টের উপার্জ্জিত অর্থ, বিলাসিতায় ব্যয় করিয়া ফেলে। সুরাপান, ব্যভিচার প্রভৃতি নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতে থাকায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং তাহারা অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

যে পিতা সন্তানকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, সেই পিতাই যথার্থ সন্তানের হিতসাধন করেন। মানুষ অনাদিকাল হইতে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং পুনঃ পুনঃ সংসার যাতনা ভোগ করিতেছে। জন্ম-মরণ-রূপ বিপদ হইতে নিস্তার পাইবার তাহার উপায় নাই। মনুষ্য জন্ম সুদুর্ল্লভ। কেবল এই মনুষ্য জন্মেই মানুষ ভগবত উপাসনা দ্বারায় এই ...

এই সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যদি কেহ ভগবত উপাসনা না করে, তবে তাহার মত আত্মঘাতী আর কে আছে? ধর্ম্ম যে কেবল পরকালের জন্য, তাহা নহে; ধর্ম্ম ইহকালের সম্ভোগের বস্তু। ইহাতে মনুষ্য-জীবন মধুময় হয়। ধর্ম্ম লাভ হইলে কামক্রোধাদি রিপুগণের অত্যাচার আর সহ্য করিতে হয় না। দুষ্প্রবৃত্তি সকল দূরীভূত হয়। সাধু-বৃত্তি সকল অন্তরে জাগরিত হয়, প্রাণের মধ্যে অমৃতের লহরী খেলিতে থাকে। ঋষিরা বলিয়াছেন—"ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি" সেই ভূমা পরমেশ্বরই সুখ, যাহা ক্ষুদ্র, যাহা অনিত্য, তাহাতে সুখ নাই। মানুষ সুখের জন্য লালায়িত। অবিশ্রান্ত সুখের জন্য ফিরিতেছে, কিন্তু এমনই ভ্রান্ত যে সুখস্বরূপ ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া মরীচিকায় জলভ্রমে সংসার-দাবানলে পতিত হইয়া অহর্নিশি দগ্ধীভূত হইতেছে।

এই ভয়াবহ সংসার-যাতনা যাহাতে ভোগ করিতে না হয়, এই জন্য আমি আপন আপন কন্যাগণ ও আত্মীয়-স্বজনকে ভবরোগ-বৈদ্য সদ্গুরুর নিকট লইয়া যাইতেছি।

বাবুর সহচরগণ সকলেই ইংরাজী শিক্ষিত বুদ্ধিমান ও সুসভ্য। আমার কথাগুলি স্থির ভাবে শ্রদ্ধার সহিত শুনিতে লাগিলেন। দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপী সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,

বাবুগণ—আমরা আপনার কথা শুনিয়া খুবই পরিতৃপ্ত

হইয়াছি, এমন কথা আর আমরা কখনও শুনি নাই। এখন একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনার ছোট কন্যাটী নিতান্ত বালিকা, ইহার এখনও জ্ঞান হয় নাই, এই কন্যাটী ধর্ম্মাধর্ম্ম কি বুঝে? এত অল্প বয়সে দীক্ষা দিবার কারণ কি?

আমি—বহুকাল পরে যখন ধর্ম্মের অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই সদ্‌গুরুর আবির্ভাব হয়। মনুষ্য-জীবন ক্ষণভঙ্গুর, সদ্‌গুরু সুদুর্ল্লভ, সদ্‌গুরু মিলিয়াছে, দীক্ষা কার্য্যে কি আর কাল বিলম্ব করিতে আছে? যদিও ছোট কন্যাটী নিতান্ত বালিকা, তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সদ্‌গুরু আত্মায় শক্তি-সঞ্চার করেন; এই শক্তি চিরকাল আত্মার উপর ক্রিয়া করিবে। নারদ মহাশয়, শুকদেবকে ও প্রহ্লাদকে গর্ভাবস্থায় দীক্ষা দিয়াছিলেন। আমার কন্যাটী যখন বড় হইবে তখন এই শক্তি আপনা হইতে জাগিয়া উঠিবে। গুরুদত্ত নাম আপনা আপনি ভিতর হইতে বাহির হইবে এবং গুরুদত্ত শক্তি ইহাকে সাধন পথে পরিচালিত করিবে;

বাবুগণ—গুরুদত্ত নামের অর্থটাও ত জানা আবশ্যক?

আমি—গুরুদত্ত নামের অর্থ না জানিলেও কোন ক্ষতি

নাই, কারণ নাম কথা নহে, নাম শক্তি; বস্তুশক্তির গুণ কোথায় যাইবে? বস্তুশক্তি জ্ঞানের অপেক্ষা করে না। জানিয়াই হউক, আর না জানিয়াই হউক আগুনে হাত দিলেই পুড়িবে। শক্তি আপনার কায আপনি করিবে। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা লইতে, মূর্খ জ্ঞানী সকলের সমান অধিকার।

বাবুগণ—আমরাও কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, গুরু-দত্ত নাম যে শক্তি, তাহাত আমরা বুঝিতে পারি না, শক্তির কার্য্য কিছুই টের পাই না।

আমি—আপনারা যে নাম পাইয়াছেন, তাহা কি কখনও সাধন করিয়াছেন? যদি করিতেন, তাহা হইলে অবশ্য ফল পাইতেন।

বাবুগণ—শক্তিসঞ্চার কি?

আমি—ঈশ্বরের শক্তি সকলের মধ্যেই আছে, এই শক্তি নিদ্রিতাবস্থায় থাকে কোন মহাপুরুষের প্রবল শক্তি দ্বারায় সেই শক্তিকে (যাহা ক পরমাত্মা বা কুলকুণ্ডলিনী বলে) জাগ্রত করিয়া দেওয়াকেই শক্তিসঞ্চার বলে।

বাবুগণ—আমরা গুরুদিগের দুরাবস্থা দেখিয়াই ত ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। যাহারা নিজেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও চরিত্রহীন, তাহারা আবার শিষ্যের কি উপকার করিবে?

আমি—আপনারা অনেকটা ঠিক কথাই বলিয়াছেন। উপযুক্ত আচার্য্যের অভাবে আমাদের দেশের লোক এত ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছে। তবে শিষ্যেরও দোষ আছে। যেমন সদ্‌গুরু দুর্ল্লভ, তেমনি সৎশিষ্যও দুর্ল্লভ।

এই সকল কথাবার্ত্তার পর বাবুর দল পরমপ্রীতি লাভ করিয়া, আমায় অত্যন্ত আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আমার প্রতি এমনি আকৃষ্ট হইলেন যে, আমাকে আর এক দণ্ড ছাড়িতে চাহেন না। আমার কুটুম্ব মহাশয়ও অত্যন্ত সুখী হইলেন। তিনি আমার যথেষ্ট সমাদর করিয়া আমার সমস্ত পরিচয়, তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণকে জানাইতে লাগিলেন। এই অবধি আমার কুটুম্ব মহাশয়ের সহিত আমার একটা বিশেষ সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপিত হইল।

আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট থাকিতাম; বাবুরদল আমার প্রতি এমনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, যে ৩টা বাজিতে না বাজিতে তাহারা সকলে আসিয়া বাসায় উপস্থিত হইতেন এবং আমার প্রতাক্ষায় উৎকণ্ঠার সহিত কালযাপন করিতেন। আমি আশ্রম হইতে বাসায় আসিবামাত্র তাঁহারা আনন্দসহকারে আমার নিকট ধর্ম্ম বিষয়ক কথা শুনিতেন, অন্য কোন আলাপ হইত না।

লোকে বলে "রাম নামে ভূত পালায়" কথাটা মিথ্যা

নহে ; যে স্থানে ভগবত প্রসঙ্গ হয়, ভগবত-বিমুখ লোকেরা তথায় ক্ষণকাল আসিতে পারে না। ভগবত কথা বন্দুকের গুলির ন্যায় তাহাদের বুকে বাজে, তাহাদের কানে বিষ ঢালিয়া দেয়। এই বাবুর দল অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান, ভগবত কথায় তাঁহাদের যথেষ্ট রুচি দেখিয়া মনে হইল, এই সব সৎলোক কেবল সৎসঙ্গ অভাবে ধর্ম্মহীন জীবন যাপন করিতেছেন। সাধু সঙ্গ পাইলে ইঁহারা ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিতে পারিতেন। আমি কৃতবিদ্য অনেক লোকের মধ্যে বেশ ধর্ম্মভাব দেখিতে পাই, কেবল সৎসঙ্গ ও সদালোচনা অভাবে তাঁহাদের ধর্ম্মভাব বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে না।

১৯শে ফাল্গুন প্রাতঃকালে আমার কন্যা সুভাষিণী ও নবনলিনী, শাশুড়ী হরিপ্রিয়া দাসী, জ্যেষ্ঠ জামাতা জগৎপ্রিয় নন্দি ও প্রতিবেশী পুত্র যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দীক্ষা কার্য্য শেষ হইল।

আমার ভগ্নী চম্পকলতা দাসী বন্ধ্যা, বয়স্থা, বিধবা স্ত্রীলোক। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্ম্মানুরাগিনী ছিলেন। স্বামী বিয়োগের পর হইতে কেবল সা... ভজন, ব্রত, নিয়ম, উপবাস ও তীর্থ পর্য্যটনে কালাতি... করিতেন। তাঁহার অন্তরে প্রবল বৈরাগ্য। শরীর ও সংসারের প্রতি তাঁহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না। ব্যারাম হইলে ঔষধ সেবন করিতেন না, কেবল নারায়ণের চরণা-

মৃত পান করিতেন। তাঁহার যে কিছু অর্থ ছিল সমস্তই দেব-কার্য্য ও ধর্ম্ম-কার্য্যে ব্যয় করিয়া একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় কালযাপন করিতেন। দারুণ অর্থাভাব সত্ত্বেও তিনি তীর্থ দর্শনে বিরত থাকিতেন না। ভারতের যাবতীয় তীর্থ দর্শন করিয়া ফিরিতেন। অনেক সময় তিনি একাকিনী নিঃসম্বল অবস্থায় পুরী ও শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি দূরবর্ত্তী তীর্থস্থানে হাঁটিয়া যাইতেন ও ভিক্ষা বা মাধুকরী করিয়া খাইতেন। তিনি প্রায়ই একাকিনী কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িতেন; কাহারও নিকট টাকা চাহিতেন না। দূরবর্ত্তী তীর্থ স্থান হইতে লোকে দিদির সংবাদ পাঠাইলে আমি তাহাদের নিকট টাকা পাঠাইয়া দিতাম। একবার শ্রীবৃন্দাবনে রাধারাণীর পাথা টানিয়া কয়েক মাস ব্রজে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু ও ধর্ম্ম-পরায়ণা স্ত্রীলোক আমি দেখি নাই। রাত্রিকালে যখন সকলে নিদ্রা যাইত, তখন তিনি মালা লইয়া সমস্ত রাত্রি মালা জপ করিতেন।

সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকৃত অবস্থা লাভ করা অসম্ভব, একথা আমি গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি ও নিজের জীবনে ক্রমশঃ অনুভব করিতেছি। যদিও কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে—তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে দিদিকে বলিলাম

"গোস্বামী মহাশয় সদ্‌গুরু, সকলের দীক্ষা হইল, তোমার দীক্ষা হইলে তোমার যথেষ্ট কল্যাণ হইত. তুমি দীক্ষা গ্রহণ করিলে আমার বড়ই আনন্দ হয়; তুমি আমার সহোদরা ভগ্নী সেই জন্য বলিতেছি, অন্য লোক হইলে বলিতাম না।"

দিদির নিজের সাধনে অত্যন্ত নিষ্ঠা, এইকারণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লইতে তিনি সম্মত হইলেন না। ইহাতে দিদিমা ও আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আমার মনটা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায়, আমি সঙ্গের কতক লোক জন বোলপুরে পাঠাইয়া দিয়া আমার সেইবন্ধু বাবু কেদার নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটী মণ্ডলগামী গ্রামে চলিয়া গেলাম। দুই দিন পরে সে স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে দিদি আমাকে বলিলেন,

দিদি—আমি শিবরাত্রির দিন গোস্বামী মহাশয়ের পুজা করিয়াছি।

আমি—তুমি কি প্রকারে তাঁহার পূজা করিলে? তাঁহার কামরায় কোন স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার নাই; তাঁহার শাশুড়ী ও কন্যা পর্য্যন্ত তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিতে পায় না। সর্ব্বদা পাহারা থাকে, তুমি কেমন করিয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলে?

দিদি—আমিত এসব কথা কিছু জানি না, দেখিলাম

গোসাঞিজীর ঘরে কেহ নাই, দ্বারে কোন প্রহরী নাই, প্রভু একাকী রহিয়াছেন এই সুযোগে আমি বিল্বদল ও পুষ্প লইয়া তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া প্রণাম করিয়া আসিলাম।

আমি—শিবরাত্রির দিন তুমি শিবপূজা করিয়াছ ইহাতে তোমার প্রভূত কল্যাণ হইবে। তুমি ভবিষ্যতে সদ্‌গুরু লাভ করিবে।

দিদির মন গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল, কেবল নিজের সাধনে অতিশয় নিষ্ঠা থাকায় তিনি হঠাৎ দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তজ্জন্য আমার মনে যে আঘাত লাগিয়াছিল গোস্বামী মহাশয়ের চরণ পূজা করাতে সে মনঃকষ্ট অনেক পরিমাণে দূর হইয়া গেল।

গোস্বামী মহাশয় যেমন আদৌ নিদ্রা যাইতেন না, তেমনি তিনি স্নানও করিতেন না। বৎসরের মধ্যে ৺শারদীয়া পূজার সময় কেবল মহাষ্টমীর দিন স্নান করিতেন। গ্রীষ্মাধিক্য প্রযুক্ত একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

আমি—আপনি স্নান করেন না কেন? স্নান করিলে শরীর স্নিগ্ধ হয়। আমি একদিনও স্নান না করিয়া থাকিতে পারি না।

গোঁসাই—আমার স্নানের প্রয়োজন হয় না।

আমি—কেন আপনার স্নানের প্রয়োজন হয় না?

গোঁসাই—প্রত্যহ সুধা ক্ষরণ হয়। সুধা ক্ষরণ হইলে স্নানের প্রয়োজন হয় না, শরীর বেশ স্নিগ্ধ থাকে।

আমি—সুধা কি ?

গোঁসাই—ভক্তির প্রাবল্যে মস্তিষ্ক হইতে চুয়াইয়া জিহ্বায় এক প্রকার রস পড়ে, তাহাকে সুধা কহে। এই সুধার এমনি মাদকতা শক্তি যে, ইহার এক ফোঁটা খাইলে, ৪।৫ বোতল ব্রাণ্ডি খাইলে যে নেশা হয় তাহা অপেক্ষাও অধিক নেশা হইয়া থাকে। এই সুধার ২।১ ফোঁটা খাইলে মানুষের শরীর অচল হইয়া পড়ে; কিন্তু জ্ঞানের কোন হানি হয় না। অনায়াসে ৫।৭ দিন অনাহারে থাকিতে পারা যায়। তন্ত্রে এই সুধাই সুরা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

আমি—এই সুধা মস্তিষ্ক হইতে কি প্রকারে জিহ্বায় পড়িবে ?

গোঁসাই—তালুদেশের অস্থি মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, ঐ ছিদ্র দিয়া সুধা চুয়াইয়া জিহ্বায় পড়ে।

আমি—এই সুধার আস্বাদন কি প্রকার ?

গোঁসাই—উহার ভাব এক প্রকার নহে, ভক্তির ভাবের সহিত উহার যোগ আছে, উহা কখনও লবণ, কখনও লবণমধুর, কখনও বা তিক্ত, আবার

আমি—এই সুধার মাদকতা শক্তি রহিয়াছে, ইহাতে শরীরের কোন অনিষ্ট হয় না ত ?

গোঁসাই—ইহাতে শরীরের কোন অনিষ্ট হয় না, শরীর খুব ভাল থাকে। বহুক্ষণ অনাহারে থাকিলেও কোন ক্ষতি হয় না। ইহাতে শরীর বেশ গরম থাকে।

আমি—এই সুধা পান করিবার উপায় কি ?

গোঁসাই—কেবল শ্বাসে শ্বাসে নাম করা। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।

গোস্বামী মহাশয় আমার নিকট শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর জন্মোৎসবের আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিলেন। তৎপর তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া সপরিবারে বোলপুর চলিয়া আসিলাম।

৺জগন্নাথদেবকে রথস্থ করিবার জন্য কুলীনগ্রাম গমন।

কলিকাতা হইতে বোলপুর আসিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত সাধন-ভজনে রত থাকিলাম। ধর্ম্মবন্ধু পণ্ডিত মহাশয়, সরলনাথ, নাজিরবাবু হরিদাস সিংহ প্রভৃতি সতীর্থগণের সহিত একত্রে সাধন-ভজন, ধর্ম্মালোচনা ও হরিকথায় পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলাম। সংকীর্ত্তনের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ভক্তদল বাসায় উপস্থিত হইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিত; ভাবের তরঙ্গে ঘর দ্বার কম্পমান হইত। আমি সর্ব্বদাই যেন একটা নেশায় মাতোয়ারা হইয়া থাকিতাম। বিষয় কর্ম্ম দেখিবার প্রবৃত্তি ছিল না, ওকালতী শিথিল হইয়া পড়িল, কেবল দায়ে পড়িয়া এক একবার কাছারী যাইতাম। মক্কেল দেখিলেই গায়ে যেন জ্বর আসিত। দীক্ষার পর হইতেই কালীকৃষ্ণ ভায়ার পত্নী সুশীলাবালার মূর্চ্ছা ও দেবদর্শন আরম্ভ হইল। এ সব যে গুরুশক্তির ক্রিয়া তাহা কে বুঝিবে? কালীকৃষ্ণ ভায়া ব্যারাম হইল ভাবিয়া মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রাণের বন্ধু; তিনি একজন তেজস্বী, স্বাধীনচেতা, উদ্যমশীল ও সাধু প্রকৃতির লোক। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মানুরাগে মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্বে আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম ও শান্তিনিকেতনে একত্রে ব্রহ্মোপাসনা করিতাম। অঘোর বাবু শান্তিনিকেতনের আশ্রমধারী ও ম্যানেজারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্ব্বে ঠাকুর বাবুরা শান্তিনিকেতনে বড় একটা আসিতেন না। যদি কদাচিত কেহ আসিতেন, একবেলা থাকিয়াই চলিয়া যাইতেন। ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনের উৎসব সময়ে কেবল ঠাকুর বাবুরা আসিয়া উৎসব কার্য্য সমাধা করিতেন।

ক্রমে এই শান্তিনিকেতন ঠাকুর বাবুদের থাকিবার একটা আড্ডা হইল। ধর্ম্মপ্রাণ লোকদিগের পক্ষে ধনী লোকের সংসর্গ অনুকূল নহে। যাঁহারা ধর্ম্ম লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের ধনী লোকের সংসর্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। "বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন" এই শাস্ত্রবাক্য অঘোর বাবুর জীবনে সুস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। ঠাকুর বাবুদের সংসর্গে তাঁহার চিত্ত মলিন হইতে লাগিল। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ কমিয়া যাইতে লাগিল। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সরস উপাসনায় অসমর্থ হইলেন। তাঁহার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল। তাঁহার জীবন্ত ধর্ম্মভাব, জ্বলন্ত উৎসাহ এবং অন্তরের স্বাধীন

ভাব কিছুই থাকিল না। ক্রমে তিনি ঠাকুর বাবুদের একজন মোসাহেবের মত হইয়া পড়িলেন। আমরা তাঁহার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। কিসে তাঁহার এই চাকরী যায় এই ভাবনাই ভাবিতে লাগিলাম।

১৩০৪ সাল আষাঢ় মাহায় অঘোর বাবু পদচ্যুত হইলেন। ধর্ম্মপ্রাণ, স্বাধীনচেতা, চরিত্রবাঁন লোক, বড় লোকের পোষায় না। তাহারা নিজের মনোমত লোক চায়। যাহারা প্রতিনিয়ত তোষামোদ করিবে, অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিবে না, ধনী লোকে সেই সব লোক চায়। সেই সব লোকেই ধনী লোকের প্রিয়। চরিত্র বা ধর্ম্মের মর্য্যাদা ধনী লোকের নিকট নাই। সুতরাং শান্তিনিকেতনে অঘোর বাবুর স্থান হইল না। বলা বাহুল্য যে, পূজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্ম্মনিষ্ঠায় যে ঠাকুর বাড়ীর সকলেই অনুপ্রাণিত তাহা নহে ও হইতেও পারে না।

বেলা ৮টা বাজিয়াছে, পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আমি আপন বাসায় ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত আছি—এমন সময় নিতান্ত বিষণ্ণ ভাবে অঘোর বাবু আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ, ও শুষ্ক, চক্ষু ছল ছল করিতেছে, মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। তিনি আপনাকে বিপদসাগরে নিপতিত দেখিয়া

সংস্থান নাই—স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারবর্গ লইয়া কোথায় যান আর কিসেই বা দিনপাত হয়?

আমরা অঘোর বাবুর অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমাকে এরূপ মলিন দেখিতেছি কেন? কি হইয়াছে বল।" অঘোর বাবু বলিলেন "শান্তিনিকেতনের চাকরী গিয়াছে, বিনা দোষে ট্রাষ্টীগণ আমাকে পদচ্যুত করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় পরমানন্দ লাভ করিলেন; তিনি সাষ্টাঙ্গে ভগবানকে প্রণাম করিলেন এবং আনন্দসহকারে অঘোর বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "আজ আমার মনোরথ পূর্ণ হইল, ভগবান আপনাকে আত্মসাৎ করিবার জন্য মহা রৌরব হইতে উদ্ধার করিলেন। আজ আপনার অতি শুভ দিন, শান্তিনিকেতনের চাকরীই আপনার ধর্ম্ম লাভের অন্তরায় ছিল; চাকরী গিয়াছে বেশ হইয়াছে; আপনি কিছুমাত্র দুঃখিত বা চিন্তিত হইবেন না।" অঘোর বাবু দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন, পণ্ডিত মহাশয়ের কথায় তিনি একটু আশ্বস্ত হইলেন।

অঘোর বাবু গোস্বামী মহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবার তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল কেবল শান্তিনিকেতনের চাকরীই প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। এখন চাকরী গিয়াছে, কোন বন্ধন নাই, অঘোর বাবু কলিকাতায় গিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ

করিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন "আপনাদের দয়া না হইলে আমার কি আর উদ্ধার আছে?" অঘোর বাবু আপনার পদচ্যুতির কথা গোস্বামী মহাশয়কে জানাইলেন। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "আপনি চিন্তিত বা দুঃখিত হইবেন না। শান্তিনিকেতনের কায আর করিবেন না, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য ভাবিবেন না, ভগবান এমন করিয়া আপনার সংসার চালাইয়া দিবেন, তাহা আপনি টেরও পাইবেন না।" অঘোর বাবু গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় হইয়া বোলপুর চলিয়া আসিলেন।

অঘোর বাবুর ন্যায় সুপণ্ডিত, কার্য্যদক্ষ ও বিশ্বাসী লোক শান্তিনিকেতন হইতে অপসৃত হওয়ায় ঠাকুর বাবুদের কায কর্ম্মের হানি ও ব্যয় বাহুল্য হইতে লাগিল। তাঁহারা কাযের ক্ষতি দেখিয়া অঘোর বাবুকে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন; এবং কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে সম্মত হইলেন' কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের নিষেধ থাকায় তিনি সাহস করিয়া আর চাকরী গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু আমার পূর্ব্ব পুরুষ সত্যরাজ খানকে বৎসর বৎসর শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের পট্টডোরী দিবার আরম্ভ করেন। তিনি পুরুষোত্তমে বৎসর বৎসর পট্ট-

ড়োরী লইয়া যাইতেন। পুরুষোত্তম দূরদেশ, রাস্তা বিপদসঙ্কুল, হিন্দু মুসলমানে নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহ, একারণ প্রতি সন পুরী যাওয়া সম্ভবপর না থাকায় তিনি নিজ বাসস্থান কুলীনগ্রামে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের এক সেবা স্থাপন করেন। যে বৎসর পুরুষোত্তমে যাইতে না পারিতেন, সেই বৎসর লোকজন দ্বারার পুরুষোত্তমে পট্টডোরী পাঠাইয়া দিতেন; ৺জগন্নাথ দেবের যাত্রা মহোৎসব নিজ গ্রামেই দেখিতেন। কুলীনগ্রামের ৺জগন্নাথ দেবের রথ ভগ্ন হওয়ায় ১৩০৪ সালে নূতন রথ প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ সন ঠাকুরকে রথস্থ করিবার জন্য আমি বোলপুরের সংকীর্ত্তনের দল সঙ্গে লইয়া ১৮ই আষাঢ় কুলীনগ্রামে রওনা হইলাম। বেল' ৩টার সময় আমরা ট্রেনে উঠিলাম। পণ্ডিত মহাশয় ও আমি এঞ্জিনের নিকট একখানি গাড়ীতে চড়িলাম, আর যুবকবৃন্দ ব্রেকভ্যানের নিকট একখানা গাড়ীতে উঠিল। পাছে ট্রেনের ভিতর লম্ফ ঝম্ফ মাতামাতী হয় এই জন্য তাহা-দিগকে ট্রেনের মধ্যে গান কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু যুবকদল ট্রেনের মধ্যে গান কীর্ত্তন করিবার জন্য পরামর্শ করিয়াছিল, সেই জন্য তাহারা পৃথক কামরায় দূরে গাড়ী চাপিয়াছিল। ট্রেন ছাড়িবা মাত্র যুবকদল খোলে চাটী দিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল। যেমন সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল অমনি এই যুবকবৃন্দের হুঙ্কার

গর্জ্জন লম্ফ ও আছাড়ে ট্রেনের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কাহারও মাথা ফুটিল, কাহারও হাত ভাঙ্গিল, কেহ বা সংজ্ঞাহীন হইয়া ট্রেণের মধ্যে পড়িয়া রহিল; কিন্তু মাতামাতী ও সংকীর্ত্তনের বিরাম নাই। গাড়ী আসিবামাত্র প্রত্যেক ষ্টেশনে উহাদের কামরার সম্মুখে বিষম জনতা হইতে লাগিল। ষ্টেশনের যাত্রীগণ এই ব্যাপার দেখিবার জন্য আগ্রহের সহিত উহাদের সম্মুখে সমবেত হইতে থাকিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেবীপুর ষ্টেশনে ট্রেণ পৌঁছিলে, সংকীর্ত্তনের দল ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়িল। আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা জগৎপ্রিয় তখন একেবারে সংজ্ঞাহীন। যুবকদল তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় গাড়ী হইতে টানিয়া আনিয়া প্ল্যাটফরমে ফেলিল।

গ্রীষ্মকাল, প্রচণ্ড গরম। জগৎপ্রিয়ের অবস্থা দেখিয়া ষ্টেশনের সাহেবগণ "বেমারী হুয়া বেমারী হুয়া" চীৎকার করিতে লাগিল। রেল কর্ম্মচারী দ্বারায় জল আনাইয়া দিতে চাহিলে, যুবকদল আমাদের নিকট সংবাদ পাঠাইল। আমরা ছুটিয়া গিয়া সাহেবদিগকে বলিলাম "এই লোকটার মুর্চ্ছার ব্যারাম আছে, এখনি ভাল হইবে কোন চিন্তা নাই, মুখে জল দিবার আবশ্যক নাই"। এই কথা বলায় সাহেবরা চলিয়া গেল, সকলে ধরাধরি করিয়া জগৎকে প্ল্যাটফরম হইতে স্থানান্তরিত করিল। জগৎপ্রিয়ের চৈতন্য

থাকিলাম। অনেকক্ষণ পরে জগৎপ্রিয়ের চৈতন্য হইল, কিন্তু এমনি অবস্থা যে, পায়ের উপর ভর দিয়া তাহার দাঁড়াইবার সামর্থ্য নাই। হাত পায়ে আদৌ বল নাই। জগৎপ্রিয় ২ জন লোকের কান্ধে ভর করিয়া কোন রকমে এক এক পা হাঁটিতে লাগিল। আমরা কুলীনগ্রাম রওনা হইলাম।

কুলীনগ্রাম দেবীপুর হইতে ২॥০ ক্রোশ। এ অঞ্চলে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর সুবৃষ্টি হয় নাই, ক্যান্যাল, পুষ্করিণী,নদী,কোথায়ও একটু জল নাই। রাস্তায় তৃষ্ণায় আমাদের ছাতী ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কেহ পুষ্করিণী দিকে ছুটিল, কেহ জল খাইতে ক্যান্যালে গেল, কোথায়ও এক ফোঁটা জল নাই। নদীর ধারে উপস্থিত হইতে পারিলে জল পাওয়া যাইবে, এই আশায় সকলে নদীর নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু নদীতেও এক ফোঁটা জল নাই। আমরা অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। বৈকালে চা খাওয়া হয় নাই, তাহার উপর এই দারুণ তৃষ্ণা আর পথ হাঁটা, শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। কাহারও আর পা চলে না। ২।১০ পা অগ্রসর হয় আর বসিয়া পড়ে। কতকক্ষণে কুলীনগ্রাম পৌঁছিব, জলপান ও চা খাইয়া প্রাণ বাঁচাইব সকলেরই কেবল এই চিন্তা। রাত্রি ১০টার সময় গ্রামের সীমানার একটা প্রান্তরে পদার্পণ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

পণ্ডিত—এই স্থান কি কুলীনগ্রামের সীমানা ?

আমি—কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?

পণ্ডিত—আমার হঠাৎ অবসাদ দূর হইল, শরীরে বল আসিল, দেহ মন গর্‌গর্‌ করিতেছে।

আমি—হাঁ, ইহাই কুলীনগ্রামের সীমানা।

এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় কুলীনগ্রামকে একটা সাষ্টাঙ্গ দিলেন এবং লম্ফ প্রদান করিয়া উৎসাহের সহিত চলিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ব-পুরুষের প্রতিষ্ঠিত শিবানী দেবীকে প্রণাম ও স্তব করিয়া সকলে বাটির দিকে রওনা হইলেন।

আমার পূর্ব্বপুরুষ সত্যরাজ খান ও আর ২ কুলীনগ্রামবাসী—হরিদাস ঠাকুরের কৃপা পাত্র ছিলেন; শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভক্তি কল্পতরুর শাখা বর্ণনে আদি লীলার দশম পরিচ্ছেদে এইরূপ লিখিত আছে,—

> "হরিদাস ঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত।
> তিন লক্ষ নাম তিহোঁ লয়েন অপতিত॥
> তাঁহার অনন্ত গুণ কহি দিঙ্মাত্র।
> আচার্য্য গোঁসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র॥
> প্রহ্লাদ সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
> যবন তাড়নে যাঁর নাহিক ভ্রূভঙ্গ।
> তিহোঁ সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লঞা কোলে।

তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ॥
তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন।
সত্যরাজ আদি তার কৃপার ভাজন॥"

এই হরিদাস ঠাকুর বহুকাল কুলীনগ্রামে তপস্যা করিয়াছিলেন। কুলীনগ্রামে তাঁহার এক দারুময় প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। প্রত্যহ তাঁহার ভোগ পূজা হয়। গ্রামের প্রান্তে এক নির্জ্জন কুটীরে তিনি তপস্যা করিতেন। ঐ স্থান চিরস্মরণীয় করিবার জন্য বহুকাল যাবৎ তথায় এক সুরম্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তৎসম্মুখে শ্রীমহাপ্রভুর, শ্যামসুন্দরের ও হরিদাস ঠাকুরের সেবা স্থাপিত হইয়াছে, এই স্থান পরম রমণীয়। ইহাকে হরিদাস ঠাকুরের আকড়া কহে।

আমাদের ভদ্রাসনের লাগাও পূর্ব্বধারে জনেক পরম ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি প্রত্যহ এক লক্ষ হরিনাম না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। হরিদাস ঠাকুর এই ব্রাহ্মণের বাটীতে আহার করিতেন। এই স্থান চিরস্মরণীয় করিবার জন্য শাণ বান্ধান আছে, অনুচ্চ প্রাচীর দ্বারায় পরিবেষ্টিত সম্মুখে ছোট দরজা। এই স্থান হরিদাস ঠাকুরের পাঠ বলিয়া খ্যাত। প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে শুক্ল চতুর্দ্দশী তিথিতে এই স্থানে হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাবের মহোৎসব হইয়া থাকে। হরিদাস ঠাকুরের

তিরোভাবের পর হইতেই এই মহোৎসব চলিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বে রাস্তা সুগম ছিল না, ভাদ্র মাস বর্ষাকাল। রাস্তা দুর্গম থাকায় ভক্ত বৈষ্ণবেরা এই সময় কুলীনগ্রামে উপস্থিত হইতে অত্যন্ত ক্লেশানুভব করিতেন; একারণ প্রতি সন অগ্রহায়ণ মাহায় পূর্ণিমা তিথিতে পুনরায় হরিদাস ঠাকুরের আকড়ায় মহোৎসব হইয়া থাকে। ঐ সময় নানা দেশ হইতে বৈষ্ণবেরা আসিয়া তথায় উপস্থিত হন।

আমাদের সদর বাটীতে প্রবেশ করিতে হইলে হরিদাস ঠাকুরের পাটের আঙ্গিনা দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর ও শুষ্ককণ্ঠ এবং চা পান অভাবে অবসাদ বশতঃ মৃতপ্রায় এই ভক্তদল হরিদাস ঠাকুরের পাটের অঙ্গিনায় উপস্থিত হইবামাত্র হঠাৎ সকলের মধ্যে এক মহাশক্তির আবির্ভাব হইল। তাহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা ও অবসাদ একেবারে দূর হইয়া গেল, তাহারা মহাবিক্রমের সহিত হুঙ্কার গর্জ্জন আরম্ভ করিল, তাহাদের সর্ব্বশরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কাহারও সাধ্য হইল না যে সদর বাটীতে প্রবেশ করে; গায়ের কাপড়ও সামলাইবার সাবকাশ রহিল না; মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভক্তদলের নৃত্যে যেন ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। আমি ইহাদের কাপড় চোপড় সামলাইতে লাগিলাম। সকলেই উন্মত্ত, কাহারও

ছিল না। ইটের রোড়া ও ঘুসিম ছড়ান ছিল। এই ইটের রোড়া ও ঘুসিমের উপর এক এক আছাড়ে সকলের দেহ যেন চুরমার হইতে লাগিল ; কাহারও দৃক্‌পাত নাই। কুলীনগ্রামের কোন কোন যুবকও এই মহাশক্তির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সংকীর্ত্তনে যোগদান করতঃ ভাবাবেশে উন্মত্ত হইয়া পড়িল এবং তাহাদের ভয়াবহ আছাড়ে ইট পাটখেল সব গুঁড়া হইতে লাগিল।

আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দবসু তাঁহার সংকীর্ত্তনের দল সহ আমাদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ এই বিষম ব্যাপার উপস্থিত হওয়ায় তিনি ও গ্রামের লোকজন সকল অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন। বাটীর স্ত্রীলোকেরা সদর বাটীতে আসিয়া দরজা ও জানালা দিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। রাত্রি ১টা বাজিয়া গেল তথাপি কীর্ত্তনের বিরাম নাই। অনেক কষ্ট করিয়া কীর্ত্তন বন্ধ করা হইল। দাদা মহাশয় এই সংকীর্ত্তনের দলকে আদর করিয়া লইয়া আসিবার জন্য সন্ধ্যা হইতে আপন দলবল লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন কীর্ত্তন বন্ধ হওয়ায় তিনি নিজের দল লইয়া আসরে নামিলেন এবং নিজকৃত একটী পদ গাইতে আরম্ভ করিলেন। পদের প্রথম কলি "অবিরাম হরিনাম বল বদনে, আজ কুলীনগ্রাম ধন্য হইল [illegible]

আরম্ভ করিলেন অমনি আবার এই সংকীর্ত্তনের দল লম্ফ প্রদান করিয়া সিংহ বিক্রমে মাতিয়া উঠিল। উভয় দল একত্রিত হওয়ায় আবার মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শরীরের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই, সকলে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়াছে, কিছুমাত্র অবসাদ নাই, সকলের শরীরে সিংহের ন্যায় বল বিক্রম। রাত্রি ২॥০টা বাজিয়া গেল এমন সময় অতি কষ্টে জোর করিয়া সংকীর্ত্তন থামান হইল। তদপর সকলে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া শয়ন করিল।

পরদিন রথযাত্রা ৺জগন্নাথদেব রথারোহণে বিহার করিতে বাহির হইবেন। বোলপুর হইতে এক সংকীর্ত্তনের দল এই রথযাত্রা উপলক্ষে কুলীনগ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এই কথা বিদ্যুৎবেগে গ্রাম গ্রামান্তরে প্রচার হইয়া পড়িল। এই সংকীর্ত্তনের দলকে দেখিয়া ও ঠাকুরকে রথস্থ করিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় গ্রাম গ্রামান্তরে সাজ সাজ শব্দ পড়িয়া গেল। সর্ব্বত্র মহাসংকীর্ত্তনের আয়োজন হইতে লাগিল। বেলা ১২টা বাজিতে না বাজিতে ৺জগন্নাথদেবকে রথস্থ করাইবার জন্য কুলীনগ্রামের প্রত্যেক পাড়া ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে দলে দলে সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আকাশ ধ্বজা, পতাকায় সমাচ্ছন্ন, চারিদিকে খোল করতাল পেটা ঘড়ির শব্দ, এবং মাঝে মাঝে গগনভেদী হরিধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। এই সময় বোলপুরের দলও

কোমর বাঁধিয়া খোল করতাল লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। কীর্ত্তনের গগনভেদী রোল উঠিল। ঠাকুর শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইলে, সমস্ত কীর্ত্তনের দল ঠাকুরের অগ্র পশ্চাৎ কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। লোকে লোকারণ্য, ক্রমে ঠাকুর রথস্থ হইলেন। সংকীর্ত্তনের দল সমূহ রথকে প্রদক্ষিণ করিয়া মহা সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। বোলপুরের সংকীর্ত্তন দলের ভাবের বিরাম নাই, ভক্তগণের হুঙ্কার গর্জ্জন, নৃত্য ও আছাড়ের অবধি নাই। সংকীর্ত্তনের গগনভেদী রোলে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। যাত্রী ও দোকানদারগণ কেনা বেচা বন্ধ করিয়া এই মহা সংকীর্ত্তন দেখিতে লাগিল। তাহারা "জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ" বলিয়া হস্তোত্তলন করিয়া জগন্নাথ দেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও বন্দনা করিতে লাগিল।

রথ প্রদক্ষিণের পর ঠাকুরের সম্মুখে রথাগ্রে ভক্তদল কীর্ত্তন করিতে লাগিল। যাত্রী ও গ্রামবাসী সকলে কাছি হস্তে দণ্ডায়মান। রথে টান দিবার উপায় নাই। বোলপুরের সংকীর্ত্তনের অধিকাংশ লোক রথাগ্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। ইহাদের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে ইহারা ধীরে ধীরে সংকীর্ত্তন ও জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিতে লাগিল। বিহারি দাসের মূর্চ্ছা আদৌ ভঙ্গ হইল

না, সে রথের সম্মুখে পড়িয়া রহিল। বোলপুরের সংকীর্ত্তনের দল বেহুঁস, কে কাহাকে সামলায়? বহুক্ষণ রথ টানা বন্ধ থাকায় কতক লোকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। কোন কোন দুষ্টবুদ্ধি লোক মনে করিল এই লোকটা ভণ্ডামী করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, রথ আসিতেছে দেখিলেই উঠিয়া পালাইবে। এই ভাবিয়া তাহারা হরিধ্বনি করিয়া রথে টান দিল, রথ হড়হড় করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল, সকলে "জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ" বলিয়া যোড়হাতে প্রণাম করিতে লাগিল। বিহারি দাস যে অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া আছে, কেহ তাহার খোঁজ খবর লইল না। তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার কোন চেষ্টাই হইল না। রথ বিহারি দাসের নিকটবর্ত্তী হইয়া কঁ্যা কোঁ্যা করিয়া একটা ভীষণ শব্দ করতঃ ঘুরিয়া বিহারি দাসকে বেষ্টন করিয়া চলিয়া গেল; বিহারি দাসের অঙ্গ আদৌ স্পর্শ করিল না। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে সকলে বিস্মিত হইল। ক্ষণকাল মধ্যে রথ টানা বন্ধ করিয়া বিহারি দাসকে দর্শন করিবার জন্য চারিদিক হইতে লোক সকল ছুটিয়া আসিতে লাগিল। এতক্ষণ যাঁহারা জগন্নাথ দেব দর্শন করিতেছিলেন, এখন তাঁহারা বিহারি দাসকে দর্শন করিতে লাগিলেন। রথতলায় মহা ভীড়, ছুটাছুটী হুড়াহুড়ি উপস্থিত হইল। ক্রমে বিহারি দাস চৈতন্য লাভ করিলে, সংকীর্ত্তন দলে আসিয়া উপস্থিত

সেই স্থানের ধূলী লইতে লইতে যায়গাটা খাল হইয়া গেল।

কুলীনগ্রাম ভক্ত প্রধান স্থান ; তাহারা ভক্তের আদর জানে। পাড়ায় পাড়ায় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে বোলপুরের এই সংকীর্ত্তন দলের মহিমা বিঘোষিত হইতে লাগিল। সকল পাড়ায় সকল বাড়ীতে, কেবল ইহাদেরই প্রসঙ্গ ; ইহাদের অমানুষী ভাবের কথা, ইহাদের সংকীর্ত্তনের মত্ততার কথা। এই সংকীর্ত্তনের প্রভাবে কুলীনগ্রামের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বাতাস যেন ফিরিয়া গেল। লোকের মনে ধর্ম্মানুরাগ ও বৈরাগ্যের উদয় হইল।

ঠাকুরের এই বিজয়োৎসবের পরদিন সংকীর্ত্তনের দল বিশ্রাম লাভ করিল ; তাহার পরদিন অর্থাৎ ২১শে আষাঢ় তারিখে প্রাতে পণ্ডিত মহাশয় আবার গ্রামে সংকীর্ত্তন বাহির করিলেন : সংকীর্ত্তনের দলের লোকগুলি যেন নেশায় মাতোয়ারা ; তাহাদের শরীরে ক্ষুধা তৃষ্ণা বাধে না, ক্লান্তি বোধ হয় না, শরীর মন সদাই গর গর। যেমন খোল করতাল বাজিল, অমনি সংকীর্ত্তনের দল হুঙ্কার করিয়া উঠিল। আর তাহাদিগকে সামলায় কে ? কীর্ত্তনের ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তাহারা উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিল ; তাহাদের পদভরে পৃথিবী যেন টলটলায়মান ; হুঙ্কার গর্জ্জনে

গ্রাম তোলপার হইতে লাগিল। কীর্ত্তন দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে লোক আসিল। গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা, কুলের কুলবধূ পর্য্যন্ত এই সংকীর্ত্তন দেখিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়াইল। এক এক আছাড়ে কীর্ত্তনীয়াগণের শরীর যেন চুরমার হইয়া যায়। এই অদ্ভুত দৃশ্য গ্রামবাসিগণ পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। গ্রামবাসিগণ মধ্যে যাহারা এই কীর্ত্তনে যোগ দিল, তাহাদের মধ্যেও ভাবের প্রবল তরঙ্গ উঠিল; তাহারাও ইহাদের সঙ্গে আত্মহারা হইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল। এই কীর্ত্তন ৺জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে পণ্ডিত মহাশয় চারিদিকে কেবল জগন্নাথ মূর্ত্তিই দেখিতে লাগিলেন, অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার এই কীর্ত্তন যখন ৺মদন গোপালের নাট মন্দিরে উপস্থিত হইল, তখন দেখিলেন মদনগোপাল মদমোহনরূপে সখিগণে পরিবৃত হইয়া সখিসহ এই নাট মন্দিরে নৃত্য করিতেছেন। সংকীর্ত্তনের দল ভাবের তরঙ্গে আত্মহারা, কেবল আমিই একমাত্র পাষণ্ড আকাট হইয়া দাঁড়াইয়া সভঁয়ে আত্মরক্ষা করিয়া ফিরিতেছি। উন্মত্ত ভক্তগণের আছাড়ের উপক্রম দেখিবামাত্র সরিয়া দাঁড়াইতেছি। আমার এমন সাহস বা সাধ্য নাই যে, কাহাকেও ধরি বা সংকীর্ত্তনের মধ্যে প্রবেশ-

আমার এমনি দুর্ভাগ্য ও আমার হৃদয় এতই শুষ্ক যে, ইহা আমাকে আদৌ স্পর্শ করিতেছে না। আমি কেবল সামাল সামাল করিয়া তফাতে ফিরিতেছি। যদিও আঘাতের আশঙ্কায় সংকীর্ত্তনের দল হইতে একটু তফাতে তফাতে থাকি, তথাপি অনাহত থাকিতে পারিলাম না। বিহারি দাস উন্মত্ত হইয়া আমার পায়ের উপর এমনি আছাড় খাইয়া পড়িল যে, সেই আছাড়ে আমার পায়ে দারুণ বেদনা হইল, পা ফুলিয়া উঠিল, প্রায় ১৫ দিন কষ্ট পাইলাম।

মদনগোপালের বাড়ী হইতে সংকীর্ত্তন হাড়ীপাড়া হইয়া মিত্র পাড়ায় পৌঁছিল। এই সময় ছোট হরিদাস ডোমের এমনি ভাবের অবস্থা হইল যেন তাহার আসন্ন-মৃত্যু উপস্থিত। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া সকলে ভীত হইল; সংকীর্ত্তন আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। মিত্র পাড়ার আবাল বৃদ্ধ বণিতা পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। অনেকেরই ধারণা হরিদাস মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কেহ কেহ পুলিশের ভয়ে গা ঢাকা দিল; কেহ ত্বরায় ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য বলিতে লাগিল। আমার অন্তরেও একটু ভয়ের সঞ্চার হইল; কিন্তু উন্মত্ত কীর্ত্তনীয়াগণ দৃকপাৎ করিল না, তাহাদের কীর্ত্তনের বিরাম নাই। কোথা কি হইতেছে না হইতে...

তাহাদের দৃষ্টি নাই; এই সময় পণ্ডিত মহাশয় গ্রামবাসিগনকে সাহস দিয়া আশ্বস্ত করিলেন। যাহা হউক বেলা ২॥০টা বাজিয়াছে, এখন সংকীর্ত্তন বন্ধ করাই যুক্তিসঙ্গত ভাবিয়া কীর্ত্তন থামান হইল।

সংকীর্ত্তন থামিয়া গেলে হরিদাসের শুশ্রূষা আরম্ভ হইল। শুশ্রূষা আর কি? কেবল ভব রোগের মহৌষধি তারকব্রহ্ম হরিনাম তাহার কর্ণ কুহরে ধীরে ধীরে প্রদত্ত হইতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে হরিদাসের একটু সংজ্ঞা হইলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া তাহার বাটীতে রাখিয়া আসা হইল। কালীকৃষ্ণ সরকার, যোগেশ চক্রবর্ত্তী ও নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়েকজন হরিদাসের পাটের সম্মুখের আঙ্গিনায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিল। কালীকৃষ্ণ ভায়ার মুখ দিয়া অবিশ্রান্ত লালা নির্গত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার প্রাকালে ইহারা প্রকৃতিস্থ হইয়া আহারাদি করতঃ বিশ্রাম লাভ করিল।

পরদিন প্রাতে যোগেশ চক্রবর্ত্তী, নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কালীকৃষ্ণ ভায়া প্রভৃতি অনেকগুলি সংকীর্ত্তন দলের লোক কাহাকেও কিছু না বলিয়া কুলীনগ্রামের শ্রীবিগ্রহ সকল দর্শন করিতে চলিয়া গেলেন। বেলা ১০টা পর্য্যন্ত ইহাদের কোন সংবাদ না পাওয়ায় আমি অনুসন্ধানে জানিলাম ইহারা প্রাতঃকালে ঠাকুর দর্শনে বহির্গত হইয়াছে। কাল ইহাদের শরীরের উপর বিষম চোট গিয়াছে, সকাল

সকাল আহার করান কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আমি ইহাদিগকে বাটীতে আনিবার জন্য বাহির হইলাম। প্রথমতঃ হরিদাস ঠাকুরের পাট তদপর রঘুনাথের বাড়ী, জগন্নাথ দেবের বাড়ী, মদনগোপালের বাড়ী, গোপেশ্বরের বাড়ী কোথায়ও ইহাদিগকে দেখিতে না পাওয়ায় গ্রামের প্রান্তে সেই হরিদাস ঠাকুরের আখড়ায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে গিয়া দেখি যোগেশ, নৃপেন্দ্র, কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের আঙ্গিনায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। আখড়ার মহান্ত ও ২।১টী বৈষ্ণব নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। আমি উপস্থিত হইয়া ইহাদের চৈতন্য সম্পাদন জন্য ক্রমাগত এক একজনের কাণে নাম দিতে লাগিলাম। একজনের চৈতন্য হইলে তাহাকে সদর দরজায় বসাইয়া রাখিয়া অপর জনের কাণে নাম দিতে আরম্ভ করিলাম। নাম গ্রহণ করিতে করিতে ইহার চৈতন্য হইল বটে কিন্তু যে লোকটীকে সদর দরজার বসাইয়া রাখিয়াছিলাম, সে আবার এই নাম শ্রবণ করিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িল। এইরূপে একের চৈতন্য সম্পাদন করিতে অপরে অচৈতন্য হইতে লাগিল। আমি বিষম দায়ে পড়িলাম। ইহাদিগকে বাড়ী ফিরাইয়া আনা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। বেলা অনেক হইয়াছে, প্রচণ্ড রৌদ্র, আর আখড়ার আঙ্গিনায় থাকিতে পারা যায় না। অবশেষে এক বুদ্ধি ঠাওরাইলাম। নাম দিতে দিতে

যেমন একজনের চৈতন্য সম্পাদন হইল, অমনি তাহাকে আখড়ার বাহির করিয়া দূরে বকুল তলায় বসাইয়া রাখিয়া আসিলাম। সেখান হইতে যেন আর নাম শুনিতে না পায়। এইরূপে একে একে সকলের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া অপরাহ্নে তাহাদিগকে লইয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। পথে ইহাদের মুখে কোন কথা নাই, মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন আর ইহাদের স্নান হইল না কিছু আহার করাইয়া বিশ্রাম করাইতে লাগিলাম।

পরদিন ইহারা সুস্থ হইলে আমি ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বোলপুর ফিরিলাম। আসিবার সময় রাস্তার দূরত্ব দেখিয়া সকলে অবাক, তাহারা দেবীপুর ষ্টেশনে আসিয়া বলিল এইটুকু পথ? ইহাত প্রত্যহ বেড়ান যায়। কুলীনগ্রাম যাইবার দিন আমাদের যেন ২০ ক্রোশ মনে হইয়াছিল।

গুরু দর্শনে কলিকাতা গমন।

কালপ্রভাবে কুলীনগ্রামবাসিগণ বহির্ম্মুখীন হইয়া পড়িলেও তাহাদের প্রকৃতি গত একটা ধর্ম্মানুরাগ আছে। রথ যাত্রার পূর্ব্ব হইতে তথায় প্রত্যহ নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে গ্রামবাসী সকলের মনে ধর্ম্মানুরাগ অধিকতর রূপে জাগ্রত হইল। তাহারা মালি মোকর্দ্দমা দলাদলী ঝগড়া গণ্ডগোল পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। আমিও তাহাদিগকে গুরু সন্নিধানে লইয়া গিয়া দীক্ষা দেওয়াইবার জন্য চেষ্টিত থাকিলাম। কুলগুরু পরিত্যাগ করা, উচ্ছিষ্ট ভোজন ত্যাগ করা, সুতরাং ভোজ কার্য্যে খাওয়া বা অন্যের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাওয়া বন্দ করা, সর্ব্বপ্রকার সদাচার রক্ষা করিয়া চলা ইত্যাদি গ্রাম বাসীর পক্ষে একটা বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল।

যুবকগণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গিয়া দীক্ষা লইতে উদ্যত হইয়াছে, এই কথা গ্রামে রাষ্ট্র হইল। যে সকল লোক নিতান্ত সংসার মুগ্ধ তাহারা দেখিল তাহাদের সন্তানেরা যদি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লয় তাহা হইলে আর তাহাদের সংসারে মন থাকিবে না, সাংসারিক

নানা ক্ষতি উপস্থিত হইবে, এজন্য তাহারা নিজের সন্তান গণকে দীক্ষা লইতে নিষেধ করিতে লাগিল। যদিও যুবকগণের দীক্ষা লইবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল তথাপি ধর্ম্মভীরু পিতৃবৎসল পুত্রেরা পিতার কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। যাহারা দুর্দ্দাণ্ড ও অশিষ্ট তাহাদিগকে তাহাদের অভিভাবকেরা নিবারণ করিতে পারিল না। গ্রামের মধ্যে বিলক্ষণ আন্দোলন চলিতে লাগিল।

দাদা মহাশয় বহু অপরাধে অপরাধী ছিলেন, সদ্‌গুরুর আশ্রয় ব্যতিরেকে তাঁহার রক্ষার উপায়ান্তর নাই, এই ভাবিয়া আমি দাদা মহাশয়কে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লইবারজন্য ক্রমাগত জেদ করিতে লাগিলাম; তিনি দীক্ষা গ্রহণে নানা আপত্য উপস্থিত করিতে লাগিলেন।

এদিকে আমি বোলপুর চলিয়া আসিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত সাধন ভজন ও নাম সংকীর্ত্তনের দল সহ প্রত্যহ নাম সংকীর্ত্তনে পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলাম। দিন দিন গুরুশক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকায়, আমার অনুরাগ ও উৎসাহ ক্রমাগত বাড়িতে লাগিল। কায কর্ম্মের অনেক ক্ষতি করিতে হইল। সন্ধ্যা হইলে সংসারের বা মালি মোকদ্দমার কথা আর আমার কাণে উঠিতে পাইত না। প্রাতঃকালে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে সাধন ভজনে ব্যাপৃত থাকিতাম, তখনও মক্কেলগণ

আমাকে পাইত না, সুতরাং ওকালতী অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল।

পূজার বন্দ উপস্থিত হইলে আমি পণ্ডিত মহাশয় সহ কলিকাতায় গুরু দর্শনে গমন করিলাম। কতকগুলি সুন্দর পদ্মফুল ও দুইটী ছোট ছোট কাঁচা আম সঙ্গে লইলাম। কলিকাতা পৌঁছিয়া গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করতঃ এই ফুল ও আম তাঁহার পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম। গোস্বামী মহাশয় ফুল ও আম প্রাপ্ত হইয়া, পরমানন্দ প্রকাশ করিলেন। আমাদের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। একটা বড় পিতলের গামলা জলপূর্ণ করিয়া ফুলগুলি তাহাতে রক্ষা করতঃ ঐ গামলা নিজের কাছে রাখিলেন এবং আম দুইটী ছাড়াইয়া কুচী কুচী করিয়া লবণ মাখাইয়া আনিতে বলায় সেবকগণ তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ করিয়া আনিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করিলেন। গোস্বামী মহাশয় সমস্ত শিষ্যগণকে এক এক কুচী করিয়া বাঁটিয়া দিলেন এবং নিজেও এক কুচী খাইলেন। শিষ্যগণ এক এক কুচী আম মুখে দিয়া উঃ আঃ করিতে করিতে আমার নিকট আসিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন "ভাই আচ্ছা আম আনিয়াছ, আমাদের এই ৮০ জনের সাধ্য নাই যে তোমার দুইটী আম খাইয়া নিঃশেষ করি; এমন টক যে কাহার সাধ্য যে এক কুচী মুখে দেয়, আমরা সকলে পরাস্ত"। আমি বলিলাম "আমাদের বোলপুরের আম

এমনি মিষ্ট জানিবে, এমন না হইলে গোস্বামী মহাশয়কে আনিয়া দিব কেন? এই আমের আবার আদরত দেখিলে? তোমাদের এ আম খাওয়া অনেকদিন মনে থাকিবে।

৺জগন্নাথ দেবকে রথস্থ করিবার জন্য বোলপুর হইতে কুলীনগ্রাম যাইবার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বর্ণন করিলাম। সংকীর্ত্তন দলের ক্ষুধা তৃষ্ণা ও অবসাদের কথা জ্ঞাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—

আমি—ক্ষুধা, তৃষ্ণায়, নিতান্ত কাতর ও চা অভাবে নিতান্ত অবসাদ গ্রস্ত সংকীর্ত্তনের দল হরিদাস ঠাকুরের পাটের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইবামাত্র হঠাৎ তাহারা সংকীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিল কেন? তাহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা ও অবসাদ কি প্রকারে দূর হইল?

গোঁসাই—কুলীনগ্রামের দেবতা সকল জাগ্রত, তোমাদিগকে পাইয়া তাঁহারা পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তোমাদিগকে আপ্যায়িত করিবার জন্য এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের কৃপায় সকলের ক্ষুধা তৃষ্ণা ও অবসাদ দূর হইয়াছিল।

আমি—কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, শিব প্রভৃতি হিন্দুদের বিবিধ দেবদেবী এসব কি?

গোঁসাই—এ সমস্তই ঠিক, এ সব ভগবানেরই রূপ,

আমি—সাধন প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ নানা দেবদেবী দর্শন করেন, কেহ কেহ আদৌ দর্শন করেন না এরূপ কেন হয় ?

গোঁসাই—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাহার যেমন তপস্যা ; যাহার দেব দর্শনের ইচ্ছা প্রবল, তাহার দেব দর্শন হইয়া থাকে, যাহার সে ইচ্ছা নাই তাহার দেবদর্শন হয় না। যে ব্যক্তি যে দেবতা ভাল বাসে, তাহার নিকট সেই দেবতা প্রকাশিত হন। সকলের পথও একরূপ নহে। কেহ দেব দর্শন অপেক্ষা জিতেন্দ্রিয় হওয়া প্রয়োজন বোধ করে।

আমি—আমাদের মধ্যে অনেকেরই বেশ দেবদর্শন হইয়া থাকে কিন্তু তাহাতে তাহাদের হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হইতে দেখা যায় না। শাস্ত্রে লিখিত আছে "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" তাঁহাকে দর্শন করিলে হৃদয় গ্রন্থি থাকে না, সর্ব্ব প্রকার সংশয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আর সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া থাকে। আমাদের মধ্যে অনেকেরই বেশ দেব দর্শন হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের আসক্তি বা সংশয় দূর হইতে দেখি না কর্ম্মক্ষয়ও দেখিতে পাই না।

গোঁসাই—দেব দর্শনে সংশয় নাশ বা আসক্তি দূর হয় না কর্ম্ম ক্ষয়ও হয় না। যতদিন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের দর্শন লাভ না হইয়াছে, ততদিন আসক্তি ও থাকিবে, সংশয় ও থাকিবে কর্ম্মও থাকিবে!

আমি—কোন্ সময় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের দর্শন লাভ হইয়া থাকে।

গোঁসাই—মায়া থাকিতে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের দর্শন হয় না।

আমি—যদি দেবদর্শনে আসক্তি দূর হয় না, সংশয় নাশ হয় না, কর্ম্মক্ষয় হয় না, তবে দেবদর্শনে লাভ কি?

গোঁসাই—অনেক লাভ আছে; দেবদর্শনে সাধনে নিষ্ঠা হয়, নামে রুচি জন্মে; আরও অনেক উপকার আছে, তবে অহঙ্কার হইলেই বিপদ।

আমি—জীব কি পঞ্চকোষে আবদ্ধ?

গোঁসাই—হাঁ; সাধন দ্বারা এই পঞ্চকোষ ভেদ করিতে হয়।

আমি—পঞ্চকোষ কি কি?

গোঁসাই—১। অন্নময় কোষ, ২। প্রাণময় কোষ, ৩। মনোময় কোষ, ৪। বিজ্ঞানময় কোষ, ৫। আনন্দময় কোষ।

আমি—কোন্ কোষের কি কার্য্য ?

গোঁসাই—অন্নময় কোষে আহারে পরিতৃপ্তি ; প্রাণময় কোষে ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য ; মনোময় কোষে বাসনা, কামনা, জল্পনা, কল্পনা ; বিজ্ঞানময় কোষে আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব ইত্যাদি প্রশ্নের উদয় হয়। আনন্দময় কোষে পার্থিব আনন্দ ভোগ। এই পর্য্যন্ত জীবের বদ্ধাবস্থা। আত্মা যতক্ষণ পঞ্চকোষে আছে, ততক্ষণ জীবাত্মা নামে খ্যাত। এই অবস্থায় কখন সুখ কখন দুঃখ। পঞ্চকোষ ভেদ হইলে উহাকে আত্মা বলে। ইহার পরও আত্মার বাসনা থাকে, সেই বাসনা পূর্ণ করিতে দেহ ধারণ করেন। কেহ স্থূল দেহ ধারণ করিয়া বাসনা ভোগ করে, কেহ বা আতিবাহিক দেহে বাসনা ভোগ করে।

আমি—পঞ্চকোষ ভেদ হইল, ইহা কিসে বুঝা যাইবে ?

গোঁসাই—পার্থিব ভোগে অনাশক্তি উপস্থিত হইলে বুঝিতে হইবে অন্নময় কোষ ভেদ হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য নষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে প্রাণময় কোষ ভেদ হইয়াছে, জল্পনা কল্পনা দূর হইলে বুঝিতে হইবে মনময় কোষ ভেদ হইয়াছে। সংশয় নষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে বিজ্ঞানময়

কোষ ভেদ হইয়াছে, আর পার্থিব যাবদীয় সুখে মন সুখানুভব না করিলে বুঝিতে হইবে আনন্দময় কোষ ভেদ হইয়াছে।

আমি—পঞ্চকোষ ভেদ হইলে মানুষের কি বদ্ধাবস্থা দূর হয়? ইহাই কি তাহার নিরাপদ অবস্থা?

গোসাই—না। পঞ্চকোষ ভেদ হইলেও বাসনা থাকে। বাসনার লয় হইলে স্থূল দেহের লয় হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ থাকে। সূক্ষ্ম দেহ যে যে বাসনার দ্বারায় উৎপন্ন হয় তাহাদের লয় হইলেও কারণ দেহ থাকে। সমস্ত বাসনার একেবারে নিবৃত্তি না হইলে, কারণ দেহের বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ নিশ্চিন্ত অবস্থায় পৌঁছে না। ছোট বাসনা হইতে পুনরায় বাসনার অতিশয্যে জীব স্থূলদেহ ধারণ অর্থাৎ জন্ম গ্রহণ করে। মুক্ত হইলে সে সর্ব্বদাই সচ্চিদানন্দের আনন্দ সাগরে ডুবিয়া থাকে। সেখানে সর্ব্বদাই ভগবানের লীলা দর্শন হইয়া থাকে।

আমি—যাঁহারা ভগবানকে লাভ করিতে চান, তাঁহাদের একটা আহারের নিয়ম করিয়া চলা উচিৎ কিনা? অনেকে বলেন আহারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই।

গোঁসাই=আহারের সহিত ধর্ম্মের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। রাজসিক ও তামসিক আহার করিলে, শরীরে রজোগুণ ও তমোগুণ বৃদ্ধি পায়, ইহাতে সাধন-ভজন একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা ভগবান্‌কে লাভ করিতে চান তাঁহাদের সাত্বিক আহার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

আমি—সাত্বিক আহার কি ?

গোঁসাই—আতপ চাউল, ঘৃত, দুগ্ধ, মাস কলাইয়ের ডাইল, মুগের ডাইল ইত্যাদি যাহা সহজে পরিপাক হয় ও পেট গরম না করে।

আমি—আমাদের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ কেন ?

গোঁসাই—ইহাতে অত্যন্ত তমোগুণ বৃদ্ধি করে, এবং দয়া বৃত্তির স্ফূর্ত্তি পায় না।

আমি—মৎস্য আহারে দোষ আছে কি ?

গোঁসাই—হাঁ, দোষ আছে, যাহারা প্রথম প্রথম সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত, তাহাদের তত ক্ষতি হয় না। কিন্তু একটু উন্নত হইলেই ক্ষতি করে। সূক্ষ্ম দেহে গতি বিধানে একটু কষ্ট হয়। দয়া বৃত্তির ও স্ফূর্ত্তির হানি হয়। বৌদ্ধ বা মুসলমান যোগী কেহই মৎস্য মাংস আহার করেন না। আহার সাত্বিক হইলে মনও

সাত্ত্বিক হয়। এজন্য আহার বিষয়ে খুব সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

আমি—আহার্য্য দ্রব্য যে সে স্পর্শ করিলে ক্ষতি হয় কি না?

গোঁসাই—হাঁ, তাহাতে ক্ষতি হয়। যদি কাহারও কোন রোগ থাকে তাহা হইলে সেই রোগ সংক্রামিত হইতে পারে। আর তোমার মনবুদ্ধিকে তাহার মনবুদ্ধি ভাবাপন্ন করিবে. তাহার সমস্ত পশুভাব তোমাতে প্রবেশ করিবে।

গোস্বামী মহাশয়ের সহিত এইরূপ নানা কথোপকথনের পর একদিন পণ্ডিত মহাশয়ের দেবদুর্ল্লভ অবস্থার কথা তাঁহার নিকট বর্ণন করিলাম। তাহাতে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—

গোঁসাই—পণ্ডিত মহাশয়ের অবস্থা খুব ভাল, তিনি একটা গ্রন্থিতে আটকাইয়া আছেন। (গ্রন্থিটা কি ইহা আমি আর জিজ্ঞাসা করিলাম না, আমি বুঝিয়াছিলাম ইহা অভিমান)।

আমি—কি উপায়ে এই গ্রন্থিটা ছিন্ন হইবে?

গোঁসাই—তাঁহাকে সাধু সেবা করিতে হইবে।

আমি—আপনিত বলিয়াছেন; এক নাম হইতে সমস্ত অবস্থা লাভ হয়, আবার সাধু সেবার কথা বলিতেছেন কেন?

গোঁসাই—নাম করিতে পারিলে ত? নাম করা বড় কঠিন, যে ব্যক্তি নাম করিতে পারে তাহার আর কিছুই করিতে হয় না। কর্ম্ম থাকিতে সাধক নাম করিতে পারে না, কর্ম্ম নাম করিতে বাধা দেয়। কর্ম্মের দ্বারায় কর্ম্ম ক্ষয় করা সহজ।

আমি—আপনি সাধু-সেবা করিতে বলিতেছেন; কে সাধু কে অসাধু কি প্রকারে জানা যাইবে যে পণ্ডিত মহাশয় সাধু-সেবা করিবেন?

গোঁসাই—যে ব্যক্তি দিনান্তে একবারও ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন তিনিই সাধু।

আমি—কে দিনান্তে ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, কে বা না করেন, তাহাই বা কি প্রকারে জানা যাইবে?

গোঁসাই—যে ব্যক্তি নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করেন, তিনিই সাধু।

আমি—পণ্ডিত মহাশয় বোলপুরে থাকেন; লোকে তাঁহাকে পরম সাধু বলিয়া জানে, লোকে তাঁহার সেবা গ্রহণ করিবে কেন?

গোঁসাই—কোন অজানিত স্থানে গিয়া লোকের সেবা করা কর্ত্তব্য।

আমি—জনসেবার জন্য তিনি কি কায করিবেন?

গোঁসাই—তিনি অধিক আর কি করিবেন? কাহার ঘাস কাটুন, কাহারও গরুরসেবা করুন ইত্যাদি।

আমি—আপনি আমাদিগকে যে সাধন দিয়াছেন তাহাতে মানুষের কি লাভ হয়?

গোঁসাই—এই পৃথিবীতে যত প্রকার সাধন-প্রণালী বর্ত্তমান আছে, তাহাতে মানুষ যাহা কিছু লাভ করিতে পারে তৎসমুদয় লাভ হইয়া থাকে, অধিকন্তু ভগবানে প্রেম-ভক্তি লাভ হয়।

আমি—প্রেম-ভক্তি কাহাকে বলে

গোঁসাই—ভক্তি সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। সাত্বিক রাজসিক, ও তামসিক। ভগবানে যে অহৈতুকী ভক্তি তাহাকেই প্রেম-ভক্তি বলে। ভক্তি-শাস্ত্র পাঠ করিলে তাহাতে ভক্তির তারতম্য জানিতে পারিবে।

আমি—এই সাধন দ্বারায় আপনার কি লাভ হইয়াছে?

গোঁসাই—মানুষ যাহা কিছু লাভ করিতে পারে তৎসমুদয় লাভ হইয়াছে, আমার লাভ হইবার কিছু বাকী নাই।

পণ্ডিত মহাশয় বোলপুরে ভিক্ষা করিয়া স্বপাক খাইতেন, গোস্বামী মহাশয় একদিন তাঁহার ভিক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—

যে বাড়ীতে যান, সেই বাড়ীর লোক একটা সিদা সাজাইয়া আনিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হন। পণ্ডিত মহাশয় তাহা হইতে ২।৩ মুঠা চাউল ও তদুপযুক্ত কিছু তরকারী, লবণ, তেল, ঘি, মসলা ও দুগ্ধ গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট জিনিস ফিরাইয়া দেন। এক বেলার অধিক আহার করেন না। বেশ্যা, যাজক ব্রাহ্মণ ও শুঁড়ীবাড়ীর ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। যদি কোন দিন কাহারও বাটীতে ভিক্ষার ঐ সমস্ত জিনিস না থাকে, তাহা হইলে যে সমস্ত জিনিস নাই তাহা বাজার হইতে খরিদ করিয়া লইবার জন্য সে ব্যক্তি কিছু পয়সা দেয়, পণ্ডিত মহাশয় তদ্দারায় বাজার হইতে জিনিস খরিদ করিয়া লয়েন।

গোঁসাই—একি? পণ্ডিত পয়সা গ্রহণ করেন? পয়সা ভিক্ষা নহে, পয়সা যেন কদাচ গ্রহণ না করেন।

পণ্ডিত মহাশয়কে এই সকল কথা জ্ঞাপন করায় তিনি বোলপুর আসিয়া কাহারও নিকট আর পয়সা ভিক্ষা করিতেন না। সাধু-সেবার আজ্ঞাটা কথঞ্চিৎ পালন করিবার জন্য কিছু দিন আমাদের অজ্ঞাতে আমার বাসায় গরুর জাব কাটিতেন; কোন কোন দিন বোলপুরে মহাপ্রভুর আখড়ায় গিয়া জাব কাটিয়া দিতেন। আমি পণ্ডিত

মহাশয়ের দেহে যেরূপ সাত্ত্বিক লক্ষণ সকল দেখিয়াছি এরূপ সাত্ত্বিক লক্ষণ আর কুত্রাপি দেখি নাই। তাঁহার স্বভাব ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষক ছিল।

গোস্বামী মহাশয়ের উপর বন্ধুবর অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ব্ব হইতে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষা লইতে ইচ্ছুক ছিলেন, কেবল শান্তি-নিকেতনের চাকরীই তাঁহার দীক্ষার প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। এখন তাঁহার দীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করায় গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "এখন তাঁহার সময় হয় নাই এখন তিনি সাধন পাইবেন না।"

শান্তি-নিকেতনের কার্য্য হইতে অপসৃত হওয়ায় অঘোর বাবুর আর্থিক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে; বাবুরা তাঁহাকে কায দিতে ও বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন,—এক্ষণ তিনি কায গ্রহণ করিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "শান্তি-নিকেতনে অঘোর বাবুর কায করা হইবে না; সুতরাং অভাব সত্ত্বেও অঘোর বাবু শান্তি-নিকেতনের কায গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

পণ্ডিত মহাশয় ও দিদিমার কুলীনগ্রাম গমন।

পূজার অন্ধ শেষ হইয়া আসিল, গুরু ভাই ভক্ত শ্রীধরচন্দ্র ঘোষ কুলীনগ্রামের অত্যদ্ভুত ব্যাপার শুনিয়া কুলীনগ্রাম যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কুলীন গ্রামের শ্রীবিগ্রহ সকল, হরিদাস ঠাকুরের পাঠ ও হরিদাস ঠাকুরের আখড়া দেখিবার জন্য তিনি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে কুলীনগ্রাম আনিবার জন্য আর আমি অধিক দিন কলিকাতায় থাকিতে পারিলাম না। আমি গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতি লইয়া পণ্ডিত মহাশয়, ভক্ত, শ্রীধর ও দিদিমাকে সঙ্গে লইয়া কুলীনগ্রাম রওনা হইলাম। ভক্ত শ্রীধরের গুরুগত প্রাণ, তিনি গোস্বামী মহাশয়কে ছাড়িয়া এক দণ্ডও কোথায়ও থাকিতে পারেন না। কুলীনগ্রাম দর্শনের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বলবতী হওয়ায় তিনি আপন মনকে অনেক রকম প্রবোধ দিয়া আমাদের সহিত কুলীনগ্রাম রওনা হইলেন।

আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেবীপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া গোগাড়ীযোগে কুলীনগ্রাম রওনা হইলাম। কুলীন-গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটা গ্রামে উপস্থিত হইতে রাত্রি

৮ টা বাজিয়া গেল, তখন গাড়োয়ান বলিল সম্মুখে নদী; নদী পার হওয়া ক্লেশকর হইবে। আমরা তাহার কথায় অগত্যা একজন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিলাম। ব্রাহ্মণ মহাশয় আমাদের যথেষ্ট যত্ন করিলেন। আহার ও শয়নের সুবন্দোবস্ত করিলেন।

গুরু বিরহে ভক্ত শ্রীধর অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, তিনি আর আমাদের সঙ্গে কুলীনগ্রাম যাইতে সমর্থ হইলেন না। প্রভাতে তাঁহাকে দেবীপুর ষ্টেশনে ফেরত পাঠাইয়া আমরা কুলীনগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

কুলীনগ্রামে বৎসরাধিক কাল নিত্যনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, এই সংকীর্ত্তনের দল ও কুলীনগ্রামের আত্মীয় স্বজন পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন, এবং সংকীর্ত্তনের জন্য আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন।

পরদিন অপরাহ্ণে হরিদাস ঠাকুরের পাটের আঙ্গিনায় সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সংকীর্ত্তনের ধ্বনি গগণভেদ করিয়া উত্থিত হইল, ভক্তগণের হুঙ্কারগর্জ্জনে দিক সকল কাঁপিতে লাগিল। এক এক লম্ফে তাহারা ৮। ১০ হাত তফাতে আছাড় খাইয়া পড়ে; কাঁটা খোঁচা ঝোড় জঙ্গল কিছুই বাধে না। আবার তথা হইতে লম্ফ দিয়া সংকীর্ত্তনে আসিয়া উপস্থিত হয়। এক এক জনের শরীরে যেন মত্ত-সিংহের বল; তাহাদের এক এক আছাড়ে পৃথিবী যেন

বিদীর্ণ হইয়া যায়। সকলেই প্রমত্ত, শরীরের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই; কাহার ও ক্লান্তি নাই। এমন অদ্ভুত কীর্ত্তন আর আমি কখনও দেখি নাই।

এই সংকীর্ত্তন দেখিতে গ্রামবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা, কি ছোটলোক, কি ভদ্রলোক, সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। শক্তির ক্রিয়ার ও ভাবের তরঙ্গ এতই প্রবল হইয়াছিল যে দর্শকগণ মধ্যে ২০।২৫ জন স্ত্রীলোক ও ৭।৮ জন পুরুষ একেবারে অচৈতন্য হইয়া ধরাশায়া হইল, কতক পথিক লোকেরও ঐ অবস্থা ঘটিল। গায়ক ও বাদক সকলেই উন্মত্ত, কাহারও হুস নাই। ইহারা সকলেই উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছে, নৃত্যের বিরাম নাই।

এই সময় অনেকের দেবতা দর্শন হইতে লাগিল। একটি ব্রাহ্মণশিশু পিতার কোলে থাকিয়া বলিতে লাগিল—

শিশু—বাবা ও কে? দেখ দেখ ওকে?

পিতা—কইরে, কে?

শিশু—ঐ যে বাবা ঐ, তুমি দেখিতে পাইতেছ না? কেমন সুন্দর চেহারা! চারিহাত, মাথায় মুকুট, কেমন হাসিতেছে, ওকে বাবা?

পিতা—কইরে কই?

শিশু—(আকাশ পানে তাকাইয়া) ঐ যে বাবা ঐ, তুমি দেখিতে পাইতেছ না?

শিশুর কথায় পিতা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সকলে স্তম্ভিত।

শিশুকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় শিশু নারায়ণের রূপেরই বর্ণনা করিলেন ; এদিকে দাদা মহাশয় দেখিতেছেন প্রকাণ্ড ভীষণদর্শনা এক দশভূজা মূর্ত্তি, দেবীরদেহ গগণ স্পর্শ করিতেছে ; তদনুরূপ অসুরের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও ভীষণ দর্শন সিংহের প্রকাণ্ড দেহ ; অসুরের দেহ হইতে এমনি রক্ত স্রোত নির্গত হইতেছে যেন সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতেছে। আবার এক প্রকাণ্ড কালীমূর্ত্তি ভীষণ হইতে ভীষণতর। হিমালয়ের ন্যায় প্রকাণ্ড এক মহাদেবের উপর তিনি উলাঙ্গিনী হইয়া নৃত্য করিতেছেন। গলদেশে ভীষণ দর্শন অসুরের মুণ্ডমালা ; সর্ব্বশরীর অসুরের রক্তে পরিপ্লুত। এক হস্তে প্রকাণ্ড পানপাত্র, অপর হস্তে খড়্গ। এই খড়্গ হইতে রক্তধার নদীর প্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। এক হস্তে অসুরের প্রকাণ্ড মুণ্ড, অপর হস্তে অসুরের প্রকাণ্ড দেহ লইয়া চর্ব্বণ করিতেছেন, আর জিহ্বা হইতে বেগে রক্তধার নির্গত হইতেছে।

এই ভীষণরূপ দর্শনে দাদা মহাশয় কম্পান্বিত কলেবরে অস্থির হইয়া পড়িয়া কেবল "ভোগ দাও ভোগ দাও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত, মুখে আর অন্য কথা নাই, কেবল "ভোগ দাও, ভোগ দাও" এই মাত্র রব। আমি তৎক্ষণাৎ ভোগের আয়োজন করাইলাম এবং দাদাকে সুধাইয়া দেবীর ভোগ দেওয়াইলাম। কীর্ত্তন সমভাবে চলিতে লাগিল, কীর্ত্তনের আর

বিরাম নাই। গায়ক ও বাদকগণ সকলেই বেহুঁস, তাহারা উদ্দণ্ড নৃত্যে উন্মত্ত। অনেক রাত্রি হইয়া গেল ; সংকীর্ত্তন বন্দ করাইবার অভিপ্রায়ে হরিরনুট আনান হইল। হরির-নুটের গান আরম্ভ হইল। যাহারা উদ্দণ্ড নৃত্যে উন্মত্ত ছিল, তাহারা আর এ গানে যোগ দিতে পারিল না। তাহারা যেরূপ নাচিতেছে সেইরূপ অবিশ্রান্ত নাচিতে লাগিল ; যাহাদের সংজ্ঞা ছিল কেবল তাহারাই এই গান ধরিল। হরিরনুটের গানের মধ্যে যখন "হরিদাস খাতাঞ্জি হ'য়ে নুট বিলাল নগরে"এই কলি গীত হইল,তখন পণ্ডিত মহাশয় দেখিলেন এক মহাপুরুষ হরিরনুটের ধামা হাতে লইয়া হরিদাসের পাট হইতে বহির্গত হইতে-ছেন। ঐ মহাপুরুষ দীর্ঘাকায়, গলদেশে গুঞ্জার পর্ব্বতের বড় বড় তুলসীর মালা।

হরিরনুট দেওয়া শেষ হইল, সংকীর্ত্তন বন্ধ হইল, দর্শকগণ আপন আপন বাটী চলিয়া গেল। যে সকল লোক অজ্ঞান অবস্থায় ভূতলে পড়িয়াছিল তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন করা হইল। কিন্তু সংকীর্ত্তন দলের লোকদের চৈতন্য হইল না, তাহাদের নৃত্যও থামিল না। বাদক-দিগকে থামান হইল, কীর্ত্তন বন্ধ হইল, কিন্তু নৃত্য বন্ধ হইল না। গান নাই, বাজানা নাই, অনেক লোক চলিয়া গিয়াছে, তথাপি কতকগুলি লোক বেহুঁস অবস্থায় নৃত্য করিতেছে, তাহাদের সকলেরই চক্ষু মুদ্রিত, বাহ্যজ্ঞান

রহিত। রাত্রি অধিক হওয়ায় আমি ঐ নৃত্যকারীর এক এক জনকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিতে লাগিলাম। অবশেষে ৪। ৫ জন নৃত্যকারীকে যেমন স্পর্শ করিলাম অমনি তাহারা ভূতলে পড়িয়া গেল এবং কাটা ছাগল যেমন ধড় ফড়্ করে, সেইরূপ ধরফড় করিতে লাগিল।

এই দৃশ্য দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলাম। মনে হইল ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়া কুকার্য্য করিয়াছি। ইহাদের অবস্থা ভঙ্গ করা ভাল হয় নাই।

একজন ময়রার আর চৈতন্য হইল না। ৪। ৫ জন লোক তাহাকে তুলিয়া লইয়া গিয়া তাহার বাটীতে রাখিয়া আসিল। ইহার পর পণ্ডিত মহাশয় ও দিদিমা ৪। ৫ দিন ধরিয়া কুলীনগ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তীগ্রাম সকলের শ্রীবিগ্রহ সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। তদপর আমি উঁহাদিগকে লইয়া বোলপুর চলিয়া আসিলাম।

পুনরায় গুরু দর্শনে কলিকাতা গমন।

১৩০৪ সাল পৌষমাস বড় দিনের বন্ধ উপস্থিত। গুরুদর্শনের জন্য মন মাতিয়া উঠিল, আর বোলপুরে স্থির থাকিতে পারিলাম না। দাস, দাসী, পাচক, ইহারা আমার সেবা করিয়াছে, ইহাদের উপকার করা কর্ত্তব্য। আমি ইহাদের আর কি উপকার করিব? যাহাতে ইহারা দুর্ণিবার ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়, সেইজন্য ইহাদিগকে গোস্বামী মহাশয়ের চরণে অর্পণ করিবার মানসে, আমার চাকরানী যুগল মোহিনী দাসী, পাচক গোবিন্দপদ সরকারকে সঙ্গে লইয়া, পণ্ডিত মহাশয় সহ কলিকাতা রওনা হইলাম। আমার সম্বন্ধি কালিকৃষ্ণ সরকার ও প্রতিবেশী-পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীও আমাদের সঙ্গে চলিল। কলিকাতায় সেই হ্যারিসন রোডের বাসায় উপস্থিত হইয়া গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করিলে তিনি পরমানন্দে আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি বোলপুর ও কুলীনগ্রামের সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলাম। এই দুই স্থানের অলৌকিক কীর্ত্তনের কথা তাঁহার কর্ণগোচর করিলাম।

বন্ধুবর অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় কৃতবিদ্য ও

কর্ম্মীলোক শান্তিনিকেতন হইতে অপসৃত হওয়ায় ঠাকুর বাবুরা তাহার অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিতে লাগিলেন। যাহাতে অঘোরবাবু পুনরায় শান্তিনিকেতনের কার্য্যভার গ্রহণ করেন এইজন্য ঠাকুরবাবুরা আমাকেও উপরোধ করিতেছিলেন। এদিকে অঘোরবাবুর অত্যন্ত আর্থিক অভাব, এই সকল কথা গোস্বামী মহাশয়কে আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলাম।

গোস্বামী মহাশয় আমার কথা শুনিয়া বলিলেন "যদি অঘোরবাবু পুনরায় শান্তিনিকেতনের কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এবার তাঁহাকে অপমানের সহিত কার্য্য হইতে দুরীভূত হইতে হইবে।" অঘোরবাবু আমার পরম বন্ধু, গোস্বামী মহাশয়ের এই কথায় আমি চিন্তাকুল হওয়ায়, গোস্বামী মহাশয় পুনরায় বলিলেন—"অঘোরবাবুকে ভাবিতে মানা করিবেন, ভগবান্ এমন করিয়া তাঁহার সংসার চালাইয়া দিবেন যে তিনি তাহা আদৌ টের পাইবেন না।"* আমি গোস্বামী মহাশয়ের কথায় আশ্বস্ত

* অঘোরবাবু ঔষধের কারবার করায় এখন তাঁহার আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। শান্তিনিকেতনের কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে তাঁহাকে চিরদরিদ্রতা ভোগ করিতে হইত এবং তাঁহার ধর্ম্ম জীবন কলুষিত হইত। তিনি ক্রমে ক্রমে ঠাকুর বাবুদের একজন মোসাহেব হইয়া পড়িতেছিলেন।

হইলাম। তাঁহার দীক্ষার জন্য অনুরোধ করায় গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "এখনও তাঁহার সময় হয় নাই।"

শ্রীবৃন্দাবনের গৌরশিরোমণি মহাশয়কে গোস্বামী মহাশয় অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। রামপুরহাটের ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে বক্তৃতাকালীন তিনি বলিয়াছিলেন "ঠাকুর আমাকে শিরোমণি কর।" এই শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র ভক্তিভাজন রাসবল্লভ ভক্তিভূষণ মহাশয় ও পৌত্র শচীনন্দন মাঝে মাঝে আমার বাসায় আসিয়া থাকিতেন। ইহাদের কথা প্রসঙ্গে গোস্বামী মহাশয় শিরোমণি মহাশয়ের জীবনের অনেক কথাই বলিতেন। তিনি একবার বলিয়াছিলেন শিরোমণি মহাশয়ের ন্যায় বৈষ্ণব আমি একটীও দেখি নাই। রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইবার সময় পথে কুকুর শুইয়া থাকিলে কুকুরকে যোড়-হাতে বলিতেন "আপনি একটু সরুন, আমি যাইব।" কখনও কুকুরকে ছেই করিতেন না। ভাঙ্গিকে (মেথর) কখনও ভাঙ্গি বলিতেন না। তিনি বলিতেন "যিনি আমাদের বাড়ী পরিস্কার করেন।" বাড়িতে কাজকর্ম্ম হইলে সর্ব্বাগ্রে ভাঙ্গিকে খাওয়াইতেন ও যত্নপূর্ব্বক বাড়ীর জন্য খাবার জিনিস দিতেন। তিনি কাহারও কোন দোষ দর্শন করিতেন না।

এক দিন নব্য সম্প্রদায়ের কয়েকটী লোক শিরোমণি মহাশয়কে বলিলেন—আপনি শ্রীবৃন্দাবনের শিরোমণি,

এখানকার সকলেই আপনার অনুগত; আপনি শ্রীবৃন্দাবনের উচ্ছৃঙ্খল বৈষ্ণবগণকে শাসন না করায় তাহারা প্রশ্রয় পাইয়া যথেচ্ছাচার করিতেছে, আপনার শাসন করা কর্ত্তব্য। অমুক বৈষ্ণব ঘোর ব্যভিচারী, তাহাকে কদাচ নিকটে আসিতে দিবেন না। নব্যদল শিরোমণি মহাশয়কে এই সব কথা বলিতেছেন এমন সময় সেই ব্যভিচারী লোকটা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে সকলে নীরব হইলেন। শিরোমণি মহাশয় প্রণাম করিয়া তাহাকে বসিতে আসন দিলেন। লোকটী কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া গেলে নব্যদল শিরোমণি মহাশয়কে বলিলেন, আপনি আবার এই লোকটাকে প্রণাম করিলেন এবং আসন দিয়া আদর করিয়া বসাইলেন, ইহাতে কি আর লোকের দুর্নীতি দূর হয়? শিরোমণি মহাশয় তাহাতে নব্যদলকে বলিলেন।

শিরোমণি—ইনি গুরু, ইঁহাকে প্রণাম করিব না? ইঁহাকে আদর করিয়া আসন দিয়া বসাইব না?

নব্যদল—(আশ্চর্য্য হইয়া) ইনি আবার কিসে গুরু হইলেন?

শিরোমণি—ইনি যথার্থই গুরু। বৈষ্ণব ব্যভিচারী হইলে লোক সমাজে কিরূপ নিন্দনীয় ও ঘৃণিত হইতে হয় তাহা নিজের জীবনে আচরণ করিয়া ইনি আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন,

নব্যদল শিরোমণি মহাশয়ের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন। লোকটাও শিরোমণি মহাশয়ের কথায় বিমোহিত হইয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সেই দিন হইতে তাহার ব্যভিচার দোষ একেবারে দুরীভূত হইল।

এইবার শিরোমণি মহাশয়ের মৃত্যুর কথা আমি গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শুনিলাম। তিনি শিরোমণি মহাশয়ের জন্য অনেক আক্ষেপ করিলেন। আমি শিরোমণি মহাশয়ের মৃত্যু বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করায় গোস্বামী মহাশয় বলিলেন—

গোঁসাই—শিরোমণি মহাশয় গোপীদেহ লাভ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালীন দেহ হইতে বাহির হইয়াই গোপীদেহে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করত যোড় হস্তে বলিলেন "দাসী হাজির, যখন যে আজ্ঞা হয় করিবেন।"

আমি—তাঁহার আকৃতি ও রূপ কি প্রকার দেখিলেন?

গোঁসাই—ঠিক ব্রজ-গোপী; অতি উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী।

আমি—তাঁহার পরিধেয় কি প্রকার ছিল?

গোঁসাই—শ্বেতবর্ণের আথরা ও ওড়না ইত্যাদি। তাহাতে স্বর্ণের ফুলকাটা।

আমি—তাঁহার বয়স কি আন্দাজ?

গোঁসাই—প্রথম যৌবন।

শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র ভক্তিভাজন রাসবল্লভ ভক্তি-ভূষণ মহাশয় আমার নিকট গিয়া পিতার শেষাবস্থার মহাভাবের কথা বর্ণন করিলেন। আমি সেই মহাভাবের কথা ও গোস্বামী মহাশয়ের মুখে তাঁহার দেহ ত্যাগের এই সকল বিবরণ শুনিয়া বুঝিলাম শীরোমণি মহাশয় গোস্বামী মহাশয়ের সম্বন্ধ রাখিতেন নতুবা এইপ্রেম আর কোথা হইতে পাইবেন। যাহা হউক কথাটা গোস্বামী মহাশয়কে আর খুলিয়া জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করি নাই।

শিরোমণি মহাশয়ের দেহত্যাগে গোস্বামী মহাশয় ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার কোন শিষ্য গোস্বামী মহাশয়কে বলেন "একি মহাশয়, মানুষের মৃত্যুতে আবার ক্রন্দন?" গোস্বামী মহাশয় তদুত্তরে বলিয়াছিলেন "এ ক্রন্দন মায়ীক নহে, ভক্তবিরহে যে কি হয়, তাহা তোমারা বুঝিবে না।"

একদিন কুলীনগ্রামের ঠাকুর-সেবার ত্রুটীর কথা গোস্বামী মহাশয়কে জ্ঞাপন করিলাম, তাহাতে তিনি বলিলেন এখন সর্ব্বত্রই পূজারীগণ চরিত্রহীন, তাহাদিগকে লইয়া ঠাকুর-সেবা করান বড়ই কঠিন। শান্তিপুরের শ্যামসুন্দরের* পূজারীকে সময় মত খুজিয়া পাওয়া যায় না।

*। শ্যামসুন্দর গোস্বামী মহাশয়ের কুলদেবতা।

কোথায় কোন্ বেশ্যা বাড়ীতে পড়িয়া আছে তাহার ঠিকানা নাই। একদিন শ্যামসুন্দর আসিয়া বলিলেন—

শ্যামসুন্দর—তুমি আমাকে স্থাপন করিয়া খোঁজ খবর লওনা। আমার সাতদিন স্নান হয় নাই।

গোসাই—ঠাকুর আমায় দোষ কেন দিতেছ? এ জগতে এমন কে আছে যে তোমাকে ধরিয়া রাখিতে পারে। তুমি আপন ইচ্ছায় আসিয়াছ, আপন ইচ্ছায় রহিয়াছ, আমার উপর অকারণ দোষারোপ কেন?

এই ঘটনার পর যাহাতে প্রতিদিন শ্যামসুন্দরের স্নান হয় তজ্জন্য শান্তিপুরের বাটীতে খবর দিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় আরও বলিলেন পূজারীগণ যেরূপ চরিত্র-হীন হইয়াছে তাহাদিগকে শাসন করিলে কিছু হইবে না, তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া কায করাইয়া লইতে হইবে। বাড়িতে লাউ, কলা, শশা, কুমড়া ইত্যাদি ও শাকসবজী জন্মিলে আগে ঠাকুর বাড়ী পাঠাইয়া দিবে; সময় সময় সিদা পাঠাইবে। পূজারীগণের সহিত মিলিয়া মিসিয়া কায চালাইবে। কদাচ তাহাদের সহিত বিরোধ করিবে না।

হ্যারিসন রোডের ৪৫ নং বাটীর মাষিক ভারা ১০০৲ টাকা। এই সময় গোস্বামী মহাশয়ের অনেকগুলি শিষ্য তাঁহার নিকট থাকিতেন। গোস্বামী মহাশয়কে সমস্ত

ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিতে হইত। তাঁহার আকাশ-বৃত্তি। দৈনিক আবশ্যকীয় জিনিস পত্র মুদীর দোকান হইতে আসিত, টাকা আমদানি হইলে মুদীকে দেওয়া হইত। যোগজীবন এই সব দেখিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের সহিত লেন দেনের কোন সম্বন্ধ ছিল না। দেনা পাওনার কোন হিসাবও থাকিত না। মুদী, যাহা পাওনা বলিত তাহাই দিতে হইত। সময়ে সময়ে যোগজীবনকে অর্থের জন্য বড় প্রয়াস পাইতে হইত। একদিন প্রাতঃকালে একটা অপ রিচিত লোক গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিয়া বলিল—

অপরিচিত লোক—মহাশয় আপনার বাক্সে যাহা আছে তাহা আমাকে দিউন।

গোঁসাই—আমার কোন বাক্স নাই।

অপরিচিত লোক—ঐ দিকের ঘরে বাক্স আছে ?

এই কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় যোগজীবনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

গোঁসাই—এখানে কি কোন বাক্স আছে ?

যোগজীবন—কি করিব ? টাকা পয়সাট আসিলে কোথায় রাখিব, এই জন্য একটা টিনের বাক্স আনিয়া রাখিয়াছি।

গোঁসাই—ঐ বাক্সে যাহা কিছু আছে সমস্ত এই লোক-টীকে আনিয়া দাও।

এই কথায় যোগজীবন মহামুস্কিলে পড়িলেন; তিনি মনে করিলেন, আমরা তেতালা বাটীতে বাস করিতেছি, এই লোকটা হয়ত আমাদিগকে ধনশালী মনে করিয়া ভিক্ষার্থে এখানে আসিয়াছে, আমরা যে সুদরিদ্র তাহা এই লোকটা জানে না; প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিলে এরূপ প্রার্থনায় ক্ষান্ত হইবে। এই মনে করিয়া যোগজীবন গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন "বড়ই অর্থাভাব ৫০০৲ টাকা বাড়ী ভাড়া বাকী পড়িয়াছে, বাড়ীওয়ালার লোক পুনঃ পুন তাগাদা করিতেছে; কোথায়ও টাকা পাইতেছি না। বাড়ীওয়ালার লোক প্রত্যহ ফিরিয়া যাইতেছে। আমি দুই মাস যাবৎ ধার করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছি, কোথায়ও ধার পাইতেছি না। শেষে মাসাধিককাল খোসামোদ করিয়া বড়বাজারের একজন লোকের নিকট উচ্চ সুদ কবুল করিয়া কল্য বৈকালে ২০০৲ টাকা কর্জ্জ করিয়া আনিয়া ঐ বাক্সে রাখিয়াছি; অদ্য বৈকালে বাড়ীও-ওয়ালার লোক আসিবে তাহাকে না দিলেই নয়, আর তাহাকে ফিরাইতে পারা যাইবে না।"

এই কথা শুনিয়া লোকটা চুপ করিয়া থাকিল, কোন কথা বলিল না। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, বাক্সটা লইয়া আইস এবং তাহাতে যাহা কিছু আছে সমস্তই ইহাকে দাও। যোগজীবন অগত্যা বাক্স আনিয়া টাকা-

আপনার কাপরের খুটে বান্দিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন, অদ্য আমি এই স্থানে আহার করিব।

লোকটা চলিয়া গেল, যোগজীবন ও উপস্থিত শিষ্যবৃন্দ এই লোকটার ব্যবহারে দুঃখিত হইলেন। ক্রমে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল, আহারের সময় উপস্থিত; সেই অপরিচিত লোকটার দেখা নাই। গোস্বামী মহাশয় উপবাস করিয়া রহিলেন, তাঁহার দেহ অসুস্থ, অনাহারে ক্রমে ভয়ানক মাথা ধরিল, চক্ষু ও মুখমণ্ডল সমস্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; মাথার যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় একটা ন্যেকড়া শক্ত করিয়া মাথায় বাঁধিয়া চুপ করিয়া সেই লোকটার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। অর্থ লউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের এই ক্লেশ দেখিয়া শিষ্যগণ অত্যন্ত সন্তাপিত হইলেন।

শিষ্যগণ গোস্বামী মহাশয়কে আহার করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন; তাহাতে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "যখন সেই লোকটী এখানে আহার করিবেন বলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি অতিথি; অতিথিকে আহার না করাইয়া আমি কি প্রকারে আহার করিব? আমি অনুমতি দিতেছি তোমরা আহার করগে, আমি উপবাসী থাকিলাম।" ক্ষুধিত শিষ্যগণ গোস্বামী মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে

আহার করিলেন; তিনি উপবাসী থাকিয়া বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিনের মধ্যে লোকটার দেখা পাওয়া গেল না; ক্রমে রাত্রি উপস্থিত। গোস্বামী মহাশয় জলস্পর্শ করিলেন না, আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া কেবল যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। রাত্রি ৮টার সময় সেই লোকটা আসিয়া উপস্থিত হইল। গোস্বামী মহাশয় যত্নপূর্ব্বক তাহাকে বসিতে আসন দেওয়াইলেন এবং বিবিধ উপাদেয় সামগ্রীর দ্বারায় প্রচুর আহার করাইয়া বিদায় দিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল তিনি আর আহার করিতে পারিলেন না, যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া থাকিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়াছিল। তিনি ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। এ জগতে তাঁহার অদেয় কিছুই ছিল না। তুচ্ছ অর্থের কথা কি, জীবন দান করিলেও যদি কেহ সুখী হইত, তাহাতেও তিনি প্রস্তুত। তাঁহার নিকট শত্রু-মিত্র আপনার-পর কেহ ছিল না। তিনি সকলের মধ্যে ভগবানকে বিরাজিত দেখিতেন। সুতরাং একটা কুকুরকেও অমর্য্যাদা করিতেন না।

ধর্ম্ম স্থাপন ও জীব-শিক্ষার জন্য তাঁহার আগমন। কি প্রকারে অতিথি সৎকার করিতে হয়, অতিথির মর্য্যাদা

কেমন করিয়া রক্ষা করিতে হয়, কিরূপ ধৈর্য্যশালী হওয়া মানুষের আবশ্যক নিজের আচরণ দ্বারায় তৎসমুদয় শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেন।

বাবু উমাচরণ দাস গোস্বামী মহাশয়ের একজন অনুগত শিষ্য। তিনি পোষ্ট-আপিস সমূহের ডেপুটী কণ্ট্রোলার জেনারেল; অনেক টাকা বেতন পাইতেন; সন্তান সন্ততি ছিল না! কলিকাতায় মাসিক ১০০৲ টাকা হিসাবে বাড়ী ভাড়া দিতে হইতেছে দেখিয়া গোস্বামী মহাশয়কে একদিন বলিলেন "মহাশয় আমার ইচ্ছা যে কলিকাতায় থাকিবার জন্য আপনার একটা বাড়ি প্রস্তুত করিয়া দিই।" তাহাতে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "আমি বাড়ী লইয়া কি করিব?" আমাকে কি এই তেতলা বাড়ীতে থাকিতে আছে? বনে জঙ্গলে কি পাহাড় পর্ব্বতের কোন নিভৃত গুহায় আমার পড়িয়া থাকা কর্ত্তব্য; কেবল গুরুজীর আদেশে আমি এই নগরীর মধ্যে বাস করিতেছি। কয়েকটী লোককে সাধন দিতে হইবে তাহাদের সময় উপস্থিত হয় নাই এজন্য তাহাদের অপেক্ষায় থাকিতে হইয়াছে। যদি বাড়ি প্রস্তুত করিয়া দিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে একটা ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিয়া দাও, সাধু সন্ন্যাসীগণ অনায়াসে আসিয়া তথায় থাকিতে পারিবে। এই কথায় উমাচরণ বাবু নিরস্ত হইলেন।

একবার উমাচরণ বাবু গোস্বামী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, তিনি একদিন কোন এক রূপলাবণ্যবতী দেবীর দর্শন পাইয়াছিলেন; ঐ দেবী কে? তাহাতে গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন "শ্রীকৃষ্ণের সখী ললিতা তোমাকে কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছিলেন।" ইহাতে উমাচরণ বাবু গোস্বামী মহাশয়কে বলেন "আর ত কখন দেখা হইল না?" তাহাতে গোস্বামী মহাশয় উত্তর করেন "যাহার এতগুলি টাকা তিনি যে একবার দর্শন পাইয়াছেন ইহাই যথেষ্ট।"

বাবু মোহিনীমোহন রায় পূর্ব্বে ব্রাহ্ম ছিলেন; পরে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার বেশ প্রতিপত্তি ছিল। অনেক ব্রাহ্ম তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, তিনিও ব্রাহ্মসমাজে পবিত্র জীবন যাপন করিতেন। ব্রাহ্ম-সমাজে তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের আশা পূর্ণ না হওয়ায় তিনি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণের অতি অল্প দিন পরেই তাঁহার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়; তিনি নূতন জীবন লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। একদিন তিনি গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন,

মোহিনী বাবু—মহাশয় সাধন লইয়া এ কি হইল।

যাঁহারা প্রাণের বন্ধু, অতি পবিত্র জীবন যাপন করেন, যাঁহাদের সহিত বহুকাল যাবৎ একত্রে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া আসিলাম, তাঁহারা

নিকটে থাকিলে নাম বন্ধ হইয়া যায়, আর একটা চরিত্রহীন বাজারে বেশ্যা নিকটে থাকিলে বেশ নাম চলিতে থাকে, কোন রকমে নাম বন্ধ হয় না; ইহার কারণ কি?

গোঁসাই—যাহারা ভগবদ্দ্বেষী তাহাদের নিকট ভগবানের নাম কেন চলিবে? ভগবদ্দ্বেষীর নিকট ভগবানের নাম চলে না।

মোহিনী বাবু—একি! নিষ্ঠাবান্ সচ্চরিত্র ব্রাহ্মগণ কি প্রকারে ভগবদ্দ্বেষী হইলেন? ইহারাত নিত্য ব্রহ্মোপাসনা করিয়া থাকেন।

গোঁসাই—হাঁ, তাঁহারা ভগবদ্দ্বেষী; যাহারা ভগবদ্ভক্তগণের দ্বেষ করে, তাহারাই ভগবদ্দ্বেষী। ব্রাহ্মেরা সমস্ত সাধু সন্ন্যাসী ও ভগবদ্ভক্তগণের দ্বেষ করিয়া থাকে, ইহাদের অপেক্ষা ভগবদ্দ্বেষী আর কে আছে? যদিও বেশ্যারা কুচরিত্রা, কুকার্য্যে রত, তথাপি তাহারা ভগবদ্দ্বেষী নহে, তাহারা কুকার্য্যে রত থাকায় আপনাদিগকে পতিতা বলিয়াই জানে, তাহারা ভগবান ও ভগবদ্ভক্তগণকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট ভগবানের নাম না চলিবে কেন?

মোহিনী বাবু গোস্বামী মহাশয়ের মুখে এই সকল

কথা শুনিয়া বুঝিলেন, যাহারা আমাদের ভজনদ্বেষী, বা ভগবদ্বেষী তাহাদের সঙ্গ করিলে ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই, একারণ তিনি ব্রাহ্ম বন্ধুগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন।

কাঁচড়াপাড়ার নিকট কুলিয়া গ্রাম দেবানন্দ ঠাকুরের তপস্যার স্থান, এই স্থানে গোপাল চাপালের অপরাধ ভঞ্জন হইয়াছিল, একারণ ইহাকে অপরাধ ভঞ্জনের পাট বলে। ঠাকুর দেবানন্দের তিরোভাব উপলক্ষে প্রতি সন পৌষমাসের কৃষ্ণ একাদশী তিথিতে এই স্থানে মহোৎসব হইয়া থাকে। এই মহোৎসব উপলক্ষে নানা স্থান হইতে বৈষ্ণবেরা তথায় গমন করিয়া থাকেন। এই স্থানে নিতাই গৌরের সেবা প্রকাশিত আছে। এবার আমার দিদি সেই চম্পকলতা নাম্নী এই মহোৎসব উপলক্ষে অপরাধভঞ্জনের পাট দর্শনার্থ কুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গাগর্ভে স্নান করিতেছেন এমন সময় গোস্বামী মহাশয় তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন "তুই কি করিতেছিস্? আমার নিকট আয়, আমি তোকে দীক্ষা দিব।" এই ব্যাপার দর্শনে দিদি ঠাকুরাণি দিগ্বি-দিক্ জ্ঞান শূন্যা হইয়া ভিজা কাপড়ে পাগলিনীর ন্যায় গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ছুটিয়া আসিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষার পর কয়েক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না ঠিক যেন পাগলিনী হইয়াছি

আমার সঙ্গের লোক নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দপদ সরকার ও যুগলমোহিনী দাসীর দীক্ষা কার্য্য শেষ হইল।

আমার সম্বন্ধি কালিকৃষ্ণ সরকার গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন "এবারেও কি অদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎসব করিতে হইবে?' তাহাতে গোস্বামী মহাশয় বলেন "এ কথা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? 'এ সব না করিলে কি ধর্ম্ম হয়?"

আমি এক দিন গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—

আমি—সাধন ভজন চলিতেছে, ইহাতে যে ধর্ম্ম লাভ হইতেছে তাহা কি প্রকারে বুঝা যাইবে?

গোঁসাই—ধর্ম্ম লাভ হইতে থাকিলে, নিয়ত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইবে। আজ যাহা ছিলে কাল আর তাহা থাকিবে না। সাধন ভজন করিয়া যদি জীবনের পরিবর্ত্তন না ঘটে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সাধনে কোন ফল হয় নাই।

আমি—পরমেশ্বরকে কি সত্য সত্যই দেখা যায়?

গোঁসাই—হাঁ, তাঁহাকে দেখা যায়, তাঁহার সহিত কথা-বার্ত্তা কহা যায়, তাঁহাকে সর্ব্ব প্রকারে সম্ভোগ করা যায়। পারমেশ্বর অপেক্ষা সত্য বস্তু আর কিছুই নাই।

আমি—তাঁহার কি রূপ আছে?

গোঁসাই—তাঁহার রূপ আছে, সে অপ্রাকৃত রূপ। সে রূপ একবার দেখিলে চক্ষু আর অন্য রূপ দেখিতে চায় না। তাঁহার মুখের কথা শুনিলে কাণ আর অন্য কথা শুনিতে চায় না। তাঁহার অঙ্গ-গন্ধের ঘ্রাণ একবার পাইলে নাসিকা আর অন্য গন্ধ আঘ্রাণ করিতে চায় না। তাঁহাকে একবার স্পর্শ করিলে শরীর আর কিছুই স্পর্শ করিতে চায় না।

আমি—সাধন পন্থায় এত ক্লেশ কেন?

গোঁসাই—ক্লেশ ব্যতীত জীবন প্রস্তুত হয় না। ভগবান যাহাদিগকে আত্মসাৎ করিবেন, তাঁহাদের রোগ, শোক, অপমান, লাঞ্ছনা, দরিদ্রতা, নির্যাতনের আর বাকী থাকে না। ধৈর্য্য সহকারে এ সব সহ্য করিতে হয়। জীবন-গঠনের জন্য এ সকল দরকার, ইহা না হইলে মানুষ জীয়ন্তে মরা হয় না। জীয়ন্তে না মরিলে ভগবত কৃপা অনুভব হয় না।

আমি—কাম ক্রোধাদি রিপুগণের অত্যাচার আরত সহ্য হয় না।

গোঁসাই—ইহারাই আবার পরমবন্ধু, ইহারা কেহই যাইবে না ইহাদের দ্বারায় ভগবত্ত সেবা হইবে। রিপু-গণের অপব্যবহারেই ইহারা

প্রকৃতপক্ষে ইহারা পরমবন্ধু। কাম প্রেমে পরিণত হইবে; ক্রোধ, তেজে পরিণত হইবে; আশক্তি, ভগবানে অর্পিত হইবে; লোভ, তাঁহাতেই উপস্থিত হইবে ইত্যাদি; রিপুগণ সংসার উন্মুখী থাকায় ইহারা রিপু হইয়াছে।

ছুটী ফুরাইয়া আসিল, আমি গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতী লইয়া বোলপুর চলিয়া আসিলাম।

শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর তৃতীয় বারের জন্মোৎসব।

এবার কলিকাতা হইতে বোলপুর আসিয়াই শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎসবের আয়োজনে ব্যাপৃত হইলাম। উৎসবের ২১ দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩০৪। ২৫ পৌষ তারিখে নিত্য সংকীর্ত্তনের এমনি জমাট বান্ধিল এবং ভাবের প্রবল বন্যা চারিদিক ভাসাইয়া এমনি তীব্র বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, যে সকলের মনে হইল, আজ হইতেই উৎসব আরম্ভ হইল। প্রকারান্তরে তাহাই ঘটিল। যদিও ৮ই মাঘ সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঠাকুরদের আসন স্থাপিত বা ৯ই মাঘের পূর্ব্বে ভোগ পূজা আরতী ইত্যাদি আরম্ভ হইল না তথাপি এই কীর্ত্তনের ব্যাপারটা ২৫ পৌষ হইতেই সমভাবে চলিতে লাগিল। এবারকার মত দীর্ঘকালব্যাপী উন্মাদকারী সংকীর্ত্তন আর কখনও দেখা যায় নাই। গুরু-ভাই-ভগ্নির দল এখন বৃদ্ধি পাইয়াছে, সকলের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বলবতী। সংকীর্ত্তনের দল একেবারে উন্মত্ত, কীর্ত্তনের সময় কে কার ঘাড়ে পড়ে, আর কে কাকে বা ধরে। ঘর দুয়ার যেন চুরমার হইয়া যাইতে লাগিল। উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে একজন ভাবাবেশে

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, আবার তাহার উপর আর একজন পড়িল, দেখিতে দেখিতে আবার ৩। ৪ জন তাহাদের উপর পড়িল; সকলে জড়াজড়ী করিয়া ঘরের এক ধার হইতে আর এক ধার পর্য্যন্ত গড়াইতে লাগিল। কিছুকাল পরে আবার লম্ফ দিয়া উঠিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। কাহারও ক্লান্তি নাই, একদণ্ড বিশ্রাম নাই। কাহারও হাত ভাঙ্গিতেছে, কাহার ও পা ভাঙ্গিতেছে, কাহারও কপাল ফুটিয়া রক্ত পড়িতেছে, কিছুতেই দৃকপাৎ নাই। স্ত্রীলোক মহলেও ক্রন্দনেররোল, সেখানেও আছাড়পিছেড় আর রক্তারক্তি। দিবারাত্রি কেবল এই সব ব্যাপার। প্রত্যহ রাত্রি ২॥০ টার কম কেহ বিশ্রাম করিতে যাইত না। সংকীর্ত্তনের এমনি নেশা যে তাহারা কিছুতেই ঘরে থাকিতে পারিত না। রাত্রি ৪টা বাজিতে না বাজিতে একে একে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইত, এবং প্রভাতী গান আরম্ভ করিয়া দিত। ভোগারতীর সময়ের উল্লম্ফন দেখে কে? এক এক জন লম্ফ দিয়া আছার খাইয়া পড়িতেছে আর ভূমির উপর গড়াগড়ি দিতেছে।

সংকীর্ত্তন দলের মত্ততা দেখিয়া আমি সংকীর্ত্তন মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতাম না; কি জানি একজন লম্ফ দিয়া গায়ের উপর পড়িলেই দেহটা চুরমার হইয়া যাইবে। আমি ভয়ে ভয়ে কেবল পাস কাটাইয়া বেড়াইতাম।

রাওয়া শুকাইয়া গেলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া জল দিই। বাদকগণের হাত ফাটিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, বেলের আটা, গ্লিসারিন ও ন্যাকড়া যোগাইয়া দিই। পৌষ মাঘ মাসের শীত কিন্তু সংকীর্ত্তনের দলের লোকদের গলদঘর্ম্ম। এজন্য চাকর দ্বারায় বড় বড় পাখা দিয়া সংকীর্ত্তন দলের লোকদের উপর অবিশ্রান্ত বাতাস চালাই, সময়ে সময়ে পান ও জল যোগাই।

তখন পেশাদার কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায় দ্বারায় কীর্ত্তন করান হইত না। সেরূপ কীর্ত্তন করাইবার ও উপায় ছিল না। একটা গান ধরিলে কি আর রক্ষা আছে? যুবক দল উন্মত্ত হইয়া নেচে কুন্দে একাকার করিলে, কোথায় বা মুল গায়েন আর কোথায় বা তাহার দোহারগণ। হয়ত মুল গায়েনকে কান্দে করিয়া নাচিতে থাকিল আর সে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িল! বায়েনের সাধ্য কি যে এই যুবক দলের সহিত ৫ মিনিট বাজায়। সম্প্রদায়ের গানের সময় তাহারা যেমন টোকা দিয়া বাজাইয়া যায় এরূপ বাজাইলেও চলিবে না। ক্রমাগত ডুন্দের উপর খোল চালাইতে হইবে। ১০ মিনিট বাজাইলেই খোল খানি অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে আর বাদকের হাত ফাটিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকিবে; বাজনা বন্ধ হইবে; সুতরাং সংকীর্ত্তনের সম্প্রদায় দ্বারা গান করাইবার উপায় ছিল না।

এ পর্য্যন্ত আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার সাধন প্রাপ্ত হন নাই।

তিনি বড় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। মাঝে মাঝে বোলপুরে আসিয়া গান শুনাইতেন, এবারকার উৎসবেও তিনি সপরিবারে আসিয়াছিলেন। তিনি সকলকে তাঁহার গান শুনাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু এই যুবক দলের নিকট যেমনি গান আরম্ভ করিতেন, অমনি তাহারা উন্মত্ত হইয়া নাচিয়া উটিত, আর সে নৃত্য থামে না। সুতরাং দাদা মহাশয়ের আর গান করা হইত না। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিতেন ইহাদের নিকট গান করিতে যাওয়া ঝকমারী। তাঁহার দীক্ষা লাভের পর তিনি কিন্তু নিজেই আবার এই দলে মিশিয়া পড়িয়াছিলেন। সকলের নৃত্য থামিত কিন্তু তাঁহার নৃত্য থামিত না। তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন কে ইহাদিগকে নাচায়। এবার উৎসবে পূজা ভোগ আরতীর সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল; এই সকল কার্য্য পণ্ডিত মহাশয় নিজে করিতেন। পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় এবারও বেশ নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। তদ্‌পর কাঙ্গালীভোজন হইলে ১৬ই মাঘ উৎসব শেষ হইয়াছিল।

আমি এই গ্রন্থে বোলপুর ও কুলীনগ্রামের সংকীর্ত্তনের যে সকল বর্ণনা করিয়াছি, তাহা অতিরঞ্জিত বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন। আমি সাহিত্য সেবক নহি আমার লিখিবারও শক্তি নাই। যাহা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক বর্ণন করিতেও আমি নিতান্ত অযোগ্য, যে সব ব্যাপার

ঘটিয়াছে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। এই সময় কুলীনগ্রাম ও বোলপুরে গোস্বামী মহাশয় মহাশক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন; সেই শক্তি বলে এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। যাহারা সংকীর্ত্তন করিতেন,তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন কেহ বা স্থানান্তরিত হইয়াছেন। যাহারা জীবিত আছেন এখন তাঁহাদের এমন শক্তি নাই যে ক্ষণকালের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় কীর্ত্তন করেন। তখন যাহা কিছু ঘটিয়াছিল তাহা কেবল গোস্বামী মহাশয়ের শক্তি প্রভাবে। মহাপুরুষে অলৌকিক শক্তি ব্যতিরেকে মানুষ নিজ শক্তিবলে কখনই এইরূপ কীর্ত্তন করিতে পারে না।

কুলীনগ্রামবাসির দিক্ষালাভ।

কুলীনগ্রাম আমার জন্মস্থান। পণ্ডিত মহাশয় আমাকে প্রায়ই বলিতেন, কুলীনগ্রামের উপর আমার কর্ত্তব্য আছে। আমি সামান্য লোক, আমার দ্বারায় গ্রামবাসিগণের আর কি উপকার হইবে। আমার সাধ্যই বা কি। আমি দুস্তর ভবসমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া সন্ত্রাসিত। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে ভগবান আছেন, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকলোক আছেন, ধর্ম্ম-সাধন ব্যতিরেকে মনুষ্যের নিস্তারের আর উপায় নাই। আমি কুলীনগ্রামবাসীর ধর্ম্মজীবন প্রস্তুতের জন্য তাহাদিগকে হরিনাম সংকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত করাইবার মানসে এখান হইতে খোল করতাল পাঠাইয়া দিয়াও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের নিকট গিয়া উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত করিতাম।

কুলীনগ্রাম ভক্তি প্রধান স্থান, কালপ্রভাবে সাধন-ভজন নষ্ট হওয়ায় গ্রামবাসীগণ কেবল দলাদলী, মালি মোকদ্দমা, পরনিন্দা ও পরছিদ্রানুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। বহুকাল পরে তাহারা হরিনামের আস্বাদ পাইয়া ও পণ্ডিত মহাশয়ের ভক্তি দেখিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব স্মৃতি

জাগরিত হইল। তাহারা দলাদলী ও মালি মোকদ্দমা ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যহ নাম সংকীর্ত্তনে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনের ভাব অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সঙ্গীত-বিদ্যায় দাদা মহাশয়ের কিছু পারদর্শিতা ছিল, তিনি এই নূতন দলের নেতা হইলেন।

আমি কুলীন গ্রাম বাসীর কল্যাণ কামনায় তাহাদিগকে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে দাদা মহাশয়কে লিখিলাম "আপনি কুলীন গ্রাম বাসীগণকে দীক্ষার্থে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিউন, আমি তাহাদের সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিব। দাদামহাশয় আমার এই পত্র পাইয়া গ্রাম-বাসী গণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

বাবু যদুনাথ রায় রামপুরহাট ব্রাহ্ম-সমাজের সেক্রেটরী, ঐ স্থান ব্রাহ্মদিগের একটা প্রধান আড্ডা। যদুবাবু একজন কৃতবিদ্য, নিষ্ঠাবান ব্রহ্মোপাসক। ব্রাহ্মদিগের বাড়াবাড়ী দেখিয়া তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দল রামপুর হাটে এক হরিসভা স্থাপন করেন। ব্রাহ্ম-সমাজের যেমন উৎসাহ হরি-সভারও তেমনি উৎসাহ।

ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসব কালিন যদুবাবুর আগ্রহে যদিও তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীমনী দাসী (আমার জেটতুত ভগ্নী,) ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতেন, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনায়,

তাঁহার মন প্রসন্ন হইত না, তাঁহার সেই বাপের বাড়ীর জগন্নাথ, রঘুনাথ, মদনগোপাল, শ্যামসুন্দর, মহাপ্রভু, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতিই ভাল লাগিত। তিনি সময়ে সময়ে স্বপ্নাবস্থায় ঐ সকল ঠাকুর দর্শন করিতেন এবং কুলীনগ্রাম গিয়া তাঁহাদের ভোগদিয়া আসিতেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী দল তাঁহাকে বৈষ্ণবী ঘরের কন্যা জানিয়া যথেষ্ট মর্য্যাদা করিতেন, তিনিও তাহাদের হরি-সভার যথেষ্ট অর্থসাহার্য্য করিতেন। যদুবাবু উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি পত্নীর ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপণ করিতেন না।

আমি এখন বেশ বুঝিয়াছি—মহাপুরুষের শক্তি ব্যতীত ধর্ম্মলাভের উপায় নাই; একারণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দিদিকে দীক্ষিত করিবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হইলাম। আমি রামপুরহাট গিয়া দিদিকে বলিলাম, মনুষ্য-জন্ম অতিদুর্লভ জীবন শেষ হইয়া আসিতেছে, তুমি আর এমন করিয়া কত দিন কাটাইবে, চল, গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গিয়া দীক্ষা লও, তোমার প্রভুত কল্যাণ হইবে; এই কথা শুনিয়া দিদি আনন্দিতা হইলেন; স্বামীর অনুমতি চাওয়ায় যদুবাবু অনুমতি দিলেন। তাহাতে তিনি আমাকে বলিলেন, যখন কলিকাতা যাইবে তখন আমাকে লইয়া গিয়া দীক্ষা

১৩০৪ সাল ফাল্গুন মাস শিবরাত্রির বন্ধ উপলক্ষে ৮ই ফাল্গুন শনিবার আমার কলিকাতা যাইবার দিন স্থির হইল। আমি কুলীনগ্রাম ও রামপুরহাটে পত্র লিখিলাম সময় মত রামপুরহাট হইতে দিদিঠাকুরাণী বোলপুরে আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন দাদা মহাশয় পত্রের উত্তর লিখিলেন "যদি তুমি ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হও তাহা হইলে আমি সমস্ত গ্রামবাসীকে কলিকাতা পাঠাইয়া দিতে পারি।"

৮ই ফাল্গুন প্রাতে লুপমেলে আমার চাকর গোপীদাস শুক্লাম্বর দিদি লক্ষমণি দাসী ও পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা রওনা হইলাম। বেলা ৯টার সময় মেমারী ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া দেখি প্ল্যাটফরম্ লোকে লোকারণ্য, কুলীনগ্রামের স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকায় প্ল্যাটফরম্ পরিপূর্ণ, তন্মধ্যে একজন লোক দাদার পত্র আমার হাতে দিল।

আমি দেখিলাম ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, উগ্র ক্ষত্রিয়, তাঁতি যুগী, সৎগোপ, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, সুত্রধর, বৈষ্ণব, নাপিত ময়রা, গোয়ালা, হাড়ী, ডোম, দুলে প্রভৃতি নানাজাতীয় লোক প্ল্যাটফরমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন ভদ্র ঘরের কুলবধূও আছেন, আর ষণ্ডা গুণ্ডা চোর ছ্যাঁচোড় লম্পট দস্যুও আছে। উপপতি উপপত্নিকে সঙ্গে লইয়া উভয়ে এক যোট বাঁধিয়া

আসিয়াছে। সতী-সাধ্বী সধবাও আছেন আর, ব্যাভিচারিণী বিধবাও আছে।

এই সমস্ত দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। ভয় ভাবনায় আকুল হইয়া পড়িলাম। মনে করিলাম ইহাদিগকে কলিকাতা লইয়া গেলে গোস্বামী মহাশয় কি বলিবেন, দেশ দেশান্তর হইতে কত সাধু সচ্চরিত্র লোক সাধন লইবার জন্য গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় তাহাদিগকে সাধন না দিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এই সকল লোক গোস্বামী মহাশয়ের নিকট লইয়া গেলে নিশ্চয়ই একটা অশান্তি উপস্থিত হইবে, আর আমাকে তিরস্কৃত হইতে হইবে। ইহাদিগকে গোস্বামী মহাশয় কখনই সাধন দিবেন না।

একবার মনে করিলাম এই দুর্বৃত্তগণকে ফিরিয়া যাইতে বলি, কিন্তু ষ্টেসনেই শুনিলাম ইহারা গ্রামে সমস্ত বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া মেগারী চলিয়া আসিয়াছে। ইহাদের আত্মীয় স্বজনগণ ইহাদিগকে নিবারণ করিয়া রাখিতে পারে নাই, ইহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যদি গোস্বামী মহাশয় সাধন না দেন তাহা হইলে ইহারা আর কুলীনগ্রামে মুখ দেখাইবে না, গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিবে। দুর্বৃত্তগণের অসাধ্য কিছুই নাই, আমি নিষেধ করিলেও ইহারা শুনিবে না। এই সমস্ত

চিন্তা করিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া চিন্তাকুল চিত্তে কলিকাতায় পৌছিলাম।

এই সময় বাবু সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় গোস্বামী মহাশয়ের প্রধান পরিচারক ছিলেন। এই সকল কুলীনগ্রাম বাসীর নৈতীক অবস্থা ও আগমন বৃত্তান্ত তাঁহাকে অবগত করায় তিনি বলিলেন। "গোস্বামী মহাশয় যাহাকে তাহাকে সাধন দেন না, দূর দূরান্তর হইতে কত সচ্চরিত্র পদস্থ ভদ্রলোক আসিয়া সাধন না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন; আর এই সব নষ্ট দুষ্ট লোক যদি সাধন লইতে গিয়া বিতাড়িত হয়, তাহা হইলে সেই সময় একটা মহা অশান্তি উপস্থিত হইবে, গোস্বামী মহাশয়কে সকলের পরিচয় জ্ঞাপন করুন তদপর তিনি যাহা বলিবেন সেই মত করিবেন।" এই কথা শুনিয়া আমি পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিতে লাগিলাম, তিনি বলিলেন "যাহারা আসিয়াছে তাহাদের যে প্রকৃতি গোস্বামী মহাশয়কে কি জানেন না? তাঁহাকে কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই; তাঁহার অজানিত কি আছে? তাহার আকর্ষণ ব্যতিরেকে ইহারা কি আসিয়াছে?"

আমার সঙ্গে বহুলোক কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছে, আমার দায়ীত্ব গুরুতর, একারণ গোস্বামী মহাশয়ের মনোগত ভাব বুঝিবার জন্য আমি আস্তে আস্তে গোস্বামী

মহাশয়ের ঘরে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এক পাশে বসিলাম। আজ শিবচতুর্দ্দশীর দিন, গোস্বামী মহাশয়ের ঘর লোকে লোকারণ্য। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শিবচতুর্দ্দশীর কথা হইতেছে। পশুহন্তা ব্যাধ মহাদেবের কৃপায় কি প্রকারে উদ্ধার হইয়া গেল গোস্বামী মহাশয় নিজ মুখে তাহা বিবৃত করিলেন। কথা শেষ হইলে আমি সুযোগ বুঝিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম, "দেবাদিদেব মহাদেব কৃপা করিয়া কেবলমাত্র একটী ব্যাধকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, আজ শত শত ব্যাধ কুলীন গ্রাম হইতে আসিয়া আপনার পদপ্রান্তে উপস্থিত। এবার আমার ভোলানাথ কি করিবেন?" আমার এই কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "কল্য প্রাতে ৮টার সময় সকলকে বসাইয়া দিও।" এই কথায় আমি পরমানন্দ লাভ করিয়া গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করত পণ্ডিত মহাশয়কে ও সারদা বাবুকে গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতির কথা জ্ঞাপন করায় তাহারা আনন্দিত হইলেন, আমার সমস্ত ভয় ভাবনা দূর হইল।

পরদিন প্রাতে সকলে গঙ্গা স্নান করিয়া যথাসময়ে উপস্থিত হইল। গোস্বামী মহাশয়ের প্রশস্ত ঘরের মধ্যে আর লোক ধরে না। একদিকে স্ত্রীলোকগণ ও অপর দিকে পুরুষদিগের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। স্থানাভাবে সকলে ঠেসাঠেসী করিয়া বসিল। আমরা

স্থানাভাবে বাহিরের বারান্দায় বসিলাম কেহ বা দাঁড়াইয়া থাকিলাম। গোস্বামী মহাশয় উপদেশ দিয়া যেমন নাম দিলেন, অমনি মহা হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত হইল। কেহ কাঁদিয়া উঠিল, কেহ মাথা খুঁড়িতে লাগিল, কেহ চীৎকার করিতে থাকিল, কাহার কাহার বিষম প্রাণায়াম উপস্থিত হইল। তাঁহাতে বোধ হইতে লাগিল ঘরের মধ্যে একটা বিষম ঝড় প্রবাহিত হইতেছে। অধিকাংশ লোক আছাড় পিছাড় করিতে লাগিল, কে কার গায়ে পড়ে, আর কে বা কাকে ধরে। কেহই আত্মসম্বরণে সমর্থ হইল না। কেহ কেহ গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয় জয় গুরু জয় গুরু বলিয়া সকলকে থামাইতে লাগিলেন। আমরা অবাক হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর সকলে স্থির হইলেন। আহারান্তে সকলকে কুলীনগ্রাম পাঠাইয়া দিলাম। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "আবার তোমাদের সেই সাবেক কুলীনগ্রাম হইল।

বন্ধুবর অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দীক্ষা না হওয়ায় আমার মনে বড়ই একটা ক্লেশ ছিল। তাঁহাকে সাধন দেওয়াইবার জন্য আমি অনেক দিন হইতে চেষ্টা পাইতে ছিলাম। গোস্বামী মহাশয় অঘোর বাবুকে খুব ভাল বাসিতেন এইবার গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম "আপনি

উপস্থিত হয় নাই, এই কথা শুনিয়া অঘোর বাবু বলিয়াছেন "ভাল কোন জন্মেওত সুময় উপস্থিত হইবে? গোস্বামী মহাশয়ের কৃপায় ত বঞ্চিত হইব না? ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।" এই কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "অঘোর বাবুকে আসিতে বলুন তাঁহার সাধন হইবে;"

গোস্বামী মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া আমার আনন্দের সীমা থাকিল না। আমি গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম "তবে অঘোর বাবুকে একখানা চিঠি লিখি?" তিনি উত্তর করিলেন হাঁ লিখিতে পার। আমি তৎক্ষণাৎ চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিলাম। চিঠি লিখিতে লিখিতে মনে হইল শুভস্য শীঘ্রং, চিঠি পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইবে, কখন কোন বাধা উপস্থিত হয় কিছু বলা যায় না, একটা টেলিগ্রাম পাঠানই কর্ত্তব্য। এই কথা মনে হওয়ায় চিঠি লেখা বন্ধ করিয়া আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গিয়া বলিলাম "অঘোর বাবুকে একটা টেলিগ্রাম করিলে ভাল হয় না?" তিনি উত্তর করিলেন "হাঁ টেলিগ্রাম করিতে পার।" এই কথা শুনিয়া আমি কালবিলম্ব না করিয়া অঘোর বাবুর নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইলাম। তিনি টেলিগ্রাম পাইবামাত্র সস্ত্রীক হ্যারিসন রোডের এই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরদিন তাঁহাদের দীক্ষার দিন স্থির হইল। অঘোর বাবুর স্ত্রী কোলের শিশু সন্তান লইয়া আসিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়কে

ঐ শিশুর কথা বলায় তিনি বলিলেন "শিশুকে কোলে লইয়া বসিতে বলিবেন।" পরদিন সস্ত্রীক অঘোর বাবুর দীক্ষা কার্য্য শেষ হইল; ইহাতে ঐ শিশুরও দীক্ষা হইয়া গেল।

একাল পর্য্যন্ত দাদা মহাশয়ের দীক্ষা হয় নাই। তিনি কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া ছিলেন। কুলগুরু পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে বিবেচনায় তিনি এপর্য্যন্ত গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লইতে সম্মত হন নাই। কুলীনগ্রামবাসী ষণ্ডাগুণ্ডাদের দীক্ষার পর তাহাদের অবস্থা দেখিয়া দাদা মহাশয় স্ত্রী ও কন্যা সহ কলিকাতায় আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। আমার আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি বন্ধু দাস দাসী কেহই গোস্বামী মহাশয়ের কৃপায় বঞ্চিত হইলেন না। গোস্বামী মহাশয় আমাকে বলিলেন "তুমি জগন্নাথদেবের পট্টডোরী দিতেছ, সেই জন্য জগন্নাথ দেব কৃপা করিয়া তোমার আত্মীয় স্বজন সকলকে আত্মসাৎ করিলেন। যদু বাবুর ন্যায় ব্রাহ্মের নিকট হইতে তোমার ভগ্নিকে কাড়িয়া আনিলেন।" আমি বলিলাম "আপনার কৃপাই আমার যথাসর্ব্বস্ব।"

কুলীন গ্রামের অনেক ষণ্ড, গুণ্ডা, চোর, ছ্যাচোড়, লম্পট ও ব্যভিচারী লোকে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা পাইল, অথচ দূরদুরান্তর হইতে সমাগত সাধু সচ্চরিত্র অনেক লোক আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের কৃপায়

বঞ্চিত হইয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। অনন্তকালের মধ্যে আমারা ইহ জীবনের কয়েক দিনের বাহ্যিক আচরণ দেখিয়া লোকের বিচার করিয়া থাকি। কাহাকেও সাধু বলি, আর কাহাকেও অসাধু বলি। মহাপুরুষেরা আত্মার অবস্থা দেখেন। যে ব্যক্তি নিতান্ত দুরাচার বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হইতেছে, হয়ত সেই লোকটাই একজন মহাত্মা; কেবল কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য দুরাবস্থায় কাল যাপন করিতেছে। আর যাহাকে সাধু বলিয়া বিবেচনা করিতেছি, হয়ত সেইই মহাপাতকী; অভিমান অহঙ্কারে স্ফীত, লোকের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য নিজেকে আবরণ দিয়া চলিতেছে। মহাপুরুষের নিকট এসব কিছুই গোপন থাকিবার উপায় নাই, তাঁহারা মানুষের আত্মার অবস্থা দেখিয়া ভাল মন্দের বিচার করেন।

এই বার ব্রাহ্ম-সমাজের মাঘোৎসব হইয়া গেলে শ্রদ্ধেয় বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত কতকগুলি ব্রাহ্ম সঙ্গে লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে এই হ্যারিসন রোডের বাসায় গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি।" গোস্বামী মহাশয় তদুত্তরে বলিয়াছিলেন "মড়া আগলাইয়া থাকার প্রয়োজন কি? এখন আপন আপন ইষ্ট চিন্তা করুন।" অর্থাৎ যে কার্য্যের জন্য ব্রাহ্ম সমাজের অনুষ্ঠান

হইয়াছিল,সে কার্য্য শেষ হইয়াছে, এখন এই ব্রাহ্ম-সমাজে থাকার আর কোন প্রয়োজন নাই, ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ ইষ্ট চিন্তার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মসমাজে থাকিলে আর ধর্ম্ম লাভ হইবে না।

গোস্বামী মহাশয় দিবা নিশি যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া নাম সাগরে ডুবিয়া থাকিতেন, চলা ফেরা বড় একটা ছিল না একারণ তিনি চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

গোস্বামী মহাশয় অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই মহাভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। ভাব সমুদ্রের বিষম তরঙ্গাঘাতে অবিশ্রান্ত আহত হইয়াও তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখা যাইত না।

গোস্বামী মহাশয়ের পুরী গমন।

গোস্বামী মহাশয় নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ছিলেন; কিন্তু জগন্নাথ দর্শনে এ পর্য্যন্ত পুরী গমন করেন নাই। এইবার তাঁহার পুরী গিয়া ৺জগন্নাথ দর্শন করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইল। তিনি একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মধ্যে দশদশা প্রকাশ পাইতে লাগিল*। তিনি জগন্নাথ দর্শন করিবার জন্য বালকের

---

* চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগো তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহ মৃত্যুর্দ্দশাদশঃ॥

মহাভাবের অবস্থায় ভগবানের বিরহে ভক্তের দশ দশা উপস্থিত হইয়া থাকে। এক এক সময় এক একটী অবস্থা প্রকাশ পায় প্রথমত চিন্তা, ক্রমে অনিদ্রা, উদ্বেগ, শীর্ণতা, অঙ্গমালিন্য প্রলাপ ব্যাধি, উন্মত্ততা, মোহ, অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। এই দশ দশা জীবের ভাগ্যে ঘটেনা। কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুতে এই সকল দশা উপস্থিত হইয়াছিল। এইবার গোস্বামী মহাশয়ের মধ্যে এই সমস্ত দশা একে একে প্রকাশ পাইতে দেখিলাম; ভগবত বিরহে ভক্তের যে কি দশা হয় আমরা ক্ষুদ্র জীব হইয়া তাহা কি প্রকারে বুঝিব? শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবিষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে॥

ন্যায় ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার আর্ত্তি দেখিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। সর্ব্বদাই হা হুতাশ করিতে লাগিলেন। চিন্তায় জর জর হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন "হে দেব আমার চলৎশক্তি রহিত করিয়া দিয়া আমার এই দুর্দ্দশা করিলেন ? আমি আপনাকে দেখিবার জন্য যাইতে পারিলাম না। আমার মনে হইতেছে আমি গড়াইয়া গড়াইয়া গিয়া আপানার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হই। গঙ্গাবক্ষে যখন কোন ষ্টীমার ছাড়িবার বাঁশির শব্দ হইত তখনই তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিতেন ঐ পুরীর ষ্টীমার ছাড়িল। ঐ বাঁশির শব্দ শুন। তিনি যেন ষ্টীমারে উঠিতে না পারিয়া ভগ্ন হৃদয়ে আর্ত্তনাদ করিতেছেন। এক এক বার শিষ্যগণকে বলিতেন, তোমরা কি করিতেছ ? "আমাকে পুরুষোত্তম পাঠাইয়া দিতে পারিতেছ না ? শীঘ্র আমাকে জগন্নাথধাম পাঠাইয়া দাও।" গোস্বামী মহাশয়ের আর্ত্তি ও উৎকণ্ঠা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শিষ্যগণ দেখিলেন আর তাঁহাকে কলিকাতায় রাখা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাকে পুরী লইয়া যাইবার জন্য একখানি ষ্টীমার ও দুইখানি বজরা ভাড়া হইল। আমি যোগজীবন দ্বারায় গোস্বামী মহাশয়ের সহিত পুরী যাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তিনি বলিলেন "হরিদাস বাবুর পুরী যাওয়া হইবে না, তাঁহার উপর অনেক দায়, তাঁহার এখন অর্থোপার্জ্জন

আবশ্যক তাঁহাকে বোলপুর যাইতে হইবে।” আমি গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বোলপুর চলিয়া আসিলাম। ১৩০৪।২৪শে ফাল্গুন তারিখে গোস্বামী মহাশয় পুরী রওনা হইলেন। আমি বোলপুরে পণ্ডিত মহাশয় ও সরলনাথের সহিত বড় সুখে থাকিতাম; এইবার তাঁহাদের সঙ্গসুখে বঞ্চিত হইলাম। তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের সহিত পুরী রওনা হইলেন।

এই মহাপুরুষ কলিকাতায় অবস্থিতি করায় বিউবনিক প্লেগ কলিকাতায় উপস্থিত হইতে পারে নাই। মহাপুরুষের প্রভাবে কলিকাতাবাসিগণ নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছিলেন। তিনি যেমন কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন অমনি দুরন্ত এই প্লেগ সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা আক্রমণ করিল। প্লেগ রেগুলেশন পাস হইয়া গেল। কলিকাতাবাসীর দুঃখের আর সীমা থাকিল না। পাঠক মহাশয়গণ আপনারা এই প্লেগের অত্যাচার ও কলিকাতাবাসীর দুঃখের কথা সমস্তই অবগত আছেন; আমি আর আপনাদিগকে লিখিয়া কি জানাইব! আমি এই মাত্র বলিতেছি যেস্থানে কোন মহাপুরুষ বাস করেন, সেস্থানে যে দৈব উৎপাৎ থাকে না এই ঘটনাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আমি গোস্বামী মহাশয়ের আদেশে কলিকাতা হইতে বোলপুর চলিয়া আসিলাম। কুলীন গ্রামের পুরস্ত্রীগণ

মত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; তাঁহাদের সংসারে মন ছিল না ; তাঁহারা গৃহকার্য্য করিতে পারিতেন না ; নাম করিতে করিতে কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন, কাহার কাহার শরীরে দারুণ কম্প হইত ; কাহার কাহার দেহের অস্থি-গ্রন্থি খসিয়া যাইত। স্ত্রীলোকগণ ইহাতে ভয় পাইয়া আমাকে বোলপুর হইতে ত্বরায় কুলীন গ্রাম যাইবার জন্য পত্র লিখিলেন।

আমি স্ত্রীলোকগণের পত্রানুসারে কুলীন গ্রাম যাওয়ায় তাঁহারা ভয়বিহ্বল-চিত্তে আপনাদের এই সকল নূতন অবস্থার কথা আমাকে জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা কোন একটা পীড়ার আশঙ্কা করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম "তোমাদের মধ্যে সদ্‌গুরু শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, তোমরা মহাভাগ্যবতী, তোমাদের কৃষ্ণভক্তির উদয় হইয়াছে এবং অপূর্ব্ব ভক্তির লক্ষণ সকল তোমাদের দেহে প্রকাশ পাইতেছে এখন তোমাদের শরীর সদ্‌গুরু মহাশক্তির তেজ সহ্য করিতে পারিতেছে না; ক্রমে সাধন একটু গাঢ় হইলে সব সহ্য হইয়া যাইবে, তোমরা ধৈর্য্য সহকারে নাম করিতে থাক, কোন অবস্থাতেই নাম পরিত্যাগ করিও না ; কত লোকে কত কথা বলিবে কাহারও কথা শুনিও না ; ক্রমে দেখিবে জীবন মধুময় হইয়াছে।

আমি কুলীন গ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে আশ্বস্ত করিয়া

ও পুরুষগণকে সাধনে উৎসাহিত করিয়া বোলপুর ফেরত আসিলাম। এখানে এখন পণ্ডিত মহাশয় নাই সরলনাথ নাই, আমার প্রাণ বিষাদে বিষণ্ণ হইল। তাঁহাদের বিরহে অতিকষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

৺জগন্নাথ দেবের পাণ্ডারা অতি নষ্টপ্রকৃতির লোক। এমন কাষ নাই যাহা তাহারা অর্থের জন্য করিতে না পারে। সিঙ্গারী পাণ্ডা ভুবন মিশ্রকে রাজা বলিয়াছিলেন যদি কুলীন গ্রামের বসু বংশীয়েরা দরিদ্রতা প্রযুক্ত পট্ট-ডোরী দিতে অসমর্থ হইয়া থাকে, রাজ সরকার হইতে তাহাদিগকে টাকা দিয়া পট্টডোরী আনাইয়া দাও। এই ছিদ্র পাইয়া ভুবন পাণ্ডা আমার নিকট হইতে পট্টডোরী লইয়া গিয়া রাজ সরকার হইতে আমাদের নাম করিয়া অনেক টাকা বাহির করিয়া লইত। ১৩০৫ সালের পট্টডোরী অর্থের জন্য আটক করিয়া রাখিয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় এই কথা আমাকে জ্ঞাপন করায় আমি রাজষ্টেটের তৎ-কালিন ম্যানেজার প্রাইস্ সাহেবকে পত্র লিখিলাম।

প্রাইস্ সাহেব আমার এই পত্র পাইবামাত্র ভুবন পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া তাহার নিকট হইতে সমুদয় টাকা আদায় করিয়া লইলেন এবং তাহাকে ফৌজ-দারি সোপরদ্দ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ভুবন পাণ্ডা এই বিপদে পড়িয়া আমার নিকট লোক পাঠাইয়া আমার শরণাপন্ন হইল। ৺জগন্নাথ দেবের পাণ্ডাকে কয়েদ

দিয়া আর কি হইবে, এই ভাবিয়া প্রাইস্ সাহেবকে অনুরোধ করিয়া পাণ্ডাকে ফৌজদারি দায় হইতে মুক্ত করিলাম। যে সকল দুর্ব্বৃত্তেরা ষড়যন্ত্র করিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল তন্মধ্যে এই ভুবন পাণ্ডা একজন। এই পট্টডোরী ব্যাপারে গোস্বামী মহাশয়ের উপর তাহার জাতক্রোধ জন্মিয়াছিল। বিষ প্রয়োগের অল্পদিন পরে ভুবন পাণ্ডা ও তাহার পুত্র মৃত্যু-মুখে পতিত হইল।

দ্বিতীয় পুত্রের রোগমুক্তি।

—:*:—

১৩০৫ সালের ভাদ্র মাহায় বামন-দ্বাদশী তিথিতে আমার দ্বিতীয় পুত্র বল্লভীজনবল্লভ ভূমিষ্ঠ হয়। জন্মের কিছু দিন পর হইতে তাহার নিদারুণ পীড়া উপস্থিত হইল, ডাক্তার চিকিৎসা করিতে লাগিল, কিছুতেই ব্যারাম আরোগ্য হইল না। বালকের জীবনের আশায় সকলে নৈরাশ হইল।

সন্তানের রোগ মুক্তির জন্য দেবার্চ্চনা আমার অভিপ্রেত নহে। এই দেবার্চ্চনা, প্রকৃত পক্ষে দেবার্চ্চনা নহে, ইহা স্বার্থের পূজা ও দোকানদারী মাত্র। স্বার্থ লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হওয়া আমার নিকট একটা ঘৃণিত ব্যাপার; আমার পক্ষে সন্তানের জীবন লাভই মঙ্গল কি মৃত্যুই মঙ্গল আমি কিছু জানি না। হয় ত মৃত্যুই মঙ্গল হইবে। এমন অবস্থায় কি প্রকারে সন্তানের জীবনদানের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিব? আমি এই মাত্র বলিতে পারি যাহাতে আমার কল্যাণ হয় তাহাই করুন; সন্তান মারিতে হয়

সংসার একার মতে চলে না, পাঁচ জনের মনস্তুষ্টি করিয়া চলিতে হয়। পাড়ার লোক ও ব্রাহ্মণসজ্জনগণ দেবার্চ্চনার জন্য জেদাজেদী করিতে লাগিলেন। বাটীর স্ত্রীলোকেরা তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল, সুতরাং দেবার্চ্চনা আরম্ভ হইল, চিকিৎসা ও দেবার্চ্চনা উভয়ই চলিতে লাগিল। স্বস্ত্যয়ন, কালী পূজা ইত্যাদি যে যাহা বলিতে লাগিল সমস্তই অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। রোগ কিন্তু দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর আকার ধারণ করিতে লাগিল। অবশেষে বালকের প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইবার উপক্রম দেখিয়া বালকের অঙ্গ হরি-নামাঙ্কিত হইল। তাহার মুখে দুগ্ধ গঙ্গাজল দেওয়া হইল, কর্ণে হরিনাম প্রদত্ত হইতে লাগিল। হরিনামের ধ্বনি ও স্ত্রীলোকগণের ক্রন্দনের রোলে বাসা তোলপাড় হইতে লাগিল। বাসায় লোকে লোকারণ্য, পাড়ার মেয়েরা ছুটিয়া আসিয়াছে, মহা হাহাকার উপস্থিত।

বালকের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমি বৈঠকখানায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলাম; ভাবিতে লাগিলাম সন্তানের জন্মই বা কেন আবার মৃত্যুই বা কিজন্য। এই ঘটনার পূর্ব্বে আমার আর কোন সন্তান বিনষ্ট হয় নাই, পুত্র বিয়োগ মনকে কিরূপ বিষাদিত করিতেছে কেবল ইহাই আমি দেখিতেছি। ডাক্তারবাবু উঠিয়া

বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল অন্তঃপুরের কান্না আর থামে না। আমার কর্ম্মচারী ও স্বতীর্থ শ্রীনাথ সরকার বলিলেন মৃতদেহ আর অধিকক্ষণ বাড়ীতে রাখিবার প্রয়োজন নাই, মৃতদেহ যতক্ষণ গৃহমধ্যে থাকিবে ততক্ষণ কান্না থামিবে না।

এমন সময় সেই বৈষ্ণব উকিলবাবু যশোদানন্দন সিংহ আপন বাসা হইতে আমার নিকট আসিয়া বলিলেন বাটীতে মহা কান্নাকাটি, তুমি কাঁদিতেছ কিনা, আমি তাই দেখিতে আসিলাম, যদি তোমাকে কাঁদিতে দেখিতাম তাহা হইলে আমি তোমাকে তিরস্কার করিতাম। আমি বলিলাম পুত্র-বিয়োগে আমার কষ্ট হয় নাই, তবে ভগবান কেনই বা সন্তান দিলেন, আর কেনই বা লইলেন, আমি কেবল ইহাই চিন্তা করিতেছি। তদপর তাঁহার সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ হইতে লাগিল।

বালককে সৎকার করিবার জন্য শ্রীনাথ সরকার কোমরে গামছা বান্ধিয়া কোদাল হস্তে ঠিক হইয়া আসিল। এই সময় মনে হইল ছেলেটিকে একবার শেষ দেখা দেখে আসি।

এই ভাবিয়া আমি স্বতীর্থ যুগলকৃষ্ণ সরকার সহ ছেলেটিকে দেখিবার জন্য অন্দরে চলিলাম। স্ত্রীলোকের ভিড়ে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করা যায় না, ইহাদিগকে

শয়ান রহিয়াছে। গঙ্গা মৃত্তিকা দ্বারায় তাহার তিলক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ হরিনামাঙ্কিত। শীয়রে দুধ গঙ্গাজলের বাটী। দিদি কংকালীর পূজা করাইয়া চরণামৃত ও পুষ্প আনিয়াছেন, সমস্তই বালকের পার্শ্বে রক্ষিত রহিয়াছে। মাতৃকোলে বালককে দেখিয়া মনে হইল যেন সরোবরে একটি শতদল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে।

আমরা দেখিলাম বালকের শ্বাসপ্রশ্বাস নাই। নাড়ীর স্পন্দন নাই; চক্ষু মুদ্রিত। যুগলবাবু এক ফোঁটা দুধ গঙ্গাজল আঙ্গুলের অগ্রভাগে লইয়া বালকের জিহ্বায় দেওয়ায় তাঁহার মনে হইল এখনও জীবন শেষ হয় নাই; তিনি আরও ২।১ ফোঁটা দুধ-গঙ্গাজল বালকের মুখে দিলেন। স্ত্রীলোকদিগকে সরাইয়া দিয়া শিশুকে একটা বিছানায় শুয়াইয়া রাখা হইল, আর সৎকার করা হইল না।

রাত্রি ১০টার সময় দিদি স্বপ্ন দেখিলেন কোন এক মহাপুরুষ বালকের জীবন রক্ষার জন্য তাঁহাকে ঔষধ দিতেছেন। এমন সময় বাড়ীর লোক ডাক দিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করায় আর তিনি ঔষধ পাইলেন না, নিদ্রাভঙ্গের পর অনেক আক্ষেপ করিলেন, তদপর রাত্রি ৩টার সময় দিদি আমার নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, গুরুদেব প্রকাশিত হইয়া বলিলেন "কেন ছুটা ছুটী করিয়া মরিতেছিস, হরিরলুট দে, আর নাম সংকীর্ত্তন

কর, খোকা ভাল হইবে।” আমি বলিলাম “ইহার আর ভাবনা কি? সংকীর্ত্তনের দল ত প্রস্তুতই আছে; একবার বলিলেই হয়।” প্রাতঃকালে হরিরলুট দেওয়া হইল, সংকীর্ত্তনের দল গগণভেদী নামসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। বালক সুস্থ হইল। আর কোন প্রয়াস পাইতে হইল না।

পুরীধামে গোস্বামী মহাশয়ের ঋণ।

পুরী-ধামে অবস্থিতি কালীন গোস্বামী মহাশয় যে সমস্ত লীলা করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনী-লেখকগণ তৎসমুদয় সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। পুরীর দান তাঁহার জীবনের এক অদ্ভুত কার্য্য, গোস্বামী মহাশয়ের পুঁজীর মধ্যে একটী মাত্র কৌপীন। কি প্রকারে এই বিপুল দানকার্য্য সম্পন্ন হইল তাহা জানিবার জন্য পাঠক মহাশয়দিগের একটা কৌতুহল জন্মিতে পারে; জীবনী-লেখকগণ তাহা বর্ণন করেন নাই, একারণ পাঠক মহাশয়গণের কৌতুহল নিবারণার্থ এই স্থানে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

একদিন গোস্বামী মহাশয় ৺জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিতে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর দর্শনের পর বাসায় ফিরিয়া আসিবার সময় পাণ্ডা ও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণগণ গোস্বামী মহাশয়কে টাকার জন্য ঘিরিয়া ফেলিল। গোস্বামী মহাশয় মুক্তীমণ্ডপে * বসিয়া পাণ্ডা ও উপস্থিত ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কি চান"? পাণ্ডা ও ব্রাহ্মণগণ যে যেমন

---

* ৺জগন্নাথ দেবের মন্দিরের দক্ষিণে একটা স্থানের নাম।

লোক সে তেমনি প্রার্থনা করিল। কেহ চাহিল ২০৲ টাকা, কেহ চাহিল ১৫৲ টাকা, কেহ চাহিল ১০৲ টাকা, কেহ চাহিল ৫৲ টাকা, কেহ বা ১৲ টাকা চাহিল। অর্থার্থীগণ মোট ৫০০ টাকা চাহিয়া বসিল।

গোস্বামী মহাশয় কপর্দ্দক শূন্য, কোথা হইতে এই টাকা দিবেন? তিনি সঙ্গের শিষ্যগণ মধ্যে শিক্ষিত বুদ্ধিমান কোন লোককে কোন কথা না বলিয়া সেই বেকুব সরলনাথকে বলিলেন "সরলনাথ, আমাকে ৫০০৲ টাকা আনিয়া দাও।" সরলনাথ যে আজ্ঞে বলিয়া টাকা আনিতে চলিলেন।

সরলনাথের বিশ্বাস গুরুর যখন টাকার আবশ্যক হইয়াছে তখন আর টাকার অভাব হইবে না, নিশ্চয় টাকা পাওয়া যাইবে, যেখানে যাইব সেইখানেই টাকা পাইব, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সরলনাথ নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্তে সিংহদরজা হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে একটা কাপড়ের দোকান দেখিয়া অপরিচিত দোকানদারকে * বলিলেন, "আরে ভাই তুমি নাকি আমাকে ৫০০ টাকা দিতে পার।" দোকানদার সরলনাথের মুখের দিকে তাকাইল; এ ব্যক্তি কে, কোথাকার লোক, কি জন্য টাকা চাহিতেছে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না; এক খানা দলিলও লিখিয়া দিতে বলিল না, অপরিচিত

* এই দোকানদারের নাম ছিল ...

বিদেশস্থ সরলনাথকে অম্লানবদনে ৫০০ টাকার তোড়া দিল। সরলনাথ টাকার তোড়া আনিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করিলেন। এই টাকা কোথায় কি প্রকারে পাওয়া গেল একথাও গোস্বামী মহাশয় সরল নাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন না। এই টাকা পাইয়া যে যাহা চাহিয়াছিল গোস্বামী মহাশয় তাহাকে তাহাই দিলেন।

টাকা দেওয়ার পর এই দানের কথা চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়িল। গোস্বামী মহাশয় বাসায় আসিবা-মাত্র বাসার শিষ্যেরা গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ নাকি মন্দিরে গিয়া আপনি ৫০০ টাকা দান করিয়া আসিয়াছেন? গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেন,"হাঁ, ৫০০ টাকা কি, আজ যদি পাণ্ডা ও ভিক্ষুক-গণ আমার নিকট পাঁচ লক্ষ টাকা চাহিত তাহাই দিয়া আসিতাম, উহারা পাঁচশত টাকার অধিক চাহিল না, আমি কি করিব, পাঁচশত টাকাই দিলাম।" শিষ্যেরা চুপ করিয়া রহিলেন।

ইহার পর পুরী-ধামে গোস্বামী মহাশয় নগদে, কাপড় ও কম্বল ইত্যাদিতে যে সহস্র সহস্র টাকা দান করিয়া-ছিলেন তৎসমুদয় একাকী এই সরলনাথ ভায়া এই প্রকারে যোগাইয়াছিলেন। বিবিধ দোকান হইতে এই প্রকারে টাকা ও বস্ত্রাদি আনিয়া দিয়াছিলেন;

অধিক কি, যাহারা রাস্তায় পয়সা বিক্রয় করে, যাহাদের পূঁজী যৎসামান্য তাহারাও যথাসাধ্য সরলনাথকে টাকা দিয়াছিল। দোকানদারদিগের কাপড় ফুরাইলে তাহারা অর্ডার দিয়া কলিকাতা হইতে কাপড় আনাইয়া কাপড় যোগাইয়াছিল।

ঘটী বিতরণের জন্য গোস্বামী মহাশয়ের কয়েক সহস্র টাকার ঘটীর প্রয়োজন হয়। গোস্বামী মহাশয় সরলনাথকে এই ঘটী আনিবার ভার দেন নাই। অন্য শিষ্যেরা ঘটীর চেষ্টা করায় দোকানদারগণ কেহই ঘটী দিল না; অবশেষে পূরীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু জগচ্চন্দ্র রায় ও মুন্সেফ বাবু কিশোরীমোহন সেন জামিন হইয়া ঘটী আনিয়া দিলেন।

দানকার্য্য শেষ হইলে, দুষ্ট লোকেরা দোকানদার ও পাওনাদারগণকে বলিতে লাগিল "কাহাকে ঋণ দিয়াছ?" "ঋণ দিবার কি যায়গা পাও নাই? ঋণ কিসে আদায় করিবে? অনেক টাকা লাভ করিবার আশায় ধারে জিনিস ও টাকা দিয়াছ; এইবার টের পাইবে; তোমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে; জটীয়া বাবার আছে কি? তাঁহার পূঁজীর মধ্যে একখানি কৌপীন। তোমাদের মত বেকুব কে আছে? টাকার লোভে পূঁজী হারাইলে?"

ধারে জিনিস বিক্রয়ের কথা প্রকাশ হইলে দোকানের

ক্রোধভরে বিক্রেতা শরিককে তিরস্কার করিতে লাগিল। এই বিলাৎবাকী ও এই বিক্রয়ের লাভ লোকসান তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিল ও কেহ বা নিজের অংশ পৃথক করিয়া লইল। বিক্রেতা শরিকের সহিত কোন সংস্রব রাখিল না।

জিনিস বিক্রেতা ও ঋণ দাতাগণের চৈতন্য হইল; তাহারা ভয়বিহ্বলচিত্তে হাহাকার করিতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দলে দলে লোক আসিয়া টাকার তাগাদা করিতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয় সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন "তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, এক মাসের মধ্যে সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া দিব।"

গোস্বামী মহাশয় আশ্বাস দিলেন বটে, কিন্তু পাওনা-দারগণের ভয় ভাবনা দূর হইল না। এক এক দিন এক একটা আওয়াই উঠিতে লাগিল। কোন দিন আওয়াই উঠিল, জটীয়া বাবা পলাইতেছে, কেহ কেহ সাক্ষী দিল "আমি আঠার নালা পার হইতে এই মাত্র দেখিয়া আসি-তেছি।" কোন দিন আওয়াই উঠিল" জটীয়াবাবা পূরীতে নাই, লোকজন লইয়া রাতারাতি পলাইয়া গিয়াছে।" অমনি পাওনাদারগণ সচকিতচিত্তে গোস্বামী মহাশয়ের বাসায় ছুটিয়া আসিতে লাগিল। টাকা কড়ি, জিনিসপত্র বেহাত হইয়াছে, কাযে কাযেই পাওনাদার-গণকে এখন জীবন্মৃত অবস্থায় চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

গোস্বামী মহাশয়ের এই বিপুল ঋণের কথা তাঁহার

শিষ্যমণ্ডলীর শ্রুতিগোচর হইল। গোস্বামী মহাশয়ের রাজা, জমিদার, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও ব্যবসায়ী অনেক ধনাঢ্য শিষ্য আছেন। গুরুগত প্রাণ কতকগুলি শিষ্য গোস্বামী মহাশয়ের এই ঋণ শোধের জন্য ঐ সকল ধনাঢ্য শিষ্যগণের নিকট উপস্থিত হইয়া অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ধনীর টাকা কখনও সৎকার্য্যে ব্যয় হয় না; ইহা মদ্যপান, ব্যভিচার, নাচ-তামাসা ও পরপীড়নে প্রায়ই ব্যয়িত হইয়া থাকে। ক্ষুধার্থের ক্ষুধা নিবারণে, বিবস্ত্রের লজ্জা নিবারণে অথবা বিপন্নের বিপদোদ্ধারে ধনীর অর্থ প্রায়ই ব্যয় হয় না।

ধনাঢ্য শিষ্যগণ,এই গুরুগত প্রাণ গরীব শিষ্যদলকে বলিলেন "গোস্বামী মহাশয়কে ঋণ করিয়া দান করিতে কে বলিয়াছিল?" কেহ বলিলেন "দান করার পূর্ব্বে গোস্বামী মহাশয় কি আমাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?" কেহ বলিলেন "যাহার টাকা নাই তাহার দান করিবার নাম পাড়ান কেন!" যাহার মনে যাহা আসিল সে তাহাই বলিল। ফলতঃ ধনী শিষ্যগণ এক পয়সা দিল না অথচ লম্বা চওড়া বাত শুনাইয়া দিল। যাহাদের অর্থই সর্ব্বস্ব, তাহারা এইরূপ কথা ভিন্ন আর কি বলিবে? তাহারা জানে এজগতে অর্থ ভিন্ন আর কিছুই নাই। অর্থই পরম দেবতা।

যাহা হউক দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শিষ্যগণ গুরুর ঋণ

শোধ করিবার একটা সুযোগ পাইয়া আপনাদিগকে মহা ভাগ্যবান জ্ঞান করিলেন। এই সকল শিষ্য মধ্যে কেহ স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, কেহ জমি, কেহ বাড়ী, কেহবা পুস্করিণী বিক্রয় করিয়া বা বন্ধক দিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। যাহাদের এ সব কিছুই নাই তাহারা ঋণ করিয়া টাকা পাঠাইলেন; আবার কেহ পুস্তকের কপিরাইট পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইলেন তৎ সমুদয় গোস্বামী মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

এই সকল গুরুগত প্রাণ শিষ্যের মণি অর্ডার বা রেজেষ্টরী-ডাকে টাকা পাঠাইবার বিলম্ব সহ্য হইল না। যাহার যতদুর সাধ্য তিনি Teligraphic money-order দ্বারায় গোস্বামী মহাশয়ের নিকট টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। পূরীর পোষ্ট আফিসে মহা হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত হইল। দিবা-রাত্রি কেবল টেলিগ্রাফিক মণি অর্ডার। পোষ্টমাষ্টার কেরাণী ও পিয়ন এই সমস্ত মণি অর্ডার গ্রহণ ও বিলি করিতে অশক্ত হইয়া পড়িলেন। এজন্য পোষ্ট-আফিসের কর্ত্তারা জটীয়াবাবার টেলিগ্রাফিক মণি অর্ডার বিলির জন্য আলাহিদা একটা বিভাগ খুলিয়া দিলেন।

টাকা আমদানি আরম্ভ হইয়াছে; আবার সেই ঋণ-কর্ত্তা ভক্ত সবলনাথের উপর ঋণ শোধের ভার অর্পি-

হইল। সরলনাথের খাতা পত্র হিসাব কিতাব কিছুই নাই, কাহার কাহার নিকট হইতে ঋণ করিয়াছেন,কে কত টাকা পাইবে কিছুই জানা নাই। এক্ষণ ঋণ শোধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রত্যেক দোকানদারের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ভাই কত টাকা পাইবে ?" যে যাহা চাহিল, সরলনাথ তাহাকে তাহাই দিতে লাগিলেন। দোকানদারের খাতাটার পাতা উল্টাইয়াও একবার দেখা হইল না। লোকে বলিতে লাগিল দোকানদারগণ কেহ দেড়গুণ, কেহ দুইগুণ লইতেছে, তাহাতে সরলনাথের ভ্রুক্ষেপ নাই। প্রত্যেক দোকানদার ও পাওনাদারকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের সমস্ত পাওনা মিটা-ইয়া দিয়া আসিলেন।

ঘটী বিক্রেতা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ বাবু জগচ্চন্দ্র রায় ও মুন্সেফ বাবু কিশোরী মোহন সেনকে জামিন লইয়া ঘটী দিয়াছিলেন; এক্ষণ সেই ঘটি বিক্রেতা চোরের মত সেই উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর নিকট টাকার জন্য হাঁটা হাঁটি করিতে লাগিল। সে কোন দিন তাহাদের দেখা পায় না, কোন দিন একজনের দেখা পায় ত আর জনের দেখা পায় না। কোন দিন যদি দেখা পাইল, তাঁহাদের ফুরসুত হইল না। এইরূপে ঘটিওয়ালা মাসাধিক কাল হাঁটাহাঁটি করিয়া হয়রাণ পেসমান হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা দোকানদারকে তাহার খাতাপত্র চালান

ইত্যাদি সহ তলব করিয়া আনাইয়া খরিদেরদর আনিবার খরচা, কসিয়া মাজিয়া টায়ে টায়ে দোকানদারের পাওনাটা মিটাইয়া দিলেন। ঘটিওয়ালা এ-ক্ষেত্রে বড় কিছু লাভ করিতে পারিল না, তবে আসল টাকাটা পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

এই সব ব্যাপার দেখিয়া একদিন গোস্বামী মহাশয়ের কোন শিষ্য গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "সরলনাথ নেহাত নির্ব্বোধ, যে যাহা চাহিল সরলনাথ তাহাকে তাহাই দিয়া আসিল, আর এই ঘটিওয়ালা এত কাল হাঁটাহাঁটি করিয়া মরিল, উপযুক্ত লাভও পাইল না, এ কেমন হইল?" গোস্বামী মহাশয় ইহার উত্তরে বলিলেন "দোকানদারগণ আমাকে বিশ্বাস করিয়া টাকা ও জিনিস যোগাইয়াছিল, তাহাদেরও একটা পুরস্কার আছে; ঘটিওয়ালা আমাকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই, তাহার বিশ্বস্ত কিশোরী বাবু ও জগৎ বাবু, তাহাকে যাহা দিলেন সে তাহাই পাইল।"

অল্প দিন মধ্যে সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়া গেল। গোস্বামী মহাশয় ঋণশোধের সংবাদ পাইয়াও প্রত্যেক দোকানদারকে পুনরায় সুধাইবার জন্য সরলনাথকে প্রেরণ করিলেন। সরলনাথ পুনরায় প্রত্যেক দোকানদারের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া গোস্বামী মহাশয়কে

পুরী অবস্থিতি কালীন গোস্বামী মহাশয় যখন ৺জগন্নাথ দর্শনে মন্দিরে যাইতেন তখন অনেকগুলি টাকা সঙ্গে লইয়া যাইতেন। ঠাকুর দর্শনের পর ফিরিয়া আসিবার কালীন ভিখারিগণ দলে দলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা চাহিত। তিনিও তাহাদিগকে দান করিতেন। এক দিন ঠাকুর দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন এমন সময় ভিখারিগণ ভিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনিও তাহাদিগকে টাকা দিতে লাগিলেন। এক জন ভিখারী আমি পাই নাই বলায় তাহার হাতে একটী টাকা দিলেন, পুনঃ ঐ ব্যক্তি কিছুক্ষণ পরে আমি পাই নাই বলিয়া হাত পাতায় তাহার হাতে দুইটী টাকা দিলেন, সে আবার কিছুক্ষণ পরে আমি পাই নাই বলিয়া হাত পাতায় তাহার হাতে তিন টাকা দিলেন, আবার আমি পাই নাই বলিয়া হাত পাতিলে গোস্বামী মহাশয়ের কোন শিষ্য বলিল "এব্যক্তি বড়ই ধূর্ত্ত, মিছামিছি আমি পাই নাই আমি পাই নাই বলিয়া তিনবার লইয়াছে, আবার আমি পাই নাই বলিয়া হাত পাতিতেছে।" এই কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "আমি সমস্তই জানি জগন্নাথ দেব দান করিতেছেন চুপ কর না," এই কথা বলিয়া গোস্বামী মহাশয় ঐ লোকটার হাতে আবার পাঁচ

বহিয়া যাইতেছে আমরা তাহাতে হাত ধুইয়া পা· হইতেছি।

সংসারী লোকে গোস্বামী মহাশয়ের এই দান-ব্যাপার সমর্থন করিতে পারিতেন না। তাঁহার নীতিশাস্ত্র দেখাইয়া বলিলেন দানের জন্য ঋণ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহার ঋণশোধের সঙ্গতি আছে সে বরং ঋণ করিতে পারে, যাহার সে সঙ্গতি নাই তাহার পক্ষে ঋণ করা অতীব অন্যায়। গোস্বামী মহাশয়ের ঋণ করা উচিত হয় নাই। তাঁহার ঋণ শোধের সঙ্গতি ছিল না। যদি ঋণশোধ না হইত তাহা হইলে পাওনাদারগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আজীবন দুঃখ সাগরে ভাসিত ও গোস্বামী মহাশয়ও নাস্তানাবুদ হইতেন। আর যদিও শিষ্যগণ অতিক্লেশে এই বিপুল ঋণ পরিশোধ করিয়াছিল কিন্তু ইহাতে তাহাদিগকে অনেকটা বেগ পাইতে হইল, অথচ এই দানের দ্বারায় বিশেষ কোন উপকার হইল না। এই বিপুল অর্থ যদি জনসাধারণের কোন হিতকর কার্য্যে ব্যয় হইত তাহা হইলেও দেশের একটা উপকার হইত। এই অর্থ বৃথা নষ্ট করা হইয়াছে।

সংসারী লোকের এই সকল কথায় পাঠক মহাশয়গণের মনে একটা দারুণ খটকা লাগিতে পারে। আপনারা মনে করিতে পারেন গোস্বামী মহাশয় ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া এই দান কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে

গোস্বামী মহাশয় মায়াতীত পুরুষ। মায়াতীত পুরুষের কখনও ভ্রান্তি হইতে পারে না। মায়া সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত করে। গোস্বামী মহাশয়ের বাসনা কামনা কোন প্রকার আসক্তি বা নিজের একটা স্বাধীন ইচ্ছা ছিল না। ভগবান তাঁহাকে যাহা আজ্ঞা করিতেন, অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তিনি তাহাই প্রতিপালন করিতেন। ৺জগন্নাথদেব এই দান করিবার জন্য তাঁহাকে প্রত্যক্ষ আদেশ করিয়াছিলেন। ইষ্টদেবের আজ্ঞা পালনের জন্য তিনি এই দান-কার্য্যে ব্রতী হন। ইহার ভাবীফলের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই। নিজের সন্তানসন্ততি বা পরিবারস্থ লোকের জন্য একটী পয়সাও সঞ্চয় করেন নাই। তাহারা কাল কি খাইবে একবারও ভাবেন নাই, গোস্বামী মহাশয়ের জামাতা বাবু জগদ্বন্ধু মৈত্র পুত্রের জন্য একখানী রেশমী কাপড় খরিদ করিয়া আনায় তিনি ধমক দিয়া বলিয়াছিলেন "এ টাকা কাহার যে তুমি পুত্রের জন্য রেসমী কাপড় খরিদ করিয়া আনিলে?" গোস্বামী মহাশয় বলিলেন এই সমস্ত টাকার মালিক স্বয়ং জগন্নাথ দেব, আর এই দান কার্য্য তাঁহারই কার্য্য; গোস্বামী মহাশয় কেবলমাত্র একটা উপলক্ষই তাঁহার সহিত দানের আর কোন সংস্রব ছিল না।

গোস্বামী মহাশয়ের শাশুড়ী এই দানের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে তিনি বলিয়াছিলেন "

অবিশ্বাসী তাহাদিগকে এইস্থানে থাকিতে নাই। ভগবান দান করিতেছেন আর মানুষ হাহাকার করিতেছে।"

এই দান-ব্যাপারে দোকানদার বা পাওনাদারগণের কোন ক্ষতি হয় নাই, তাহারা লাভবানই হইয়াছিল। যে সমস্ত দোকানদার গোস্বামী মহাশয়কে ঋণ দিয়াছিল সকলেরই আর্থিক উন্নতি হইয়াছে এবং এই উন্নতির মূল যে জটীয়া বাবার কৃপার তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে।

গোস্বামী মহাশয়ের যে সকল শিষ্য তাঁহারা এই বিপুল ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন, তঁহাদেরও কোন ক্ষতি হয় নাই। গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন যাঁহারা তাঁহার এই ঋণ পরিশোধের জন্য টাকা দিবেন, তিনি তাঁহাদের টাকা পরিশোধ করিবেন। যে দিন সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়, তাহার পরদিন গোস্বামী মহাশয় দেহত্যাগ করেন। এখন কেহ কেহ বলিতে পারেন, গোস্বামী মহাশয় যে বলিয়াছিলেন, যাঁহারা ঋণ পরিশোধের জন্য টাকা দিবেন তিনি তাঁহাদের সে টাকা পরিশোধ করিবেন, এ কথাটা স্থির থাকিল কই? আমি এ কথার উত্তরে বলিতেছি, যে সব লোক গোস্বামী মহাশয়ের ঋণ শোধের জন্য টাকা দিয়াছিলেন, গোস্বামী মহাশয় সেই সমস্ত লোকের দেনা প্রচুর রূপে পরিশোধ করিয়াছেন।

দিয়াছিলেন, সেই সমস্ত লোকেই প্রচুর লাভবান হইয়াছিলেন এবং যে যেমন লোক তাহার তেমনি আর্থিক উন্নতি হইয়াছিল। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই আপনারা এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন। স্বনামখ্যাত বাবু মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় দরিদ্রতা প্রযুক্ত পুস্তকের কপিরাইট বিক্রয় করিয়া গোস্বামী মহাশয়কে টাকা দিয়াছিলেন। এই টাকা দেওয়ার পরই তিনি প্রভূত ধনশালী হইয়াছিলেন। আপনারা কদাচ মনে করিবেন না মনোরঞ্জন বাবু কেবল নিজের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় গুণে ধনশালী হইয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে ইহার মূলে গুরুর দান।

এই ঋণ পরিশোধ দ্বারায় শিষ্যগণের আর একটা মহৎ উপকার সংসাধিত হইয়াছে। তাঁহাদের অনেক কর্ম্মক্ষয় হইয়া গিয়াছে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে। পুরীর দেনা ভগবানের নিজের দেনা, যাঁহারা এই দেনা পরিশোধ করিয়াছেন, ভগবান তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত না করিয়া কি থাকিতে পারেন ?

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ মধ্যে যাহারা নিতান্ত হতভাগ্য কেবল তাহারাই এই ঋণ শোধে অগ্রসর হয় নাই। আসল কথা ভগবান কৃপা করিয়া যাঁহার নিকট যাহা লইয়াছেন, কেবল তিনিই তাহা দিতে সমর্থ হইয়াছেন, নতুবা প্রভূত অর্থ থাকিতেও

পারেন নাই। ভগবানের লীলা কে বুঝিবে? বিশ্বাসী-গণের মধ্যে গোস্বামী মহাশয়ের এই দান কোন প্রকারে দূষণীয় হয় নাই।

তৃতীয় কন্যা নবনলিনীর বিবাহ।

গোস্বামী মহাশয় পুরীতে অবস্থিতি কালিন ১৩০৫ সালের ফাল্গুন মাহায়ন্ত বসর প্রাপ্ত সর্বজ্ঞ ব্যাঙড়া-নিবাসী বাবু ত্রৈলোক্যনাথ 'মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র অমরনাথ মিত্রের সহিত আমার তৃতীয় কন্যা নবনলিনী দাসীর বিবাহের সম্বন্ধ হইলে আমি গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলাম। এই পত্রের উত্তরে গোস্বামী মহাশয় লিখিয়া পাঠাইলেন "ত্রৈলোক্য বাবুকে আমি জানি. সে পরিবারে আপনার কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত নয়।"

অমরনাথ পরম বৈষ্ণব, মৎস্য মাংসাহারী নহে, আতপ অন্ন আহার করে, সদাচারী ও হরিপরায়ণ চরিত্রবান যুবক। অমরনাথের স্বভাবও অতি মধুর। আমি অমরনাথের এই সকল গুণের কথার উল্লেখ করিয়া পুনরায় গোস্বামী মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলাম তাহাতে তিনি যেন অনিচ্ছায় উত্তর দিলেন "তবে বিবাহ দিতে পার।"

আমি মোহ মুগ্ধ ;এতদিনেও সদ্‌গুরুর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই নাই। গোস্বামী মহাশয়

তখন অমরনাথের চরিত্র বর্ণন করিয়া আর তাঁহাকে অনুরোধ পত্র লেখা উচিত হয় নাই। সদ্‌গুরু একবার মাত্র ইঙ্গিত করেন, শিষ্য যদি সে কথা প্রতিপালন না করে তাহা হইলে শিষ্যের অভিরুচির উপর শিষ্যকে ছাড়িয়া দেন। শিষ্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না।

গুরুর পত্র পাইয়া তাঁহার অনুমতি হইয়াছে বিবেচনা করিয়া ১৩০৬ সালের আষাঢ় মাহায় নবনলিনীর সহিত অমরনাথের বিবাহ দিলাম। ইহাতেই আমার ভাবী বিপদের বীজ রোপিত হইল। পাঠক মহাশয়গণ এই বিপদের কথা পশ্চাৎ জানিতে পারিবেন।

সরলনাথের পূরী ত্যাগ।

১৩০৪ সাল ২৪শে কার্ত্তিক তারিখে গোস্বামী মহাশয় পুরী রওনা হইলেন। আমি তাঁহার আজ্ঞায় বোলপুরে আসিয়া ওকালতী করিতে লাগিলাম। যদিও গুরুর অদর্শনে কাতর হইয়া পড়িলাম, তথাপি গুরু আজ্ঞা স্মরণ করিয়া ধৈর্য্য সহকারে নাম লইয়া বোলপুরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। গুরু দূরদেশে চলিয়া গিয়াছেন, প্রাণের বন্ধু পণ্ডিত মহাশয় ও সরলনাথ ভায়া বোলপুর ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আমার মনের কষ্ট মনে মনে চাপিয়া রাখিয়া কোন রকমে দিন কাটাইতে লাগিলাম। পণ্ডিত মহাশয় ২।৪ দিন অন্তর পুরী হইতে পত্র লিখিয়া তথাকার বিস্তারিত সংবাদ ও গোস্বামী মহাশয়ের লীলা আমাকে জানাইতে লাগিলেন। এক বৎসরের মধ্যে আর আমার পুরী যাওয়া হইল না। তদপর গোস্বামী মহাশয়কে বিষ-প্রয়োগের সংবাদ পাইয়া বড়ই বিচলিত হইলাম। পুরী যাইবার মনস্থ করিলাম। এমন সময় পণ্ডিত মহাশয়ের পত্রে জ্ঞাত হইলাম বিষ নষ্ট হইয়াছে, গোস্বামী মহাশয়ের দেহ সুস্থ হইয়াছে তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া

যাইবার জন্য ষ্টীমার ভাড়া হইয়াছে তিনি সত্বর কলিকাতায় যাইতেছেন।

পুরী হইতে পণ্ডিত মহাশয় প্রত্যহ টেলিগ্রাম পাঠাইয়া গোস্বামী মহাশয়ের শারীরিক অবস্থা জানাইতে লাগিলেন। ১৩০৬ সালের ২০শে জ্যৈষ্ঠ আমার নিকট টেলিগ্রাম আসিল গোস্বামী মহাশয় ভাল আছেন। পর দিন টেলিগ্রাম পাইলাম গোস্বামী মহাশয় ২২শে তারিখে রাত্রি ৯টার সময় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। আমার সঙ্গে আর দেখা হইল না। আমি তাঁহার দেহ ত্যাগে নিতান্ত শোকাভিভূত হইলাম। এ জীবনে আমার যাহা কিছু সুখ ছিল, তাহা এই খানেই শেষ হইল।

গোস্বামী মহাশয়ের দেহত্যাগের বিবরণ তাঁহার জীবনী লেখকগণ বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন, সে জন্য আমি আর এই ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম না।

পুরীর বিখ্যাত নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর পাহাড়ে গোস্বামী মহাশয়ের দেহ সমাধিস্থ করা হয়। সেই অবধি এই সমাধির সেবা পূজা চলিয়া আসিতেছে। গোস্বামী মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ভক্তিভাজন যোগজীবন গোস্বামী এই সমাধির সেবাইত হইয়া সেবা পূজা চালাইতে লাগিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের আকাশ-বৃত্তি ছিল, ভগবান তাঁহার সমস্ত ভার বহন করিতেন। এখন যোগজীবন সেবাইত

হইয়া অর্থাভাবে পতিত হইলেন। তিনি ঋণ করিবার অভিপ্রায়ে সরলনাথকে ডাকিয়া বলিলেন—

যোগজীবন—পুরীর দোকানদারগণ তোমার পরিচিত ও তোমার বিশ্বাসী, তুমি তাহাদের নিকট হইতে কিছু টাকা ধার করিয়া আনিয়া দাও।

সরলনাথ—আমি টাকা ধার করিতে পারিব না।

যোগজীবন—কেন? তুমি বাবাকে হাজার হাজার টাকা ধার করিয়া আনিয়া দিতে, আর আমাকে সামান্য টাকা ধার করিয়া আনিয়া দিতে পারিবে না?

সরলনাথ—যখন গোস্বামী মহাশয় আমাকে টাকা আনিতে বলিতেন, তখন আমার মনে কোন সংশয়ের উদয় হইত না। আমার মনে হইত যেখানে যাইব সেইখানেই টাকা পাইব। এখন আমার মনে নানা সংশয় উপস্থিত হইতেছে। আমার মনে হইতেছে আমি বিদেশী লোক, আমার চাকরী বা বিষয় সম্পত্তি কিছু নাই, আমি কি বলিয়া লোকের নিকট টাকা ধার চাহিব? আর লোকেই বা আমাকে টাকা ধার দিবে কেন? ইত্যাদি নানারূপ সংশয় হইতেছে। টাকা ধার করা আমার কায নহে; আমি টাকা ধার করিতে পারিব না।

যোগজীবন সরলনাথের এ ইব সরল কথার মর্য্যাদা দিতে পারিলেন না। তিনি সরলনাথের উপর মনে মনে বিরক্ত হইলেন। সরলনাথ যোগজীবনের বিরক্তির ভাব বুঝিতে পারিয়া পুরী পরিত্যাগ করতঃ কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

সরলনাথ কলিকাতা হইতে বোলপুর আসিয়া আমার বাসায় কিছুদিন অবস্থিতি করিলেন। আমি বলিলাম, ভাই তোমার আপনার বলিতে কেহ নাই। তুমি জীবনের শেষ কয়টা দিন এই স্থানেই থাক। যেমন জুটিবে দুই ভাইয়ে তেমনি খাইব। আর কোথায়ও যাইও না। উভয়ে একত্রে সাধন ভজনে আনন্দে কাল-যাপন করিব।

সরলনাথ ভায়া এক স্থানে থাকিতে পারেন না— তিনি কিছুদিন বোলপুরে থাকিয়া আবার অন্যত্র চলিয়া গেলেন। যোগজীবন ভায়ার মৃত্যু হইলে আবার পুরী গিয়া কতক দিন তথায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তদপর নানা স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া এখন আবার পুরীতেই অবস্থিতি করিতেছেন।

তীর্থ-পর্য্যটন।

—:*:—

গোস্বামী মহাশয়ের অভাবে পণ্ডিত মহাশয়, বা সরলনাথ আমার নিকট থাকিলে আমি কতকটা ভাল থাকিতে পারিতাম; কিন্তু ইহাদের সকলের অভাবে, আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল; আমি জীবন্মৃত অবস্থায় একাকী সাধন ভজনে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। ১৩০৬ সালের আশ্বিন মাহায় পূজার ছুটী হইল। বরিশাল জেলার অন্তর্গত ভারুকাটী নারায়ণপুর গ্রাম নিবাসী বাবু চন্দ্রকান্ত দত্ত আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য। গুরু ইহাঁকে তীর্থ পর্য্যটন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। ইহাঁর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে। কায় ক্লেশে সংসার প্রতিপালন করেন।

এই সময় পণ্ডিত মহাশয় গোবিন্দ কুণ্ডে কুটীর বাঁধিয়া মাধুকরী করিয়া দিন যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত দেখা করিবার প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। আমি তাঁহাকে সংবাদ দিয়া বাবু চন্দ্রকান্ত দত্তকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলাম। আমার সঙ্গে আমার মুহুরি তিনকড়ি সরকার, নববিবাহিত জামাতা অমরনাথ মিত্র

তাঁহার গুরু ভগ্নি ও আত্মীয়া নগেন্দ্রবালা সরস্বতী ও তাঁহার স্বামী বাবু খগেন্দ্রনাথ মুস্তফী তীর্থ-পর্য্যটনে চলিলেন।

আমরা প্রথমতঃ গয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে পিতৃলোকের পিণ্ড দান করিয়া, ফল্গুতে বালির পিণ্ড প্রদান করিলাম। তদপর রামগয়ায় গিয়া তথাকার ঠাকুর দর্শন করিলাম। গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্ব জন্মে যে অশ্বত্থ বৃক্ষের ডালে "ওঁ রাম" লিখিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষ দেখিয়া নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিলাম। ডালের লেখা প্রায়ই পুরিয়া গিয়াছে, ভাল করিয়া দেখিলে ডালে যে "ওঁ রাম" লিখিত ছিল তাহা বুঝা যায়।

এই সময় গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ে কঠোর সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় গয়ার জজ কোর্টে ওকালতী কার্য্য করিতেছিলেন। আমরা আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ে গিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। তথায় গোস্বামী মহাশয়ের ভোগ দিয়া সকলে মিলিয়া প্রসাদ পাইলাম।

রঘুবর দাস বাবাজী পূর্ব্বে এই আশ্রমে থাকিতেন, তাঁহার দণ্ডাঘাতে এই আকাশ গঙ্গা পাহাড়ে, পাহাড় ভেদ করিয়া যে জলস্রোত নির্গত হইয়াছিল,সেই স্রোতজল পান

করিলাম ও তথায় স্নান করিলাম। জল সুমিষ্ট ও স্বাস্থ্য-প্রদ। নাতি শীতোষ্ণ। এই আশ্রমের যে গুহায় গোস্বামী মহাশয় বারদিন সমাধি অবস্থায় ছিলেন, সেই গুফাটা দর্শন করিলাম। পাহাড়ের শিখরদেশ যেস্থানে গোস্বামী মহাশয়কে পরমহংসদেব দীক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শিখরদেশে উঠিয়া সেই স্থান দর্শন করিলাম ও তথায় গড়াগড়ি দিলাম।

শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় এই পাহাড়ে একাকী থাকিতেন। তাঁহার অযাচক বৃত্তি। প্রত্যহ ঝরণার জলে ২।৩ বার স্নান। দিবারাত্রি সাধন-ভজনে কালাতিপাত করিতেন। বেলা অপরাহ্নে বরদা বাবুর বাসা হইতে কিছু খাবার আসিত, তিনি তাহাই একবার মাত্র আহার করিতেন। তাঁহার শরীরের জ্যোতিঃ, সাধনের অনুরাগ ও তীব্রতা এবং তন্মধ্যে গুরু শক্তির প্রভাব দেখিয়া আমি পরম পুলকিত হইলাম। তাঁহার বৈরাগ্য ও সাধনে অনুরাগ দেখিয়া আমি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিলাম। প্রাণপণে সাধনভজনে জীবন অতি-বাহিত করিবার জন্য তাঁহাকে উৎসাহিত করিলাম। তিনিও আমাদিগকে পাইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন।

গয়ার দর্শনীয় স্থান সমুহ দেখিয়া বুদ্ধগয়ায় গিয়া বুদ্ধ-দেবের প্রাচীন প্রতিমুর্ত্তি ও মহারাজ অশোকের প্রস্তর নির্ম্মিত বিশাল মন্দির দর্শন করিলাম। যে স্থানে

মহামহিমান্বিত বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থান দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইলাম। এক্ষন আর সে বোধিদ্রুম নাই, একটা নূতন অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিয়াছে মাত্র।

আমরা গয়া হইতে কাশী রওনা হইলাম, এখানে গঙ্গাপুত্রগণের বড়ই অত্যাচার। তাহাদের অত্যাচারে কাশিতে কিছুমাত্র শান্তিলাভ করিতে পারিলাম না। মনিকর্ণিকার স্থান, বাবা বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া, তিন দিন মাত্র কাশী বাস করতঃ শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হইলাম।

পণ্ডিত মহাশয় গোবিন্দকুণ্ডে সাধন-ভজনে কালাতিপাত করিতেছিলেন, আমাদের শ্রীবৃন্দাবন গমনের সংবাদ পাইয়া আমাদের জন্য বাসাভাড়া, চাকর ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া আমাদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমরা শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম।

পণ্ডিত মহাশয় আমার পরম হিতৈষী ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন, আমার ধর্ম্মলাভ হইলেই তাঁহার পরমানন্দ। যদিও এই সময় তাঁহার প্রত্যহ জ্বর হইত, তথাপি তিনি আমাদিগকে এক দণ্ড বিশ্রাম করিতে দিতেন না। প্রত্যহ ভোর বেলায় আমাদিগকে বিছানা হইতে উঠাইয়া আমাদিগকে লইয়া ঠাকুর ও সাধু দর্শনে বহির্গত হইতেন।

যেস্থানে যে ঠাকুর ও সাধু সজ্জন আছেন সকলের নিকট লইয়া গিয়া দর্শন করাইতেন। এই গোবিন্দদেব, এই তাঁহার প্রাচীন ভগ্ন মন্দির, এই গোপীনাথ, এই মদন-মোহন, এই রাধারমণ, এই রাধাদামোদর,এই গোকুলানন্দ, এই শ্যামসুন্দর, এই বঙ্কবিহারী, এই রাধাবল্লভ, এই কিশোরীবল্লভ, এই ভূতেশ্বর মহাদেব-দর্শন কর। পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে শেঠের বাড়ী, লালাবাবুর কুঞ্জ, তাঁহার সমাধি, তানশেনের গুরু হরিদাসের সমাধি, সনাতন গোস্বামীর সমাধি প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত লোকের সমাধি ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান সকল দর্শন করাইলেন। যে যে স্থানে ভেটের বন্দোবস্ত আছে, সেই সেই স্থানে ভেট করাইলেন।

আমাদের কল্যাণের জন্য পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে পঞ্চক্রোশী শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা করাইলেন। বনের অপূর্ব্ব শোভা, বৃক্ষবল্লী দর্শন করিলে বোধ হয় তাহারা যেন হস্ত প্রসারণ করতঃ সাষ্টাঙ্গে ভগবানকে প্রণাম করিতেছে। নির্জ্জন বনমধ্যে ময়ূর সকল কেকারব করিতেছে। আমাদিগকে দেখিয়া তাহারা ও অন্যান্য অনেকগুলি বন্য পক্ষী আমাদের নিকট ছুটিয়া আসিল। পণ্ডিত মহাশয়ের কথায় আমরা ছোলা ভাজা, ভূট্টার খই ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, সেই সমস্ত

খাইতে খাইতে আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেকদূর পর্য্যন্ত আসিতে লাগিল।

রাস্তায় রজের কথা আর কি বলিব? রজ এমন মোলায়েম যে শরীরে লাগিলে শরীর যেন জুড়াইয়া যায়। আমি কতকদূর পর্য্যন্ত যাই, আর পণ্ডিত মহাশয় বলেন এই স্থানে একটা সাষ্টাঙ্গ দাও। এইরূপ মাঝে মাঝে আমাকে সাষ্টাঙ্গ দেওয়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। এই ধীর-সমীর, এই রাধাবাগ, এই রাসস্থলী, এই দাবানল-কুণ্ড, এই ব্রহ্মকুণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া ভগবানের লীলাস্থল সমুহ দর্শন করাইতে লাগিলেন।

রাসস্থলী দেখাইয়া বলিলেন, এই স্থানে একবার গড়াগড়ি দাও। আমি তাঁহার কথায় গড়াগড়ি দিলাম। বনমধ্যে এইরূপে যাইতে যাইতে আমার বুকের উপর কি একটা পড়িয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। আমি তাহা কুড়াইয়া লইয়া দেখিলাম একটী সুন্দর দোনা। ইহা মাকড়শা বা অন্য কোন কীটের তন্তু দ্বারায় নির্ম্মিত হয় নাই, ইহা বৃক্ষের একটি পত্রের দ্বারায় সুনির্ম্মিত, একটি বোঁটা, আমি গোস্বামী মহাশয়ের মুখে দোনার কথা শুনিয়া পূর্ব্বে তাঁহাকে কত বিদ্রূপ করিয়াছিলাম। এক্ষণ গোস্বামী মহাশয়ের কথার সত্যতা প্রমাণ করাইবার জন্য ও আমার দুর্ম্মতি দূর করিবার মানসে ভগবান কৃপা করিয়া আমাকে এই অপূর্ব্ব দোনা দেখাইলেন।

করিলাম, আর কোন দোনা দেখিতে পাইলাম না। এই দোনা দেখিয়া আমার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। আমি—আপনাকে শত শত ধিক্কার দিলাম। রাত্রি ৯টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

যে দিন নিকুঞ্জবন দর্শন করিতে গিয়াছিলাম সেই দিন বেলা ৮ ঘটিকার সময় ময়ুর-মুকুট বাবার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। ইনি চিরকুমার, অনিকেতন, এবং অযাচক। দেহে মালা তিলক ইত্যাদি কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন নাই। ইহাঁর আদৌ কোন বেশ নাই। আহারের কোন চেষ্টা করেন না। কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কিছু দিলে আহার করেন। ইহাঁর শরীর সুদৃঢ়; সর্ব্বদাই পাগলের ন্যায় আপন মনে একাকী নির্জ্জনে গান ও নৃত্য করিতে-ছেন। ইহাঁর মস্তকোপরি সর্ব্বদাই ময়ুরের পাখার একটা মুকুট থাকে এইজন্য ইহাঁকে সকলে ময়ুর-মুকুট বাবা বলে।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন এক দিন ইনি ঠাকুর বঙ্কু-বিহারীর মস্তকে শিখিপুচ্ছ দেখিয়া নিজে শিখিপুচ্ছ ধারণ করিয়াছেন। ইনি আদৌ লবণ খান না। যে দিন ইহাঁর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়; সেই দিন অপরাহ্নে তিনি আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি অযাচক জানিয়া আহারের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন সমস্ত দিন আহার হয় নাই। এই কথা শুনিয়া আমরা

তাঁহাকে আহার করাইলাম। তিনি যৎসামান্য আহার করেন। এই দিন হইতে তিনি প্রত্যহ অপরাহ্নে এক একবার আমাদের বাসায় আসিতেন।

ময়ুর-মুকুট বাবা আমাদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। আমরা যেদিন রাধাকুণ্ড গিয়া অবস্থিতি করি, সেই দিন ঘোর অন্ধকারে রাত্রি ৯টার সময় তিনি রাধাকুণ্ডে আমাদের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "আমরা রাধাকুণ্ডে আসিয়া এখানে অবস্থিতি করিতেছি, আপনি কেমন করিয়া জানিলেন? আর এই ঘোর অন্ধকারে হিংস্র জন্তু সমাকুল অরণ্যের ভিতর দিয়া কি করিয়া আসিলেন?" তিনি হাসিয়া উত্তর দিলেন "এ সব জায়গায় আমার যাতায়াত আছে, আমি এই রাত্রেই ফেরত গিয়া কুসুম-সরোবরে থাকিব।" আমরা তাঁহাকে আহার করাইয়া বিদায় দিলাম। তিনি প্রত্যহই একবার করিয়া আমাদের বাসায় আসিতেন। বহুকাল পরে টের পাইলাম তিনি আমার স্বতীর্থ। গোস্বামী মহাশয় কুম্ভ মেলায় তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনের ও রাধাকুণ্ডের অনেকগুলি তমাল বৃক্ষে শালগ্রাম প্রস্তুত হইতেছে ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইতেছে, পণ্ডিত মহাশয় এই সব আমাকে দেখাইলেন। এই সমস্ত শালগ্রাম ও প্রতিমূর্ত্তিতে কোন কৃত্রিমতা আছে

বলিয়া বোধ হইল না। কালীয়দহের পাহাড়ের যে কদম্ব বৃক্ষ হইতে ভগবান কালীয়দহে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন সেই কদম্ব বৃক্ষ ও কালীয়দহ দেখাইলেন। এই কদম্ব বৃক্ষের গুঁড়ি ও ডালে অনেক গুলি রাধাকৃষ্ণের নাম অঙ্কিত আছে, ইহার মধ্যে কতকগুলি কৃত্রিম বলিয়া বোধ হইল।

এক দিন আমাদিগকে চৌষট্টি মহান্তের সমাধি দর্শন করাইবার জন্য পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। আমরা ঐ সমাধিবাড়ী পৌছিয়া মহান্তগণের সমাধি পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। কোন্ সমাধি কোন্ মহান্তের জানিবার উপায় নাই। সমাধিতে মহান্তের নাম খোদিত নাই, সমাধির লোকেরা তাহা অবগত আছে। সমাধিগুলি দেখিতে দেখিতে, আমি যেমন একটি সমাধির নিকট উপস্থিত হইলাম, অমনি আমার শরীরটা উচ্চৈস্বরে কান্দিয়া উঠিল। চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আমি স্থিরভাবে এই ব্যাপারটা দেখিতে লাগিলাম,কেন এত কান্না কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দেখিলাম এই কান্নার সহিত আমার নিজের কোন সংস্রব নাই, শরীরটা উচ্চৈস্বরে কান্দিতেছে। সকলে চতুষ্পার্শ্বে দাড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছেন।

কিছুকাল পরে কান্নাটাও থামিয়া গেলে পণ্ডিত মহাশয় এই কান্নার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

সমাধি স্থানের লোকদিগের নিকট গিয়া একজন অভিজ্ঞ লোককে ডাকিয়া আনিলেন, সেই লোকটীকে এই সমাধিটী দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এই সমাধিটী কোন্ মহাত্মের?" লোকটী উত্তর করিলেন "এই সমাধি বসু রামানন্দের সমাধি"। তখন এই কান্নার কারণ বুঝা গেল। বসু রামানন্দ আমার পূর্ব্ব পুরুষ, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জনৈক পার্ষদ, বৈষ্ণবগণ ব্রজলীলায় ইহাঁকে চম্পকলতা সখী বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহার বংশধর আমাকে এই শ্রীবৃন্দাবনে তাহার সমাধির নিকট উপস্থিত হইতে দেখিয়া আমাকে জানাইলেন তিনি সিদ্ধ দেহে ভগবানের নিত্য-লীলায় বর্ত্তমান আছেন, এবং তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আমার উপর আছে। আমি ঐ সমাধিতে গড়াগড়ি দিয়া অপর সমাধিগুলি একে একে দেখিতে লাগিলাম।

অধ্যাত্ম জগতের বিচিত্র ব্যাপার; মায়ামুগ্ধ জীব এ জগতের সংবাদ কি প্রকারে জানিবে? আমি এই ব্যাপারে যাহা বুঝিলাম তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রীবৃন্দাবনের যে আমলীতলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বসিয়াছিলেন, পণ্ডিত মহাশয় সেই আমলীতলায় আমাদিগকে লইয়া গেলেন। সেই তেঁতুল গাছের তলাটা একটু বাঁধান আছে। সে স্থানে উপস্থিত হইয়াই উচ্চৈস্বরে কান্দিতে লাগিলাম। কেন কান্দি তাহা বুঝি

না, অথচ কান্না থামাইতে পারি না। আমি কান্না থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম কিন্তু শরীরটা থামে না, ক্রমাগত কান্দিতে থাকে আর চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যায়। একটু স্থির হইলে, শ্রীসনাতন গোস্বামীর সমাধি দেখাইবার জন্য আমাদিগকে তথায় লইয়া গেলেন। আমরা সমাধি দর্শন করিয়া প্রণাম বন্দনা করতঃ বেলা অতিরিক্ত হওয়ায় বাসায় ফিরিলাম।

শ্রীবৃন্দাবনের ব্রহ্মচারীর বাড়ী ও সাজীর বাড়ী প্রভৃতি আর আর সুবিখ্যাত বাড়ী ও ঠাকুর-সেবা দর্শন করতঃ বেল-বনে লক্ষ্মী-ঠাকুরাণি, মান-সরোবরে মানিনী-শ্রীমতীকে দেখিলাম। রাসোৎসব শেষ হইলে আমরা মথুরায় চলিলাম।

মথুরায় তিন দিন থাকিয়া তথাকার সমস্ত সেবা ও দর্শনীয় স্থান সকল দর্শন করিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া বিশ্রামঘাটের আরতি দর্শন করিতে গেলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসবধের পর এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম বিশ্রামঘাট। এই স্থানে প্রত্যহ যমুনামায়ীর আরতি হয়। ইহা একটা দেখিবার জিনিস। দেবালয়ে পঞ্চ প্রদীপে আরতি হইয়া থাকে, এখানে চৌরাশী প্রদীপে আরতি হয়। পূজারী দুই হাতে চৌরাশী প্রদীপের ডাণ্ডা ধরিয়া ভক্তিভরে যমুনামায়ীকে আরতি করিতে-

ছেন, আর সহস্র সহস্র স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা, কেহ পাহাড়ে, কেহ নৌকার উপর দাড়াইয়া, ভক্তির সহিত আরতি দর্শন ও যমুনামায়ীকে প্রদীপ দিতেছেন, এ দৃশ্য দেখিতে বড়ই সুন্দর।

যমুনার কচ্ছপগণকে খাওয়াইবার জন্য অনেকে বুট-ভাজা, ভুট্টার খই যমুনাগর্ভে ছড়াইতেছেন। আমরাও ঐ সকল জিনিস সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। আম-রাও যমুনাতে বুটভাজা ও খই ছড়াইতে লাগিলাম। শত শত কচ্ছপ জলের উপর ভাসিয়া খাইতে লাগিল। একে রাত্রিকাল, তাহাতে গভীর জল, বানরের যাইবার উপায় নাই। কিন্তু বানরগুলা ছাড়িবার পাত্র নহে, তাহারা লাফাইয়া লাফাইয়া ভাসমান কচ্ছপের পৃষ্ঠে বসিয়া বুটভাজা ও খই খাইতে লাগিল। বানরের ভরে যেমনি কচ্ছপটা জলমধ্যে ডুবিয়া যাইতে লাগিল, অমনি বানরগুলা অপর ভাসমান কচ্ছপের পৃষ্ঠে লাফাইয়া গিয়া নদীস্থ বুটভাজা ও খই খাইতে লাগিল। এইরূপে কচ্ছপ ও বানর একত্রে খাইতে লাগিল, দেখিবার তামাসা বটে। আরতি শেষ হইলে আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতে আমরা গোকুল দর্শনার্থ রওনা হইলাম। গোকুল পৌছিয়া নন্দ মহারাজের বাটী, যমলার্জ্জুন ভঙ্গের স্থান, পুতনার দেহ পতনের স্থান ও

অন্যান্য যাবতীয় দর্শনীয় স্থান দর্শন করিয়া অপরাহ্নে মথুরায় ফেরত আসিলাম।

মথুরার যাবদীয় বিগ্রহ ও ভগবানের লীলার স্থান সমূহ দর্শন করিয়া আমরা রাধাকুণ্ড দর্শনার্থ রওনা হইলাম। রাধাকুণ্ডে কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডে স্নান তর্পণ আদি কার্য্য শেষ করতঃ তথাকার যাবদীয় বিগ্রহ দর্শন করিতে লাগিলাম। ব্রজমায়ীদের নিকট মাধুকরী করিলাম।

তাড়াশের প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু বনমালী রায় বাহাদুরের সহিত আলাপ হইল। শুনিয়াছি ইহাঁর নাকি চারি লক্ষ টাকা জমিদারির মুনফা। ইহাঁকে দেখিয়া বড়লোক বলিয়া আদৌ মনে হয় না। ইহাঁর পরিধানে সামান্য মোটা বস্ত্র, হাঁটু পর্য্যন্ত প্রসারিত। হস্তে হরিনামের ঝুলী। বৈষ্ণবের বেশ। ইনি পরম ভাগবত। এতাধিক ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও, ইহার মধ্যে কোন প্রকার অভিমান বা আত্মগৌরব দৃষ্টিগোচর হয় না। জমিদারির অধিকাংশ মুনফা কেবল দেব-সেবা বৈষ্ণব-সেবা ও সাধু কার্য্যে ব্যয় হইয়া থাকে। ইনি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। গোস্বামী-গ্রন্থ সকল ও ভক্তি শাস্ত্রগুলি ছাপাইবার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন। শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ করিবার জন্য যাহাতে লোকে সংস্কৃত অধ্যয়ন করে তজ্জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করিতেছেন।

বাবু বনমালি রায় বাহাদুরের সহিত অনেক আলাপ করিলাম। তিনি আমাদের খুব যত্ন করিলেন। তিনি বলিলেন আমি গৃহস্থাশ্রমে থাকায়, দাদা অত্যন্ত দুঃখিত। তাঁহার ইচ্ছা যে আমি কৌপীন কান্থা লইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই। অনিত্য সংসারের মোহে কেন আবদ্ধ হইয়া থাকি। আমি স্ত্রী পুত্র বিষয় বৈভব সমস্তই পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু প্রাণেশ্বরীর সেবা হইবে না, এই চিন্তাতেই আমাকে আকুল করিয়া ফেলে। আমি কোন রকমেই প্রাণেশ্বরীর সেবা পরিত্যাগ করিতে পারি না।

এখন প্রাণেশ্বরীর বিবরণ জানিবার জন্য পাঠক মহাশয়-গণের কৌতুহল জন্মিতে পারে, একারণ প্রাণেশ্বরীর বিবরণ এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

কোন এক ব্রাহ্মণ পদ্মা নদীতে স্নান করিতেছেন এমন সময় তাঁহার পায়ে কি একটা ঠেকিল। তিনি তাহা উঠাইয়া দেখিলেন একটী সুন্দর শ্রীবিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি। ব্রাহ্মণ ঐ বিগ্রহ বাটীতে আনিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের দ্বারা ভালরূপ সেবা হইবে না ভাবিয়া শ্রীযুত বনমালি রায় বাহাদুরের পূর্ব্ব পুরুষ ঐ বিগ্রহ নিজ বাটীতে আনিয়া সেবা-স্থাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীমতী না থাকায় ভক্ত সেবকের প্রাণের সাধ মিটিল না। তাঁহার ইচ্ছা যে শ্রীকৃষ্ণের

বামে শ্রীমতীকে দেখিয়া চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদন করেন।

এই ভক্তের একটি অষ্টম বর্ষীয় দুহিতা ছিল, তাহার নাম প্রাণেশ্বরী। প্রাণেশ্বরীকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। হটাৎ প্রাণেশ্বরী দারুণ জ্বরে আক্রান্ত হইলেন; তাঁহার বহু চিকিৎসা আরম্ভ হইল,কিন্তু ব্যায়ারাম ভাল হইল না। চিকিৎসকেরা নৈরাশ হইলেন। রাত্রিকালে পিতা স্বপ্নাবস্থায় আদিষ্ট হইলেন "প্রাণেশ্বরীর জীবন রক্ষা হইবে না, তাহার মৃত্যু হইলে তাহার দেহ যেন দাহ করা না হয়। একদিন মৃত দেহ কাপড় ঢাকা দিয়া রাখিতে হইবে, পরদিন যাহা করিবার তাহা করিবে।" পিতা এই স্বপ্ন দেখিয়া প্রাণেশ্বরীর জীবনে নৈরাশ হইলেন। যথাকালে তাহার মৃত্যু হইলে শবদেহ কাপড় ঢাকা দিয়া রাখা হইল। পরদিন পিতা এই কাপড় উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, শব নাই। শবের পরিবর্ত্তে শ্রীমতীর এক সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি।

ভক্ত পিতা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দর্শনে মনে করিলেন স্বয়ং শ্রীমতীই কন্যারূপে তাঁহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ আর ধরে না। তিনি মহাসমারোহে এই প্রতিমূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণের বামে স্থাপন করিলেন, এবং প্রাণেশ্বরী নাম দিলেন। এই অবধি পুরুষানুক্রমে প্রাণেশ্বরীর সেবা পূজা চলিয়া

শ্রীযুক্ত বনমালি রায় বাহাদুর তাড়াশের বাটি ত্যাগ করিয়া রাধাকুণ্ডে বাস করায় প্রাণেশ্বরীকে এই রাধা কুণ্ডে আনিয়া অতি যত্ন সহকারে তাঁহার সেবা চালাইতে- ছেন। আমরা প্রাণেশ্বরীকে দর্শন করিলাম। তাঁহার সম্মুখে ময়নাডালের মিত্র ঠাকুরগণ খুব কীর্ত্তন করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় ভাবাবেশে অনেকক্ষণ নৃত্য করিলেন। তদপর কীর্ত্তন শেষ হইলে আমরা বাসায় ফেরত আসিলাম।

আমরা পরদিন কুসুমসরোবরে গিয়া স্নান তর্পণ আদি কার্য্য শেষ করিয়া হরিদেব দর্শন করিলাম। হরিদেবের চিবুকে একটি অতি উজ্জ্বল মাণিক আছে। মাণিকটি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, ইহার দীপ্তি অতি উজ্জ্বল। ৺ জগন্নাথ দেবের ললাটে যে মাণিক আছে তাহা আয়তনে অনেক বড় হইলেও, ইহার দীপ্তির কাছে সে মাণিকের দীপ্তি কিছুই নহে। মাণিকের আলোকে হরিদেবের গৃহ একেবারে আলোকিত।

পণ্ডিত মহাশয় হরিদেবকে দর্শন করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন; এবং মন্দির মধ্যে আছাড় খাইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সংজ্ঞা লাভ হইলে আমরা গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় রওনা হইলাম।

গিরিগোবর্দ্ধন একটি অনুচ্চ পাহাড়; ইহা দীর্ঘে

হইবে। সমস্ত পাহাড়টি গৈরীক রঙ্গের প্রস্তরে কে যেন নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে। প্রস্তরগুলি সুসজ্জিত, যেন কোন মিস্ত্রি গাঁথনী করিয়া রাখিয়াছে। পাহাড়ের উপর ছোট ছোট বাবলা বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল। অন্য বৃক্ষ বা ঘাস নয়নগোচর হইল না।

পশ্চিম দেশীয় বহু লোক এই গিরিরাজকে সাষ্টাঙ্গ দিতে দিতে পরিক্রমা করিতেছেন। পণ্ডিত মহাশয় এই গিরিগোবর্দ্ধন দর্শন করিয়া যেমন সাষ্টাঙ্গ দিলেন, অমনি আর ভাব সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার ভয়ানক কম্প আরম্ভ হইল। তিনি উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। এবং মূর্চ্ছিত হইয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। তদপর সংজ্ঞা লাভ হইলে চলিতে লাগিলেন। রাখালেরা মাঠে গরু চড়াইতে যাইতেছে, এই সমস্ত গরু দেখিয়া তাঁহার যেমন গোষ্ঠ-লীলা স্মরণ হইল অমনি তিনি আছাড় খাইয়া পড়িলেন। এবং একেবারে সংজ্ঞাহীন হইলেন। তাঁহার ভাবময় দেহে আর ভাব সম্বরণ হয় না। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে সাষ্টাঙ্গ দিতে বলিলেন; আমার ভক্তি না থাকিলেও আমি তাঁহার কথায় মাঝে মাঝে এক একবার সাষ্টাঙ্গ দিয়া চলিতে লাগিলাম। বেলা একটার সময় আমরা গোবিন্দকুণ্ডে উপস্থিত হইলাম।

এই গোবিন্দকুণ্ডের নিকট বাবু বনমালি রায় বাহা-

বান্ধিয়া একাকা নিজ্জনে ভজন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আমরা তাঁহার গোফায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম একটা উচ্চ ভূমির উপর তাঁহার ক্ষুদ্র গোফা। এই গোফা খড় বা পাতার দ্বারায় নির্ম্মিত নহে, কেবল আবুড় খাবুড় দেওয়াল, আর মাটির ছাদ। নিতান্ত সংকীর্ণ। একটি মাত্র লোক কোন রকমে থাকিতে পারে। দরজায় একটা আগোড়ও দেখিলাম না। গোফার সম্মুখে কয়েকটী পিলু ফলের গাছ। বসিবার ভূমি নাই। এই পিলু ফলের গাছের নিম্নে আমরা কিছুক্ষণ উপবেশন করিলাম।

গোবিন্দবাবু আমাদিগকে দেখিয়া গোফা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার গৌরকান্তি, দেখিতে পরম রমণীয়; পরিধানে কৌপীন, অঙ্গে ছিন্ন কাঁথা। তাঁহার পূর্ণ যৌবন, পুঁজীর মধ্যে কেবল একটি গোবর্দ্ধনের মৃন্ময় ভাণ্ড! তাঁহার শুইবার বা বসিবার কোন বিছানা নাই; ধূলায় উপবেশন ও শয়ন। বড় লোকের ছেলে সুবিস্তীর্ণ জমিদারি, ধনৈশ্বর্য্য স্ত্রী পুত্রাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নবীন বয়সে হরি আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইনি একেবারে নিঃসম্বল ও নিঃসঙ্গ। দিনান্তে একবার মধুকরী করিয়া জীবন রক্ষা করেন।

সহোদর বাবু বনমালি রায় বাহাদুর জ্যেষ্ঠের আহার জন্য স্বর্ণথালে বিবিধ উপাদেয় প্রসাদ গোবিন্দবাবুর

নিকট পাঠাইয়া দিতেন। প্রসাদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তিনি কণিকামাত্র গ্রহণ করিয়া সমস্ত ফিরাইয়া দিতেন। তিনি বলিতেন "আমার এই আহার কি শোভা পায়?" জ্যেষ্ঠের একান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া বাবু বনমালি রায় বাহাদুর আর প্রসাদ পাঠাইতেন না।

এই গোবিন্দকুণ্ডের তীরে বৃক্ষতলে মাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞীকে গোপাল দুগ্ধ খাওয়াইয়াছিলেন। আমরা গোবিন্দবাবুর নিকট বিদায় হইয়া যে স্থানে গোপাল পুরী গোসাইকে দুগ্ধ খাওয়াইয়াছিলেন, সেই স্থান আসিয়া দর্শন করিলাম। ঐ স্থানটি বান্ধান আছে। ঐ স্থানে আমি সাষ্টাঙ্গ দিলাম।

এই গোবিন্দকুণ্ডের সামান্য দূরে পণ্ডিত মহাশয় কুটীর বান্ধিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন; আমরা তাঁহার সেই কুটীর দর্শন করিলাম। নিকটে ঠাকুর বাড়ি। আমরা গোবিন্দ কুণ্ডে স্নানাদি করিয়া ঐ ঠাকুর বাড়ীতে প্রসাদ পাইলাম। ব্রজভূমে জীবহিংসা নাই। গোবিন্দকুণ্ডের কচ্ছপ ও মৎস্য ঘাটে আসিয়া আমাদের হাতে আহার করিতে লাগিল। তাহারা একেবারে নিঃশঙ্ক।

আমরা গিরিগোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতে করিতে যে স্থানে মাধবেন্দ্রপুরীর গোপালের সেবা প্রতিষ্ঠিত আছে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। "গোবর্দ্ধনে না উঠিবে ... গোপাল" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্য স্মরণ করিয়া

আমরা গোপাল দর্শন করিতে আর গোবর্দ্ধনে উঠিলাম না। গোবর্দ্ধনের পাদদেশ হইতে গোপালকে প্রণাম করিয়া রওনা হইলাম। তৎপর মুখারবিন্দ দর্শন করিলাম। ইহা গোবর্দ্ধনের শ্রীমুখ। এই স্থানে প্রত্যহ গোবর্দ্ধনের পূজা হয় এবং সময়ে সময়ে উৎসব হইয়া থাকে। ইহার পর নানা রমণীয় স্থান ও সেবা দর্শন করিয়া আমরা রাধাকুণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এই রাধাকুণ্ডে কোন ভক্ত বৈষ্ণব বৃক্ষ-দেহ ধারণ করিয়া বহুকাল হইতে বাস করিতেছিলেন। রাধাকুণ্ড পৌঁছিবার অন্যূন এক মাস পূর্ব্বে ঐ বৃক্ষ দেহধারী বৈষ্ণব স্বপ্নযোগে রাধাকুণ্ডবাসী জনৈক বৈষ্ণবকে বলেন যে তিনি অমুক তারিখে বৃক্ষ-দেহ পরিত্যাগ করিবেন; রাধাকুণ্ডবাসী বৈষ্ণবগণ যেন তাঁহার মহোৎসব করেন।

কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বিশ্বাস করিল না। এই সম্বন্ধে বৈষ্ণব-গণের মধ্যে অনেক আলোচনা হইতে লাগিল। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঝড় নাই, বাতাস নাই নির্দ্দিষ্ট দিনের নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৃক্ষটীর স্কন্ধদেশ হঠাৎ মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বৈষ্ণবগণ আশ্চর্য্য হইয়া

বৃক্ষতলে মাহা সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং তথায় মহোৎসব করিলেন।

আমরা রাধাকুণ্ডের ঐ বৃক্ষটি একদিন দেখিতে গেলাম। দেখিলাম বৃক্ষটির স্কন্ধদেশ হইতে বৃহৎ বৃহৎ ডালগুলি চারিদিকে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে গুড়ীটি প্রায় ৭ হাত খাড়া আছে। গুড়ী ডাল সমস্ত শুকাইয়াছে। কেহ ডালপালা স্পর্শও করে নাই; যেমন পড়িয়াছিল ঠিক তেমনি পড়িয়া আছে।

আমরা ঐ বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলাম। তখন আমার মনে হইল, গোস্বামী মহাশয় যে বলিয়াছিলেন, অনেক মহাত্মা বৃক্ষদেহ ধারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেছেন, এই ঘটনা তাহার একটা উজ্জ্বল প্রমাণ। আমরা নিতান্ত অজ্ঞান, অনন্ত দেবের অনন্ত সৃষ্টির গুঢ় ব্যাপার আমরা কি বুঝিব? যাহা আমরা বুঝিতে পারি না, তাহাই কিছু নয় বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকি।

রাধাকুণ্ডে দাস গোস্বামীর সমাধি, জাহ্নবা ঠাকুরাণির সমাধি মণিহারী কুণ্ড ইত্যাদি ঐ স্থানের যাবতীয় দর্শনীয় স্থান দর্শন করিয়া আমরা শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলাম। শিরোমণি মহাশয়ের ঠোরে যে বৃক্ষ সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিয়াছিল সেই বৃক্ষ দর্শন করিলাম।

[illegible] বিদেশে থাকায় অনিয়মে আমার সঙ্গী

তিনকড়ি সরকার ও নগেন্দ্র-বালার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল একারণ আর তীর্থ-পর্য্যটনে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া অনুচিত মনে করিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া সকলে মিলিয়া বোলপুর ফিরিয়া আসিলাম।

নামের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন।

শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে বোলপুর আসিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত কিছুকাল সাধনভজনে পরমানন্দে কাল-যাপন করিতে লাগিলাম। বাবু চন্দ্রকান্ত দত্ত মাসাবধি বোলপুরে থাকিয়া আপন বাসা বরিশালে রওনা হইলেন। পণ্ডিত মহাশয় আরও কিছুকাল এই স্থানে থাকিয়া গুরুর সমাধিস্থান পুরী মোকামে রওনা হইলেন। আবার আমি একাকী বিষণ্ণ অন্তরে বোলপুরে কাটাইতে লাগিলাম, দেখিলাম পৃথিবীর বন্ধুতা অকিঞ্চিৎকর। বন্ধুবর কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় দূরদেশে থাকিলেন। অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নলহাটিতে চলিয়া গেলেন, পণ্ডিত মহাশয় পুরীতে থাকিলেন, সরলনাথ বোলপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি যে একাকী, সেই একাকী, লাভের মধ্যে বিরহ জনিত ক্লেশ। এখন মনে করিলাম, যদি কাহারও সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিতে হয় তবে গুরুদত্ত নামের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করাই কর্ত্তব্য। এই নাম সুখের সুখী, আর দুঃখের দুঃখী। নিতান্ত ক্লেশের সময় এই নাম আপনা হইতেই প্রাণের

পারে না। যতক্ষণ দুঃখ যন্ত্রণা থাকিবে এক দণ্ডও কাছ-ছাড়া হইবে না। আবার সুখের সময় আমাকে লইয়া কত আনন্দ করে।

আমি সংসারের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে দেখিলাম কেবল স্বার্থের ভালবাসা, স্বার্থের একটু হানি হইলে আর রক্ষা নাই। ধর্ম্ম বন্ধুগণের মধ্যে যোগ বিয়োগ অবশ্য-স্থাবী। সংযোগে কিছু আনন্দ বটে কিন্তু বিয়োগে বড় ক্লেশ, এই সকল ভাবিয়া আমি নামের সঙ্গেই বন্ধুত পাতাইলাম। নামকে বলিলাম সব ছাড়িয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম,দেখিও ধর্ম্মরক্ষা করিও আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমার অপরাধ লইও না, আমার শত অপ-রাধ তোমায় ক্ষমা করিতে হইবে। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। দোষ করিলে এক আধবার ভ্রুকুটী করে বটে, কিন্তু প্রাণের টানটা কিছুতেই যায় না। আমি নামের সহিত বন্ধুতা সংস্থাপন করায় নামও আমাকে যথেষ্ট ভালবাসিতে লাগিলেন। আমি নাম লইয়া বোলপুরে পড়িয়া রহিলাম। নামের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন অবধি নামের অনেক খেলা দেখিলাম। তাহার স্বভাবটা বড় চঞ্চল, সে পরের অভিমান দেখিতে পারে না কিন্তু নিজে নিতান্ত অভিমানী। সে আমার বশে আসে না আমাকে তাহার বশীভূত করিতে চায়। একটু ত্রুটী হইলে আর রক্ষা নাই।

আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কত সাধ্য-সাধনা, কত হাতে ধরা, পায়ে পড়া, নাক খপ্তা, কান খপ্তা দিয়া ফিরাইয়া আনিতে হয়। আমি তাহাকে বলি সামান্য ক্রটীতে এত রাগ করিলে চলিবে কেন? এই কি তোমার ভাল বাসা?

ক্রটীর মধ্যে সে সহস্র ক্রটী মাপ করিতে পারে কিন্তু মন মধ্যে একটু অহঙ্কার, একটু অভিমান প্রতিষ্ঠা বাজে কথা, পর নিন্দা, তাস পাসা ইত্যাদি খেলা ধূলা করিলে আর রক্ষা নাই। মেলার স্থানে দেখিতে পাইলেই আমাকে ভ্রুকুটি করিয়া চলিয়া যায়। নামের সহিত ভালবাসা পাতাইয়া মহাবিপদে পড়িলাম। স্বভাব দোষে তাহার নিকট নানা ক্রটী করিয়া ফেলি আর তাহার নিকট তাড়না ও ভৎর্সনা খাই। আমাকে প্রতিনিয়ত তাহার সাধ্য সাধনা করিতে হয়।

নাম বড় আদর ভালবাসে, তাহাকে আদর যত্ন করিতে পারিলে সে আর কাছ ছাড়া হয় না। আমাকে লইয়া যথেষ্ট আনন্দ করিতে থাকে। আমাকে বলে যদি "আমাকে চাও তবে আর সব পরিত্যাগ কর" "শ্যামও রাখিবে কুল ও রাখিবে" "তাহা হইবে না," সংসারের "মায়া মমতা কাটাও সর্ব্ব প্রকার আসক্তি পরিত্যাগ কর, তবে আমার আশা করিও, যে স্থানে ঘোর সাংসারিতা আমি সে স্থলে থাকি না।"

আমি নামের কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলাম সংসারের মায়া মমতা ও বিবিধ আসক্তি আমার পরিত্যাগ করিবার সামর্থ নাই, আমি যখন তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি তখন তুমি আমার সহায় হইয়া সংসারের মায়া মমতা ও বিবিধ আসক্তি দূর করিয়া দাও; সাধূ মুখে শুনিয়াছি তুমি সর্ব্বশক্তিমান। তোমার শক্তি ব্যতীত আমার কি সাধ্য আছে যে সামান্য একটি প্রকৃতিকে দমন করি, আমি সাধূ মুখে তোমার অনেক গুণের কথা শুনিয়াছি, তুমি লোহাকে সোণা করিতে পার, অন্ধকারে আলো করিতে পার, তাই তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি এখন যাহা করিবার তাহাই কর; তুমি ভিন্ন আর আমার গত্যন্তর নাই।

অনেককে দেখিলাম প্রবল বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রী, পুত্র, ঘর, বাড়ী, বিষয়, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন হয়; আবার কিছু কাল পরে হয় সংসারে ফিরিয়া আসে নতুবা একটা নূতন সংসার পাতাইয়া বসে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে কর্ম্ম থাকিতে কর্ম্ম ত্যাগ। ইহ সংসারে কর্ম্ম আছে কি না এইটী তলাইয়া না বুঝিয়া মানুষ শ্মশান বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হয়। গুরুদেহে বর্ত্তমান নাই, তাঁহার নিকট কোন উপদেশ পাইবার যো নাই, আমি নিজের অবস্থা নিজে বুঝি না একারণ আমি আমার জীবনের

সমস্ত ভার এই নামের উপরে অর্পণ করিলাম। নামকে বলিলাম আমাকে যাহা করিবার তাহা করিয়া লও; মারিতে হয় মার, রাখিতে হয় রাখ।

গুরু দত্ত নামের শরণাপন্ন হওয়ায় তিনি আমাকে যথেষ্ট কৃপা করিতে লাগিলেন। চৌষট্টী অঙ্গ ভক্তি যাজন মধ্যে এই নামের নিকট আর সমস্তই অঙ্গ অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে লাগিল। শাস্ত্র পাঠ দেবার্চ্চনা, তীর্থ পর্য্যটন ব্রত নিয়মাদির সর্ব্ববিধ ভক্তি অঙ্গ যাজন পরিত্যাগ করিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, যতক্ষ ণ এই সব লইয়া থাকিব ততক্ষণ নাম করিলে আমার বিশেষ উপকার হইবে। নাম ত্যাগ করিয়া এই সমস্ত ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া মূঢ়ের কার্য্য। যাহারা নাম করিতে অসমর্থ তাহাদের এই সব লইয়া কালক্ষেপণ করা উচিত। নতুবা জল্পনা কল্পনা দুর্ব্বুদ্ধি তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে।

আমি বুঝিলাম যে সমস্ত কর্ম্ম আমার নামের অন্তরায় তাহা আমার পক্ষে পরিত্যজ্য, আর যাহা অনুকূল তাহাই আচরনীয়। শাস্ত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে, শাস্ত্র পাঠ না করিলে নিজের ত্রুটী দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রবল মায়া মানুষকে তাহার ত্রুটী দেখিতে দেয় না; আবার সময়ে সময়ে দোষগুলি গুণরূপে ব্যাখ্যা করে। যখন নিজের দোষ আর দোষ বলিয়া মনে হয় না তখন

তাহার প্রতিকারের আর উপায় থাকে না। শাস্ত্র এই সমস্ত দোষ তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দেয়।

শাস্ত্র পাঠে আর একটা উপকারিতা আছে, ইহাতে ভগবানের গুণ ও লীলা বর্ণিত থাকায় ইহা শ্রবণ করিতে করিতে চিত্ত ভগবানের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। ভগবানের গুণ শ্রবণ করিলে চিত্ত বিমোহিত হয়। তাহাতে গুরু শক্তি জাগ্রত হইয়া শ্রবণ করিলে আনন্দপাথারে ভাসায়। গুরুশক্তি জাগ্রত হইলে শরীরের আত্মার ময়লা নষ্ট হইতে থাকে।

শাস্ত্র পাঠের এত উপকারিতা থাকিতেও নাম বাদ করিয়া শাস্ত্র পাঠ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইত না। অন্যে শাস্ত্র পাঠ বা গান-কীর্ত্তন করিত, আমি তাহাই বসিয়া শুনিতাম ও নাম সাধনে প্রবৃত্ত থাকিতাম, এসম্বন্ধে কালিকৃষ্ণ ভায়াই আমার অধিক উপকার করিতেন। তিনি প্রত্যহ সংকীর্ত্তন ও শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমাকে শুনাইতেন।

আমি সংসারী লোক। সংসারের কাযকর্ম্ম না করিলে চলে না। অথচ নাম পরিত্যাগ করিয়া কায করিতে প্রবৃত্তি হয় না। নিতান্ত দায়ে পড়িয়া নাম বন্ধ করিয়া যখন সংসারের কাযে প্রবৃত্ত হইতাম তখন ভয়ে ভয়ে নামের নিকট অনুমতি চাহিতাম। নাম কিন্তু এমনি নিষ্ঠুর যে তিনি আমার অবস্থা না দেখিয়া আমাকে একে-

বারে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন, সাধ্য সাধনা করিলেও আর তাহার দেখা পাইতাম না। নাম কাহারও বশ নহে, তাহার নিকট জোর জুলুম থাকে না। অধিক তোসামোদ ও মিনতি করিলে, তবে দেখা দিতেন।

নামের ভয়ে সংসারের দিকে মনোনিবেশ করিতে পারিলাম না; কাযে কাযেই সংসারটা ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে তিনি আমাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিলেন।

আমি যতই নাম সাধন করিতে লাগিলাম, আমার মধ্যে ততই বিষয় কর্ম্মে ঔদাসীন্য, কায কর্ম্মে নিশ্চেষ্টতা, এবং মত্ততা উপস্থিত হইতে লাগিল। দেখিলাম নাম (stimulent) উত্তেজক, রোগনাশক, স্বাস্থ্যপ্রদ ও আনন্দ দায়ক। নাম বাদ হইলেই ব্যাকুলতা উপস্থিত হইতে লাগিল। নামের প্রতি মনের একটা আকর্ষণ জন্মিল। পূর্ব্বে নাম করা একটা দুরূহ ব্যাপার ছিল, ক্রমে নাম ছাড়া দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল।

সাধন পন্থায় নামের আরও অনেক গুণ দেখিতে লাগিলাম। নাম দুষ্প্রবৃত্তির দমনকারী, সৎপ্রবৃত্তির পরিবর্দ্ধক; ইহা অভিমান অহঙ্কার নষ্ট করিয়া মানুষকে দীনহীন কাঙ্গাল করিয়া ফেলে। কৃপণকে দাতা করে। নির্দ্দয়কে দয়ালু করে। পরদুঃখে কাতরতা আনিয়া দেয়। পরকে সুখী করিবার ইচ্ছা বলবতী করে।

পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরের কুৎসায় অপ্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয়। নাম সর্ব্বপ্রকার স্বার্থের বিনাশ করে। নামে বাসনা লয় হয়; মিথ্যা কল্পনা তিরোহিত হয়। অধিক কি মানুষকে ভগবানের চরণে অর্পণ করিবার উপযোগী করিবার জন্য মানুষকে নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলে। নামের গুণের কথা আমি ক্ষুদ্র কীট হইয়া কি বলিব শ্রীমহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

"চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপনং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যা-বধূ জীবনম।
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

যাহা মানস দর্পনের মালিন্য দূর করে, যাহা সংসার-রূপ ভীষণ দাবানল নির্ব্বাপিত করে, যাহা পরম মঙ্গল রূপ কুমুদের সম্বন্ধে জ্যোৎস্না বিতরণ করে, যাহা সুখ-সাগর পরিবর্দ্ধন করে, যাহা পদে পদে পূর্ণ অমৃতের ন্যায় আস্বাদ প্রদান করে, যাহা আত্মাকে প্রেম সাগরে অবগাহন করায় সেই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন জয় যুক্ত হউক।

আবার তিনি দৈন্য করিয়া বলিয়াছেন;—

নান্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্ব-শক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশ মিহাজনি নানুরাগঃ ॥

হে ভগবান, মানুষের রুচি অনুসারে বহু নাম প্রচার করিয়াছ, এবং তাহাতে তোমার নিজের সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ, নাম লইবার কালাকালও নাই কিন্তু আমার এমনি দুর্দ্দৈব, যে এমন নামে অনুরাগ হইল না।

যে নামের এত গুণ আমি তাহার শরণাপন্ন হইব না ত আর কাহার শরণাপন্ন হইব? এই ভাবিয়া এক মাত্র নামকে অবলম্বন করিয়া বোলপুরে একাকী কাল-যাপন করিতে লাগিলাম।

পুরী গমন।

১৩০৭ সাল জ্যৈষ্ঠ মাস, পুরীধামে গোস্বামী-মহাশয়ের তিরোভাবের উৎসব হইবে। আমি এই সংবাদ পাইয়া কালিকৃষ্ণ সরকারকে সঙ্গে লইয়া পুরী রওনা হইলাম, তখন হাবড়া হইতে পুরী পর্য্যন্ত রেল-রাস্তা খোলে নাই। আমরা কলিকাতায় গিয়া বেলা ৮ ঘটিকার সময় কয়লা ঘাটে ষ্টীমারে উঠিলাম, বেলা ২টার সময় আমাদিগেকে কোলা ঘাটে নামাইয়া দিল, আমরা বেলা অবসানে আবার ট্রেণে উঠিয়া পরদিন প্রাতে পুরী পৌঁছিলাম।

গোস্বামী মহাশয় নীলমণি বর্ম্মাণের যে বাড়িতে ছিলেন; আমরা সেই বাড়িতে গিয়া থাকিলাম। গোস্বামী মহাশয়ের পাণ্ডা হরেকৃষ্ণ খুঁঠিয়াকে পাণ্ডা করিয়া ৺ জগন্নাথ দর্শন, পঞ্চ তীর্থে শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্য নির্ব্বাহ করিলাম। তৎপরে ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া তীর্থের আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিলাম। আমাদের পৈত্রিক পাণ্ডা সেই ভুবনমিশ্র বিষপ্রয়োগ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় তাহার বংশধরগণকে আর পাণ্ডা করিলাম না।

নীলমণি বর্ম্মাণের সেই ভাড়াটীয়া বাড়ির যে

স্থানে গোস্বামী মহাশয় থাকিতেন ঠিক সেই স্থানেই তাঁহার আসন রক্ষিত হইয়াছিল। তিনি দেহে বর্ত্তমান থাকা সময়ে যে ভাবে তাঁহার সেবা হইত ঠিক সেই ভাবে এই আসনের সেবা হইয়া থাকে, নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর—ভাগের ভূমিতে গোস্বামী মহাশয়ের দেহ সমাহিত হইয়াছিল। এই সময় সেই সমাধির উপর কেবল মাত্র তালপাতার টাইট ছিল।

এই সমাধির স্থানের একটি ক্ষুদ্র কুটীরে পণ্ডিত মহাশয় থাকিতেন ও সমাধির সেবা পূজা করিতেন। সমাধির উপরে পাঁচহাত পরিমাণ ইটের গাঁথনীর বেদী এই বেদীর উপরে এক থানি গেরুয়া কাপড় বিস্তৃত থাকিত। আমি সমাধিস্থান দর্শন মানসে সমাধি-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাহা পরিক্রমা করিতে আরম্ভ করিলাম। যে বিমানে গোস্বামী মহাশয়ের মৃতদেহ এই সমাধি-ক্ষেত্রে আনা হইয়াছিল পরিক্রমা করিতে করিতে সেই বিমান আমার দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় আমার দেহটা উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সে কান্না আর কিছুতে থামে না। আমি থামাইবার অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই থামাইতে পারিলাম না। দেখিলাম আমার সহিত এই কান্নার কোন সংশ্রব নাই দেহটা কাঁদিতেছে, আমি স্থির হইয়া দেখিতেছি মাত্র, কান্না আমাকে স্পর্শ করিতেছে না। কিছুক্ষণ পরেও আমাকে

আপনা আপনি থামিয়া গেল। যাহাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার হয় নাই, যাহারা ভগবত শক্তির আশ্রিত নহে তাহাদের এরূপ কান্না হয় না। এই জন্য কান্নায় আমি ও আমার দেহ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহা বেশ অনুভব করা যায়।

সমাধি বেদীর পাঁচ হাত গাঁথনির উপর গোস্বামী মহাশয়ের দেহের একটি অবিকল চিত্র পড়িয়াছিল। পরিক্রমা শেষ হইলে পণ্ডিত মহাশয় বেদীর উপরিস্থিত গেরুয়া বসন উন্মোচন করিয়া আমাকে গোস্বামী মহাশয়ের দেহের চিত্রটী দেখাইলেন। তিনি সমাধিমধ্যে যে ভাবে শায়িত হন ঠিক সেই ভাবে চিত্রটী উঠিয়াছে। সেই হাত, সেই পা, সেই উদর, সে মুখমণ্ডল, সেই জটা, সেই গোঁফ, সেই দাড়ি; সমস্তই পরিষ্কার রূপে দেখা যায়।

এই বেদীটি মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা বান্ধাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। পাছে গোস্বামী মহাশয়ের এই চিত্রটি নষ্ট হইয়া যায় এই আশঙ্কায় কেহ কেহ আপত্তি করায় বেদিটি মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারায় বান্ধান হয় নাই। আমি বলিলাম যদি পাঁচ হাত ইটের গাঁথনী ভেদ করিয়া চিত্র উঠিতে পারে তাহা হইলে এই মর্ম্মর প্রস্তর ভেদ করিয়া কি চিত্র উঠিতে পারিবে না। যাহা হউক অধিকাংশ লোকের অমত হওয়ায় সমাধির বেদী আর মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারায়

যে বস্ত্র দ্বারা সমাধির বেদী আবৃত থাকিত সেই বস্ত্রে প্রায়ই ভগবানের নাম, তাঁহার পদচিহ্ন পড়িত। কলিকাতায় থাকিতে গোস্বামী মহাশয়ের দেহ আসন ও বস্ত্রে যেরূপ ভগবানের নাম পদচিহ্ন বা মূর্ত্তি পড়িতে দেখিতাম এই বস্ত্রেও ঠিক তদ্রূপ নাম পদচিহ্ন মূর্ত্তি পড়িতে দেখিলাম, ইহাতে আমার মনে হইতে লাগিল গোস্বামী মহাশয় যেন বলিতেছেন হতাশ হইও না, আমি বর্ত্তমান আছি।

এই সময় পণ্ডিত মহাশয়ের একটু একটু জ্বর হইত, তাহার শরীরটা ভাল ছিল না। তিনি আমাকে পাইয়া পরম পুলকিত হইয়াছিলেন। প্রত্যহ আমাকে লইয়া সমুদ্রস্নানে যাইতেন, তথায় তর্পণ আদি করাইতেন। ৺জগন্নাথ দেব দর্শন করাইতেন। পুরীর তীর্থ মার্কণ্ড সরোবর, শ্বেত, গঙ্গা, চক্রতীর্থ, সিদ্ধবকুল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর গম্ভীরা, হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, টোটা গোপীনাথ, লোকনাথ, গুণ্ডিচা মন্দির, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব ইত্যাদি একে একে দেখাইতেন। কিসে আমার কল্যাণ হইবে সর্ব্বদা এই চিন্তাই করিতেন। আমি তাঁহার সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতাম।

পুরীর কোন পাণ্ডা একটী ক্ষুদ্র কাঠের মন্দির সহ গোস্বামী মহাশয়কে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার ক্ষুদ্র বিগ্রহ উপহার প্রদান করেন। আর এক জন ব্রাহ্মণ

ঐরূপ মন্দির সহ একটী শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুদ্র বিগ্রহ গোস্বামী মহাশয়কে প্রদান করেন। গোস্বামী মহাশয় প্রত্যহ এই বিগ্রহ গুলির পূজা করিতেন। তিনি বলিতেন "যে বিগ্রহ আমার সহিত কথা কয় না, আমি তাহার মাথায় তুলসী প্রদান করি না।" এই বিগ্রহ গুলির সহিত গোস্বামী মহাশয়ের কথাবার্ত্তা চলিত।

গোস্বামী মহাশয়ের তিরোভাবের পর যে স্থানে গোস্বামী মহাশয়ের আসন রক্ষিত হইত এই বিগ্রহ গুলি সেই ক্ষুদ্র কাষ্ঠে নির্ম্মিত মন্দির মধ্যে রক্ষিত হইত। ঐ মন্দিরের কপাট বন্ধ থাকায়, কেহ দেখিতে পাইত না। সারদা নিভৃতে ঐ বিগ্রহগুলির পূজা করিতেন।

ঐ বিগ্রহ দেখিবার আমার প্রবল ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। উৎসবের দিন ভক্তিভাজন বাবু কুঞ্জলাল নাগ ঐ আসনের নিকট সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, ভক্ত শ্রীধর ঘোষ ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া যেমন পড়িলেন অমনি তাঁহার হাত ঠেকিয়া দুইটী মন্দিরেরই কপাট খুলিয়া গেল, আমি বিগ্রহ গুলিকে দর্শন করিলাম। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেব আমার বাসনা পূর্ণ করিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের আসনে ভোগ দেওয়া হইলে, আসনে তাঁহার সুন্দর পদচিহ্ন পড়িল। আমি এই সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। এই আশ্চর্য্য ঘটনার দ্বারায় বেশ বুঝা গেল গোস্বামী মহাশয়

বর্ত্তমান, তিনি সেবা পূজা ভোগ সমস্তই গ্রহণ করিতেছেন।

কয়েক দিন পণ্ডিত মহাশয়ের পবিত্র সহবাসে কাল-যাপন করিয়া আমরা বোলপুর ফেরত আসিলাম।

ললিত বাবুর আগমন।

পুরীধাম হইতে বোলপুরে ফেরত আসিবার অল্প দিন পরে বাবু ললিতকুমার গুহ ঠাকুরতা বোলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি জেলা বরিশালের অন্তর্গত বানরীপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ গুহ ঠাকুরতা বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার বয়স তখন আন্দাজ ৪০ বৎসর হইবে। ইনি গোস্বামী মহাশয়ের এক জন শিষ্য। ইঁহার বাটিতে মাতা, স্ত্রী, শিশু কন্যা ও ভ্রাতা বর্ত্তমান। প্রবল বৈরাগ্য ও ধর্ম্মানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। সংসারের নানা কোলাহল, ভজন সাধনের বহুবিঘ্ন, এজন্য দূরে নির্জ্জনে থাকিয়া ভজন-সাধন করিবেন এই অভিপ্রায়ে তাঁহার বোলপুরে আসা।

ললিত বাবু যখন বোলপুরে আসিলেন তখন তিনি মৌনব্রতধারী। কাহারও সহিত কোন কথাবার্ত্তা কহিতেন না। নিতান্ত আবশ্যকীয় কথা হইলে পেন্সিলে লিখিয়া দিতেন। আমি তাহাকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম।

আমি একজন উকিল, বাসায় সর্ব্বদা মক্কেলের

যাতায়াত, নানা কোলাহল, একারণ ললিত বাবুর থাকিবার জন্য নিকটস্থ আমার আর একটা বাসায় * তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলাম। ললিত বাবু ঐ বাসায় আপন আসন করিলেন। আমার বাসায় আহারাদি করিতে লাগিলেন, তিনি মৌনী, কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা নাই, কঠোর সাধনে নিমগ্ন থাকিতেন। পাছে তাঁহার চিত্তের বিক্ষেপ হয় এজন্য আমি কাহাকেও তাঁহার নিকট যাইতে দিতাম না। তিনি আপন বাটির‌ও কোন খবর লইতেন না।

কিছুকাল এই ভাবে কাটিয়া গেলে তাঁহার সর্দ্দি হইয়া এ্যাকিউট্ ব্রংকাইটিস্ (Acute Bronchitis) রোগ দেখা দিল, আমি ভীত হইয়া ডাক্তার ডাকাইলাম, কিন্তু ললিত বাবু কিছুতেই ঔষধ খাইতে সম্মত হইলেন না। বহু সাধ্য সাধনা করিলাম, কিছুতেই রাজী করিতে পারিলাম না। রোগ ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করিল আমি প্রমাদ গণিলাম। তখন ললিত বাবুকে বলিলাম—

আমি—আপনার ব্যারাম দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছি না, আপনার বাটিতে সংবাদ পাঠাই ?

ললিত বাবু—(পেন্‌সিলে লিখিয়া) আমার বাটিতে কোন সংবাদ দিবার আবশ্যক নাই।

আমি—আপনার মাতা, স্ত্রী, ভ্রাতা, আত্মীয়স্বজন সকলই বর্ত্তমান, আপনার ব্যারামের সংবাদ না দিলে আমার কর্ত্তব্য পালন করা হয় না।

ললিত বাবু—সংসারের কোলাহল আমাকে ভাল লাগে না, বাটিতে সংবাদ দিলে সেখান হইতে লোক-জন আসিবে, আমার ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইবে। আপনি চিন্তিত হইবেন না, এরূপ ব্যারাম আমার মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। আবার ভাল হইয়া যায়।

যাহা হউক আমি ললিত বাবুর কথায় স্থির হইয়া থাকিতে পারিলাম না, ব্যারাম সাংঘাতিক মনে করিয়া গোপনে তাঁহার বাটিতে সংবাদ পাঠাইলাম। অনেক অনুরোধ করিয়া ডাক্তারী চিকিৎসা আরম্ভ করাইলাম। তিনকড়ি সরকার, তাঁহার পিতা শ্রীনাথ সরকার দ্বিজপদ চক্রবর্ত্তী, কালিকৃষ্ণ সরকার, নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, যোগেশ চক্রবর্ত্তী, যুগলকৃষ্ণ সরকার, প্রভৃতি এখানকার সতীর্থগণ প্রাণপণে তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। রাত্রি জাগরণের জন্য ইঁহারা পালা ঠিক করিয়া লইলেন। এই সময় কালিকৃষ্ণ সরকার রামপুর হাটে চাকরী করিতেন, ললিত বাবুর সেবার জন্য তিনি ছুটী লইয়া এখানে আসিয়া দিবারাত্রি সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিলেন। কিন্তু অদৃষ্টে যাহা

আছে তাহা কে খণ্ডন করিবে ? রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ।

ললিত বাবুর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এই রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি মৌন ব্রত ত্যাগ করিলেন না। সমভাবে ভজন-সাধনে নিযুক্ত থাকিলেন। যখন একেবারে আসন্ন হইয়া পড়িলেন তখন বিছানায় শুইয়া থাকিয়া নাম-সাধনে তৎপর থাকিলেন। মৃত্যুর দুই দিন পুর্ব্ব মৌন ব্রত ত্যাগ করিলেন। তখন একেবারে শয্যাশায়ী, আর বসিবার সামর্থ নাই, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

আমি—আপনি কেমন আছেন ?

ললিত বাবু—থাকা থাকি আর কি ? জীবন শেষ হইয়াছে, শীঘ্রই দেহ ত্যাগ হইবে।

আমি—স্ত্রী, সন্তান, মাতা প্রভৃতির জন্য আপনার মন কেমন করে না ?

ললিত বাবু—তাহাদিগকে মনেই হয় না, তাহাদের সহিত কেবল ত সংসারের সম্বন্ধ।

আমি—আপনার কোন ক্লেশ হইতেছে ?

ললিত বাবু—শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় নামের বিঘ্ন হইতেছে, ইহাই আমার কষ্ট। অন্য কষ্ট কিছু নাই।

আমি—আপনার জন্য আমরা বড়ই চিন্তিত ও দুঃখিত

ললিত বাবু—চিন্তিত বা দুঃখিত হইবার কারণ নাই, প্রারব্ধ বলবান, যখন যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই ঘটিবে, কেহ খণ্ডন করিতে পারিবে না। আশীর্ব্বাদ করুন নাম করিতে করিতে যেন নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিতে পারি।

ললিত বাবু সংকীর্ত্তন বড় ভাল বাসিতেন; এজন্য সতীর্থগণ সকলে মিলিত হইয়া প্রত্যহ খোল করতাল সংযোগে তাঁহাকে সংকীর্ত্তন শ্রবণ করাইতেন। ক্রমে রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া, ললিত বাবু সংজ্ঞাহীন হইলেন; ইহা দেখিয়া সতীর্থগণ তাঁহার আসন্ন মৃত্যু মনে করিয়া সন্ধ্যার পর তাঁহার নিকট সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় হরিনাম শ্রবণে ললিত বাবুর সংজ্ঞা হইল, তিনি মহোৎসাহে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন, এবং নাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রভাত হইলে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সতীর্থগণ অন্য কোন লোককে ললিত বাবুর শবদেহ স্পর্শ করিতে দিলেন না। তাঁহারা নিজে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মৃত দেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া সৎকার করিয়া আসিলেন।

মৃত্যুর দুইদিন পরে ললিত বাবুর সহোদর ভ্রাতা বাবু শশিকুমার গুহ ঠাকুরতা বানরীপাড়া হইতে বোলপুর

আসিয়া পৌঁছিলেন। জ্যেষ্ঠের সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হইল না।

ললিত বাবুর পারলৌকিক হিতার্থে আমি এক মহোৎসব করিলাম। এবং প্রভুগণের ভোগের প্রসাদের কিয়দংশ ললিত বাবুকে নিবেদন করিয়া দিলাম।

নাম সংকীর্ত্তন বন্দ।

বোলপুরে যে নাম সংকীর্ত্তনের প্রবল বন্যা উপস্থিত হইয়াছিল এই সময় হইতে তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইতে লাগিল। পণ্ডিত মহাশয় পুরীতে আসিলেন। সরলনাথ অন্যত্র চলিয়া গেলেন। এখানকার গুরুভাইগণ চাকরী উপলক্ষে একে একে স্থানান্তরিত হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দুর্দ্দৈব বশতঃ কেহ কেহ একেবারে সাধন-ভজন পরিত্যাগ করিলেন। যে সকল লোক অবশিষ্ট থাকিল তাহাদের পূর্ব্বের ন্যায় আর অনুরাগ থাকিল না।

পূর্ব্বে সন্ধ্যা হইলে কেহ গৃহে থাকিতে পারিত না, আপনা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সংকীর্ত্তনে যোগ দিত; এখন ডাকিয়া আনিতে হয়। আমাকে সংকীর্ত্তনের আয়োজন করিয়া তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, অবশেষে বাড়ি বাড়ি লোক পাঠাইয়া ডাকিয়া আনিতে হয়। তাহারা যেন আমার খাতিরে আসিয়া সংকীর্ত্তন করে। সে স্ফূর্ত্তি নাই, সে মত্ততা নাই; গলা হইতে স্বর নির্গত হইতে চায় না। এত যে ভাবের তরঙ্গ

রাত্রি নৃত্য করিয়াও ক্লান্ত হইত না এখন আর তাহাদের পা উঠে না ; সকলেই যেন মৃত।

আমার মুহুরি রাখাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নাম-সংকীর্ত্তনের উৎকৃষ্ট বাদক ছিল. সে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় খোল বাজাইবার লোকের অভাব হইল। বেতনভোগী লোক দ্বারায় মনোমত করা হয় না। বেতনভোগী লোক দ্বারায় সংকীর্ত্তন করার অপেক্ষা না করানই ভাল। এই নাম-সংকীর্ত্তনের অপেক্ষায় বৃথা সময় নষ্ট হয়, নাম সংকীর্ত্তন অপেক্ষা ইষ্টনাম জপ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনায় আমি নাম-সংকীর্ত্তন বন্দ করিয়া দিলাম। যাহারা আমার খাতিরে সংকীর্ত্তন করিতে আসিত তাহারাও খালাস পাইল, সকল ল্যেঠা চুকিয়া গেল। আমি কেবলমাত্র নামকে সঙ্গী করিয়া বোলপুরে পড়িয়া থাকিলাম। মাঝে মাঝে এক একবার পুরী গিয়া কিছুকাল পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত ভগবত প্রসঙ্গে কাটাইয়া আসিতাম।

ইষ্টদেব শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎসব করিবার আদেশ দিয়াছেন, ইহা পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। লোকাভাব বশতঃ উৎসবের সমস্ত আয়োজন আমাকে একাকী নির্ব্বাহ করিতে হইত। পূর্ব্বে বোলপুরের সংকীর্ত্তনের দল উৎসবে সংকীর্ত্তন করিত, এখন ঠাকুরদিগকে হরিনাম শুনাইবার জন্য সঙ্কীর্ত্তনের সম্প্রদায় আনাইতে হইল। পূর্ব্বে গুরু ভাইগণ ভোগ পূজা নির্ব্বাহ করিত, এক্ষণ

ভক্তিমান বাহিরের লোক আনাইয়া তাহার ভোগ পূজা নির্ব্বাহ করিতে হইল।

বোলপুরের এই সব শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমি জীবন্মৃত অবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলাম। শ্রীমদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎসব হইতেছে ইহাতেও গুরুভাই-গণকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না।

আমি দেখিলাম গোস্বামী মহাশয়ের অলৌকিক শক্তি এই বোলপুরে কাজ করিতেছিল এবং বোলপুরের অনেক লোককে ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিতেছিল। বোলপুরের কার্য্য শেষ হওয়ায় সেই শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন সেই শক্তি অভাবে বোলপুরের এই দুর্দ্দশা হইল। আমার বুকটা দিন দিন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। আমি কোন রকমে জীবন্মৃত অবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলাম।

পুরী হইতে পণ্ডিত মহাশয়ের আগমন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পণ্ডিত মহাশয় আমার পরম সুহৃদ ছিলেন। তিনি পুরী মোকামে গুরুর সমাধিতে অবস্থিতি করায় আমি তাঁহার বিরহে যেমন কাতর হইয়াছিলাম, তিনিও তথায় আমার বিচ্ছেদে দুঃখিত হইয়াছিলেন। পুরীতে এক দিনের জন্যও তিনি সুখী হন নাই। আশ্রমের এক খানি নির্জ্জন কুটিরে তিনি একাকী বাস করিতেন। তথায় তাঁহার সেবার কোন ত্রুটী হইত না; তথাপি তাঁহার মনে সুখ ছিল না। তিনি দিবারাত্রি সাধন-ভজনে কাল যাপন করিতেন।

পুরীর আশ্রমে অশান্তি বোধ হওয়ায় বোলপুরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে ১৩০৯ সালে তিনি পুরী হইতে বোলপুর আসিয়া উপস্থিত হন। পণ্ডিত মহাশয় বোলপুর ত্যাগ করায় এবং আশ্রমে থাকিবার উপযুক্ত কোন লোক না থাকায় আশ্রমটী পড়িয়া গিয়াছিল। তথায় আর ঘর ছিল না। পণ্ডিত মহাশয় বোলপুর আসিয়া পুনরায় ঘর প্রস্তুত করিতে বলায় আমি আনন্দিত হইয়া ঘর প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলাম।

বোলপুর আসিয়া পণ্ডিত মহাশয় দেখিলেন ; আর সে বোলপুর নাই। লোকের ধর্ম্মানুরাগ অন্তরিত হইয়াছে। গুরুভাইগণ অনেকে এ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, আর যাহারা আছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই সাধন-ভজনে উদাসীন ; সংসারে নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহ সাধন-ভজন পরিত্যাগ করিয়া কুকার্য্যে রত হইয়াছেন। বোলপুর যেন শ্মশান ভূমি। এখানকার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মন বিষণ্ণ হইল। তিনি বলিলেন—

পণ্ডিতমহাশয়—আমার বোলপুরে থাকিবার স্থিরতা নাই, আমাকে পুরীতেই থাকিতে হইবে, অকারণ অর্থ ব্যয় করিয়া আর ঘর প্রস্তুত করিতে হইবে না।

আমি—আপনি ছয় মাস কাল এখানে থাকুন, তাহা হইলে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় আমি সার্থক জ্ঞান করিব।

পণ্ডিতমহাশয়—আমি কখন্ পুরী যাইব তাহার কিছুই ঠিক নাই অকারণ অর্থ ব্যয় করিও না।

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। ভাবিলাম তাঁহার বয়স হইয়াছে, ভিক্ষা করিয়া স্বপাক খাওয়া তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর। আমার বাসায় সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ-পাচক থাকে না। পুরীতে যথেষ্ট সেবা হইবে।

সেখানে থাকিবার ও ভজন করিবার সর্ব্বপ্রকারের সুবিধা আছে। এই সকল ভাবিয়া আর আশ্রম প্রস্তুত করিলাম না। পণ্ডিত মহাশয় ২৩ মাস বোলপুরে থাকিয়া দেখিলেন এখানকার অবস্থা বড় মলিন। তিনি পুরী চলিয়া গেলেন। আমি যে একাকী ছিলাম, সেই একাকী থাকিলাম।

পরমাত্ম তত্ত্ব লাভ।

আমি এত দিন এক প্রকার হেঁস খেলে কাটাইতে-ছিলাম কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে এমনি পারিবারিক অশান্তি উপস্থিত হইল যে আমার সংসারে বাস করা দায় হইয়া উঠিল। সংসার-মরুভূমে শান্তিছায়া ভোগ করিবার মানসে আমি সমস্ত পরিবার আত্মীয় স্বজন আর দাস-দাসী পর্য্যন্ত সদ্‌গুরুর আশ্রিত করিয়াছিলাম, মনে করিয়া-ছিলাম সুখের সংসার হইবে কিন্তু কার্য্যকালে ঠিক তাহার বিপরীত হইল। সংসার আমার পক্ষে দাবানল হইয়া উঠিল। পারিবারিক যন্ত্রণায় আমি দিবানিশি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। এ যন্ত্রণা কিছুতেই নির্ব্বাণ হইল না। আমি চেষ্টার বাকি করি নাই কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। গুরু দেহে বর্ত্তমান নাই যে তাঁহাকে নিবারণ করিতে অনুরোধ করিব। পরিবারস্থ সকলের ভক্তি-ভাজন পণ্ডিত মহাশয় পুরী হইতে আসিয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। আমার যাতনা ও দুর্গতির সীমা থাকিল না। দুঃখময় সংসারে এক মাত্র নামকে অবলম্বন করিয়া পড়িয়া রহিলাম। আমার দুঃখ ও অনন্য-গতি দেখিয়া আমার প্রতি নামেরও দয়া হইতে লাগিল।

বহুকাল এই ভাবেই কাটিয়া গেল। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির উপর আমার যে মমতা ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গেল। ইহাদিগকে দেখিতে না হইলেই যেন বাঁচি।

গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন "জীবনের কথা কেহ লিখিতে পারে না।" আমি দেখিতেছি কথাটি বড় সত্য, অন্যে অন্যের জীবনে কি লিখিবে? মানুষ নিজে, নিজেরই জীবন লিখিতে পারে না। গুরুভাইদের একান্ত অনুরোধে আমি নিজের জীবনে সদ্গুরুর লীলা যাহা উপলব্ধি করিয়াছি তাহাই লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিন্তু এখন এমনি সঙ্কোচ উপস্থিত হইতেছে যে আর কলম চলে না। আমি এ পর্য্যন্তও নিজের জীবনের বাহিরের কথাই লিখিয়াছি এই অবিশ্বাসের কালে ভিতরের কোন কথা লিখিতে সাহস করি নাই; লিখিবার ইচ্ছাও ছিল না; কারণ নিজের ধর্ম্ম-জগতের কথা লিখিলে সাধারণ লোকে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিবে না তাহারা উপহাস করিবে, আর নিজকে প্রকারান্তরে আত্ম প্রশংসার অপরাধে অপরাধী করা হইবে। আত্ম-প্রশংসা আর আত্মহত্যা একই কথা। কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আত্মহত্যারূপ মহাপাতকে পতিত হইতে ইচ্ছা করে।

ভক্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভাবিলাম, সদ্-গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া দীর্ঘকাল যাবত তীব্র

সাধন-ভজন করিয়াও যদি কিছু উচ্চ ধর্ম্ম লাভ না হইল, পাঠক মহাশয়গণ যদি দেখিতেন, আমার জীবনটা কেবল হৈ চৈ করিয়া কাটিয়া গেল, তবে তাঁহারা মনে করিবেন সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হওয়া, আর না হওয়া দুই সমান। তাঁহারা ভাবিবেন ধর্ম্ম একটা কথার কথা। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অনাস্থা থাকিবে। এই পাশ্চাত্য শিক্ষার যুগে ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা ও অবিশ্বাস বড়ই মারাত্মক। জীবনের কথা খুলিয়া না লিখিলে সদ্‌গুরুর লীলা গোপন করা হয়। পুস্তকের উদ্দেশ্য বিফল হয়। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া সদ্‌গুরুর কৃপায় এ পর্য্যন্ত আমার জীবনে যাহা কিছু লাভ হইয়াছে সহৃদয় পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমি নিজে আইন ব্যবসায়ী, অধিকাংশ দুষ্ট লোকের সহিত আমার সংশ্রব। মিথ্যা প্রবঞ্চনার মধ্যে আমার বাস।

এ জীবনে কোন প্রকারে কিছু ধর্ম্ম লাভ হইবে ইহা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু সদ্‌গুরুর অপার মহিমা, গুরুশক্তির অমোঘ বল, ভগবানের অমূল্য নাম সর্ব্বশক্তি সমন্বিত। গোস্বামী মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন "তোমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বুঝ না, কেবল সংসারে ঘুরিয়া মরিতেছ।" তিনি আমাকে আরও বলিয়াছিলেন "হরিদাস দুঃখ করিও না, ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান; যদি

তিনি ধর্ম্ম দেন, তবে তিনি এই নরকের মধ্যেই দিবেন, নতুবা কিছুতেই কিছু হইবে না।” এই সকল কথা এখন প্রত্যক্ষীভূত হইতে লাগিল। এবার গোস্বামী মহাশয় মরুভূমে নন্দন-কানন প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন।

১২৯৬ সালের আশ্বিন মাহায় আমি দীক্ষা লাভ করিয়াছি। ১৩১২ সালের মধ্যেই আমার পরমাত্মতত্ত্ব লাভ পূর্ণ রূপে সম্ভোগ ও ভেদ হইয়া গেল। এই অবস্থা মনুষ্যের পক্ষে সামান্য অবস্থা নহে। ইহা লাভ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার।

যে পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করিবার জন্য কত যোগীন্দ্র মুণীন্দ্র, গিরি গহ্বরে, যোগাসনে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করতঃ ধ্যান ধারনায় যুগ যুগান্তর কালাতিপাত করিয়াও সফলকাম হন না, আমার ন্যায় একজন নষ্ট লোক সদ্‌-গুরুর কৃপায় এই পরম তত্ত্ব অনায়াসে লাভ করিল, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি হইতে পারে? “কহিবার কথা নয়, তথাপি বাউলে কয়, কহিলে বা কেবা পাতি যায়।” এ সব কথা বলিবারও নহে, বিশ্বাস করিবারও নহে না বলিলে সদ্গুরুর মহিমা গোপন করা হয় কেবল এই জন্য বলিলাম।

পরমাত্মতত্ত্ব ব্যাপারটা কি পাঠক মহাশয়গণকে তাহার কিছু আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য; এই বিবেচনায় এই তত্ত্বের কথা এই স্থানে কিছু লিপিবদ্ধ করিতেছি—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন; সেই তত্ত্বকে উপনিষদ বেত্তারা ব্রহ্ম হিরণ্য গর্ভের উপাসক যোগীরা পরমাত্মা এবং ভক্তেরা ভগবান্‌ বলেন।

'হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।"

নিষ্কল ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মা প্রত্যেকের আত্মার মধ্যে বিরাজ করেন। তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষের চক্ষু কর্ণের কর্ণ। তাঁহা অপেক্ষা নিকটের বস্তু আর কিছু নাই? এই পরমাত্মা *শক্তিরূপে সমস্ত জীবের মধ্যে বাস করিতেছেন, কিন্তু জীব তাঁহাকে টের পায় না। মানুষ বহু তপস্যার দ্বারায়ও তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে অসমর্থ।

সদ্‌গুরুর কৃপায় মানুষ যখন তাঁহাকে লাভ করে তখন সেই সাধকের মধ্যে এই পরমাত্মার কেবল মাত্র অনুভূতি হয়। এক অনুভূতি ব্যতীত আর তাঁহাকে অন্য কোনরূপে সম্ভোগ করা যায় না। স্ত্রীলোকের গর্ভের সঞ্চার হইলে, সে যেমন বুঝিতে পারে যে গর্ভের সঞ্চার হইয়াছে, পরমাত্ম তত্ত্ব লাভ হইতে আরম্ভ হইলে সাধকও সেইরূপ বুঝিতে পারে। ক্রমে সন্তান সম্ভাবিতা

* ইহা জড়ীয় শক্তি নহে, ইহার সহিত পরিচয় না হইলে,

স্ত্রীলোকের গর্ভ মধ্যে যেমন ভ্রূণ দেহের অনুভূতি হইতে থাকে সাধকের অন্তরেও ঠিক সেইরূপ পরমাত্মার অনুভূতি হইতে থাকে। গর্ভের পূর্ণতার সঙ্গে যেমন ভ্রূণদেহের অধিকতর নড়ন চড়ন অনুভব হয় সাধনের পর পর অবস্থায় সাধকের মধ্যেও সেই পরমাত্মার অনুভূতিও প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে। গর্ভের সঞ্চার হইলে যেমন স্ত্রীলোকের আহারে অরুচি জন্মে, এই পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হইতে থাকিলে সাধকেরও তেমনি সংসারে অরুচি জন্মে। তাঁহার আর সংসার বা বিষয়কর্ম্ম ভাল লাগে না। স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, বৈভব কিছুতেই স্পৃহা থাকে না। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের যেমন অম্বল আদি কোন কোন পদার্থ খাইতে রুচি জন্মে, সাধকেরও সেইরূপ হরি কথায়, হরি গুণানুকীর্ত্তনে রুচি জন্মে। শোণিত শুক্রের যোগে যেমন সন্তানের জন্ম হয়, সদ্‌গুরুর বীজ মন্ত্রে তেমনি ভক্ত হৃদয়ে ভগবানের জন্ম হয়।

যতই দিন যাইতে লাগিল, আমার মধ্যে পরমাত্মার অনুভূতি ততই প্রবল হইতে লাগিল। বিশেষতঃ নাম করিবার সময় এই অনুভূতি প্রবল হইয়া উঠিত। প্রথমতঃ এই অনুভূতি হৃদয় মধ্যে আবদ্ধ থাকিত; কয়েক বৎসর পরে ক্রমে ক্রমে উহা নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। নখ বা কেশের কোন অনুভূতি

নাই ; উহা কাটিয়া ফেলিলেও মানুষের কোন অনুভূতি হয় না ; কিন্তু ইহাতে পরমাত্মার অনুভূতি সুস্পষ্ট বুঝা যায়। এই অবস্থাটা অনেক দিন থাকিল, তদ্‌পর পরমাত্মতত্ত্ব ভেদ হইয়া গেল। পরমাত্মতত্ত্ব ভেদ হইলে অনুভূতি বন্ধ হইল।

যদিও পরমাত্মতত্ত্বলাভ ধর্ম্ম জীবনের সামান্য অবস্থা নহে, তথাপি আমি এ অবস্থা লাভেও পরিতৃপ্ত হইতে পারিলাম না। ইহাতে বিশেষ আনন্দ নাই, বাসনা-কামনাও ইহাতে নির্ম্মূল হয় না, ইহা মানুষের নিরাপদ অবস্থা নহে।

পরমাত্মতত্ত্ব লাভে মায়ার বন্ধন কিয়ৎ পরিমাণে শিথীল হওয়ায় জীবনটা একেবারে আলুনী হইয়া গেল। না আছে আহারে সুখ, না আছে স্ত্রী পুত্রাদিতে সুখ, না আছে বিষয়-বৈভবে সুখ। পৃথিবীতে এমন কোন সুখ নাই যাহা প্রাণের মধ্যে আনন্দ ঢালিয়া দিতে পারে। এই অবস্থায় জীবনটা যেন ভারবহ হইয়া উঠিল।

শাস্ত্রে লিখিত আছে "ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি ? শোকং তরতি চাত্মবিৎ.রস ব্রহ্ম রসং লব্ধানন্দী ভবতি নান্যথা।" ব্রহ্মবিৎ পরম পদ লাভ করে, আত্মবিৎ শোক হইতে মুক্ত হয়, আর রসস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিয়া ভক্তেরা আনন্দ উপভোগ করে।

এই রসস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিবার জন্য আমার

মন ধাবিত হইল। যতদিন তাহাকে না পাইয়াছি ততদিন আমার তৃপ্তি নাই, মনের ব্যাকুলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি প্রাণপণে সাধন-ভজনে ব্যাপৃত থাকিলাম।

সেবাইত নিয়োগ।

পুরাধামের নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর পাহাড়ে ৩.২১ একার ভূমি খরিদ করিয়া ইহার মধ্যে গোস্বামী মহাশয়কে সমাধিস্থ করা হয়। এই ভূমি খণ্ডে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফলের বাগিচা ও ইমারৎ আদি প্রস্তুত হইয়াছে। ভক্তি ভাজন যোগ জীবন গোস্বামী মহাশয় এই সমাধিক্ষেত্রে নাম-ব্রহ্মের সেবা স্থাপন পূর্ব্বক ১৯০৪।১৪ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে এই সম্পত্তি নাম-ব্রহ্মের সেবায় অর্পণ করেন। যতদিন যোগজীবন গোস্বামী মহাশয় জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি নিজেই নাম-ব্রহ্মের সেবাইত ছিলেন। ১৩১২ সালের আশ্বিন মাহায় যোগজীবন গোস্বামী মহাশয় পরলোক গমন করিলে নূতন সেবাইত নিযুক্তের আবশ্যক হয়। ট্রাষ্ট ডিডের সর্ত্ত মত ১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাহায় এই সমাধিক্ষেত্রে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের এক মহতী সভা হয়। গুরু ভাইগণের দ্বারায় আহুত হইয়া আমিও এই সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তাঁহারা আমাকে সভাপতি পদে বরণ করেন।

শিষ্যগণের মধ্যে কতক লোকের ইচ্ছা যে গুরুপরি-বারস্থ কেহ সেবাইত নিযুক্ত হন; কতক লোক ভাবিলেন

গুরু পরিবারস্থ কেহ সমাধির সেবাইত নিযুক্ত হইলে এই সমাধিক্ষেত্রে সাংসারিকতা উপস্থিত হইবে। সেবা-কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইবে না। সেবার ক্রুটী হইলে তাহাদিগকে কোন কথা বলিতে পারা যাইবে না। তাঁহ-দের ইচ্ছা, ভক্তিভাজন সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সেবাইত নিযুক্ত হন। আবার কাহারও কাহারও ইচ্ছা যে অন্য লোক সেবাইত নিযুক্ত হন। অধিকাংশ লোকের মত অনুসারে বাবু সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ই সেবাইত নিযুক্ত হইলেন।

এই ঘটনায় গুরু পরিবারস্থ লোকেরা আমার উপর বিষম বিরক্ত হ লেন। তাঁহাদের ধারণা আমা হইতেই তাঁহারা সমাধিক্ষেত্র হইতে বঞ্চিত হইলেন। তাঁহারা অভিমান ও দুঃখ করিয়া আমাকে পত্র লিখিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের ভুল ধারণা কিছুতেই অপনয়ন করিতে পারিলাম না। অনেক বুঝাইলাম, কিছুতেই তাঁহারা বুঝিলেন না। একে আমার নিজের দারুণ পারিবারিক অশান্তি তাঁহার উপর আবার এই এক অশান্তি উপস্থিত হইল।

সরল নাগ ভায়া পুরীর সমাধিক্ষেত্রে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে একাকী থাকিতেন। তিনি বসিয়া নাম করিতে পারিতেন না, শুইয়া শুইয়া নাম করিতেন। এক দিন দুঃখ করিয়া আমাকে বলিলেন—

সরলনাথ—আর আমার এখানে থাকা হইতেছে না।

আমি—কেন ? কি হইয়াছে ?

সরলনাথ—আমার সুধাক্ষরণ হইয়া থাকে; তাহাতে অত্যন্ত নেশা হয়। আমি বিছানা হইতে উঠিতে পারি না। ইহাতে আশ্রমের লোকেরা আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়। খাবার সময় উপস্থিত হইলে চাকরেরা জানালা দিয়া পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া আমার অবস্থাটা নষ্ট করিয়া দেয় আশ্রমের লোকেরা বলে কেবল দিবারাত্রি বিছানায় পড়িয়া ঘুমাইবে,খাবার সময় দিন দিন হাকাহাকি ডাকাডাকি করিতে হইবে।

আমি—যখন সুধা ক্ষরণ হয় তখন তোমার অবস্থাটা কিরূপ হয়।

সরলনাথ—তখন অত্যন্ত নেশা হয়, নাম চলিতে থাকে বিছানা হইতে উঠিতে পারি না। বাহ্যজ্ঞান প্রায়ই থাকে না। আমি শুইয়া থাকি আর মনে হয় আমার উপর যেন গুড়ী গুড়ী বৃষ্টি পতিত হইতেছে। সর্ব্ব শরীর শীতল হইয়া যায়।

আমি—কোন সময় সুধাক্ষরণ হয় ?

সরলনাথ—সকল দিন হয় না এবং ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই।

আমি—সুধার আস্বাদন কিরূপ ?

সরলনাথ—কখনও তিক্ত কখনও লবণ আর কখনও বা মিষ্ট।

সরলনাথের কথা শুনিয়া আশ্রমবাসী স্ত্রীপুরুষ সকলকে বলিয়া দিলাম আহারের জন্য সরলনাথকে যেন ডাকাডাকি না হয় ; তাঁহার খাদ্যের রাখিয়া দিতে হইবে সে ইচ্ছামত খাইবে। অতঃপর সেইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

আর একদিন সরলনাথ বলিল, দাদা, আমার সম্মুখে একটা দৃশ্য পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, ব্যাপারটা কি ; কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

আমি—দৃশ্যটা কিরূপ ?

সরলনাথ—গুরু-দত্ত নাম আমার সম্মুখে জ্বলিতে থাকে, বড় বড় অক্ষরে যেন ইলেক্‌ট্রিক আলোতে ঐ নাম লিখিত হইয়াছে। কিছুকাল পরে ঐ নাম প্রণবে পরিণত হয় ; আবার এই প্রণবটী গুরুরূপে পরিণত হইয়া যায়। আবার এই গুরুরূপ নামে পরিণত হয়, নাম আবার প্রণবে, প্রণব আবার গুরুরূপে পরিণত হয়। এইরূপ ক্রমাগত হইতে থাকে। এ রকম কেন হয় ?

আমি—নাম, নামী ও নাম দাতা যে একই তত্ত্ব—গুরু

কৃপা করিয়া তোমাকে তাহাই দেখাইতেছেন।

তুমি মহাভাগ্যবান।

পণ্ডিত মহাশয়ের সহবাসে পুরীতে কিছুদিন আনন্দে কাটাইয়া বোলপুর চলিয়া আসিলাম।

চিতারোহণ।

অষ্টাঙ্গ যোগ, সাত্ত্বিক বিকার, দেবতা দর্শন, যোগৈশ্বর্য্য লাভ ইত্যাদি আমার নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি অনেকের মধ্যে এই সব অবস্থা দেখিলাম, আবার কিছুকাল পরে সব চলিয়া গেল, ইহাও দেখিলাম। পূর্ব্বে যাহা উচ্চ ধর্ম্ম বলিয়া মনে হইত, এখন আর তাহা ধর্ম্ম বলিয়াই মনে হয় না। যত দিন কাম ক্রোধাদি দুর্দ্দমনীয় রিপুগণের দাসত্ব মোচন না হইয়াছে, যতদিন জল্পনা কল্পনা, বাসনা কামনার হস্ত হইতে অব্যাহতি না পাইয়াছি, যত দিন দুষ্প্রবৃত্তি সকল নির্ব্বাপিত না হইয়াছে, যত দিন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন না হইয়াছে, যত দিন ভগবানের নামের মধুরাস্বাদন অনুভব না হইয়াছে; ততদিন আমার যে একটা ধর্ম্মলাভ হইল ইহা আমার মনে হয় না। সাধন পন্থায় পথের খবর দিবার জন্য গোস্বামী মহাশয় আমাকে পরমাত্ম তত্ত্বটা কি তাহা বিশেষভাবে দেখাইয়া ছিলেন।

পরমাত্ম তত্ত্ব লাভে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া ইহার উপরের ধর্ম্ম পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিবার

উৎসাহ ও সাধন শক্তি দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। ক্রমে বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর লইবার জন্য সচেষ্টিত থাকিলাম। ওকালতী প্রায় তের আনা কমিয়া গিয়াছে তিন আনা মাত্র বাকী আছে, এই টুকুও ছাড়িয়া সংসারের ভার স্ত্রীকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার মনস্থ করিলাম। এ-দিকে আমাকে জলন্ত অনলে দগ্ধীভূত করিবার জন্য গুরু যে তলে তলে আয়োজন করিতেছেন আমি ইহা ঘুণাক্ষরেও টের পাইলাম না। গোঁসাই বলিয়াছিলেন "তোমাদের পন্থা জ্বলন্ত হুতাশনের মধ্য দিয়া তোমা-দিগকে পুড়িয়া ছার খার হইতে হইবে।" এই বার সেই পালা উপস্থিত হইল।

১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাহায় আমার তৃতীয় জামাতা সেই অমরনাথ মিত্র স্বদেশী হাঙ্গামায় মত্ত হইয়া চাকরী ছাড়িয়া স্বগ্রামী প্রিয়গোপাল ঘোষ সহ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া ৩০০০ টাকা সাহায্য চাহিলেন। তাঁহারা এই টাকায় লোহার দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।

অমরনাথ চরিত্রবান, সাধুলোক বলিয়াই আমি জানিতাম। তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতাম। তাহার চাকরীর খাটুনী দেখিয়া আমার প্রাণ ব্যথিত হইত যদি ৩০০০ তিন হাজার টাকা দিলে স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহা হইলে সুখের বিষয়

হইবে এই ভাবিয়া তাহাদের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলাম। প্রিয় গোপাল লোহার দোকানে চাকরি করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, অমরনাথও কিছু কিছু কায জানেন, বিশেষ তিনি হিসাব নিকাশের কাযে সুদক্ষ। ইহারা দোকান চালাইতে পারিবে এই ভাবিয়া আমি ইহাদিগকে তিন হাজার টাকা দিলাম। ইহারা বলিল অল্প দিন মধ্যে সমস্ত টাকা আপনাকে দিয়া আমরা credit এ কারবার চালাইব। যত দিন টাকাটা পড়িয়া থাকিবে ততদিন সুদের পরিবর্তে মুনফার একটা অংশ দিব।

আমি বাল্যকাল হইতে দেখিতেছি আমার জীবনটা যেন এক অন্যদীয় শক্তি দ্বারায় পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। আমার মনে হইল, আমাকে এত দিনে ওকালতী ছাড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই কারবারে মাসিক যদি ৫০৲ টাকাও লাভ পাওয়া যায়, তাহা হইলে ওকালতীটা ছাড়িয়া দিব, এই ঘৃণিত ব্যবসার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব। এই ভাবিয়া আমি তাহাদিগকে ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা দিলাম।

কিছুদিন পরে অমরনাথ আসিয়া আমাকে বলিলেন "এই দোকানে আপনার নামের একটা সংশ্রব থাকিলে দোকানের একটা গুরুত্ব জন্মে।" গুরু আমাকে

একারণ এইখানে আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইল। আমি ভাল মন্দ, অগ্র পশ্চাৎ কিছুই ভাবিলাম না; অমরনাথের উপকার হইবে এই ভাবিয়া আমার নাম দিতে সম্মতিপ্রদান করিলাম। দোকানের উপর হরিদাস বসু এণ্ড কোম্পানি নাম দিয়া অমরনাথ এক সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া দিলেন।

অমরনাথ আমাকে দোকানের কোন খবরই দিত না। বিষয়ের কথাও আমার কানে যেন বিষ ঢালিয়া দিত। ইহার উপর আমি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। বাজার পড়িয়া গেল, বহু টাকা লোকসান দেখিয়া প্রিয়গোপাল সরিয়া পড়িল। অমরনাথও পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইলেন, তিনি কর্ম্মচারী থাকিলেন। দোকান আমার ঘাড়ে পড়িল। দোকানের দেনা পরিশোধের জন্য আমি ক্রমে ক্রমে অন্যূন ২২০০০৲ বাইস হাজার টাকা দিলাম। তাহাতেও সামলাইতে পারিলাম না। লুটপাট বেশ চলিতে লাগিল; দোকান উঠিয়া গেল। এই বাইশ হাজার টাকা সমস্ত লোকসান হইল। তদুপরি ২৭০০০৲ সাতাইশ হাজার টাকা দেনা দাঁড়াইল। আমি অকূল অস্থলে পড়িলাম। আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইলেও এই বিপুল দেনা পরিশোধ হয় না। ওকালতীর আয়ে আমার অর্দ্ধেক বাসাখরচ চলে না, বিপুল সংসার লইয়া আমি দাঁড়াই কোথায়? ঋণের বন্দোবস্ত করিবার জন্য বহু প্রয়াস পাইলাম, বহু লোকের তোসামোদ করিলাম

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চারিদিক হইতে আমার নামে নালিশ রুজু হইল।

Misfortune never comes alone বিপদ কখন একাকী আসে না। আমার গৃহিণী অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোক। এই অভাবনীয় ঋণের কথা শুনিয়া তিনি একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। দুশ্চিন্তায় তাঁহার রোগ জন্মিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র অবাধ্য হইয়া লেখা পড়া ত্যাগ করিল। সময় সময় ছোট কন্যার মাথা গরম হয়, সে আর শ্বশুরকুলে স্থান পাইল না। অবাধ্য চাকর ক্রমাগত জ্বালাতন করিতে লাগিল। দাদা ঘোর বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা ঝগড়া আরম্ভ করিলেন। আত্মীয়গণ শত্রুতা করিতে লাগিল; দুষ্ট লোকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য সময় বুঝিয়া মিথ্যা ফৌজদারী মোকর্দ্দমা রুজু করিল। জমিদারগণ সময় পাইয়া নির্য্যাতন আরম্ভ করিল। তাহাদের সহিত মালি মোকর্দ্দমা চলিতে লাগিল। যাহারা আমার অনুগত ও আশ্রিত ছিল এই সময় আমাকে সমূলে নিপাত করিবার জন্য তাহারা বিপক্ষ ডিক্রিদারগণের সহিত মিলিত হইল। তাহাদের উত্তেজনায় ডিক্রিদারগণ আমার সহিত আর কোনরূপ বন্দোবস্ত করিল না। চারিদিক হইতে আমার নামে ডিক্রিজারি হইতে লাগিল। কোন আদালত হইতে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক, কোন আদালত

করিবার জন্য আদালতের পেয়াদা ও নাজির আমার প্রতি ধাবিত হইল। আমার বাড়ী ঘর, জমি জায়গা, পুকুর, বাগান যাহা কিছু ছিল সমস্ত ক্রোক হইয়া গেল। ডিক্রি-দারগণ ইয়ুরোপীয়, আদালত তাহাদেরই পক্ষপাতী হইলেন, আদালতে আমি আইনের সাহায্যও পাইলাম না। অপমান, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতনের কিছু বাকী থাকিল না।

কালের বন্ধুগণ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন ও কেহ বা মুখে হাহাকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মহা খুসি। যাহারা খল স্বভাব ও পরশ্রী কাতর তাহাদের এইবার পরমানন্দ। যাঁহারা প্রকৃত বন্ধু কেবল তাঁহারাই আমার জন্য হাহাকার করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম।

কুটুম্বগণ এখন আর আমার দিকে তাকায় না। ধনী আত্মীয়গণ খোঁজ খবর লয় না, পাছে দুটাকা কর্জ্জ চাই। এক সময় টাকার অত্যন্ত অভাব হওয়ায় আমি কোন ধনী আত্মীয়ের নিকট ৩০০৲ টাকা কর্জ্জ চাহিয়া-ছিলাম। তিনি আমার অবস্থা বিপর্য্যয়ের কথা টের না পাওয়ায় আমাকে ৩০০৲ টাকা কর্জ্জ দিতে সম্মত হইয়া আমাকে পত্র লেখেন। তদপর আমার বিপদের কথা শুনিতে পান। আমি ঐ আত্মীয়ের পত্রানুসারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন "আমি আপনাকে পুনরায় পত্র লিখিয়াছি সে পত্র কি আপনি পান নাই?

আমি লজ্জায় ম্রিয়মান হইলাম। নিতান্ত আবশ্যক থাকায় জেদ করিয়া কিছু টাকা লইয়া আসিলাম। কুটুম্ব মহাশয় বোধ হয় আমাকে টাকা দিয়া দুশ্চিন্তায় আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুই মাস গত হইবামাত্র আমাকে টাকার তাগাদা করিলেন, আমি তাঁহার টাকা গুলি মায় সুদ মিটাইয়া দিলাম।

কেহ কেহ আত্মীয়তা করিয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন "তোমার মত বেকুব লোক ত্রিভুবনে আর নাই, এত গুলা টাকা পরের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে? কি হইতেছে কি না হইতেছে একবারও চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে না।" কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন "এই টাকার সিকি লইয়া যদি বোলপুরে একটা কারবার করিতে তাহা হইলে বড় মানুষ হইয়া যাইতে।" আবার পরোক্ষে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন "পাপের ধন থাকিবে কেন? ওকালতীর পয়সা, কত জুয়াচুরী বাটপারি করিতে হইয়াছে; এ পয়সা কি ভোগ হয়?" যাহার মনে যাহা আসিল, সে তাহাই বলিতে লাগিল। এই দুঃসময়ে ধর্ম্মবন্ধুগণ মধ্যেও কেহ কেহ আমার প্রতি বিরূপ হইয়া আমার কুৎসা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। কেবল পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছিলেন, বিপদ হইয়াছে, ভালই হইয়াছে, কোন ভয় নাই, চিন্তা নাই! বিপদ নিশ্চয়ই কাটিয়া যাইবে।

পাঠক মহাশয়গণ, আমার অবস্থাটা একবার দেখিলেন। অর্থনাশ, মনস্তাপ, ভয়, ভাবনা, অপমান, লাঞ্ছনার আর কিছু বাকী থাকিল না। ইহার উপর পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক যন্ত্রনা ত আছেই। আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। আমার নিকট আর পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয় না, মলয়মারুত প্রবাহিত হয় না, সরোবরে শতদল বিকশিত হয় না। সমস্ত জগৎ অন্ধকার ময়। আমার হৃদয় সাহারা মরুভূমির ন্যায় সদাই ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। সে জ্বালার বিরাম নাই।

যখন আত্মরক্ষার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল, কোন রকমে কোথায়ও আশ্রম পাইলাম না, তখন বুঝিলাম দৈবের মার। গুরু বলিয়াছেন জ্বলন্ত অনলে দগ্ধীভূত হইতে হইবে, এই সেই কাল উপস্থিত, আর আমার রক্ষা নাই,—আমাকে দগ্ধীভূত, আমাকে ভস্মীভূত হইতেই হইবে। চিতানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, আর কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, আমি আত্মরক্ষার সমস্ত উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া গুরুকে স্মরণ করতঃ একমাত্র নামকে সম্বল করিয়া প্রজ্জ্বলিত চিতায় আরোহণ করিলাম। হু হু শব্দে দাহকার্য্য চলিতে লাগিল।

আমার বিপদ ও দুঃখের কথা আপনাদিগকে সাধারণভাবে জানাইলাম। ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিলে পুস্তক বাড়িয়া যাইবে এবং আপনারা আমার দুঃখে

নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পড়িবেন এজন্য বিস্তারিত বিবরণ লেখা হইল না। আপনারা মনে মনে আমার অবস্থাটা ভাবিয়া লইবেন।

শুশ্রূষা আরম্ভ।

প্রজ্জ্বলিত চিতানলে অবিশ্রান্ত দগ্ধীভূত হইতে থাকায় আমার জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া উঠিল। আমার হাত, পা কাঁপিতে লাগিল, সময়ে সময়ে তাহাতে খিল ধরিতে লাগিল; কণ্ঠস্বর হাঁড়ির ভিতর ঢুকিল, বুকের ভিতর গুর-গুরুনী আরম্ভ হইল শরীর জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, মনে হইতে লাগিল প্রাণটা এখন গেলেই বাঁচি।

আমি সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম কেহ হাঁসে কি না। যদি কাহাকেও একটু হাসিতে দেখিতাম, তাহা হইলে প্রাণে একটু আরাম পাইতাম; আমার মনে হইত, ভাল এ লোকটা ত ক্ষণকালের জন্যও সুখে রহিয়াছে। আমার মত ত দুঃখী নহে। মাতাল, বেশ্যা দুর্বৃত্ত সকলকেই আমার অপেক্ষা সুখী দেখিতাম। তাহারা কুকার্য্যে রত থাকিয়া যে ক্ষণিক সুখ ভোগ করিত, তাহাও আমার নিকট ভাল বোধ হইত।

বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় পণ্ডিত মহাশয়ের দীক্ষার কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং পণ্ডিত মহাশয়কে বলিয়াছিলেন "এমন কাজ কেন করিলে?

যন্ত্রণার সীমা থাকিবে না।” আমার এই সব কথা মনে হইত আর চক্ষু ফুটিয়া জল বাহির হইত।

আমার যন্ত্রনা যখন একেবারে অসহ্য হইত তখন আপনা হইতে নাম আসিয়া আমার মধ্যে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত, গুরু-শক্তি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। তখন আর দুঃখ যন্ত্রনা থাকিত না; তখন মনে হইত এইরূপ বিপদ যেন চিরকাল থাকে; তাহা হইলে গুরু শক্তির যোগে নাম লইয়া পরমানন্দে থাকিতে পাইব।

যন্ত্রনার লাঘব হইলে নাম ও গুরু-শক্তি চলিয়া যাইত, আবার আমি হাহাকার করিতে থাকিতাম। আবার যন্ত্রনা অসহ্য হইবামাত্র নাম আসিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত ও গুরুশক্তি সর্ব্বশরীর আচ্ছাদন করিয়া ফেলিত। এই জন্য উপর্য্যুপরি নাম ও গুরুশক্তির আবির্ভাব ও অন্তর্ধান হইতে লাগিল। গুরু শক্তির আবির্ভাব হইলে সমস্ত যাতনা ভুলিয়া যাইতাম। যে কয়েক বৎসর আমার বিপদ ছিল সেই কয়েক বৎসর নাম ও গুরুশক্তি এইরূপে আমার শুশ্রূষা করিয়াছিল।

এই সময়ে শ্রীমদ্ভাগবত ও গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ আমার প্রাণে কিছু কিছু সান্ত্বনা দিত। ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন যে আমাকে চায়, আমি তাহার ধন, জন, মান, সম্ভ্রম সমস্তই হরণ করি। গুরুও বলিয়াছেন

জীয়ন্তে মরা না হইলে ধর্ম্ম হয় না। আমি এই সকল কথা স্মরণ করিয়া কিছু কিছু সান্ত্বনা পাইতাম। আমার যন্ত্রনা হ্রাস হইত।

সান্ত্বনা প্রদান।

পাঠক মহাশয়গণ, আপনারা অবগত আছেন আমার মধ্যে অর্থাশক্তি অত্যন্ত প্রবল এবার যেমন রোগ তেমনি ঔষধের ব্যবস্থা হইয়াছে। গোঁসাই আমাকে পথের ভিখারী করিতেছেন। শরীর-যাত্রা কিসে নির্ব্বাহ হইবে এই ভাবিয়াই আমি অস্থির। ইহ সংসারে ধন, জন, আত্মীয়তা সকলই যে অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী তাহা গোসাঁই স্পষ্ট করিয়া দেখাইলেন।

আমার যে বিপদ, ইহাতে মানুষের জীবন রক্ষা হয় না। হয় মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, না হয় আত্মহত্যা করিয়া ফেলে। যন্ত্রনার সময়ে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য গোঁসাই প্রবল গুরুশক্তি দ্বারা আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেন, আবার রাত্রিকালে বিবিধ স্বপ্ন দ্বারা আমাকে সান্ত্বনা দিতেন।

গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন "আমি স্বপ্ন দ্বারা শিষ্যগণকে নানা উপদেশ দিই।" এই সময় আমি প্রায় প্রত্যহই একটা না একটা স্বপ্ন দেখিতাম। এই সকল স্বপ্ন দ্বারায় গোস্বামী মহাশয় আমাকে আমার নিজের প্রকৃত অবস্থাটা ভাল করিয়া দেখাইয়া দিতেন।

জাগ্রত অবস্থায় নিজেকে নিজে ঠিক করিয়া ধরিতে পারা যায় না? মায়ার কুহকে পড়িয়া প্রায়ই প্রতারিত হইতে হয়।

আমার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, অভিমান, নিন্দা, প্রতিষ্ঠা, স্বার্থপরতা, হিংসা, ভয়, শোক, অর্থাসক্তি, মান, অপমান, কি পরিমান বর্ত্তমান, তাহাদের প্রভাবই বা কিরূপ এই সকল স্বপ্ন দ্বারায় গোঁসাই স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিতেন। দয়া, ক্ষমা পরদুঃখ কাতরতা দীনতা, নামে রুচি ও বিশ্বাস, ভগবানে রতি, গুরুতে আসক্তি, আমার মধ্যে কি পরিমাণে বর্ত্তমান আছে তাহাও এই সকল স্বপ্ন দ্বারা দেখাইয়া দিতেন। আমার অন্তরের যাবতীয় অবস্থার ছবি আমার সম্মুখে ধরিতেন। আমি গুরুকে স্মরণ করিয়া দুষ্প্রবৃত্তি সকল দূর করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

স্বপ্ন বৃত্তান্ত লিখিয়া বিস্তারিত জানাইতে হইলে পুস্তক বাড়িয়া যায় একারণ স্বপ্নের ভাবটা দেখাইবার জন্য গুরুদেব যে স্বপ্ন দ্বারা আমাকে সান্ত্বনা ও উপদেশ দিয়াছিলেন কেবল সেই স্বপ্ন দুইটীর বৃত্তান্ত লিখিলাম।

এক দিন রাত্রে বিছানায় নিদ্রা যাইতেছি, এমন সময় স্বপ্ন দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড মত্ত হস্তী আমার প্রাণ

প্রাণ ভয়ে যতই পলাইতেছি, হাতীটা ততই আমার পিছু পিছু ছুটিয়া আসিতেছে। আমি জীবন রক্ষার জন্য একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষে আরোহণ করিলাম, মনে করিলাম আর হাতীটা আমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। বৃক্ষ হইতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, হাতীটা প্রবল বেগে সেই বৃক্ষের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে; তখন মনে হইল; যেরূপ প্রকাণ্ড হাতী দেখিতেছি, তাহাতে সে এই বৃক্ষ অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে? এই বৃক্ষ নিরাপদ স্থান নহে; তখন বৃক্ষ হইতে নামিয়া ছুটিতে লাগিলাম, আর এক একবার পিছু দিকে তাকাইতে লাগিলাম, দেখি হাতীটা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিতেছে। একটা শাখা প্রশাখায় সমাচ্ছন্ন প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিয়া তাহাতে আরোহণ করিলাম, এবং পত্রের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া ভাবিলাম হাতীটা আমাকে দেখিতে পাইবে না। কিছুকাল পরে বৃক্ষোপরি পত্রের অন্তরাল হইতে উঁকি মারিয়া দেখি হাতীটা সেই বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে; তখন মনে হইল এ স্থান নিরাপদ নহে। আমি বৃক্ষ হইতে নামিয়া গ্রাম গ্রামান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কত গ্রাম যে অতিক্রম করিয়া গেলাম তাহার ইয়ত্তা নাই, মনে করিলাম, আমি যে কোন্ দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি

ক্ষণ কাল পরে পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া দেখি হাতীটা আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে; তখন আবার প্রাণ ভয়ে দৌড়িতে লাগিলাম, একটা গ্রামের কোন গৃহস্থের বাটিতে প্রবেশ করিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। এবং ঐ গৃহের একটা কোটায় উঠিয়া লুকাইয়া থাকিলাম, মনে হইল হাতীটা আমার অনুসন্ধান পাইবে না, আর সদর দরজা বন্ধ থাকায় গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেও পারিবে না। কিছুক্ষণ পরে লুকাইত স্থান হইতে উঁকি মারিয়া দেখি, হাতীটা গৃহাভিমুখে ধাবিত হইয়া আসিতেছে। তখন মনে হইল হাতীটা পদাঘাতে সদর দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে এবং গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার প্রাণ সংহার করিবে।

এইরূপ মনে হওয়ায় আমি গৃহ হইতে অবিলম্বে বাহির হইয়া আবার দৌড়াইতে লাগিলাম। বহু গ্রাম অতিক্রম করিয়া একটা প্রকাণ্ড নগরীতে প্রবেশ করিলাম। নগরের মধ্যে নানা দিকে নানা পথ, আমি নানা পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া এক বড় লোকের একটা প্রকাণ্ড দালানের মধ্যে আশ্রয় লইলাম ও তাঁহার সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। আমি মনে করিলাম হাতীটা রাস্তা ঠিক করিতে পারিবে না এবং গৃহস্থের সুদৃঢ় দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

তেছে, আমি ভাবিতে লাগিলাম হাতীটা কেমন করিয়া আমার লুক্কাইত স্থান টের পাইল, রাস্তা ঠিক করিয়াই বা কি করিয়া আসিল; যাহা হউক এখানে আমার থাকা কর্ত্তব্য নয়, এই ভাবিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

হাতীটা স্থূলদেহ, সংকীর্ণ গলির মধ্যে তাহার দেহ প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না, এই ভাবিয়া নগরীর অতি সংকীর্ণ গলির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, বহুদূর ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিলাম এবং হাতীটার চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপ মানসে তাহার অলক্ষিতে নানা বাইলেনের ভিতর দিয়া এক নিভৃত স্থানে উপস্থিত হইলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, হাতীটা দ্রুতবেগে আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে; তখন মনে করিলাম হাতী উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, এই ভাবিয়া উচ্চ উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দ্রুতবেগে একটা বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই বাড়ী হইতে দেখিতে পাইলাম হাতীটা আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

যখন কিছুতেই হাতীর আক্রমণ এড়াইতে পারিলাম না, তখন প্রাণভয়ে ভীত হইয়া নগরের প্রান্তে কোন বড়লোকের দক্ষিণদ্বারি একটা বৈটকখানায় প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। বৈঠকখানায় কোন লোক দেখিতে পাইলাম না। এই বৈঠকখানার পূর্ব্বদিকে

সুন্দর পুষ্করণী দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ পুষ্করণীর চারি পাহার সুন্দর বাঁন্ধান, বৈঠকখানায় থাকা নিরাপদ নহে, এই ভাবিয়া পূর্ব্বদিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া পুষ্করণীর জলমধ্যে ডুবিয়া থাকিলাম।

কিছুক্ষণ ডুবিয়া থাকার পর মনে হইল, জল নিরাপদ স্থান নহে, অতএব এ স্থান হইতে পলায়ন করাই কর্ত্তব্য এই ভাবিয়া যেমন জল হইতে উত্থিত হইলাম, অমনি সম্মুখে ২।৩টী বাবু দেখিতে পাইলাম; তাঁহারা আমার আসন্ন বিপদ দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মুখ হাত নাড়িয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "শীঘ্র কৃষ্ণচক্রের আশ্রয় আশ্রয় লও।" আমি বাবুদের কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলাম। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন "কথাটা বুঝিলে না?" আমি উত্তর করিলাম "না।"

তখন বাবুরা আমার সম্মুখে একখানি কৃষ্ণচক্রের চিত্র উপস্থিত করিলেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঐ চিত্র দেখাইতে লাগিলেন। এই চিত্রখানি অতি কৌশলে নির্ম্মিত ও সুচিত্রিত। ইহাতে রাসের ছবির ন্যায় অনেকগুলি শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি চক্রাকারে চিত্রিত আছে; এই চক্রের মধ্যস্থানে একটী বালক যোড়হস্তে শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে চাহিয়া দণ্ডায়মান আছে; একটা মত্ত হস্তী ঐ বালককে

সুকৌশলে নির্ম্মিত যে ঐ হস্তী বালকের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবে কিন্তু এক অঙ্গুলী মাত্র ব্যবধান থাকিবে বালককে আর স্পর্শ করিতে পারিবে না। এই হস্তী যে দিক দিয়া বালককে আক্রমণ করুক না কেন, নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, চক্র ঘুরিয়া যাইবে. হাতীটা পশ্চাতে পড়িবে আর বালকের চক্ষু ভগবানের পদারবিন্দে ন্যস্ত থাকিবে।

আমি এই চক্রটি দেখিতে দেখিতে চক্রস্থ চিত্রিত হস্তীর নিম্নে কি যেন লেখা রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। লেখাটি পাড়িয়া দেখিলাম "সংসার রূপ মত্ত হস্তী" লেখা রহিয়াছে। এই লেখাটি পড়িবামাত্র মনে হইল যে মত্ত হস্তী আমাকে মারিবার জন্য তাড়া করিয়াছে, সে আর কেহ নহে, দারুণ সংসার। যেমন এই কথা মনে হইল অমনি আতঙ্ক দূর হইল; অমনি আশ্বস্ত হইলাম; আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

নিদ্রা ভঙ্গের পর আমি গুরুদেবকে প্রণাম করিলাম; তাঁহার অপার করুণার বিষয় ভাবিতে লাগিলাম; এই স্বপ্নের দ্বারায় তিনি বুঝাইয়া দিলেন সংসারের নির্য্যাতন হইতে কোন প্রকারে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে মানুষকে সংসার-যাতনা হইতে রক্ষা করিতে পারে। ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার পদারবিন্দে আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত উপায়ন্তর

স্থির করিয়া থাক, সমস্ত বিপদ-আপদ কাটিয়া যাইবে, সংসাররূপ মত্তহস্তী আমার কেশ স্পর্শ করিতে পারিবে না, সমস্ত ভয় বিভীষিকা অন্তরিত হইবে।

এই স্বপ্ন দর্শনের পর অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। আমার মনে হইল যদি ভগবানের পদারবিন্দে চিত্ত সমাধান করিয়া থাকিতে পারি তাহা হইলে আমার সমস্ত বিপদ কাটিয়া যাইবে। আমি গুরুকে স্মরণ করিয়া ভগবানে চিত্ত সমাধান করতঃ অবিশ্রান্ত নাম-সাধনে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। এখন হইতে আর অন্য চিন্তা আমার মন মধ্যে স্থান পাইত না। যদি কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে অন্য দিকে মনোনিবেশ করিতে হইত তাহা হইলে আমার যেন বুক ফাটিয়া যাইত।

পাঠক মহাশয়গণ, আপনাদিগকে আর একটি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনাইবার কথা বলিয়াছি। তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি। ভোলানাথ দাস আমার বাসার চাকর। সে সতীর্থ কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জনৈক শিষ্য। আমার বাসায় একটা কুকুর বড় উৎপাত করিত, সময়ে সময়ে ঘর ঢুকিয়া খাবার জিনিস খাইয়া পলাইত। আমি একদিন যষ্টি হস্তে বেড়াইতে বাহির হইতেছি, এমন সময়ে ঐ কুকুরকে ঘরের বারান্দায় উঠিতে দেখিয়া এক ঘা প্রহার করিলাম, কুকুরটা কেঁউ কেঁউ করিয়া পলাইয়া গেল।

কুকুরকে প্রহার করায় আমার মনটা খারাপ হইল; ভাবিলাম হঠাৎ এমন কুকাজ কেন করিলাম? আমি মনে মনে কুকুরকে প্রণাম করিলাম। ভোলানাথকে বলিলাম এই কুকুরটাকে আঘাত করিয়া কুকাজ করিয়াছি। ইহাকে প্রত্যহ ভাল করিয়া খাওয়াইবে। ভোলা ঐ কুকুরকে প্রত্যহ আহার দিত এবং অত্যন্ত যত্ন করিত। আমি কুকুরটাকে দেখিলেই প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম। কয়েক মাস পরে কুকুরের একটা ঘা হওয়ায় ভোলানাথ স্নেহবশতঃ তাহার যথেষ্ট সেবা করিল ও চিকিৎসা করাইল। কিন্তু ব্যারাম কিছুতেই ভাল হইল না। ভোলানাথ তাহার আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিল এবং কর্ণে ভগবানের নাম প্রদান করিল। ভাগ্যবান কুকুর নাম শ্রবণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। ভোলানাথ ঐ কুকুরের মৃত দেহ সমাধিস্থ করিল।

কিছুদিন পরে স্বপ্ন দেখিলাম, আমি রাস্তা দিয়া যাইতেছি একটু তফাতে একটা কুকুর দণ্ডায়মান। কুকুরটার চেহারা ভীতিপ্রদ, তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, এই কুকুরটাকে আমি প্রহার করিয়াছি,—এ আমাকে দংশন করিবার জন্য দণ্ডায়মান আছে, নিকটস্থ হইবামাত্র আমাকে দংশন করিবে, তাহা হইলে অতি যন্ত্রণাদায়ক জলাতঙ্ক রোগে আমাকে মৃত্যুপথে পতিত হইতে হইবে।

এই ভাবিয়া অন্য পথে গমন করিলাম। সে রাস্তায় গিয়াও দেখি সম্মুখে ঐ কুকুর। তদপর কুকুরকে এড়াইবার জন্য লুক্কায়িতভাবে নানা লোকের বাটির ভিতর দিয়া গিয়া দেখি সেই কুকুর দণ্ডায়মান। আমি যে দিকে যাই সেই দিকেই ঐ কুকুর। তখন আমি নিতান্ত ভীত হইলাম। মনে হইল এই কুকুরের নিকট আমার পরিত্রাণের উপায় নাই, এ নিশ্চয়ই আমাকে দংশন করিবে। এই ভাবিয়া কুকুরের নিকট আত্ম-সমর্পণ করাই কর্ত্তব্য বিবেচনায়, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে স্থির করিয়া কুকুরের নিকট গমন করিলাম।

কুকুরটা একটা বৃদ্ধা দরিদ্রা স্ত্রীলোকের কুটীরের ছাইচ তলায় শুইয়া আছে; আমি তাহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গ দিয়া তাহার চরণতলে পড়িলাম। তাহার পদধুলি লইয়া অষ্টাঙ্গে মাখিলাম এবং যোড় হস্তে বলিলাম—

আমি—আমায় ক্ষমা করুন, আপনাকে প্রহার করিয়া বড়ই কুকর্ম্ম করিয়াছি।

কুকুর—ক্ষমা কিসের? যে মার মারিয়াছ? আবার ক্ষমা?

আমি—আমার দুর্ম্মতি উপস্থিত হইয়াছিল, আমি না বুঝিয়া অপরাধ করিয়াছি; আমায় ক্ষমা করুন।

কুকুর—কোমরটা ভাঙ্গিয়া দিয়া আবার ক্ষমা ?

আমি—যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাত আর ফিরিবার উপায় নাই, এখন্ যে প্রতিকার করা যাইতে পারে তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

কুকুর—তুমি আমার জন্য কি করিতে পার?

আমি—আমি আপনার সেবার জন্য ১০০্ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি।

কুকুর—আচ্ছা এই বুড়িকে আপাততঃ ৫্ টাকা দাও ঐ টাকা হইতে বুড়ি আমার সেবা করিবে।

আমি—বুড়িকে টাকা দিতে গেলাম, এমন সময় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি গুরুকে প্রণাম করিয়া বলিলাম ঠাকুর আজ আমার খুব শিক্ষা দিলে, এত দয়া না হইলে আমার কি আর পরিত্রাণ ছিল?

এই স্বপ্নের দ্বারায় গুরু শিক্ষা দিলেন, কাহারও নিকট কোনরূপ অপরাধ করিয়া নিস্তার পাইবার উপার নাই, অপরাধ করিলেই তাহার শাস্তিভোগ করিতে হইবে। সমস্ত নর-নারী পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ এমন কি বৃক্ষ-লতাকেও উপযুক্ত সম্মান ও মর্য্যাদা দিয়া সকলের পদানত হইয়া ভজন করিতে হইবে।

আমি গুরু উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চিতা-শয্যায় শয়ান থাকিয়া ধৈর্য্য সহকারে নাম করিতে থাকিলাম।

গেল। আমার বিশ্বাস হইল, আমাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে না। শরীর-যাত্রা গোঁসাই কোন না কোন রকমে চালাইয়া দিবেন।

শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দাসী।

আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দাসী স্বভাবতঃ ধর্ম্ম-পরায়ণা ছিলেন। আমার দীক্ষার পর হইতেই তিনি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সন ১৩০০ সালের ভাদ্র মাসায় তাঁহার দীক্ষা লাভ হইলে, তিনি সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করেন। নাম করিবার সময় নামের প্রবল শক্তি তাঁহার দেহ ধারণ করিতে সমর্থ হইত না। অল্পক্ষণ নাম করিলেই নামের শক্তি-বলে প্রবল প্রাণায়াম উপস্থিত হইত, ক্রমে শরীর কাঁপিতে থাকিত, অশ্রু বিসর্জ্জন হইত, অবশেষে নৃত্য আরম্ভ হইত ; ক্ষণকাল নৃত্যের পর আছাড় খাইয়া তিনি পড়িয়া যাইতেন—এবং চক্রাকারে ঘুরিতেন ; তাঁহার শরীরে বিবিধ অঙ্গচেষ্টা হইত। পাছে তিনি আহত হয়েন এই আশঙ্কায় আমি নিকটস্থ জিনিস-পত্র সরাইয়া ফেলিতাম ; মাথার নিকট বালিস যোগাইয়া দিতাম এবং নাম করাইয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতাম।

এই জেলার অন্তর্গত ঠিবা নিবাসী শ্রীযুত নৃত্য গোপাল চট্টোরাজ একজন পরম ভক্ত বৈষ্ণব। তিনি

গোস্বামী মহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকেন। কলিকাতা হ্যারিসনরোডের বাসায় অবস্থিতি কালীন, চট্টোরাজ মহাশয় গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় চট্টোরাজ মহাশয়কে অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া অতি যত্নসহকারে আপনার নিকট তাঁহাকে সপ্তাহাধিককাল রক্ষা করেন, চট্টোরাজ মহাশয় প্রত্যহ গোস্বামী মহাশয়কে গান শুনাইতেন, গোস্বামী মহাশয় তাহাতে পরম প্রীতিলাভ করিতেন।

চট্টোরাজ মহাশয় বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী; এ দেশের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে তাঁহার নাম সুপরিচিত। তাঁহার ভজন যেন পাষানের রেখা। শরীর অসুস্থ বা অন্য কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলেও ভজনের ত্রুটী হইবে না। এরূপ নিষ্ঠাবান ধর্ম্মানুরাগী-সদাচারী লোক কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎসবের সময় বহু দিন হইতে ইনি সেবা-পূজার কার্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন।

ভ্রমণ উপলক্ষে শ্রীযুত নৃত্যগোপাল চট্টোরাজ মহাশয় সময় সময় আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন, এবং আবশ্যক মত ২।১ দিন অবস্থিতি করেন। সন্ধ্যারতির সময় চট্টোরাজ মহাশয় বাহির্বাটীতে ভজন-গান আরম্ভ করিলে তাঁহার কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়াই গৃহিনীর শরীর

অবশ হইয়া পড়িত ; তিনি আর দেহ ধারণে সমর্থা হইতেন না ; সময়ে সময়ে আছাড় খাইয়া ভূতলে পড়িয়া যাইতেন। চট্টোরাজ মহাশয় তুলসী প্রদক্ষিণ করিবার জন্য অন্দরে প্রবেশ করিয়া গৃহিনীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন ; ভাবিতেন একি ? আমরা এতকাল প্রাণপণে সাধন-ভজন করিতেছি, এ অবস্থার কণাও ত আমাদের মধ্যে দেখিতে পাই না। এ স্ত্রীলোক গৃহ মধ্যে আবদ্ধ, গৃহ কর্ম্মে সদাই ব্যস্ত, এই দেব-দুর্লভ অবস্থা কোথা হইতে পাইল ? মহাপুরুষের মহাশক্তি ব্যতিরেকে ইহা জীবে সম্ভবপর নহে। চট্টোরাজ মহাশয় গৃহিণীর শীয়রে বসিয়া কর্ত্তাল বাজাইয়া তাঁহাকে ভগবানের অমৃতময় নাম শুনাইতেন ; হরিনাম শ্রবণে তাঁহার চৈতন্য হইলে, তিনি চট্টোরাজ মহাশয়কে প্রণাম করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেন।

ভিখারীগণ ভিক্ষা করিতে আসিয়া বহির্বাটীতে খোল করতাল বাজাইয়া গান আরম্ভ করিলে, অন্দর মধ্যে গৃহিনীর ঐ রূপ অবস্থা হইত ; বাটীর লোক তাড়াতাড়ী অন্দর প্রবেশের দরজা বন্ধ করিয়া দিত, এবং গৃহিনীর শরীর রক্ষার জন্য তাঁহার পুত্র কন্যাগণ চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইত। তাঁহারা অতি সন্তর্পণে মাতার দেহ-রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। চৈতন্য না হওয়া পর্য্যন্ত ভিক্ষুকগণকে অধিক পয়সা কবুল করিয়া গান করাইতে থাকিত ;

কিছুতেই গান থামাইতে দিত না *। অবশেষে গৃহিণীর চৈতন্য সম্পাদন হইলে ভিক্ষুকগণকে প্রচুর পয়সা দিয়া বিদায় দিত।

গুরু-কৃপায় গৃহিণীর অন্তরে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল; তিনি চাকর-চাকরাণীকে শাসন করিতে পারিতেন না। ঘরের জিনিস-পত্র বহুল পরিমাণে অপচয় হইয়া যাইত; সংসারের কাযকর্ম্ম সুশৃঙ্খলায় চলিত না। সন্তান-সন্ততি বা স্বামীর প্রতি তাঁহার বড় একটা মমতা ছিল না; তিনি জানিতেন এ সব কিছুই কিছু নয়। নিশার স্বপ্ন মাত্র। দুই দিন পরে ইহার কিছুই থাকিবে না। সংসারের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া আমি সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতাম। একদিন তাঁহাকে বলিলাম ঃ—

আমি—তুমি সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত কর না, সমস্ত

---

* সঙ্গীত শ্রবণে যদি গুরুশক্তির আবির্ভাব হয় তাহা হইলে ভাবানুরূপ গানে এই শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয় এবং সাধক তখন অমৃত সাগরে ভাসমান থাকে। হঠাৎ গান বন্ধ বা গানের বেভাব হইলে সাধকের দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, উৎকট ব্যারাম হয়, মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই কারণ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত আর রসাভাস।
ইহা শুনি মহাপ্রভুর না হয় উল্লাস॥

জিনিস-পত্র অপচয় হইয়া যাইতেছে, এমন করিয়া কি প্রকারে সংসার চলে ?

গৃহিণী—আমি কি করিব ? নাম করিব না সংসার লইয়া থাকিব ?

আমি—নামও করিবে সংসারও করিবে। "হাতে কাজ মুখে নাম।" কাজ না করিলে, কর্ম্মক্ষয় হয় না।

গৃহিণী—আমি নাম ও কাজ এক সঙ্গে করিতে পারি না। নাম করিলে আমার শরীর অবশ হইয়া পড়ে, এই জন্য কাজ করিতে হইলে নাম পরিত্যাগ করিয়া কাজ করিতে হয়।

আমি—কাজ করিবার জন্য যদি নাম ত্যাগ করিতে হয়, এমন কাজ করিবার প্রয়োজন নাই ;—সংসার ভাসিয়া যায় যাউক, নাম কদাচ ত্যাগ করিবে না। নাম অপেক্ষা কিছুই বেশী নহে, এক নাম হইতেই সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যাইবে।

স্বামীর মনস্তুষ্টি জন্য গৃহিণী এই সময় হইতে গৃহ কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। ঘরের কাজ-কর্ম্ম কিছু কিছু দেখিতে লাগিলেন।

আমার বাসায় গৃহিণীকে পাকের কাজ করিতে হইত না, পাচক-পাচিকা দ্বারায় এ কাজটা বরাবর নির্ব্বাহ

থাকিলে তাঁহাকে নিজেই রান্নার কাজটা সম্পন্ন করিতে হইত। একদিন রন্ধনশালায় তিনি পাক-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন এমন সময় তিনি মনে করিলেন স্বামী বলিয়াছেন "হাতে কাম মুখে নাম"। স্বামীর কথা রক্ষা করিবার জন্য রন্ধন করিতে করিতে তিনি নাম আরম্ভ করিলেন। নাম করিতে করিতে তিনি গৃহ মধ্যে আছাড় খাইয়া পড়িলেন, বহুবিধ শারিরীক চেষ্টা আরম্ভ হইল, নাথির চোটে ঘড়া ঘটি বাসন তফাতে ছুটিয়া গড়াইতে লাগিল, ঘড়ার জলে ঘর পরিপূর্ণ হইল, বানান তরকারি চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া গেল। * প্রতিবেশিনী দুইটী গোয়ালার মেয়ে দুধ দিতে আসিয়াছিল, তাহারা ভয়বিহ্বলচিত্তে এই ব্যাপার দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

কিছুকাল পরে গৃহিণী সংজ্ঞা লাভ করিলে, প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোক দুইটী গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল,—

প্রতিবেশিনী—এই ব্যারাম আপনার কত দিন হইয়াছে ?

গৃহিণী—অনেক দিন হইয়াছে ?

প্রতিবেশিনী—বাবু ইহার চিকিৎসা করান না কেন ?

---

* কেহ কেহ বলিবেন ইহা স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা বা হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি কোন ব্যারামের কার্য্য। যাঁহারা অধ্যাত্ম রাজ্যের খবর রাখেন না কেবল সংসারের চতুঃসীমা মধ্যে যাঁহাদের জ্ঞান আবদ্ধ, তাঁহারা ইহা ভিন্ন আর কি বলিবেন ?

গৃহিণী—তিনি আর এ ব্যারামের কি চিকিৎসা করাইবেন ?

প্রতিবেশিনী—ভাল ডাক্তার বা কবিরাজ দেখাইতে হয়।

গৃহিণী—এ ব্যারাম ভাল করা ডাক্তার কবিরাজের কাজ নহে।

প্রতিবেশিনী—তবে কোন ঠাকুর-দেবতা স্থানে যান না কেন ?

গৃহিণী—ঠাকুর-দেবতার স্থানে গেলে ব্যারাম আরও বাড়িয়া যায়।

প্রতিবেশিনী—এ ব্যারাম অনেক দিন হইয়াছে, এখন কিছু কিছু নরম পড়িতেছে ত ?

গৃহিণী—নরম পড়িবে কি, দিন দিন বাড়িতেছে।

এই সকল কথাবার্ত্তার পর গোয়ালিনীগণ ভাবিতে ভাবিতে বাটী হইতে চলিয়া গেল। আমি গৃহিণীকে বলিলাম আর তোমার রান্ধিতে বা সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে হইবে না। আমি অন্য লোক দ্বারায় এ সব কার্য্য সমাধা করিব; তুমি কেবল বসিয়া বসিয়া নাম করিবে। নাম অপেক্ষা সংসার বেশী নহে, সংসারটা ভাসিয়া যায়, যাউক।

একদিন গৃহিণী আমাকে বলিবেন,—

গৃহিণী—আমাদের শীঘ্র অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইবে

আমি—কেন এমন কথা বলিতেছ ?

গৃহিণী—আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এরপর দেখিতে পাইবে।

আমি—কিসে তোমার এ জ্ঞান হইল ?

গৃহিণী—আমি স্বপ্নে দেখিলাম, লক্ষ্মী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমি—তুমি কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছ, আমাকে আদ্যোপান্ত খুলিয়া বল।

গৃহিণী বলিতে লাগিলেন আমি স্বপ্নাবস্থায় দেখিলাম এক ব্রাহ্মণ কন্যা বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনি গৌরাঙ্গী ও বয়স্থা, কপালে সিন্দুর, পরিধেয়—কস্তাপেড়ে কাপড়, হাতে শাঁখা। তিনি বাসায় আসিয়া আমাকে বলিলেন, "কামিনী, আমি ছেলেবেলা হইতে তোমাকে বড় ভালবাসি, অনেক দিন দেখি নাই, তাই দেখিতে আসিয়াছি।" আমি প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলী লইলাম ও তাঁহাকে বসিতে আসন দিলাম। ক্ষণকাল কথাবার্ত্তার পর তিনি বলিলেন, "এখন আমি চলিলাম, আবার আসিব।" তিনি গাত্রোত্থান করিলে আমি ২৲ দুই টাকা নগদ ও এক যোড়া শাড়ী তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি কাপড় ও টাকা লইয়া বিদায় হইলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

গোয়াল-বাটীতে আসিয়া তিনি গরু দেখিয়া বলিলেন, "আহা গরুর কি কষ্ট।" আমি বলিলাম "আমি কি

করিব, গরুর সেবার জন্য চাকর রাখিয়াছি, খৈল, খড়, জিউলীর কোন অভাব নাই, চাকরেরা ভাল করিয়া সেবা করে না।” তাহাতে তিনি বলিলেন “তুমি স্ত্রীলোক, তুমি আর কি করিবে?’ এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন; যাইবার সময় বলিলেন “আবার আমি আসিব।” এই স্বপ্ন দেখা অবধি আমার মনটা বিষণ্ণ হইয়াছে। গৃহিণীর মুখে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া আমি বলিলাম :—

আমি—যাঁহাকে তুমি স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলে তিনি যে লক্ষ্মী এ কথা তোমাকে কে বলিল?

গৃহিণী—তবে তিনি কে?

আমি—আমার ধারণা, তিনি অদ্বৈত-ঘরণী সীতা ঠাকুরাণি কৃপা করিয়া তোমাকে দর্শন দিয়াছেন। লক্ষ্মী হইলে তাঁহার গলদেশে মালা, হস্তে শঙ্খ; মস্তকে মুকুট থাকিত। আমাদিগকে যে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়াছেন, একথা মনে স্থান দিও না।

এই ঘটনার পর হইতে গৃহিণী বুঝিলেন, গোসেবার ত্রুটি হইলে গৃহস্থের কথনও মঙ্গল হয় না। এই জন্য সংসারের সমস্ত কায পরিত্যাগ করিয়া গো সেবায় মনোযোগী হইলেন। গরুর সেবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতেন; নানা স্থান হইতে কলাই, ভুসী, কুঁড়া, মহুল ইত্যাদি আনাইয়া গরুকে থাওয়াইতেন; গরুও যথেষ্ট দুগ্ধ প্রদান করিত।

গৃহিণী সংকীর্ত্তন শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। সংকীর্ত্তন শুনিতে বসিয়া দেহ সম্বরণ করিতে পারিতেন না; একারণ আমি তাঁহাকে অন্যত্র সংকীর্ত্তন শুনিতে পাঠাইতাম না। সময়ে সময়ে তাঁহার কর্ণতৃষ্ণা * উপস্থিত হইত। তিনি সেই সময় সঙ্গীতাভিজ্ঞা নিকটবর্ত্তী বৈষ্ণবী-গণকে আনাইয়া তাহাদের নিকট গান শুনিতেন এবং প্রচুর পয়সা দিয়া বিদায় করিতেন।

ঠাকুর দর্শনেও সময়ে সময়ে গৃহিণী দেহ সম্বরণে অসমর্থা হইতেন। একদিন পুরুষোত্তমে ৺জগন্নাথ দেব সদর্শন করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিয়া জগমোহন মধ্যে

---

* কর্ণ তৃষ্ণা কি একথা বুঝাইয়া বলিবার নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরকে বলিয়াছিলেন "কর্ণতৃষ্ণায় মরি পড় রসামৃত শুনি।" সাধনের একটু পরিপক অবস্থায় সময়ে সময়ে কর্ণতৃষ্ণা উপস্থিত হয়। এই কর্ণতৃষ্ণা উপস্থিত হইলে কাণের ভিতর ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক কট্‌কটানি উপস্থিত হয়; সাধক অস্থির হইয়া পড়ে। এই কট্‌কটানি যাহার উপস্থিত হয় নাই এই কট্‌কটানি সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে না। ফলতঃ ইহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। এই কর্ণতৃষ্ণা উপস্থিত হইলে যদি কেহ সুললিত স্বরে ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন বা লীলা গান করিতে থাকে তাহা হইলে কর্ণ জুড়াইয়া যায়, কানের ভিতরে যেন অমৃতধারা বর্ষণ হইতে থাকে। জ্বালাযন্ত্রণা মুহূর্ত্ত মধ্যে চলিয়া যায়।

নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে আছাড় খাইয়া পড়িলেন ; তাঁহার শরীরে বিবিধ অঙ্গচেষ্টা হইতে লাগিল। সেস্থানে অনেকগুলি গুরুভগ্নি উপস্থিত ছিলেন। পাছে এই দৃশ্য সাধারণের দৃষ্টিপথে পড়ে এই আশঙ্কায় তাঁহারা মুহূর্ত্তমধ্যে গৃহিণীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রকৃতিস্থ হইবামাত্র আশ্রমে লইয়া আসিলেন। আমি সেই দিন হইতে তাঁহাকে সহসা জগন্নাথ দেব দর্শন করিতে যাইতে দিতাম না। যখন দর্শনে যাইবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইত, তখন গুরু ভগ্নিগণকে সঙ্গে লইয়া দল বান্ধিয়া দর্শনে যাইতেন।

পাঠক মহাশয়গণ, আপনারা অবগত আছেন ১৩০২ সাল হইতে আমার বাসায় শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎসব হইয়া আসিতেছে। এই উৎসবে গৃহিণীর অদম্য উৎসাহ ছিল ; উৎসবের মাসাধিক পূর্ব্ব হইতে তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া অতি বিশুদ্ধভাবে প্রচুর আয়োজন করিতেন। একাল পর্য্যন্ত কখনও কোন জিনিসের অভাব বা অনাটন হয় নাই। উৎসব উপলক্ষে গুরু-ভগ্নিগণ কলিকাতা হইতে সমাগত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে সমস্ত ভাণ্ডার ছাড়িয়া দিতেন। ব্যয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। প্রচুর ব্যয় করিয়াও ভাণ্ডার ফুরাইত না। গুরু-ভগ্নিগণকে ভাণ্ডার ছাড়িয়া দিয়া ভোগ-পূজা ও সংকীর্ত্তনে তিনি মত্ত হইয়া থাকিতেন। উৎসবের কয়েক দিন তাঁহার বড় একটা ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকিত

না ; কেবল ২।১ গেলাশ সরবৎ খাইতেন। তিনি সর্ব্বদাই ভাবে বিভোর থাকিতেন ; শরীরে তখন মত্ত সিংহীর বল। সংকীর্ত্তনের সময় তিনি যে ঘরে বসিয়া সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন পাছে সংকীর্ত্তনের মধ্যে লাফাইয়া পড়েন এই আশঙ্কায় ঐ ঘর বাহির হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইত। চিকের বা পরদার আড়ালে তাঁহাকে রাখা হইত না। যতক্ষণ সংকীর্ত্তন হইত ততক্ষণ কেবল হুঙ্কার, গর্জ্জন, ক্রন্দন, নৃত্য আর বিবিধ প্রকার অঙ্গ চেষ্টা। তাঁহার কন্যা ও গুরুভগ্নিগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া তাঁহার দেহ রক্ষা করিতেন। যখন অন্যান্য গুরু ভগ্নিগণের এই দশা উপস্থিত হইত তখন গৃহ মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া যাইত ; ঘর দরজা চুরমার হইত, ক্রন্দনের রোলে আকাশ বিদীর্ণ হইত, কে কাকে সামলায়. কে কাকে ধরে। সময়ে সময়ে দেহে রক্তারক্তী হইয়া যাইত।

এই উৎসবের সময় একদিন আসনে ভগবানের পাদপদ্মের চিহ্ন পড়িল, উপস্থিত গুরু ভাইগণ তাহা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দেখা শেষ হইলে স্ত্রীলোকেরা দেখিতে গেলেন। আসনে ভগবানের পাদপদ্মের চিহ্ন দেখিয়া গৃহিণী মূর্চ্ছিতা হইয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন এবং ঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবলবেগে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। পাছে পদাঘাতে ভোগ সামগ্রী চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে

এই আশঙ্কায় দাদামহাশয় বলপূর্ব্বক গৃহিণীকে চাপিয়া ধরিলেন। আমাদের দেশে ভাসুর কখনও ভাদর বৌকে স্পর্শ করে না। উপযুক্ত লোক না থাকায় দাদা মহাশয় বাধ্য হইয়া ভ্রাতৃবধুকে ধরিয়াছিলেন একারণ তিনি আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া গঙ্গা স্নান করিয়া আসিলেন।

উৎসবের কাঙ্গালী ভোজনে তিনি সবিশেষ যত্নবতী ছিলেন। কাঙ্গালীদের আহারের জন্য তিনি প্রচুর আয়োজন করিতেন। সকলকে যত্নপূর্ব্বক আহার করাইতেন। আহারান্তে আর যে যাহা পারিত বাড়িতে লইয়া যাইত। যতক্ষণ কাঙ্গালী-ভোজন শেষ না হইত ততক্ষণ তিনি বিশ্রাম করিতেন না।

গৃহিণীর অতি সুন্দর দেবদর্শন হইত। তিনি জাগ্রত অবস্থাতে চর্ম্মচক্ষেই দেখিতেন, কখন কখন রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। কখন কখন তাঁহারা তাহার বক্ষঃস্থলে কখনও স্কন্ধ দেশে আসিয়া দাঁড়াইতেন। তখন তিনি তাঁহাদের দুইজনকে দুই হাতে লইয়া নাচাইতে থাকিতেন। কোন কোন সময় দেখিতেন রাধাকৃষ্ণ পরস্পর পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া ত্রিভঙ্গিমভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, আর সখিগণ হাত ধরাধরি করিয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া

অলৌকিক রূপ-লাবণ্যে প্রাণ মন কাড়িয়া লইতেছে। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে গৃহিণী আত্মহারা হইয়া যাইতেন, এবং লম্ফ প্রদান করিয়া সখিগণের সহিত মিলিত হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া রাধাকৃষ্ণের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন এই জ্ঞান হইত। উৎসব কালীন যখন সংকীর্ত্তন হইত তখন যে সময়ে যে দেবতার আবির্ভাব হইত তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেন। কখন দেখিতেন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্ত সঙ্গে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন, কখন দেখিতেন রাধাকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। যে সময়ে সংকীর্ত্তনে ঠাকুরদের আবির্ভাব হইত সেই সময়ে সংকীর্ত্তনের খুব জমাট বাঙ্কিত, চারিদিকে শক্তির খেলা ছড়াইয়া পড়িত।

উৎসব শেষ হইলে গুরু ভাই-ভগ্নিগণ দেশে যাইবার জন্য যখন বিদায় লইতে আসিতেন, তখন প্রায়ই তিনি আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেন না; কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেন, তাঁহার শরীরে বিবিধ অঙ্গ-চেষ্টা হইতে থাকিত? এই অবস্থায় গুরুভাইগণ আর যাইতে পারিতেন না, তাঁহারা তাঁহাকে মধুর স্বরে হরিনাম শ্রবণ করাইতে থাকিতেন; পরে তাঁহার সংজ্ঞা লাভ হইলে বিদায় হইয়া যাইতেন।

গৃহিণীর মনের একাগ্রতা অত্যন্ত প্রবল ছিল, নির্বাত

তেন। নামের সময় অন্য চিন্তা তাঁহার মন মধ্যে স্থান পাইত না। সেই সময় কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে মহা বিরক্ত ও দুঃখিতা হইতেন। তিনি আমাকে প্রায়ই বলিতেন "এই কোলাহলময় সংসারে আর আমি থাকিতে পারি না, আমাকে কোন তীর্থ-স্থানে পাঠাইয়া দাও আমি সেখানে নির্জ্জনে থাকিব।" আমি তাঁহাকে বলিতাম :—

আমি—তোমার স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনি, মাতা, ভাই সমস্ত বর্ত্তমান, ইহাদের জন্য তোমার মন কেমন করিবে না?

গৃহিণী—কাহারও জন্য আমার মন কেমন করিবে না, ইহারা কেহই আপনার নয়, পায়ের বেড়ি মাত্র।

আমি—শিশু ছেলের জন্য তোমার মন কেমন করিবে না?

গৃহিণী—কিছু না। কেহ কাহারও পুত্র নহে, কেহ কাহারও মাতা নহে। জীব আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করে, আর কাল পূর্ণ হইলে চলিয়া যায়। মানুষ যে আমার আমার বলিয়া মরে এ কেবল মায়া, সংসার বন্ধনের হেতু।

আমি—এমন কথা মুখে আনিও না। সংসার

নহে, সংসার ভগবানের। স্বামী পুত্র ইত্যাদি সকলেই ভগবানের এক এক রূপ মনে করিবে। ভগবত-সেবা মনে করিয়া স্বামী-সেবা ও সন্তান-পালন করিবে। দীক্ষার সময় গুরু তোমাকে কি বলিয়াছেন তাহা কি তোমার মনে নাই? "পতিকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে তাঁহার সেবা করিবে।'

গৃহিণী—সংসারে বড় ঝন্‌ঝট্, সংসার লইয়া থাকিতে হইলে আর সাধন ভজন চলে না। নাম করিবার সময় পাওয়া যায় না!

আমি—সংসারে নানা ঝন্‌ঝট্, নাম করিবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না একথা সত্য। সংসারের কাযকর্ম্মে সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে ভগবানের নাম করিবার সময় পাওয়া যাইতেছে না ; এই জন্য প্রাণের মধ্যে যে কাতরতা উপস্থিত হয় সেই কাতরতাই মানুষকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিয়া দেয়। প্রাণের পিপাসা যতই বলবতী হইবে, বুঝিতে হইবে ভগবানের দিকে ততই অগ্রসর হইতেছি। যাহাদের প্রচুর সময় আছে তাহারা নাম করিতে পারে না, কেবল খেলাধুলা ও বৃথা গল্প করিয়া সময় ক্ষেপণ করে। সমস্ত দিন খাটিয়া কাতর প্রাণে ভগবানকে

অল্পক্ষণ ডাকিলেই যথেষ্ট হইল জানিবে। মহাভারতের সেই জাবালী মুনির গল্প কি শুন নাই ?

গৃহিণী—গল্পটা কি আমাকে বলুন শুনি।

আমি—জাবালী মুনি বহু কাল ঘোরতর তপস্যা করিয়া মহাশক্তি সম্পন্ন হইয়াছিলেন। একদা তিনি বন মধ্যে বিচরণ করিতেছেন এমন সময় একটা বক উড়িতে উড়িতে তাঁহার গাত্রে বিষ্ঠা ত্যাগ করিল। মুনিবর ক্রোধভরে যেমন ঐ বকের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অমনি সেই বকটা ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ইহাতে জাবালী আপনাকে মহা শক্তিশালী জ্ঞান করিলেন। সেই দিন ঐ মুনি ভিক্ষার্থে কোন কৃষকের আলয়ে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন, এমন সময় কৃষক হল কর্ষণ করিয়া গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃষক-পত্নী স্বামীকে সমাগত দেখিয়া বসিতে আসন দিলেন ; জল আনিয়া পাদপ্রক্ষা-লন করিয়া দিয়া বায়ু-ব্যাজন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া মহামুনি মহাক্রুদ্ধ হইয়া কৃষক-পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পাপী-

না আমি কে? আমি দ্বারদেশে উপস্থিত রহিয়াছি আর তুই আমাকে অগ্রাহ্য করিতেছিস্?

কৃষক-পত্নী—আমি জানি, আপনি কে। আমিত আর কাগী-বগী নই যে আপনি আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন, বন মধ্যে একটা বক ভস্ম করিয়া এত আস্পর্দ্ধা?

মুনিবর কৃষক-পত্নির কথায় অবাক হইয়া গেলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন আমি যে অদ্য বন মধ্যে একটা বক ভস্ম করিয়া আসিয়াছি কৃষক পত্নী একথা কেমন করিয়া টের পাইল। পরে প্রকাশ্য ভাবে কৃষক পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—

সন্ন্যাসী—আমি অদ্য বনমধ্যে যে একটা বক কাক ভস্ম করিয়া আসিয়াছি একথা তুমি কেমন করিয়া টের পাইলে।

কৃষক পত্নী—ঠাকুর আপনারা কঠোর তপস্যা করিয়া যাহা কিছু লাভ করেন আমি এক মাত্র পতি সেবাতেই সেই সমস্ত লাভ করিয়া থাকি।

তৎপর কৃষক পত্নী অতি সমাদরে মুনিবরের সৎকার করিলেন; মুনিবর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। গৃহিণী এই সকল কথা স্থিরভাবে শুনিলেন, তৎপর আমাকে হাঁসিয়া বলিলেন:—

গৃহিণী—আপনি যাহাই বলুন, নারী জন্ম পাপ জন্ম, স্ত্রীলোক চির পরাধীন।

আমি—"নারী জন্ম পাপ জন্ম, স্ত্রীলোক চির পরাধীন" একথা কেন বলিতেছ ? আমি স্পষ্ট দেখিতেছি বহু পুণ্য ফলে নারী জন্ম লাভ হইয়া থাকে। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য স্ত্রীলোককে পাপাচরণ করিতে হয় না, একারণ তাহাদের মন সদাই পবিত্র থাকে। সংসার প্রতি পালনের জন্য পুরুষকে আজীবন অর্থোপার্জ্জন করিতে হয় না; অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলেই তাহাকে তোষামোদ, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, শঠতা, কপটতা ইত্যাদির আশ্রয় লইতে হয়। এখন যেরূপ দেশ কাল পড়িয়াছে তাহাতে মানুষ চাকরীই করুক আর ব্যবসাই করুক আর অন্য কোন কার্য্যই করুক, এই সমস্ত পাপাচরণ তাহার এড়াইবার উপায় নাই। স্ত্রীলোকগণকে এই সকল পাপাচরণে লিপ্ত হইতে হয় না। তাহারা হুকুম করিয়াই খালাস। আবশ্যকীয় জিনিস-পত্র সংগ্রহের ভার পুরুষের উপর। আর নারী-জীবন পরাধীনই বা কিসের ? স্ত্রীলোক গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী; তিনি সংসারে যাহা করেন তাহাই হয়; স্ত্রীর অস-

স্মৃতিতে স্বামী কোন কায করিতে পারে না। সংসারের যাবদীয় সুখ স্ত্রীর হাতে। স্ত্রী, পুরুষকে ক্ষুধার সময় অন্ন দেয়, তৃষ্ণায় জল দেয়, রোগে সেবা করে, দুঃখের সময় প্রাণে সান্ত্বনা ঢালিয়া দেয়। উচ্ছৃঙ্খল পুরুষকে স্ত্রীই সংযত করে। এই জন্য শাস্ত্রে স্ত্রীকে গৃহলক্ষ্মী বলিয়া থাকে। যাহার স্ত্রী নাই তাহার গৃহ শশ্মান-ভূমি। পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য দেশে স্ত্রীলোক পূজিত হইয়া আসিতেছেন। স্ত্রীলোকেরা সকল দেশেই ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আমি যখন হিন্দু রমণীর বিষয় চিন্তা করি তখন আমার প্রাণ একেবারে বিগলিত হইয়া যায়, আমি প্রাণের প্রগাঢ় ভক্তি পুষ্প তাঁহাদের চরণে অর্পণ করি। তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য না করিয়াছেন এমন কায নাই; স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছেন, সতীত্ব রক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ নারী চিতানলে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানের মুখ দর্শন করেন নাই; আর্য্য নারীগণ বাদশাহের রাজসিংহাসন বাম পদে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। এ দৃষ্টান্ত জগতে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি যে হিন্দু কুলে, হিন্দু রমণীর

গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তজ্জন্য আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি। এখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় হিন্দু-প্রকৃতি নষ্ট হইয়া যাইতেছে ইহাই আমার দুঃখ।

এইরূপ গৃহিণীর সহিত সময়ে সময়ে নানা বিষয়ের আলোচনা হইত, তাঁহার ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠা ছিল; তিনি গুরুআজ্ঞা প্রাণপণে প্রতি পালন করিতেন। সর্ব্বদা শুচি ও সদাচারী থাকিতেন। ধর্ম্মের জন্য তিনি অকাতরে ব্যয় করিতেন, ধর্ম্মার্থে সর্ব্বদা ব্যয় করিলেও তিনি আমাকে কখনও নিষেধ করিতেন না। তিনি বলিতেন ধর্ম্মার্থে যতই ব্যয় করিবে ভগবান ততই যোগাইবেন, আর যত কৃপণতা করিবে, ততই তিনি হাত গুটাইবেন। ব্যয় কর কখনও অভাব হইবে না।

অতিথি সৎকারের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল, তিনি কখন অতিথি বিমুখ হইতে দিতেন না, ভিখারীও ফিরাইতেন না। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা আদৌ জানিতেন না বলিলেই হয়। কখনও লাগালাগি ভাঙ্গাভাঙ্গী করিতেন না। কাহারও সহিত ঝগড়া, বিবাদ বিসম্বাদ করিতেন না। অন্য লোকে অকারণ গালাগালি বা ঝগড়া করিলে চুপ করিয়া থাকিতেন। চাকর চাকরাণিগণকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন। তাহাদের যথোচিত সাহায্য

স্ত্রী বিয়োগ।

আমার দুঃখময় জীবনের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিলে গাছের পাতা খসিয়া পড়ে, সমুদ্রের জল শুকাইয়া যায়। এই গ্রন্থ আমার জীবনী নহে, সদগুরু আমার জীবনে যে সকল লীলা করিয়াছেন ও করিতেছেন এই গ্রন্থে কেবল তাহাই লিখিত হইতেছে একারণ জীবনের সমস্ত ঘটনা পাঠক মহাশয়গণকে জানাইতে পারিলাম না। আর দুঃখের কথা লিখিয়া পাঠক মহাশয়গণের প্রাণেও আঘাত দিতে ইচ্ছা করি না।

গৃহিণী আমার সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। বাসা খরচের টাকা হইতে কিছু কিছু রাখিয়া ও আমার নিকট সময়ে সময়ে চাহিয়া লইয়া তিনি অনেক গুলি টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই কথাটা আমার নিকট তিনি গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তৃতীয় জামাতা আমার কন্যার নিকট সন্ধান পাইয়া দোকানে ঐ টাকা খাটাইবেন এবং মাসে মাসে কিছু কিছু সুদ দিবেন বলিয়া গৃহিণীর নিকট হইতে ঐ টাকা গুলি বাহির করিয়া লইয়া যান। দোকান উঠিয়া গেল, সুদ বা আসল তিনি কিছুই পাইলেন না; একারণ তাঁহার প্রাণে একটা বিষম আঘাত

লাগিল। আবার দোকানের ঋণদায়ে আমার উপর বহু টাকার ডিক্রি হইল; ডিক্রি জারিতে আমার ঘর, বাড়ী, জমি, পুষ্করিণী, বাগান ইত্যাদি ক্রোক হইল, আমার যাবদীয় অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হইবার আদেশ হইল; আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইল, আমি নানাস্থানী হইলাম। আমাদের অপমান লাঞ্ছনার সীমা থাকিল না; শত্রুগণ হাঁসিতে লাগিল; সন্তান-সন্ততিগণ লইয়া আমাদিগকে একেবারে গাছতলায় দাঁড়াইতে হইবে এই সমস্ত ভাবিয়া গৃহিণী অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হাতে এমন অর্থ নাই যে আমাকে অর্থ দিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন বা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। আমার বৃদ্ধ বয়স, ওকালতী নাই বলিলেই হয়। গৃহিণীকে চিন্তাকুল ও বিমনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলাম। আমি বলিতে লাগিলাম, ধর্ম্ম লাভ সহজে হয় না। যাঁহারা ধর্ম্ম লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বহু দুঃখ, যন্ত্রণা, অপমান, লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া এবং লুচী মণ্ডা আহার করিয়া কথনও ধর্ম্ম লাভ হয় না। সংসার-সুখের লেশ মাত্র অন্তরে থাকিলে ধর্ম্ম বহু দূর জানিবে। এজন্য ভগবান যাঁহাকে আত্মসাৎ করিবেন, তাঁহাকে যাবদীয় সংসার-সুখে বঞ্চিত

ভোগ করিয়াছেন তাহা কি তুমি জান না? যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তিনি তিনবার আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, মহাপুরুষেরা বারম্বার তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাভারতের পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীর কথা একবার ভাবিয়া দেখ। তিনি রাজসূয় যজ্ঞের পাটরাণী, ত্রিলোক পূজিতা। এক বস্ত্রা দ্রৌপদীকে দুঃশাসন কেশাকর্ষণ করিয়া রাজসভায় লইয়া গেল, স্বামীসমক্ষে তাঁহার কত অপমান। আবার রাজ্য হারাইয়া বনবাসিনী হইয়া নিস্তার নাই। জয়দ্রথ বন মধ্যে গমন করিয়া কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে হরণ করিল। তৎপর বিরাটের বাড়িতে দাসী হইয়া থাকিতে হইল, তথায় কীচকের হাতে তাঁহার কত লাঞ্ছনা। দুবৃত্তের পদাঘাত সহ্য করিতে হইল। তোমার কি হইয়াছে? এ পর্য্যন্ত তোমাকে একখানি গহনাও বিক্রয় করিতে হয় নাই, এত ভাবনা কিসের?

একবার বলি রাজার কথাটা ভাবিয়া দেখ। মহাবল বলি ত্রিলোকের অধীশ্বর ছিলেন, ভগবান বামনরূপে ছলনা করিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিলেন; পরে তাঁহাকে বন্ধন করিয়া তাড়না করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা আসিয়া ভগবানকে বহু স্তব স্তুতি করিলেন, ভগবান শান্ত হইলেন না; ভক্ত প্রহ্লাদ পৌত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া বহু স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন কিন্তু ভগবান কিছুতেই

ক্ষান্ত হইলেন না। বলি রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন, বিপক্ষ দেবতাগণ কত হাসি-ঠাট্টা করিতে লাগিল, বলির দুর্দ্দশার সীমা থাকিল না। তখন বলির স্ত্রী বৃন্দাবলী করযোড়ে স্তব করিয়া ভগবানকে বলিতে লাগিলেন "এই অসুরটার প্রতি দয়া করুন, এ নিতান্ত মূঢ়; এ জানে না যে আপনি এই সমস্ত চরাচরের অধিপতি; এ নিজকে বিশ্বপতি মনে করিয়া আপনাকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিতে প্রতি-শ্রুত হইয়াছিল; ইহার যদি কিছু মাত্র জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে নিজকে বিশ্বপতি কদাচ মনে করিত না। এরূপ মূঢ়ের উপর কি রাগ করিতে আছে; প্রভু ক্ষান্ত হউন। তখন ভগবান বৃন্দাবলীকে হাসিয়া বলিলেন। বলি আমার পরম ভক্ত, আমি উহার প্রতি ক্রোধ করি নাই; আমার দয়াই এইরূপ। যে আমার ভক্ত, আমি তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া থাকি। বলি ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া পাছে আমাকে ভুলিয়া যায়, সেই জন্য আমি তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিলাম। তৎপর ভগবান মহারাজ বলিকে পরম গতি প্রদান করিলেন। বলি পাতালের রাজা হইলেন, আর ভগবান তাঁহার দ্বারে দ্বারী হইয়া থাকিলেন।

এ জগতে মানুষ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। যে ব্যক্তি ধর্ম্মা-চরণে প্রবৃত্ত হইবে, সকলে তাহার বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে। অধিক কি পিতা মাতা পর্য্যন্ত শত্রুতা আরম্ভ করিবে।

প্রহ্লাদ পিতার হস্তে বহু নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, কয়াধু পুত্রের মুখে বিষ তুলিয়া দিয়াছিলেন। রাবণ বিভিষণকে পদাঘাতে লঙ্কা হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন। যাঁহারাধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন তাঁহাদের দুঃখ অনিবার্য্য!

কামিনী—আমি দেখিতেছি ইহ সংসারে সকলে বেশ সুখে সচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছে, কেবল আমাদেরই কষ্ট।

আমি—তুমি লোকের কি এত সুখ দেখিলে, আর আমাদেরই বা এত কষ্ট কিসের?

কামিনী—লোকে কেমন হেঁসে খেলে, আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাইতেছে। আমরা সর্ব্বদা কেবল মনাগুনে দগ্ধ হইতেছি।

কামিনীর মুখে এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলাম; তাঁহাকে বলিলাম, "সংসার সর্ব্বস্ব লোকের সুখ দুঃখের সহিত আমাদের সুখ দুঃখের তুলনা হইবে না। আমরা যাহা পরম দুখে মনে করি সংসারী লোকের তাহাই পরম সুখ। আমরা যাহা মল মূত্রের ন্যায় ত্যাগ করি, সংসারী লোকে তাহাই পরমাদরে অঙ্গে লেপণ করে। দেখ সন্তান সন্ততি লইয়া লোকের কত সুখ। একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে আনন্দে

বুক হইতে নামাইতে চাহে না; চক্ষের আড়াল করিতে পারে না। পুত্রবধু, জামাই, বেয়াই, কুটুম্ব লইয়া কত আমোদ। যাহাদের সন্তান নাই তাহারা একটা পোষ্য-পুত্র লইয়া আপনাদের সুখাভিলাষ পূর্ণ করে। আমাদের কিন্তু ঠিক বিপরীত। সন্তান সন্ততিকে পায়ের বেড়ী মনে করি; ইহারা চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ, ইহাদিগকে লালন পালন করিতে বৃথা সময় নষ্ট হয় এজন্য আমাদের মন বিষণ্ণ হইতে থাকে; ইহারা মরে গেলেই বাঁচি। মনে হয় বন্ধন মুক্ত হইলাম।

বিবাহ আদি উৎসবে লোকের কত আনন্দ! কুটুম্ব সাক্ষাতের হুলাহুলী, ভোজের ধুম ধাম, বাজনা বাদ্যের ও নৃত্য গীতের কত আয়োজন। আমোদ আহ্লাদের সীমা নাই। এই সকল আমোদ আহ্লাদে আমাদের গায়ে কিন্তু জ্বর আসে, ঢাকের বাদ্য যেমন থামিলেই সুয়াস্তি এই সকল কোলাহল দূর হইলেই আমাদের নিষ্কৃতি।

দেখ আমাদের ভোজ কাযে খাইবার উপায় নাই, লোকে আচার ভ্রষ্ট; একে অনাচারা লোকের হাতের রান্না, তাহাতে পঙ্‌ক্তি ভোজনে উচ্ছিষ্ট খাইতেই হইবে; একারণ কাহারও বাড়িতে খাইতে পারি না, ইহাতে লোকে আমাদিগকে অহঙ্কৃত ধর্ম্মধ্বজী ইত্যাদি কত কথাই বলিয়া থাকে।

উপাদেয় আহার একটা ভোগের জিনিস, লোকে কেল্‌নার হোটেল্, গ্রেট ইষ্টারণ হোটেল্ প্রভৃতি নানা হোটেল ও হালুইকরের দোকান হইতে কত জিনিস আনাইয়া আনন্দের সহিত আহার করিতেছে, আমরা তৎসমুদয়ে বঞ্চিত। ঘৃতের দুরবস্থা ও ময়রা হালুই-করের অনাচার দেখিয়া আমাদিগকে দোকানের ঐ সব খাদ্য খাওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছে।

আমিষ আহার বড়ই রুচিকর, লোকে পশু পক্ষী মৎস্যাদি হনন্ করিয়া বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া আহার করিতেছে। আমদের জীব হিংসার নামে কান্না পায়, সুতরাং আমিষ আহারে বঞ্চিত।

লোকের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করা মনুষ্য জীবনের একটা সুখকর বিষয়। আমরা প্রভুত্ব ত্যাগ করিয়া দাস হইতে চাহি। সেবা গ্রহণ অপেক্ষা সেবা করায় বেশী সুখ মনে করি। আমরা দাস দাসীকেও শাসনে রাখিতে পারি না, একারণ তাহারা অবাধ্য ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠে, আমাদের সংসারে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

আমরা গ্রহণ অপেক্ষা দানই আনন্দদায়ক মনে করি। পরস্ব গ্রহণ করিব কি, দুঃখীজনকে দান করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি। লোকে ছল চাতুরী প্রবঞ্চনা করিয়া বিষয়োপার্জ্জন করিতেছে আমরা ইহাতে অসমর্থ।

যশ, মান, প্রতিষ্ঠার জন্য লোকে বিব্রত। জন-সমাজে যশস্বী হইবার জন্য লোকে দু পয়সা দান করিয়া খবরের কাগজে ছাপাইয়া দিতেছে, রাজা মহারাজা উপাধি লইবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছে। আমরা কিন্তু অমানী হইবার জন্য কঠোর সাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছি। আমাদের নিকট "প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা"। লোকে মান সম্ভ্রম চায়, আমরা মানদ হইতে চাই। লোকে আপনাকে বড় করিতে চায়, আমরা আমাদের আমিত্ব লোপ করিতে চাই।

লোকে সন্তান ও স্বর্গাদি কামনায় কত যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছে, আমরা সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ করিয়া হরি-পাদপদ্ম লাভের জন্য উৎকণ্ঠার সহিত কালযাপন করিতেছি।

স্ত্রী-সংসর্গ জীবনের একটা পরমসুখকর ব্যাপার মনে করিয়া মানুষ কি না করিতেছে? ইহার জন্য এত পরদার, নরহত্যা। যাহাদের স্ত্রী-সম্ভোগের শক্তি নষ্ট হইয়াছে, তাহারা নানা প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া কামবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। আমরা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার জন্য কত প্রয়াস পাইতেছি; দুরন্ত কন্দর্পের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কত সাধন-ভজন করিতেছি।

লোকের সংসার আর আমাদের সংসার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। লোকে সুখী হইবার জন্য সংসার করে, আমরা দায়ে

ঠেকিয়া সংসার করি! কয়েদীর যেমন জেলখানা, আমাদের তেমনি সংসার। মুক্ত হইলেই বাঁচি। লোকে প্রবৃত্তির পথে ছুটিয়াছে, আমরা নিবৃত্তির পথে ছুটিয়াছি। অন্যের সহিত আমাদের বিপরীত সম্বন্ধ। আমাদের সহিত অন্যের তুলনা হয় না। সংসারে এমন কোন সুখ নাই, যাহা আমাদের মনে আনন্দ ঢালিয়া দিতে বা আমাদের মনকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে। একে ইহ-সংসারে কোন সুখ হইল না, তাহার উপর আবার আমাদের আধ্যাত্মিক যাতনা।

কামিনী—আধ্যাত্মিক যাতনা কি?

আমি—যাতনার কোন হেতু নাই, অথচ রাবণের চুলীর ন্যায় সদাসর্ব্বদা মন যে হুহু করিয়া জ্বলিতেছে ইহাই আধ্যাত্মিক যাতনা।

কামিনী—এ-যাতনা কেন হয়?

আমি—ভগবানের রাজ্যে পক্ষপাত বা অনিয়ম নাই, অপরাধ করিলেই শাস্তিভোগ করিতে হইবে; আমরা বহু জন্ম বহু অপরাধ করিয়া আসিয়াছি তাহারত একটা শাস্তিভোগ হওয়া চাই? সমস্ত অপরাধের শাস্তিভোগ করিতে হইলে অনন্ত-কাল শাস্তিভোগে কাটিয়া যায়, জীবের আর উদ্ধার হয় না; একারণ দীক্ষাকালীন সদ্‌গুরু শিষ্যের যাবতীয় অপরাধ নিজে গ্রহণ করেন;

শিষ্যগণকে কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়।

কামিনী—দীক্ষাকালীন সদ্গুরু যে শিষ্যের সমস্ত পাপ গ্রহণ করেন তজ্জন্য তাঁহাকে কি শাস্তি-ভোগ করিতে হয়?

আমি—হাঁ, তাঁহাকে ইহার জন্য শাস্তিভোগ করিতে হয়; তবে শিষ্যকে হয়ত যুগযুগান্তর শাস্তি-ভোগ করিতে হইত, তাঁহাকে না হয় আধঘণ্টা শাস্তিভোগ করিতে হইবে। তুমি দেখ নাই গোঁসাই দীক্ষা দিয়া কাতর হইয়া পড়িতেন, তাঁহার মুখমণ্ডল কাল হইয়া যাইত।

কামিনী—প্রারব্ধ কর্ম্ম কাহাকে বলে?

আমি—যে কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য দেহ ধারণ হইয়াছে; যাহা কিছুতেই এড়াইবার উপায় নাই। তাহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম।

কামিনী—কোন্ কর্ম্ম স্বেচ্ছা প্রণোদিত, আর কোন্ কর্ম্ম প্রারব্ধ কর্ম্ম, তাহা জানিবার কি কোন উপায় আছে?

আমি—যে কর্ম্ম করিবার আদৌ ইচ্ছা নাই অথচ বাধ্য হইয়া করিতে হইতেছে সেই কর্ম্ম প্রারব্ধ কর্ম্ম জানিতে হইবে। যেমন আমার ওকালতী। ওকালতী করিবার আমার আদৌ

ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি নাই অথচ শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য আমাকে বাধ্য হইয়া এই কাজ করিতে হইতেছে।

কামিনী—এই প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়ের কি কোন উপায় নাই ?

আমি—হাঁ, আছে। ভোগ দ্বারায় ইহা ক্ষয় হইয়া থাকে, আর অবিশ্রান্ত নাম করিতে পারিলেও ক্ষয় হয়। তবে প্রারব্ধ কর্ম্ম নাম করিতে বড় বাধা দেয়।

কামিনী—প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় করিতেই যে প্রাণান্ত দেখিতেছি।

আমি—তোমাদের প্রারব্ধকর্ম্ম সমস্ত ভোগ করিতে হইলে আর কি রক্ষা আছে? গুরু বলিয়াছেন তিনিই অধিকাংশ ভোগ করেন, তোমাদিগকে কেবল একটু আঁচ দিয়া থাকেন। ইহাতে অধৈর্য্য হইলে চলিবে কেন? সহিষ্ণুতা ধর্ম্মলাভের প্রধান উপায়। ধৈর্য্য সহকারে সকল দুঃখ সহ্য করিয়া নাম করিতে থাক, সময়ে নিশ্চয়ই শান্তিলাভ করিবে।

কামিনী—সাধনের যে এত ক্লেশ তাহা জানিতাম না অপরে বেশ আছে।

আমি—আবার অপরের কথা বলিতেছ? "যার নাই

উত্তর পূব, তার মনে সদাই সুখ"। যাহাদের সংসার সর্ববস্ব তাহাদের আদৌ আত্ম জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় নাই। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইতে হইবে, মনুষ্য জীবনের পরিণাম কি, এ সকল প্রশ্ন তাহাদের মনে আদৌ উদয় হয় না। শরীরের সহিত আত্মার বিনাশ এই তাহাদের ধারণা। এই জন্য তাহারা অনিত্য সংসারসুখে মগ্ন, আর ক্ষণভঙ্গুর দেহের এত পরিচর্য্যা। ভগবানের সহিত একটা সম্বন্ধ আছে ইহা তাহাদের ধারনাই নাই। কেহ কেহ ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করে না। তাহারা আত্মতত্ত্ব কিছুই জানে না।

"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।"

* * * *

"কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

* * * * * *

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃকৃষ্ণজ্ঞান॥"

* * * * * * *

সংসার সর্ব্বস্ব লোকের কোথায় সুখ দেখিলে ? আজ আনন্দ, কাল হাহাকার। একটা বিপদ পড়িলে আর সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, জন্ম মরণরূপ আধ্যাত্মিক দুঃখ তাহাদিগকে অনন্ত-কাল ভোগ করিতে হয়. বল দেখি নাম করিয়া তোমরা যে সুখ পাও, সংসারে কি তাহার কণামাত্র সুখ আছে ? সংসার সুখের পরিণাম জ্বালা-যন্ত্রনা, ভগবত উপাসনায় যে সুখ তাহার পরিণাম নিত্য আত্মপ্রসাদ ।

কামিনী—তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, ওকালতী করিবার তোমার প্রবৃত্তিও নাই, ক্ষমতাও নাই, ঋণ-দায়ে যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় হইতে চলিল, এখন ছেলেপিলে লইয়া কোথায় দাঁড়াইব, আর এই বিপুল সংসারের খরচ কিসেইবা নির্ব্বাহ হইবে ? আমি দেখিতেছি আমাদিগকে গাছ তলায় দাঁড়াইয়া অনাহারে মরিতে হইবে।

আমি—তুমি ইহার জন্য চিন্তা করিতেছ কেন ? গোঁসাই সদ্‌গুরু। তিনি যে কেবল আমাদের পরকালের ভার লইয়াছেন তাহা নহে, তিনি ইহকালেরও সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদিগকে তিনিই ধাক্কা দিয়া ফেলিয়াছেন, আবার তিনিই আমাদিগকে কোলে করিয়া

উঠাইবেন। আমাদের জীবনের সমস্ত ঘটনা তাঁহার হাত দিয়া ঘটিতেছে। আমরা যে অবস্থার লোক তিনি আমাদিগকে ঠিক সেই ভাবে প্রতিপালন করিবেন। আমাদের কোন অভাব হইবে না একটু স্থির হও, সমস্ত দেনা শোধ হইয়া যাইবে।

কামিনী—যদি সমস্ত ঘটনাই গুরুর হাত দিয়া ঘটিতেছে তবে তিনি আমাদের এ দুর্গতি কেন করিলেন ?

আমি—এরূপ না করিলে ধর্ম্মলাভ হয় না। পাছে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ভগবানকে ভুলিয়া যাই, তাই তিনি আমাদের ধন-মান সমস্ত হরণ করিলেন। এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হও। ইহা করুণাময়ের বিশেষ করুণা জানিবে।

কামিনী—আমাদের আরও ত অনেক গুরু ভাই আছেন তাঁহাদেরত এমন দুর্গতি হয় নাই ?

আমি—অল্প বিস্তর সকলেরই দুঃখভোগ হইতেছে, কাহারও এক প্রকার কাহারও অন্য প্রকার। যাহাদের যন্ত্রণা উপস্থিত হয় নাই, ভবিষ্যতের জন্য তাহাদের পূঁজী আছে জানিবে।

কামিনী—আমাদের যেরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আমার আর বাঁচিতে ইচ্ছা হয় না।

আমি—এ কথা মুখে আনিও না। তুমি যাহা আমাদের

বিপদ মনে করিতেছ, তাহাই আমাদের পরম সম্পদ জানিবে। মনুষ্য-জন্ম সুদুর্ল্লভ। কেবল এই জন্মেই ভগবত উপাসনার অধিকার আছে, ইতরযোনি বা দেবযোনিতে এ অধিকার নাই, ভগবানকে লাভ করিতে হইলে দেবতাকেও মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভগবত উপাসনা করিতে হইবে। বহু ভাগ্যে তোমার মানব-জন্ম লাভ হইয়াছে, আবার সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা পাইয়াছ এমন সুযোগ মানুষের ভাগ্যে ঘটে না; যত দিন বাঁচিয়া থাক, নাম করিয়া জীবন সার্থক কর। এ জনমে যদি চিত্ত নির্ম্মল না হয়, বাসনা-কামনা থাকিয়া যায়, তাহা হইলে আবার একটা জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। আবার বহুবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। যাহা ভোগ হইবার, তাহা এই জন্মেই হইয়া যাউক, আর যেন আসিতে না হয়। ধৈর্য্য ধরিয়া নাম করিতে থাক।

কামিনী—স্ত্রীলোকের বৈধব্য যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কিছু নাই, তোমাকে রাখিয়া যাইতে পারিলেই বাঁচি।

আমি—বৈধব্য যন্ত্রণা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক দুঃখ আর

নাই একথা সত্য। কিন্তু তুমি আগে গেলে আমার দশার কি হইবে? তুমি সংসারটা মাথায় লইয়া আছ তাই ভগবানকে ডাকিতে পাই; দুই চারি দণ্ড নাম করিতে পারি। তোমার অভাব হইলে সমস্ত সংসারটা আমার ঘাড়ে পড়িবে, নাম করিবার আর সময় পাইব না। তুমি জান না আমি প্রত্যহ তোমাকে মনে মনে প্রণাম করি; তুমি আছ বলিয়াই আমি নিশ্চিন্ত হইয়া নাম করিতে পাই।

কামিনী—তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার যথেষ্ট ধৈর্য্য আছে, সংসারের দারুণ বিপদ দেখিয়া আমি অধৈর্য্য হইতেছি, চারিদিক শূন্য দেখিতেছি।

আমি—বিপদকালে বিপদতারণ মধুসূদনই আমাদের বল-ভরসা, তাঁহাকে স্মরণ কর, অবিশ্রান্ত নাম কর, সব বিপদ কাটিয়া যাইবে।

আমি গৃহিণীকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিতে লাগিলাম। ডিক্রিদারগণের অত্যাচার, পাড়ার লোক-কানাকানি, এক এক দিন একটা হুজুক, হিংস্রক লোকের উল্লাস, তাহাদের শত্রুতা সাধন, এই সকল বিভীষিকা স্ত্রীলোকের কোমল প্রাণে সহ্য হইল না। গৃহিণী বিমনা হইলেন; দুশ্চিন্তায় তাঁহার বহুমূত্র-পীড়া দেখা দিল। ব্যারামের সূত্রপাত হইবামাত্র আমি চিকিৎসার বন্দো-

ব্যস্ত করিলাম। গৃহিণী অল্প দিন ঔষধ খাইয়া আর ঔষধ খাইলেন না, ব্যারাম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

আমার দীক্ষার পর হইতে আমার সেই মিডিয়াম সুশীলা বালার সহিত একাল পর্য্যন্ত আমার দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। বড় ঘরের কন্যা বড় ঘরের বধু. দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা কি? বাবু রসিককৃষ্ণ ঘোষ বর্দ্ধমান জেলার মহাতার সুপ্রসিদ্ধ ঘোষ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। বোলপুরে ওকালতী করিতেন। সুশীলাবালা তাঁহারই প্রথমা কন্যা। রসিক বাবু পরম বৈষ্ণব, আমিও বৈষ্ণবাচার্য্য কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এজন্য তিনি আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। বাসা বাটী নিকটে, এক আদালতে ওকালতী করিতেছি, একারণ উভয়ের মধ্যে একটা বিশেষ সৌহাদ্য ছিল। সুশীলাবালা যখন বালিকা, বন্ধুর কন্যা বলিয়া আমি তাঁহাকে কন্যারূপে দেখিতাম; সুশীলার রূপ-লাবণ্য অতি মনোহর, তাহার স্বভাব অতীব মধুর, পিতৃবন্ধু বলিয়া সুশীলা আমাকে বড়ই শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত; আমিও তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতাম। কখন কখন সুশীলা আমার স্ত্রীর নিকট আমাদের বাসায় বেড়াইতে আসিত।

বিবাহের পর হইতে সুশীলার সহিত আর আমাদের দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। তিনি কখনও পতি-গৃহে কখনও

পূর্ব্বে শান্তি-নিকেতনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। সুশীলার স্বামী হেমেন্দ্রবাবু পরম ধার্ম্মিক। ঈশ্বরে তাঁহার ঐকান্তিক নির্ভর! তাঁহার চরিত্র সুনির্ম্মল এবং আদর্শ স্থানীয়। তিনি কামিনী-কাঞ্চনের পরীক্ষায় যেরূপ উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। তাঁহাকে বিপথগামী করিবার জন্য কোন রাজা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বোম্বাই, পঞ্জাব, কাশ্মীর, গাড়য়াল, সিকিম, কাশী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে সুবিখ্যাত সুন্দরীগণকে আনাইয়া তাঁহাকে বিমোহিত করিবার চেষ্টা করেন। কোন কোন রাজার রাণীও তাঁহার প্রেম-ভিখারী হন। হেমেন্দ্রবাবু এই সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; কেহই তাঁহার মন বিচলিত করিতে পারেন নাই।

কাঞ্চন সম্বন্ধেও হেমেন্দ্রবাবুর ঐরূপ পরীক্ষা। তাঁহার কার্য্যকালে কত লোক তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা পায়! পাছে কর্ত্ত-ব্যের ত্রুটী বা প্রজার কষ্ট হয় এজন্য কাহারও নিকট তিনি এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। তিনি অর্থোপার্জ্জন করিলে আজ মহৈশ্বর্য্যশালী হইতে পারিতেন। তিনি যে রাজ্যে যখন কাজ করিতেন তখন সে রাজ্যে কোন প্রকার অত্যাচার হইতে পাইত না। প্রজাগণকে পুত্রবৎ পালন করিতেন, প্রজাগণও ঠিক পিতার ন্যায় তাঁহাকে ভক্তি করিত। তিনি সত্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ

কার্য্যকুশল, ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। তিনি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন এবং একজন সুলেখক। তিনি অনেক অতি সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'প্রেম', 'আমি' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

সুশীলাবালা হেমেন্দ্রবাবুর উপযুক্ত পত্নী। তিনি অত্যন্ত পতিপরায়ণা ও ধর্ম্মানুরাগিণী। আত্মার উৎকর্ষ সাধনই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। ইঁহারা যৌবনে উভয়েই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইঁহাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে ইহাদের ধর্ম্ম পিপাসা মিটিল না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনাচার, বিলাসিতা, একদেশদর্শিতা ও অত্যন্ত সংকীর্ণতা দেখিয়া ইঁহারা ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করেন। হেমেন্দ্রবাবু কোন অশরীরি বাণি শুনিয়া দীক্ষা গ্রহণে বিরত হন। ইঁহারা উভয়েই এক্ষণ ব্রহ্মোপাসক, কিন্তু ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণবভাব খুব প্রবল।

সুশীলাবালার বিবাহের পর আমার দীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে শান্তি-নিকেতনে সুশীলাবালার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। বন্ধুর স্ত্রী বলিয়া আমি তখন তাঁহাকে বন্ধুভাবেই দেখিতাম। আমাদের নিকট তাঁহার কোন লজ্জা বা সংকোচ ছিল না। মা ভগ্নী যেমন সন্তান ও ভ্রাতার নিকট নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করেন, সুশীলাও সেইরূপ আমাদের নিকট বিচরণ করিতেন।

যাহাতে সুশীলা দিন দিন জ্ঞানধর্ম্মে উন্নতি লাভ করিতে পারেন তাহাই আমার ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল।

আমি মূর্ত্তিপূজার ও গুরুবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলাম। আমার পক্ষে গুরুলাভ একটা অসম্ভব ব্যাপার। গোঁসাই সুশীলার মত স্ত্রীলোককে মধ্যবর্ত্তী করিয়া অলৌকিক জাল বিস্তার না করিলে আমার কিছুতেই দীক্ষা লাভ হইত না। সুশীলার মধ্যবর্ত্তীতায় গুরুলাভ হওয়ায় সুশীলাকে গুরুভক্তি করিয়া থাকি। স্বামীর বন্ধু বলিয়া তিনিও আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকেন।

১৩২১ সালের সুরু হইতে সুশীলাবালা স্বামীপুত্র সহ বোলপুরে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। দীক্ষার পর হইতে একাল পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। বোলপুর আসার পর আমার সহিত আবার সাক্ষাৎ। আমি যখন তাঁহার বাসায় যাই অতি শ্রদ্ধাসহকারে তিনি আমার পরিচর্য্যা করেন এবং এক পরিচ্ছেদ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রবণ করান। আমি ভক্তিমতীর মুখে ভক্তি-শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হই; হেমেন্দ্রবাবু নিকটে বসিয়া দুরূহ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে শ্লোকার্থ বুঝাইয়া দেন।

আমার গৃহিণীও সুশীলাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন।
[illegible] গৃহিণীর ব্যারামের কথা শুনিয়া কয়েকবার

সুশীলা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনিও সুশীলাকে বলিয়াছিলেন "একটু ভাল হই একবার তোমার বাসায় গিয়া তোমাকে একবার দেখিয়া আসিব।"

আমি যে বিপুল ঋণদায়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম গুরুকৃপায় তাহা সমস্ত পরিশোধিত হইয়া গেল। সংসারের অবস্থা আবার স্বচ্ছল হইয়া দাঁড়াইল। যাহারা শত্রুতা সাধন করিবার জন্য বিপক্ষ ডিক্রিদারগণের সহিত যোগ দিয়াছিল, তাহাদের মুখ বিষণ্ণ হইল, পাড়ার লোকের জল্পনা থামিল, কিন্তু গৃহিণীর ব্যারাম ভাল হইল না। ১৩২১ সালের কার্ত্তিক মাহায় তাঁহার কর্ণমূলে একটা ফোড়া দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হইল। একে বহু মূত্রের রোগা, তাহার উপর আবার ফোড়া, আমি প্রমাদ গণিলাম। ডাক্তার আসিয়া ফোড়াটা কাটিয়া দিল; রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

১৩২১ সাল ১লা অগ্রহায়ণ অপরাহ্নে আমি হেমেন্দ্রবাবুর বাসায় বেড়াইতে গেলাম। বাসায় উপস্থিত হইবামাত্র সুশীলাবালা আনন্দিতা হইয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার পদধূলি লইলেন। উপবেশনের জন্য আসন দিলেন ও পাদ প্রক্ষালন জন্য বিশুদ্ধ জল ও গামছা আনিয়া দিলেন। আমি পাদ প্রক্ষালন করিয়া আসনে উপবেশন করিলাম। সুশীলাবালা ভক্তিভাবে আমাকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শুনাইতে লাগিলেন। পাঠ সমাপনের পর আমি জল-যোগ করিয়া বিদায় হইলাম। হেমেন্দ্রবাবু বহুদূর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন; তৎপর বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিলেন।

সন্ধ্যার সময় আমি বাসায় উপস্থিত হইলে, চাকরেরা বলিল পাড়ার স্ত্রীলোকগণ গৃহিণীকে দেখিতে আসিয়াছেন। একারণ আমি গৃহমধ্যে প্রবেশ না করিয়া নিকট-বর্ত্তী উকীল বাবুহৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের বাসায় গিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলাম। কিছু কাল পরে বাসায় ক্রন্দনের রোল শুনিলাম। আমি বিপদ ভাবিয়া তাড়াতাড়ি বাসায় আসিয়া দেখি গৃহিণীর প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়াছে। তাঁহার হাস্যময় মুখমণ্ডলে পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে। চারিদিকে তাঁহার মাতা ও কন্যাগণ ক্রন্দন করিতেছে।

যাঁহারা সদ্‌গুরুর শিষ্য, গুরু উপস্থিত না হইলে তাঁহাদের মৃত্যু হয় না। গুরু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে শরীর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যান। গৃহিণীর মুখের প্রফুল্লতা অবলোকন করিয়া বুঝিলাম গুরু-দর্শনে ইঁহার এত আনন্দ; চেহারা দেখিয়া কোন ক্রমে মনে হয় না যে ইহা শবের চেহারা।

গৃহিণীর মৃত্যু আমার অন্তরকে আদৌ স্পর্শ করিল না।

অন্তরেও প্রসন্নতা ও পবিত্রতার উদয় হইল। এখন পর্য্যন্ত কোন সময় মন মলিন হইলে কল্পনা-চক্ষে গৃহিণীর সেই সুপ্রসন্ন পবিত্র মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করি, আর আমার মনের সমস্ত মলিনতা দূর হইয়া যায়, অন্তর নির্ম্মল হয়।

আমার কন্যা নবনলিনী দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে মাতাকে গোপীবেশে সাজাইয়া দিলেন। তাঁহার দ্বাদশ অঙ্গে দ্বাদশ তিলক করিয়া দিলেন। নাসিকায় হরিমন্দি-রের তিলক, ললাট হরিনামাঙ্কিত করিলেন। গলদেশে তুলসীর মালা পরাইয়া দিলেন। পদদ্বয় অলক্ত রঞ্জিত করিলেন। পরিধেয় সাটী ভাল করিয়া পরাইয়া দিলেন। গৃহিণীর এই গোপীবেশ দেখিয়া আমার মধ্যে গুরুশক্তি জাগ্রত হইয়া প্রবলবেগে আমাকে আচ্ছন্ন করিল; আমার মধ্যে নামের স্রোত ভীষণবেগে চলিতে লাগিল, চক্ষের জলে অঙ্গ ভাসিয়া গেল আমি ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

আমার কান্না দেখিয়া বাহিরের লোকে মনে করিল স্ত্রীর শোকে আমি কাঁদিতেছি, কিন্তু এ কান্না সে কান্না নহে, ইহাতে স্বর্গের অমৃতধারা, যে ইহা একবার ভোগ করিয়াছে সে আর জীবনে ভুলিতে পারে না। বাহিরে হা হুতাস, ভিতরে পরানন্দ।

"বাহিরে বিষ জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণ প্রেমের ঐ ছন্ন চরিত।

এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বন,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যাজন।
সেই প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃত একত্র মিলন।”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার কান্না ফোঁপানি দেখিয়া বাহিরের লোকেরা * আমাকে প্রবোধ দিতে লাগিল। আমি দেখিলাম ব্যাপার গুরুতর। ইহারা আমার অবস্থা না জানিয়া নানা সাংসারিক কথা শুনাইতেছে। তাহাতে গুরুশক্তি ম্লান হইতেছে, শরীরে জ্বালা হইতেছে, একারণ আমি বলপূর্ব্বক ভাব সমান রাখিতে বাধ্য হইলাম।

গৃহিণী রুগ্নাবস্থায় সুশীলাবালাকে বলিয়াছিলেন “একটুভাল হইলে এক দিন তোমার বাসায় গিয়া তোমার সহিত দেখা করিয়া আসিব।” তিনি রোগ মুক্ত না হওয়ায় তাঁহার জীবদ্দশায় একথা প্রতিপালিত হয় নাই। ১লা অগ্রহায়ণ যে সময় গৃহিণীর দেহত্যাগ হয় ঠিক সেই সময় সুশীলাবালা দেখিলেন গৃহিণী একাকিনী তাঁহার বাসাবাটীর সদর দরজা দিয়া বাসায় প্রবেশ করিলেন; সুশীলা যে ঘরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, উঠান দিয়া সেই ঘরের

* যাহারা গুরুশক্তি লাভ করে নাই।

দিকে আসিতে লাগিলেন এবং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। সুশীলাবালা এই দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। গৃহিণীর উৎকট ব্যারাম, তাহার উপর এই দৃশ্য; সুশীলাবালা বিপদের আশঙ্কা করিলেন। হেমেন্দ্র বাবু বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—

সুশীলাবালা—হরিবাবুর স্ত্রী কেমন আছেন?

হেমেন্দ্রবাবু—আমি তাঁহার বাসা পর্য্যন্ত যাই নাই, খবর জানি না।

সুশীলাবালা—হরিবাবুর স্ত্রীকে আমাদের বাসা মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিলাম, তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। আমার মনে হইতেছে তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে! তিনি বলিয়াছিলেন একদিন আমাদের বাসায় আসিবেন, জীবদ্দশায়ত আসা হইল না, বোধ হইতেছে দেহত্যাগ করতঃ এখানে আসিয়া অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলেন।

হেমেন্দ্রবাবু—অদ্যরাত্রি হইয়াছে, কল্য খবর লইব।

পরদিন হেমেন্দ্রবাবু বাসায় আসিয়া শুনিলেন, যে সময় গৃহিণীর দেহত্যাগ হয় ঠিক সেই সময় সুশীলাবালা এই দৃশ্য দেখিয়াছিলেন।

শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎসব।

এবার শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর বিংশতি বারের জন্মোৎসব। ১৩২১ সাল ৮ই মাঘ প্রভুজীর আবির্ভাবের দিন। এবৎসর গৃহিণী নাই, সংসার শ্মশানভূমি, বাসায় হাহাকার, কে আর বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইবেন। আমার শাশুড়ী অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি রোগশয্যায় শায়িত। সম্বন্ধী কালীকৃষ্ণ সরকার, মুহুরি তিনকড়ি সরকার প্রভৃতি কাহারও শরীর ভাল নয়। উৎসবে বহু লোকের সমাগম হইবে। আমাদের দ্বারায় তাহাদের পরিচর্য্যা হইবে না ভাবিয়া মনে করিলাম এবারকার মত প্রভুদের কেবল পূজা ও ভোগ দিয়া নিয়ম রক্ষা করা যাউক। একারণ শাশুড়ীকে আয়োজন করিতে নিষেধ করিলাম। গায়ক, বাদক, পূজারী প্রভৃতি আবশ্যকীয় লোকজনকে জবাব দিলাম, তাহারা সকলেই দুঃখিত হইয়া আপন আপন কার্য্যে নানাস্থানে চলিয়া গেল। কলিকাতাস্থ সতীর্থগণের মধ্যে এই সংবাদ প্রচার হইয়া পড়িল। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর অতিশয় মনোকষ্ট হইল।

আমার তরফ হইতে উৎসব বন্ধ হইল, এখন গুরুর

তরফ হইতে কি হয় দেখিবার জন্য আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ৪ঠা মাঘ সন্ধ্যার সময় সতীর্থ বাবুচন্দ্রকান্ত দত্ত বরিশাল হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন, "এবার উৎসব হইবে না শুনিয়া কলিকাতার গুরুভাইগণ অনেকে দুঃখিত। উৎসব বন্ধ করিবেন না। যাহা কিছু করিবার আমি করিব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়া দিউন।"

পরদিন সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান হইল, শাশুড়ী-ঠাকুরাণী আনন্দিতা হইয়া আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। সময়াভাব বশতঃ অধিকাংশ জিনিস বাজার হইতে খরিদ করিতে হইল। সতীর্থ নীলরতন পাল ও গৌর-কিশোর গোস্বামী হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরকিশোর পূজার ও ভোগ দিবার ভার লইলেন, নূতন গায়ক বাদক জুটিয়া গেল। উৎসব সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া গেল।

সতীর্থ নীলরতন পালের বাটী সর্পমোহনা গ্রামে,এখান হইতে তিন ক্রোশ ব্যবধান। ৯ই ফাল্গুন কাঙ্গালী ভোজ-নের পর, রাত্রে নীলরতন পালের ভেদ উপস্থিত হইল, তিনি কালীকৃষ্ণ ভায়ার বৈঠক খানায় থাকার সুবিধা বিবে-চনায় তথায় গিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। আমি ঔষধ

ফিবার (স্বল্প বিরাম জ্বর) দেখা দিল। কালীকৃষ্ণ সরকার, তাঁহার মাতা স্ত্রী, বাবু চন্দ্রকান্ত দত্ত, গৌরকিশোর গোস্বামী, প্রাণপণে তাঁহার সেবা ও চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন, কালীকৃষ্ণ সরকার নিজহস্তে তাঁহার মলমূত্র পরিস্কার করিতে লাগিলেন। রোগের প্রকোপ দেখিয়া সকলে ভীত হইলেন, তখন কালীকৃষ্ণ ভায়া নীলরতন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

কালীকৃষ্ণসরকার—বাড়ীতে আপনার স্ত্রী, কন্যা ও আত্মীয়-স্বজন আছেন তাঁহাদিগকে একটা খবর দেওয়া কর্ত্তব্য, তাঁহারা আপনার ব্যারামের কথা জানে না।

নীলরতনবাবু তাঁহাদিগকে কোন খবর দিবার আবশ্যক নাই। তাহারা আসিয়া আমার কি করিবে?

কালীকৃষ্ণসরকার—তাঁহারা আপনাকে বাড়ী লইয়া যাইবেন, ইচ্ছামত চিকিৎসা করাইবেন, মনোমত সেবা শুশ্রূষা করিবেন।

নীলরতনবাবু—এখানে যেরূপ সেবা ও চিকিৎসা হইতেছে সেরূপ সেবা বা চিকিৎসা বাড়ীতে হইবে না. সেখানে কেবল সংসারের কোলাহল, স্বার্থের কথা। আমি বহুদিন হইতে রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, এবার জীর্ণজ্বরে বিকার উপস্থিত

এখানে পরম শান্তিতে আছি ; বাড়ীতে পাঠাইয়া আর আমাকে সংসার-যাতনা দিবেন না। এখানে মরিতে পারিলে পরম শান্তিতে মরিতে পারিব।

কালীকৃষ্ণ—আপনার স্ত্রী, কন্যা, আত্মীয়, স্বজন বর্ত্তমান, আপনার উপর তাঁহাদের একটা দাবী আছে, তাঁহাদিগকে খবর না দিলে তাঁহাদের নিকট আমাদিগকে দোষ পাইতে হইবে। তাঁহারা আসিয়া আপনার ব্যবস্থা করেন ইহাই উচিত।

নীলরতনবাবু—আমার কল্যান দেখা উচিত না স্বার্থপর আত্মীয়গণের হস্তে দিয়া চিরদিনের জন্য আমার সর্ব্বনাশ করা উচিত? আপনারা আমার কল্যাণ কামনা করেন, আর তাহারা কেবল স্বার্থের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, কিসে আমার মঙ্গল হইবে তাহারা এ চিন্তা একবারও করে না।

কালীকৃষ্ণবাবু—যদি আপনাকে কোন বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে হয়?

নীলরতনবাবু—আবার বিষয়ের কথা কেন? আর কি বিষয়ের বা সংসারের চিন্তা করিবার সময় আছে? বহুকাল সংসারের গোলমাল করিয়াছি ; সংসার বা বিষয়ের কথা আর উত্থাপন

কালীকৃষ্ণ নীলরতনবাবুকে আর কোন কথা বলিলেন না, বাবু নীলরতন পালের কঠিন ব্যারামের কথা শুনিয়া ১৩ই মাঘ তাঁহার স্ত্রী, কন্যাদ্বয় ও ভ্রাতুষ্পুত্র কালিকৃষ্ণের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কালিকৃষ্ণের মাতা ও স্ত্রী আবার ইহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন, ডাক্তারী চিকিৎসা চলিতে লাগিল। আমরা আর সর্ব্বদা কাছে থাকিতে পারিলাম না, ইহাতে নীলরতনবাবু দুঃখিত হইলেন। ১৪ই মাঘ নীলরতনবাবু আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা তাঁহার নিকট বসিয়া রহিয়াছেন, আমাকে দেখিয়া নীলরতনবাবু বলিলেন :—

নীলরতনবাবু—দাদা! এইবার চলিলাম।

আমি—তুমি যাইবে, ইহাত ভাগ্যের কথা; গুরু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তোমাকে দেহপিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইবেন, তুমি ভগবানের নিত্যলীলায় নিত্যানন্দে কাটাইবে, পৃথিবীর এই পূতিগন্ধময় স্থানে তোমাকে আর কষ্ট পাইতে হইবে না, ইহা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে? আমি বহু অপরাধ করিয়াছি তাই এখনও এই সংসার যাতনা ভোগ করিতেছি। এইস্থান পরিত্যাগ করিতে পারিলেই বাঁচি।

নীলরতনবাবু—দাদা বড় কুকর্ম্ম করিয়াছি, সময় থাকিতে ভজন করি নাই, এখন তজ্জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি।

আমি—অগ্নি যেমন স্বর্ণকে দগ্ধ করিয়া খাঁটী করে, অনুতাপানলও তেমনি মানুষের অপরাধ সমস্ত দগ্ধ করিয়া মানুষকে খাঁটী করে। মনস্তাপে ভগবানের পদারবিন্দে এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিতে পারিলেই মানুষ ধন্য হইয়া যায়। ভাই, ভজনা করিয়া কেহ কখনও ভগবানকে লাভ করিতে পারে না; তাঁহার কৃপাই আমাদের একমাত্র ভরসা। সদ্গুরু যে দিন তোমাকে দীক্ষা দিয়াছেন; বুঝিতে হইবে সেই দিনই ভগবান তোমাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। গুরু যখন একবার কোলে লইয়াছেন তখন তিনি আর আছড়াইয়া মারিবেন না। তোমাদের নিকট যমের অধিকার নাই। ভগবানে চিত্ত সমাধানপূর্ব্বক অবিশ্রান্ত নাম করিতে থাক। খট্টাঙ্গরাজা মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন।

নীলরতনবাবু—খট্টাঙ্গরাজার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বহু তপস্যা ছিল।

আমি—তাঁহাদের কি তপস্যা ছিল না? যদি তপস্যা

না থাকিবে, তবে সদ্গুরু লাভ হইল কিসে? তুমি নিশ্চয় জানিও বহু জন্মের তপস্যার ফলে সদ্গুরু লাভ করিয়াছ। এখন নামের প্রবাহ কেমন চলিতেছে আমাকে বল।

নীলরতনবাবু—নামের প্রবাহ বেশ চলিতেছে।

আমি—তুমি বড় ভাগ্যবান, এবার বিনা আহ্বানে হঠাৎ বোলপুর আসিয়া শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎসবে যোগ দিলে, প্রসাদ পাইলে, ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে, সতীর্থগণের সহিত ভগবচ্চর্চ্চায় কাটাইলে। সংসারের মলিনতা আর তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিল না।

নীলরতনবাবু—যখন আপনাদের নিকট আসিয়া পড়িয়াছি, তখন আমার বহু সুকৃতি বুঝিয়াছি। বাড়ীতে থাকিলে যন্ত্রণার শেষ থাকিত না, এখানে মরাতেও আমার সুখ।

আমি—সংসার ভুলিয়া যাও, ভগবানে চিত্ত সমাধানপূর্ব্বক অবিশ্রান্ত নাম করিতে থাক। এখন কি মন মধ্যে কোন বিষণ্ণতা বা ভয় আছে?

নীলরতনবাবু—আমার মনে কোন প্রকার মৃত্যুভয় বা বিষণ্ণতা নাই, আমি বেশ সুখে প্রফুল্লিতচিত্তে আছি। কোন প্রকার অশান্তি বা ভাবনা আমার মনে নাই।

আমি—তবে নিবিষ্টচিত্তে নাম করুন, আমি চলিলাম।

এই বলিয়া আমি নীলরতনবাবুর নিকট হইতে চলিয় আসিলাম, নীলরতনবাবু নাম করিতে লাগিলেন। চিকিৎসায় কিছু হইল না, ব্যারাম ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ১৫ই ফাল্গুন রাত্রি ৩টা হইতে গুরুভাইগণ মিলিত হইয়া নীলরতনবাবুকে নাম শুনাইতে লাগিলেন, আমি রোগা মানুষ, রাত্রি জাগরণে অসমর্থ,একারণ আমি প্রাতঃকালে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম নীলরতনবাবুর শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। মৃত্যুর অধিক বিলম্ব নাই দেখিয়া নীলরতন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম :—

আমি—এখন কেমন আছেন ?

নীলরতনবাবু—(আস্তে আস্তে) অন্য কষ্ট নাই, কেবল শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্টানুভব হইতেছে।

আমি—নাম চলিতেছেত ?

নীলরতনবাবু—(মাথা নাড়িয়া) হাঁ চলিতেছে।

আমি—খবরদার নাম ছাড়িও না। নাম ছাড়িলে অধিক কষ্টানুভব হইবে।

নীলরতনবাবু নাম করিতে লাগিল, সতীর্থ—কালিকৃষ্ণ ভায়া প্রভৃতি নিকটে বসিয়া হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ১৬ই ফাল্গুন বেলা ৮ ঘটিকার সময় নাম করিতে করিতে সজ্ঞানে আনন্দচিত্তে নীলরতনবাবু নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন।

নীলরতন বাবুর স্ত্রী ও কন্যাগণ হাহাকার করিয়া কান্দিতে লাগিলেন; নীলরতনবাবুর ভ্রাতষ্পুত্র ও আত্মীয় স্বজনগণ গঙ্গাতীরে তাঁহার মৃতদেহের সংকার করিবার অভিপ্রায়ে শবদেহ লইয়া গিয়া কাটোয়ায় পাঠাইয়া দিলেন।

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষেরই কথা পাওয়া যায়; পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম যে, কি তাহা ঐসকল শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। বেদ উপনিষদাদি প্রাচীন শাস্ত্রে যে ধর্ম্ম বীজরূপে ছিল, তাহাই পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিশাল কল্পতরুরূপে পরিণত হইয়াছে। এই কল্পতরু নানা শাখা প্রশাখা ও পত্র পুষ্পে সুশোভিত। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত এই কল্পবৃক্ষের সুরসাল সুপরিপক্ক ফল।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং,
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং,
মুহুরহো !রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

হে ভগবৎ—প্রীতিরসজ্ঞ ভাবুকগণ! শুক-মুখ নিসৃত, বৈকুণ্ঠ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ অমৃতসার, দুর্ল্লভ এবং রসময় বেদরূপ কল্পতরুর ভাগবত নামক ফল তোমরা বারম্বার পান কর।

শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বে আমরা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের কথা

পাই নাই। ইহাতে পূর্ব্বকার সেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কৈতব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।

এই শ্রীমদ্ভাগবতে ফলাভিসন্ধি-লক্ষণ কপটতাবর্জ্জিত এবং জীববৎসল নির্ম্মৎসর ব্যক্তিগণের আচরিত, ঈশ্বরারাধনারূপ পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। আর ইহাতেই আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের উন্মূলনকারী, এবং পরম সুখদ পরমার্থতত্ত্ব বস্তু অনায়াসে জানিতে পারা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র বেদের ভাষ্য। যিনি ইহা একবার মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তাঁহার নিকট অন্য শাস্ত্র অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে। রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব যে কি তাহা এই গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত আছে।

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বকে কেহ কেহ ভগবত-তত্ত্ব, কেহ বা লীলাতত্ত্ব কহিয়া থাকেন। ইহাই পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম। ভগবানকে লাভ এবং সম্ভোগ করিতে হইলে এই প্রেম-সাধন ব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই। ভগবান শ্রীমুখে বলিতেছেন—

ন সাধয়তি মাং যোগো, ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন সাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥

ভগবান কহিলেন হে উদ্ধব! মদ্বিষয়ক দৃঢ় ভক্তি

(প্রেম) যদ্রূপ আমাকে বশীভূত করে, অষ্টাঙ্গযোগ সাঙ্খ্যযোগ, বেদাধ্যায়ন, তপস্যা, এবং সন্ন্যাসও তদ্রূপ আমাকে বশীভূত করিতে পারে না।

গোপাঙ্গনাদের বিদ্যা-বুদ্ধি কিছুই ছিল না, তাঁহারা বনচারিনী, পশু পালিকা, একমাত্র প্রেমের বলেই তাঁহারা ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

> ন পারয়েহহং নিরবদ্য সংযুজাং
> স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপিবঃ।
> যা মাহভজন্ দুর্জ্জরগেহ শৃঙ্খলাঃ
> সংবৃশ্চ্যতদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনাঃ॥

হে গোপিকাগণ, তোমাদের সংযোগ নির্দ্দোষ অর্থাৎ কামময়রূপে প্রতীয়মান হইলেও নির্ম্মল প্রেমময়। যে তোমরা দুর্জ্জর গৃহ-শৃঙ্খল সম্যকপ্রকারে ছেদন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছ, অর্থাৎ পরমানুরাগে আত্ম-সমর্পন করিয়াছ, সেই তোমাদের সাধুকৃত্য দেব পরিমানে আয়ু লাভ করিয়াও আমি করিতে পারি না। তোমাদের সৌশীল্যের দ্বারা তাহার প্রতিকার হউক।

ব্রজগোপীর কাম, কাম নহে; উহা প্রেম। কাম ও প্রেম এক বস্তু নহে, ঠিক বিপরীত। কাম নিবিড় অন্ধকারময়, প্রেম নির্ম্মল সূর্য্য। কাম স্বার্থময়, প্রেম-স্বার্থহীন। কামে আত্মসুখের ইচ্ছা, প্রেমে ভগবত্-

সুখের ইচ্ছা। কাম মানুষকে নরকের দিকে লইয়া যায়, প্রেম মানুষকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়। প্রেম ভক্তির রূপান্তর, ভক্তির পরাকাষ্ঠা; ভক্তির গাঢ় অবস্থাকে রতি বলে, রতি প্রগাঢ় হইলে প্রেম নামে অভিহিত হয়। এই প্রেম আবার গাঢ়তা অনুসারে ক্রমে স্নেহ মান, প্রণয়, ভাব, মহাভাব বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রজাঙ্গনাগণ একমাত্র এই প্রেমের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"গোপীগণের প্রেম রূঢ়* মহাভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥
কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম-নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল
লোক ধর্ম্ম বেদ ধর্ম্ম দেহ ধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্ম সুখ মর্ম্ম॥

---

* যাহাতে উদ্দীপ্ত সাত্বিক, তাহার নাম রূঢ় ভাব। এই রূঢ়ভাব গোপীগণ ব্যতীত কুত্রাপি নাই, এমন কি রুক্মিণ্যাদিতে সুদুর্লভ।

দুস্ত্যজ আর্য্য পথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করিকরে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধ তমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥
আত্ম সুখ দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥

রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলে গোপীগণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন।

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়দধীমহি কর্কশেষু
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে নকিং স্বিৎ
কূর্পাদিভি ভ্রমতিভীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥

হে প্রিয়, আমরা তোমার যে অতি সুকোমল চরনারবিন্দ ব্যথা লাগিবে বলিয়া কঠিন স্তনে ধীরে ধীরে ধারণ

করিয়া থাকি, তুমি সেই চরণ দ্বারায় অটবী ভ্রমণ করিতেছ তন্নিমিত্ত তোমার চরণ কঙ্করাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না কি ?

তদপর ভগবান প্রকাশিত হইলে গোপীগণকে বলিতেছেন—

এবং মদর্থোজ্ঝিত লোক বেদ
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মমার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ॥

হে অবলাগণ যে তোমরা আমার জন্য লোকবেদ পরিত্যাগ করিয়াছ, আমি সেই তোমাদিগের নিরন্তর ধ্যান প্রবাহ সম্পাদানার্থ ও প্রেমালাপ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিকটে থাকিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলাম অতএব হে প্রিয়াগণ! আমি তোমাদিগের প্রিয়, আমার প্রতি দোষারোপ করিও না।

গোপাঙ্গনাগণ যে বেশ ভূষা করিতেন তাহাও তাহাদের নিজের সুখের জন্য নহে।

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহোত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পন।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ সাধন॥

এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করেন দেহের মার্জ্জন ভূষণ॥

গোপীগণের আত্মসুখের প্রতি দৃষ্টি না থাকিলেও তাঁহারা ভগবদ্দর্শনে পরম সুখী হইতেন।

আর এক অদ্ভুত গোপী ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ, হয় কোটীগুণ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটি গুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধের এক মাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণ সুখে পর্য্যবসান॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক মমতা॥
'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ'।
এত সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপী শোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণ-শোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত॥
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি,

কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপ-গুণে।
তাঁর সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ-সুখ পোষে।
এইহেতু গোপী-প্রেমে নাহি কাম দোষে॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যাগমৎ প্রথাম।"

গোপীগণের বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কামাকারে প্রতীয়মান হইলেও ইহা কাম নহে।

কাম গন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী প্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥
কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব প্রেয়সী।
গোপীকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখী দাসী॥
গোপীকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেম-সেবা পরিপাটি ইষ্ট সমীহিত॥ *
সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥
রাধা সহ ক্রীড়া রস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥

* "ইষ্ট সমীহিত"—কৃষ্ণ যাহা ভাল বাসেন সেইরূপ শারী-
রিক ব্যবহার।

কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণজ প্রেমধন।
তাঁহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ॥”

*   *   *   *

কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ, পূর্ণ রস, রূপ কহে মোরে॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন॥
আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ।
সেইজন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥
আমা হইতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥
কোটিকাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সাম্য নাহি যার॥
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দরশনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর স্বর বংশী গীতে আকর্ষে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত ঘ্রাণ হরে রাধা-অঙ্গ গন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস।
রাধার অধর রসে আমা করে বশ॥

যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
এই মত জগতের সুখের আমি হেতু।
রাধিকার রূপ-গুণ আমার জীবাতু॥

* * *

"রাধার দর্শনে আমার জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান॥
পরস্পর বেণু গীতে হরয়ে চৈতন *
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ কার কোলে॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হ'য়ে অন্ধ॥
তাম্বূল চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ-সমুদ্রে ডোবে কিছুই না জানে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা—চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গোপীপ্রেমের আর একটি বিশেষত্ব আছে; ইহা মাধুর্য্যময়; একেবারে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানহীন। গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পূর্ণতম ভগবান বলিয়া জানি-

---

* অরণ্যে বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ শব্দ শুনিয়া উহা শ্রীকৃষ্ণের বংশী-

তেন। তথাপি প্রেমাধিক্য বশতঃ তাঁহাদের মনে কোন প্রকার সঙ্কোচ আসিত না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের নায়ক বলিয়াই মনে করিতেন, তজ্জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে তাড়না ভর্ৎসনা করিতেন।

"শুদ্ধ প্রেম ব্রজ দেবীর কামগন্ধ হীন।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন॥
গোপীগণের শুদ্ধ ভাব ঐশ্বর্য্য জ্ঞানহীন।
প্রেমেতে ভর্ৎসনা করে এই তার চিহ্ন॥
সর্ব্বোত্তম ভজন ইহাঁর সর্ব্ব ভক্তি জিনি।
অতএব কৃষ্ণ কাছে আমি তার ঋণী॥"

ভগবান কাহারও কখন ঋণী থাকেন না। যিনি তাঁহাকে যে ভাবে ভজনা করেন, ভগবানও তাঁহাকে সেই ভাবে ভজনা করেন। যিনি তাঁহাকে ভজনা করিয়া রাজ্য চান, ভগবান তাঁহাকে রাজ্য দেন; যিনি ঐশ্বর্য্য চান, তাঁহাকে ঐশ্বর্য্য দেন; যিনি স্বর্গ চান, তাঁহাকে স্বর্গ দেন। যাহার যে ইচ্ছা ভগবান তাঁহার সেই ইচ্ছা পূরণ করেন। শ্রীভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায় একাদশ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানু বর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

যে যে ভক্ত আমাকে যে যে ভাবে ভজনা করে, আমিও সেই সেই ভক্তকে সেই সেই ভাবে অনুগ্রহ করি।

অতএব হে অৰ্জ্জুন! মনুষ্যগণ সৰ্ব্বপ্রকারেই আমার বর্ত্মের অনুসরণ করে।

ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণ সুখের সুখী, তাঁহাদের নিজের সুখ বা অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভাল বাসিয়া ও তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াই খালাস। এরূপ ভক্তকে ভগবান আর কি দিবেন? তাঁহার ত দিবার কিছু নাই। অতএব ব্রজাঙ্গনাদিগকে তিনি আত্ম-দান করিলেন এবং চিরদিনের জন্য তাঁহাদের প্রেমের ঋণী হইয়া থাকিলেন।

"শুদ্ধ প্রেম ব্রজ দেবীর কামগন্ধ হীন।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন॥
সর্ব্বোত্তম ভজন হইয়া সর্ব্বভক্তি জিনি।
অতএব কৃষ্ণ কহে-আমি তার ঋণী

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা—সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণপ্রেম যে সে বস্তু নহে, নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে—

"অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেম সঙ্গতা।
ভক্তি রিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥
কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করয়॥
সাধু সঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীৰ্ত্তন।
সাধন ভক্তে হয় সৰ্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥

অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হইলে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হইতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
এই ভাব গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম॥”

“আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া,
ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচি স্ততঃ।
অথাসক্তি স্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি,
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥”

প্রথম শ্রদ্ধা, তদনন্তর সাধুসঙ্গ; তৎপরে ভজন ক্রিয়া, তৎপরে অনর্থ নিবৃত্তি, তাহার পর নিষ্ঠা, তাহার পর রুচি, তৎপরে আসক্তি, তদনন্তর ভাব এবং তাহার পর প্রেমের উদয় হয়। সাধকদিগের প্রেমাভির্ভাবের ইহাই ক্রম।

“যাঁহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
ক্ষান্তি রব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্ম্মানশূন্যতা,
আশাবন্ধা সমুৎকণ্ঠা নাম গানে-সদা রুচিঃ।
আসক্তি স্তদ্‌গুনাখ্যানে প্রীতি স্তদ্বসতিস্থলে,

"এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥
কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ-তারে নাহি ভায়
সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি জানে।
কৃষ্ণ-কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।
নাম গানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণ নাম॥
কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণ নানা স্থানে করে সর্ব্বদা পীরিতি॥

* * * *

শুদ্ধ ভক্তি হইতে হয় প্রেমের উৎপন্ন॥
অতএব শুদ্ধ ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকুল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি, ইহা হইতে প্রেম হয়।
পঞ্চ রাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥
"সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তি রুচ্যতে॥"

সমস্ত উপাধি রহিত, এবং নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্মাদি আবরণ শূন্য ইন্দ্রিয় ব্যাপার দ্বারায় এতাদৃশ কৃষ্ণ সেবনকে শুদ্ধ-ভক্তি বলে।

ভগবান অপ্রাকৃত, ভগবত প্রেম অপ্রাকৃত, ভগবান ও ভক্তের মধ্যে বিলাস ও অপ্রাকৃত। প্রাকৃত মানুষকে ইহা বুঝাইবার উপায় নাই, ইহার কোন ভাষা নাই, প্রাকৃত মানুষ বুঝিয়া উঠিবে এরূপ শক্তিও তাহার নাই। অপ্রাকৃত কোন বস্তুরই মানুষের ধারণা হয় না। একারণ ঋষিগণ রাধা-কৃষ্ণের প্রেম প্রাকৃতভাবেই বর্ণন করিয়াছেন। এই প্রাকৃত বর্ণনা হইতে সেই অপ্রাকৃত প্রেম-বিলাস্ যে কি তাহা মানুষকে বুঝিয়া লইতে হইবে। যাঁহাদের মধ্যে লীলা তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি পায় নাই তাঁহারা ইহার আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করেন, আর যাঁহাদের মধ্যে লীলাতত্ত্ব স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে তাঁহারা এই প্রাকৃত বর্ণনাই পরম উপাদেয় বস্তু জ্ঞান করেন।

কৃষ্ণ-প্রেম যাঁহার অন্তরে উদয় হয় তাঁহার ক্রিয়া-মুদ্রা পণ্ডিতেরাও বুঝিতে পারে না।

"যার চিত্তে কৃষ্ণ প্রেম করয়ে উদয়।
তার বাক্য-ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝায়॥"

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়,
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ অঃ ১৮ শ্লোক।

কবি-যোগীন্দ্র নিমি রাজাকে কহিলেন, মহারাজ

এই প্রকারে ভক্তি আচরণ করাই যাহার ব্রত, সেই ভক্ত নিজপ্রিয় ভগবানের নাম কীর্ত্তন দ্বারায় জাতপ্রেমা হইয়া শ্লথ হৃদয় হয়। এ নিমিত্ত কথনও উন্মাদবৎ উচ্চ হাসা করিয়া থাকেন। কখনও ক্রন্দন করেন, কথনও আক্রোশ প্রকাশ করেন, কথনও হর্ষে গান করেন, আর কখন কথন নৃত্য করিতে থাকেন।

মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে বলিতেছেন—

"নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম,
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম ॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক কহিও বিচারে॥"
"হরে র্নাম হরের্নাম হরে র্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্তেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যাথা ॥"
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লইতে লইতে মোর ভ্রান্ত হইল মন ॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি হইলাম উন্মত্ত।
হাঁসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদ মত্ত ॥
তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণ-নামে জ্ঞানাচ্ছন্ন করিল আমার ॥
পাগল হইলাম আমি ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি নিবেদিনু গুরুর চরণে ॥

"কিবা মন্ত্র দিলা গুরু কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু মোরে বলিল বচন॥"
কৃষ্ণ-নাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা, পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মানন্দাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥
কৃষ্ণ-নামের ফল প্রেমা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয়॥
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত তনু ক্ষোভ॥
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তে উপজয়ে লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কাঁদে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়॥
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্‌গদ বৈবর্ণ
উন্মাদ বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ দৈন্য॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ভাসায়॥

* * * * *

কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।

ব্রহ্মা পদ তার আগে খদ্যোতক সম ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা—সপ্তমপরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের বিকারও অত্যদ্ভুত। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের পাঠকগণ ইহা অবগত আছেন, পাঠক পাঠিকাগণের বিদিতার্থ এখানে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম——

"শেষ যে রহিল প্রভু! দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব দর্শনে।
এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
লোম কূপেরক্তোদ্‌গম দন্ত সব হেলে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥
গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব।
ভিতে মুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব॥
তিন দ্বারে কপাট, প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধু নীরে॥
চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে।
ধেয়ে চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে॥
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান।
তাঁহা যাই নাচে গায়, ক্ষণে মূর্চ্ছা যান॥

কাঁহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥
হস্ত পদের সন্ধি সব বিতস্তি প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে চর্ম্ম রহে স্থানে॥
হস্ত পদ শির সব শরীর ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয় কূর্ম্মরূপদেখিয়ে প্রভুরে॥
এই মত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা বাক্যে হা হা হুতাশ॥
কাঁহা করোঁ কাঁহা পাও ব্রজেন্দ্র নন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী-বদন।
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম দুর্লভ হইতেও সুদুর্লভ, ইহা জীবের ভাগ্যে কদাচিত ঘটিয়া থাকে—

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণ আদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥"

শ্রবণ আদি ভক্তি অঙ্গ যাজন দ্বারায় চিত্ত নির্ম্মল হয় মাত্র, কিন্তু কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয় না, ইহা ভগবানের বিশেষ দান। মহাপ্রভু আক্ষেপ করিয়া সনাতনকে বলিতেছেন—

"কৃষ্ণ-প্রেম জীবে না সম্ভবে সনাতন।"

তিনি অন্যত্র আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরা'পি মে হরৌ,
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং ॥
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা,
বিভর্ম্মি যৎপ্রাণ পতঙ্গকান্ বৃথা ॥

আমার শ্রীকৃষ্ণে প্রেম গন্ধও নাই, কেবল নিজ সৌভাগ্য ভব প্রকাশ করিবার জন্য ক্রন্দন করিতেছি। বংশীবিলাসী বদন অবলোকন ব্যতীত প্রাণ পতঙ্গগণকে বৃথা বহন করিতেছি।

দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ,
কেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়
তবে যে করি এ ক্রন্দন, সসৌভাগ্য প্রখ্যাপন,
করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
যাতে বংশীধ্বনি সুখ, না দেখি সে চাঁদ মুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজে দেহে করি প্রতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণ কীটের করিয়ে ধারণ ॥
কৃষ্ণ প্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥

শুদ্ধপ্রেম সুধাবিন্দু, পাইতার একবিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতি যায়॥"

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে মহাপ্রভু বিলাপ করিয়া বলিতেছেন

"অমূন্য ধন্যানি দিনান্তরাণি,
হরেত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈক সিন্ধো,
হা হন্ত, হা হন্ত, কথং নয়ামি॥

হে হরে! হে অনাথবন্ধো! হে করুণাসিন্ধো! তোমার দর্শন ব্যতীত এই অধন্য দিন সকল কি প্রকারে অতিবাহিত করিব।

তোমার দর্শন বিনে, অধন্য হই রাত্রি দিনে,
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন॥
বংশীগানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কায, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
সখি হে শুন মোর হত বিধি বল।

মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকলি বিফল ॥

কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিনী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।

কানাকড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হইল অকারণে ॥

কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ গুণ-চরিত,
সুধাসার স্বাদ বিনিন্দন।

তার আস্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক জিহ্বা সম ॥

মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।

হেন কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ, যার নাই সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥

কৃষ্ণ কর পদতল, কোটীচন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শ মণি।

তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লৌহ সম জানি ॥"

...ক্ষাৎ দর্শনে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

"কিবা সাক্ষাৎ কাম, দ্যুতি বিম্ব মূর্ত্তিমান,

কিম্বা মনো নেত্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥
গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনু মন,
নানা রীতে সতত নাচায়।
নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্য, হর্ষ, ধৈর্য্য মন্যু,
এই রীতে প্রভুর কাল যায় ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদ

মহাপ্রভু কৃষ্ণ বিরহে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে ॥"
"উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ যুগ সম।
বর্ষা মেঘ সম অশ্রু বর্ষে দ্বিনয়ন ॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ॥"

ঐ অন্ত্য বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণ বিরহে ক্ষণকাল থাকিতে পারে না শ্রীমতী সখাগণকে বলিতেছেন—

"হাহা প্রাণপ্রিয় সই কিনা হৈল মোরে।
কানু-প্রেম বিষে মোর তনু মন জরে ॥
রাত্রি দিনে পোড়ে হিয়া সোয়াস্থ না পাও
যাঁহা গেলে কানু পাও তাঁহা উড়িযাও ॥"

মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদের অবস্থায় বিলাপ করিয়া বলিতেছেন—

“হাহা কৃষ্ণ প্রাণধন, হাহা পদ্মলোচন,
হাহা দিব্য সদ্‌গুণ সাগর।
হাহা শ্যামসুন্দর, হাহা পীতাম্বরধর,
হাহা রাস-বিলাস নাগর॥
কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা যাই
এত বলি চলিল ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি,
নিজ স্থানে বসাইল লঞা॥
ক্ষণে প্রভুর বাহ্য হইল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
স্বরূপ কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতী, গীতগোবিন্দ গীতি,
শুনি প্রভুর জুড়াইল কান॥”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ১৭ পরিচ্ছেদ।

ভক্তগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ক্ষণকাল থাকিতে পারেন না, শ্রীকৃষ্ণও ভক্তগণকে ছাড়িয়া একদণ্ড থাকিতে পারেন না। পরস্পর পরস্পরের জন্য লালায়িত। উভয়ে মাথামাথি প্রতিনিয়ত বিবিধ বিলাস। একদণ্ড ছাড়াছাড়ি নাই। একের অদর্শনে যেন অপরের প্রাণ-বিয়োগ। এই জন্যই গোস্বামীপাদেরা বলিয়াছেন—

বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কোথায়ও যান না।
রায় রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিতেছেন—

"রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত
নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত"।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণ বা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন না, এ সব তাঁহার অংশের ও অবতারের কার্য্য। এই সকল কার্য্যে তাঁহাকে ব্যাপৃত থাকিতে হইলে ভক্ত-সঙ্গে তাঁহার বিলাস হয় না। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন তিনি স্বয়ং ভগবান "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"।

মৎস্য কূর্ম্মাদি অসংখ্য অবতারগণ তাঁহা হইতে নিসৃত। রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব লেখা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, ভক্তিশাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, পাঠকগণকে তাহার একটা আভাস দিবার জন্য ভক্তিশাস্ত্র হইতে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া উপহার দিলাম।

চিতা নির্ব্বান।

পরমাত্ম-তত্ত্ব, বা যোগ-তত্ত্ব ধর্ম্মের অতি উচ্চ অবস্থা, ইহা ব্রহ্মজ্ঞানের অনেক উপরের তত্ত্ব। ভজনের দ্বারায় ব্রহ্মজ্ঞান ভেদ হইলে তবে মানুষ এই তত্ত্বের অধিকারী হয়। কত যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র এই তত্ত্ব লাভ করিবার জন্য অরণ্যে গিরিকন্দরে আজীবন পরমাত্মার ধ্যান ধারনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন,সংসার ত্যাগ করিয়া অষ্টাঙ্গ-যোগ সাধনে শরীরপাত করিয়াছেন,অথচ অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি এই তত্ত্ব-লাভে সমর্থ হইয়াছেন। অধিকাংশ লোকে কেবল নেতি নেতিই উপলব্ধি করিয়াছেন।

ব্রজাঙ্গনাগণ যখন শ্রীকৃষ্ণ বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাগণকে এই যোগ-তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য পরম ভক্ত উদ্ধব মহাশয়কে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। উদ্ধব মহাশয় ব্রজে আসিয়া ব্রজাঙ্গ-নাদের প্রেম দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন

আসামহো চরণরেণু জুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।

যা দুস্ত্যজং সজনমার্য্য পথঞ্চ হিত্বা।
ভেজুর্মুকুন্দ পদবীং শ্রুতিভি র্বিমৃগ্যাং॥

সংপ্রতি গোপীদিগের ভাগ্য দূরে থাকুক, আমার এই প্রার্থনা, আমি এই সকল গোপীদের চরণরেণু সেবি বৃন্দা বনস্থ গুল্মলতা প্রভৃতি ওষধির মধ্যে কোন একটী হই। যেহেতু ইহারা দুস্ত্যজ স্বজন এবং সদাচার রীতি পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতির অন্বেষণীয় মুকুন্দ পদবীর ভজনা করিয়াছিলেন

ভগবত প্রেম সর্ব্বোপরি পরমাত্মতত্ত্ব ভেদ না হইলে মানুষ এই প্রেম-তত্ত্বে পৌঁছিতে পারে না। আমাদের মত গৃহিলোকের পক্ষে পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব। গৃহস্থ লোকে এই তত্ত্ব লাভ করিতে পারে ইহা আমার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। এই তত্ত্বটী কি তাহাও আমি বুঝিতে পারিতাম না। শাস্ত্রের মর্ম্ম আমার ধারণা হইত না।

সদ্গুরুর অসাধ্য কিছুই নাই, তাঁহার ইচ্ছা মাত্রেই সমস্ত তত্ত্বের প্রকাশ হইতে পারে। আমি নিতান্ত অযোগ্য হইলেও গোস্বামী মহাশয়ের কৃপায় বহুদিন হইল পরমাত্ম-তত্ত্ব লাভ হইয়াছে একথা পাঠকমহাশয়গণকে জানাইয়াছি কেবল যে এই তত্ত্ব লাভ হইয়াছে তাহা নহে; ইহা সম্যক্ উপভোগ এবং পরিশেষে ভেদ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। আপনারা এই কথা কতদূর পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারি-

লোকে বলে—"আপন ভজন কথা।
না কহিবে যথা তথা"॥

আপনার ভজনের কথা কহিতে নাই, ইহা আমি জানি এই সকল কথা আমার প্রকাশ করিবারও ইচ্ছা ছিল না। আমার জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা লিখিতেছি; লীলা গোপন করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। কর্ত্তব্য পালন করা হয় না এই জন্য কোন কোন ধর্ম্ম বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। বিশ্বাস করিতে হয় করিবেন, না করেন তাহাতেও ক্ষতি নাই।

পরমাত্ম তত্ত্ব লাভ করিয়া দেখিলাম,ইহাতেও মানুষের ত্রিতাপ নষ্ট হয় না। ইহা মানুষের পক্ষে নিরাপদ ভূমি নহে। ইহা হইতে পতন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। একারণ আমার মন ইহার উপরের তত্ত্ব লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব নিতান্ত সুদুর্ল্লভ। কৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিতে হইলে মানুষকে মাটি হইতে হয়; যতক্ষণ তাহার আপনার বলিতে কিছু থাকিবে ততক্ষণ সে এই প্রেমের অধিকারী হইবে না। কাম ক্রোধাদি রিপুগণের আধিপত্য হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, লাভ, প্রতিষ্ঠা, ধনৈশ্বর্য্য স্ত্রী পুত্রাদিতে আশক্তি,জল্পনা,কল্পনা ইত্যাদি থাকিতে কৃষ্ণ-প্রেমের আশা দুরাশা মাত্র। যিনি কৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিতে

করিতে হইবে। গ্রাম্য কথা কুসংসর্গ তাঁহার পক্ষে সর্ব্বোতোভাবে পরিত্যজ্য।

সংসার-সুখের লেশ মাত্র অন্তরে থাকিতে কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হইতে পারে না। এজন্য মনকে নিয়ত পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। এই পৃথিবীতে মানুষের যত প্রকার সুখের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কোনটিতে মন ক্ষণকালের জন্য পরিতৃপ্ত হইতে পারে কিনা। পার্থিব কোন একটি সুখে মন যতক্ষণ তৃপ্তি পাইবে ততক্ষণ মনের গতি ভগবানের দিকে হইবে না, জল্পনা কল্পনাও যাইবে না। মানুষ সংসারেই আবদ্ধ থাকিবে। সে কৃষ্ণ-প্রেমের অধিকারী নহে বুঝিতে হইবে।

কুকর্ম্ম না করিলে বা অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যে যথেষ্ট হইল তাহা মনে করিলে চলিবে না। মানুষ কুকাজ না করিলে বা কুসঙ্গে না মিশিলেও মনের মধ্যে কুচিন্তা বা কুসঙ্গের উদয় হইয়া থাকে। যতক্ষণ এইরূপ কুচিন্তার উয়ে হইবে ততক্ষণ বুঝিতে হইবে যে কুকার্য্যে বা কুসঙ্গে আশক্তি আছে, আমার দ্বারায় সেই সকল কুকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ধর্ম্মরাজ্যে কুচিন্তা ও কুকার্য্যে কোন তফাৎ নাই। এজন্য কুচিন্তার উদয় হইবা মাত্র তাহাকে তাড়াইয়া দিতে হইবে।

যতক্ষণ সংসার আছে ততক্ষণ চিন্তা, উদ্বেগ, ভয়,

চিত্তে বিন্দুমাত্র মলিনতা থাকিলে কৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হইতে পারে না।

মানুষ স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলিয়া চারিদিকে চীৎকার করিতেছে কিন্তু স্বাধীনতা যে কি তাহা তাঁহারা বুঝেন না। যতক্ষণ কাম ক্রোধাদি রিপুগণের পদাঘাত সহ্য করিতে হইতেছে, দুষ্প্রবৃত্তিগণ যতক্ষণ কানে ধরিয়া আমাদিগকে ঘোড়দৌড় করিতেছে ততক্ষণ আমাদের স্বাধীনতা কোথায়?

হিরণ্যকশিপু আপন পুত্র প্রহ্লাদের বিদ্যাশিক্ষা জন্য তাঁহাকে আপন গুরুপুত্র মহাপণ্ডিত ষণ্ডামর্কের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তিনি মাতৃগর্ভে থাকা কালীন দেবর্ষি নারদের নিকট ভগবানের নাম পাইয়াছিলেন। প্রহ্লাদ গুরুগৃহে ভগবানের নাম জপে কালাতিপাত করিতেন। তিনি গুরুগৃহের শিক্ষা সমাপন করিয়া পিতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইলে হিরণ্যকশিপু পরম আদরে প্রহ্লাদকে কোলে লইয়া তাঁহার শিরচুম্বন করিলেন এবং গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

হিরণ্য কশিপু—বাবা এতদিন গুরুগৃহে পাঠ্যাবস্থায় ছিলে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে, তুমি আমার কুল-তিলক, বল দেখি গুরুগৃহে কি উত্তম শিক্ষা লাভ করিয়াছ?

বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনং"। পিত ইহা অপেক্ষা উত্তম পাঠ এজগতে আর কিছু নাই।

এই কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্ধ হইয়া পুত্রকে র নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "দুরাত্মন্ তুই জানিস না আমি কে? আমি ত্রিভুবন বিজয়ী হিরণ্যকশিপু আমি সমস্ত শত্রুগণকে জয় করিয়াছি ত্রিলোক আমার বশীভূত। তোকে বারম্বার নিষেধ করিতেছি, তুই তথাপি আমার শত্রুর নাম করিস্? এখনি তোকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিব।" প্রহ্লাদ পিতার কথা শুনিয়া নির্ভয় চিত্তে যোড় হস্তে বলিলেন :—

পিত! কামক্রোধাদি রিপুগণ অপেক্ষা মানুষের প্রবল শত্রু আর নাই, যখন আপনি ইহাদিগকে জয় করিতে পারেন নাই, তখন কেমন করিয়া বলিতেছেন "আমি সমস্ত শত্রু জয় করিয়াছি। আর উৎপথগামী মনকে যখন বশীভূত করিতে পারেন নাই তখন ত্রিভুবন বশীভূত করিয়াছেন বলিয়াই বা কিপ্রকারে আস্ফালন করিতেছেন?"

বাস্তবিক কাম ক্রোধাদি প্রবল রিপুগণকে ও দুর্দ্দমনীয় দুষ্প্রবৃত্তিগণকে বশীভূত করিতে না পারিলে ধর্ম্মলাভ অসম্ভব। ইহাদিগকে বশীভূত করিবার কোন উপায় নাই। পুরুষকার দ্বারায় ইহাদিগকে কিছুদিন শান্ত রাখা যাইতে পারে বটে কিন্তু অল্পদিন পরে আর ইহাদিগকে শান্ত রাখা যাইবে না। তখন ইহাদের প্রবল আক্রমণে

ইহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় ভগবানের নাম। অবিশ্রান্ত শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ করিতে হইবে। কিন্তু নাম করা বড় কঠিন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বড় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

নাম্নামকারি বহুধা নিজকর্ম্ম শক্তি,
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তবকৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥
"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধ হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥
যেরূপে লইলে নামে প্রেম উপজয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥
"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥"
উত্তম হয়ে আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষাসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥

যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্মবৃষ্টি সহে আনের করয়ে পোষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হয়ে যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্যলীলা-বিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি নাম করা বড় কঠিন। পুরুষকার বলে নাম করিতে করিতে মানুষ হয়রাণ হইয়া পরে, মানুষের আর ধৈর্য্য থাকে না। ক্রমে নামে অবিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়। এইটী বড় বিপদের সময়। এই সময় সাধুসঙ্গ এবং ধৈর্য্য সহকারে নাম করিতে হয়। নাম করিতে করিতে ক্রমে নামে বিশ্বাস আসে, ক্রমে শুষ্কতা দুর হয়। সাধনরাজ্যে সহিষ্ণুতারই বিশেষ প্রয়োজন। নামের কৃপা হইলে আর ভাবনা নাই। গুরুশক্তি বলে আপনা হইতে নাম সর্ব্বদাই চলিতে থাকে, ক্রমে উহাকে আর বন্ধ করা অসম্ভব হইয়া হইয়া দাঁড়ায়।

আমি একজন উকিল, পদস্থলোক, বুদ্ধিমান ও অর্থশালী বলিয়া খ্যাত। সমাজে আমার যথেষ্ট মান-সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি আছে। আমার প্রভাব ও প্রতাপ সামান্য

অভিমানে স্ফীত। কাহাকেও দৃকপাৎ করি না। আমার মধ্যে তৃনাদপি শ্লোকের ভাব আসা অসম্ভব।

গোস্বামী মহাশয় আমাকে বহু বিপদে রক্ষা করিয়াছেন। মহারৌরব হইতে আমার চুলেরমুটি ধরিয়া আনিয়া নিজ পদ প্রান্তে উপস্থিত করিয়াছেন; মনে করিলে আমাকে এই দোকানের বিপদেও রক্ষা করিতে পারিতেন, আমাকে চিতানলে দগ্ধীভূত হইতে হইত না। কিন্তু সদ্বৈদ্য রোগীর প্রাণ রক্ষার জন্য যেমন রোগীকে টানিয়া ধরিয়া বলপূর্ব্বক অস্ত্রচালনা করিয়া তাহার মারাত্মক ফোড়া কাটিয়া দেয়, রোগীর কাকুতী মিনতী শুনে না, তেমনি সদ্‌গুরু ও শিষ্যের আত্মার মারাত্মক ব্যাধি আরাম করিবার জন্য নির্ম্মম হইয়া অস্ত্র চালনা করেন। শিষ্যের কাকুতী মিনতীতে কর্ণপাৎ করেন না।

সদ্‌গুরু শিষ্যের শত্রু নয়, পরম হিতৈষী, নিষ্ঠুর নহেন পরম দয়াবান। কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিবার জন্য তাঁহাকে এত আয়োজন করিতে হইল। তিনি সুকৌশলে চিতা সাজাইলেন, প্রজ্বলিত করিলেন এবং আমাকে হাতে পায়ে বান্ধিয়া তদুপরি নিক্ষেপ করিলেন। আমার জন্য তাঁহাকে কিনা করিতে হইল ?

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, আমার এই বিষম বিপদ আমার অনবধানতা, অপরিনাম দর্শিতা, অথবা

অদৃষ্টের লিখন। কর্ম্মবাদীগণ বলিতেন প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ। যিনি যাহাই বলুন আমি কিন্তু বলিতেছি এসব কিছুই নহে; ইহা গুরুদেবের বিশেষ করুনা। এই উপায়ে গুরুদেব আমার মত দুর্দ্দমনীয়, উদ্ধত এবং অহঙ্কৃত লোককে সায়েস্তা করিলেন। যেমন কুকুর, তেমনি থেটে; যেমন বদমাইস তেমনি শাস্তি।

আমি চিতানলে দগ্ধ হইবার সময় বেস বুঝিয়া ছিলাম, কোন সময় এই অগ্নি নির্ব্বান হইবে। যত দিন আমার দুষ্টমন সায়েস্তা না হইয়াছে যত দিন তৃণাদপি ভাবনা না আসিয়াছে তত দিন যে অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে না ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। একারণ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলাম। তদপর দুষ্টমন দমন হইলে ১৩২১ সালের শেষে এই দারুণ চিতানল নির্ব্বাপিত হইল। পারিবারিক অশান্তি দুর হইল; আত্মীয় ও ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপিত হইল; বিরোধী জমিদার গণের সহিত মনোবাদ মিটিয়া গেল; ফৌজদারি ও দেওয়ানি মোকদ্দমা রফা হইয়াগেল; পাওনাদারগণ উত্তেজনাকারী বিপক্ষগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত মিটমাট করিলেন। তাঁহারা আমার অবস্থা দেখিয়া আমাকে অনেক টাকা ছাড়িয়া দিলেন; আমি মজুদা ধান, জমি, পুষ্করিণি বাগিচা, তালুক

লইয়া তাহাদের সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া দিলাম। টাকা টাকায় শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ উপযোগী সম্পত্তিও থাকিয়া গেল। কাহাকেও একটি কথা বলিতে হইল না, সমস্ত আপনা হইতে নিষ্পন্ন হইল। যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই তৎসমুদয় আপনা হইতে সংসাধিত হইল; এই সব ব্যাপার দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম।

আমার চিন্তা, উদ্বেগ, ভয়, ভাবনা, সমস্ত দূর হইল। অহঙ্কার অভিমান প্রভুত্ব প্রতিপত্তি, মানসম্ভ্রম, প্রতিষ্ঠা সমস্ত গেল। ঘোর বিপদে পড়ায় লোকের পদানত হইতে শিখিলাম। পৃথিবীর ধনৈশ্বর্য্য সুখ বিলাস সমস্তই অনিত্য জ্ঞান হইল। এই উপায়ে গোস্বামী মহাশয় আমাকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদানের উপযোগী করিয়া লইলেন। আমার প্রাণের অবস্থা অন্যরূপ; আমি যেন আর একরাজ্যে বাস করিতেছি। গোস্বামী আমাকে ধূলীসাৎ করিয়া ফেলিলেন।

নব-জীবন লাভ।

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎযদি রতিংশ্রম এবহি কেবলম্॥"

সুত কহিলেন, হে ঋষিগণ? অতি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মও সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি হরি কথায় রতি উৎপাদন না করে তবে তাহা কেবল শ্রমমাত্র।

পাঠক মহাশয়গণ,আপনারা অনেকদিন আমার পরিচয় পাইয়াছেন। আমি যে প্রকৃতির লোক ও আমার যে ব্যবসা তাহাতে ধর্ম্মরাজ্যে আমার স্থান হওয়া অসম্ভব। গোঁসাই এত চক্রান্ত করিয়া কেন যে আমাকে আপন পদপ্রান্তে লইয়া গিয়াছিলেন বলিতে পারি না। তবে দয়া স্থানাস্থানের বিচার করে না। আমাকে মহারৌরবে পতিত হইতে দেখিয়া গুরু নিতান্ত দয়া পরবশ হইয়া আমাকে রক্ষা করিলেন।

মানুষ প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন; যাঁহার যে প্রকৃতি তাহা কিছুতেই যায় না। একমাত্র সদ্‌গুরুই কেবল প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন। এইজন্য লোকে বলে :—

"কয়লাকো ময়লা ছোড়ে যব আগ করে প্রবেশ"

কয়লার স্বভাব কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু অগ্নিসংযোগে উহা লাল বর্ণ ধারণ করে। মানুষ যতই কেন নারকী হউক না সদ্গুরুর কৃপা হইলে সে দেবতার সুদুর্ল্লভ অবস্থা লাভ করে। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া হতাশ হইবার কারণ নাই; যে যত কেন নারকী হউক না সদ্গুরুর নিকট গমন করুক জীবন নিশ্চয়ই মধুময় হইয়া যাইবে।

যেমন বীজ না পচিলে অঙ্কুর হয় না, তেমনি মানুষ না মরিলে জীবন পায় না। ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে মানুষকে জীয়ন্তে মরা হওয়া চাহি। ইন্দ্রিয়গণের ভোগ লালসা, সংসারসুখের বাসনা, এবং দুষ্প্রবৃত্তিগণের উত্তেজনা থাকিতে ধর্ম্মজীবন প্রস্তুত হয় না।

আমার ভিতরটা একটা ভীষণ অরণ্য ছিল; এই অরণ্য কাম ক্রোধ আদি ভীষণ দানবদৈত্য, পিশাচ আদির আবাসভূমি। এখানে বিষয় বাসনা, ইন্দ্রিয় লালসা নানারূপ বিবিধ মহীরুহ সকল জন্মিয়াছিল; হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতারূপ বিবিধ বিষধর সর্প সকল নিয়ত এই অরণ্যে বিচরণ করিত। দম্ভ, অহঙ্কার আদি সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি নানা হিংস্রক জন্তুর ভয়াবহ গর্জ্জনে এই বন নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত। কাহার সাধ্য যে এই বনের নিকটবর্ত্তী হয়।

সদ্গুরুর অসাধ্য কিছুই নাই, তিনি সুকৌশলে চিত্তা

সাজাইলেন, তাহাতে আগুণ ধরাইলেন, এবং আমাকে হাতে গলে বন্ধন করিয়া তদুপরি নিক্ষেপ করিলেন। আমার কঠিন প্রাণ, সহজে মৃত্যু হইবার নহে একারণ এত দীর্ঘকাল এই চিতাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলাম। আগুণ নিবাইবার বহু চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলাম না। এই অগ্নি যে কেবল আমাকেই পোড়াইতে লাগিল তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভীষণ অরণ্য জ্বলিয়া উঠিল। এই ভীষণ সিংহ শার্দ্দূল আদি যাবতীয় হিংস্র জন্তু, দৈত্য, দানব, পিশাচ আদি সকলেই ভস্মীভূত হইল। বৃক্ষ, লতা, কণ্টক আদির চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিল না। গোঁসাই খাণ্ডবদাহ করিতেছেন কাহার সাধ্য বাধা দেয়। চিতাগ্নি আমাকে ভস্মাবশেষে পরিণত করিয়া আপনা হইতে নির্ব্বাপিত হইল।

ভগবান মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে দয়া ধর্ম্ম পরোপকার, পরদুঃখকাতরতা, ভালবাসা ইত্যাদি সাধুবৃত্তি সকলের বীজ রোপণ করিয়া রাখিয়াছেন, আমার ভিতরটা নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ থাকায় ঐ সকল বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই।

এক্ষণ অরণ্য নাই, উহা সমতল ভূমিতে পরিণত হইয়াছে; বৃক্ষাদির ভস্মাবশেষ উৎকৃষ্ট সারের কাজ করিয়াছে; গুরু কৃপা করিয়া অবিশ্রান্ত শ্রবণ কীর্ত্তন জল বর্ষণ করাইতেছেন, ক্রমে বনভূমি উৎকৃষ্ট উর্ব্বরা ক্ষেত্রে

দয়া, পরোপকার, পরদুঃখকাতরতা ভালবাসা ইত্যাদি সাধুবৃত্তি সকলের যে সকল বীজ আমার মধ্যে নিহিত ছিল, অনুকূল অবস্থা পাইয়া ঐ সকল বীজ অঙ্কুরিত হইয়া সুন্দর সুন্দর বৃক্ষে পরিণত হইতেছে। ইতিমধ্যে কোন কোনটীতে ফুল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফুলের শোভা ও সৌরভে চারি দিক আমোদিত। কণ্টকাকীর্ণ ভীষণ অরণ্য এক্ষণ নন্দনকাননে পরিণত হইতে চলিয়াছে। গোঁসাইর তুল্য মালাকর আর আমি দেখি না। যাহা একেবারেই অসম্ভব তাহা তিনি কার্য্যে পরিণত করিলেন।

গোঁসাই কৃপা করিয়া এই জঙ্গলভূমি মধ্যে যে ভক্তি লতার বীজ রোপণ করিয়াছিলেন এই বীজটি অঙ্কুরিত হইয়া উদ্যান মধ্যে একটি অতি সুন্দর লতা জন্মিয়াছে। ঐ লতা শিশুটিকে গুরু সযতনে রক্ষা করিতেছেন। শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল ঐ লতায় প্রতিনিয়ত সিঞ্চিত হইতেছে। লতার গায়ে লাভ, প্রতিষ্ঠা, ভুক্তি, মুক্তি ইত্যাদি পাছে কোন উপশাখার উদ্গম হয় এইজন্য তিনি বিলক্ষণ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। লতাশিশুটি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। সময়ে এই লতা যে শ্রীকৃষ্ণ-পদকল্প-বৃক্ষে জড়াইয়া উঠিবে না একথা আর বলা যায় না। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস এই লতা উপযুক্ত সময়ে প্রেমফল প্রসব করিবে, আমি উহা আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ

সদ্‌গুরু অনন্ত, তাঁহার লীলাও অনন্ত, লীলা শেষ হয় নাই; লীলা অনন্তকাল চলিবে। গোঁসাইর লীলা বর্ণন করি আমার এরূপ সাধ্য নাই, আমার ক্ষুদ্র জীবনের কয়েকটা দিনের লীলার কিঞ্চিৎ মাত্র পাঠক পাঠিকা-গণকে উপহার দিলাম। গোস্বামী মহাশয়ের হাজার হাজার শিষ্য আছেন, প্রত্যেকের জীবনে তিনি অনন্তরূপে লীলা করিয়াছেন ও করিতেছেন। সে সব কথা সাধারণে প্রকাশ পাইতেছে না। কারণ কেহই আপনার জীবনের কথা সাধারণে প্রকাশ করিতে রাজি নহেন।

কোন কোন গুরু ভাইর একান্ত অনুরোধে আমি আমার জীবনে গোস্বামী মহাশয়ের লীলার একটা আভাস দিলাম। যদি আরও কিছু কাল বাঁচিয়া থাকি, ভবিষ্যতে আমার জীবনে আরও যে সব লীলা হইবে তাহা পাঠক মহাশয়গণকে জানাইবার ইচ্ছা থাকিল।

আমি এই পর্য্যন্ত লিখিয়া গ্রন্থ শেষ করিলাম। পাঠকগণকে আমার বিনীত নিবেদন তাঁহারা যেন নিরপেক্ষ ভাবে মনোযোগের সহিত এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি কাহারও কোন উপকার হয় তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

নানা কারণ বশতঃ ছাপায় অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে। পাঠকমহাশয় গণের পাঠ করিতে বড়ই ক্লেশানুভব

হইবে, এজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহাদের নিকট আমি অবনত মস্তকে প্রার্থনা করিতেছি তাহারা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। ইতি—

সমাপ্ত